ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র

ষাণ্মাসিক সূচী

৩য় বর্ষ । ১ম খণ্ড

মে ১৯৬৩—অক্টোবর ১৯৬৩

বৈশাখ ১৩৭০—আশ্বিন ১৩৭০

সম্পাদক

লীলা মজুমদার

সত্যজিৎ রায়

অনুগামীর আশা	....	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	....	১৫৭
অনেক ভোরে	....	প্রসূন মিত্র	....	৯৩
উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা	....	সুবিমল রায়		২২
এক যে ছিল কাল		পরিমল গোস্বামী	....	৪৫
এ সি সরকারের ম্যাজিক কবিতা				৮২, ১২২, ১৬৮ ২৭২, ৩৫৩
কাজির বিচার	....	উপেন্দ্রকিশোর রায়	....	১৩৮
কাজির বিচার	....	সুকোমল বসু	....	১৮২
কুয়াশার কাজ	....	উপেন্দ্রকিশোর রায়	....	১২
কে রাজা ?	....	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	....	২২৭
কোথা থেকে এল	....	জ্যোতিভূষণ চাকী	....	২৬৯
ক্যারিবিয়ানের ঢেউ			....	২৯০
[illegible]াব কী	....	অসীম রায়চৌধুরী	....	৩৫৬
[illegible]াল পোলে পাজি বুড়ো	....	শচীন মিত্র	....	২৮২
[illegible]লা দেখে যান	....	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	....	৪৩
[illegible]াকার এন্‌জিন	....	নির্মলেন্দু গৌতম	....	৩৩৮
[illegible]রুড়ের কথা	....	উপেন্দ্রকিশোর রায়		১৯৪, ২৫০
[illegible]রলয়	....	উপেন্দ্রকিশোর রায়	....	১৫
[illegible]ড়ের মাঠের উলট পুরাণ	....	রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	....	১২৬
[illegible]াপালনের গোড়ার কথা	....	ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	....	৩৬৩
[illegible]ণ্টুলালের চটি	....	সুনির্মল বসু	....	২৯৩
[illegible]াদের কথা	....		....	১৭০
[illegible]বি আঁকিয়ে	....	সামসুর রাহমান	....	১৯৩
[illegible]ানু চোর চানু	....	উপেন্দ্রকিশোর রায়	....	২
[illegible]পান্তরের মাঠ	....	উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	....	১৩৭
[illegible]নরাও আসতে পার"	....	জয়ন্ত চৌধুরী		১৪০, ১৯৮, ২৫৫
গোল-মোটে	....	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	....	৩৩

ৱিজেন্দ্রলাল	রবীন্দ্রলাল রায়	২০৬
াখা		৯১, ১৩৪, ১৯১, ২৪৭, ২৯২, ৩৭১
ৱঙ্কুলাল	প্রিয়ম্বদা দেবী	.... ২৫৯, ৩০৩
টলবাবু ফিল্মস্টার	সত্যজিৎ রায়	.... ২০১
ত্রবন্ধু		১৮৯, ২২৩, ২৮০
লকা	গৌরী চৌধুরী	.... ৭৩
লাশগড়ের রহস্য	নলিনী দাশ	৬৩, ১১৩, ১৭৩, ২৩১
রশুরাম	উপেন্দ্রকিশোর রায়	.... ৯৪
াখির দেশে	সুখলতা রাও	.... ২৯৭
াজি পিটার	উপেন্দ্রকিশোর রায়	.... ৩১৯
াক্কা	প্রসাদ রায়	.... ৩৩৩
কৃতি-পড়য়ার দপ্তর	জীবন সর্দার	৪১, ১০৮, ১৫১, ২১৫, ২৬৫, ৩৪৯
তিযোগিতা		৯২, ১৮৯, ২৪৫, ৩৬৯
তিযোগিতার লেখা		.... ৩১৭
া	বাণী রায়	.... ২৪৯
জে হাতে করে দেখ		৪৪, ১৮১, ২২৫, ৩৬৬
মন্তন্ন	উপেন্দ্রকিশোর রায়	.... ১
দরের বাদরামি	কল্পনা রায়	.... ২৮৩
পিন চৌধুরীর স্মৃ	সত্যজিৎ রায়	.... ৩৩৯
রতের জাতীয় পক্ষী	জীবন সর্দার	৮১
সে এক কুমির	গোবিন্দপ্রসাদ বসু	.... ৩৬১
চু পিচ্চু		.... ১২৪
বীর পঞ্চতন্ত্র	গৌরী চৌধুরী	.... ১৪৩
এখানে আস	জয়ন্ত চৌধুরী	.... ১০১
ুয়ারের ছোকরা বাঘ	বুদ্ধদেব গুহ	.... ৩১৩
গাড়ির গান	উপেন্দ্রকিশোর রায়	১৯
স এজবাস্টন গড়ের মাঠ		.... ১৮৯
রের ছড়া	সত্যজিৎ রায়	.... ২৭০
আর শীকড়		.... ২৪৪

শিবু আর রাক্ষসের কথা .... সত্যজিৎ রায় ৪৯

সদানন্দ স্বদেশলাল .... সুবিমল রায় ৩২৩
সম্পাদকের চিঠি ৮৬
সস্তার রামধনু দেখুন .... শিবানী রায়চৌধুরী ১০৫

হট্টমালার দেশে .... প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার ৩৬, ১২৮, ১৫৮, ২১৯
২৭৪, ৩৫
হাত পাকাবার আসর ৮৮, ১১৯, ১৬৩, ২৪২, ২৮৭, ৩৬
হুলোর গল্প .... যতীন্দ্রনাথ পাল ২২

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

তৃতীয় বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

নভেম্বর ১৯৬৩—এপ্রিল ১৯৬৪

কার্তিক ১৩৭০—চৈত্র ১৩৭০

সম্পাদক

লীলা মজুমদার

সত্যজিৎ রায়

অধ্যবসায়ের পুরস্কার	শশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী	১৯৮
উচিত শিক্ষা	শশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী	৭৪
এক যে ছিল ডাইনি	বিনোদ বেরা	২৩
এক স্বাভাবিক পশুশালা	...	১২৭
এ সি সরকারের ম্যাজিক কবিতা	...	১০৬
কবিতায় হেঁয়ালি	জয়ন্তকুমার মিত্র	২৩৪
কদ্রু ও বিনতার কথা	উপেন্দ্রকিশোর রায়	২১৭
কাঠকুটুম বুড়ো	জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী	১০২
কিচ্ছু নয়	বিমল দত্ত	৮৯
গল্পের চেয়ে ভয়ংকর	ময়ূখ চৌধুরী	৬২
ঘণ্টার শব্দ	জয়ন্তী সেন	৮৩
চৌভাগা বছর	...	১৭৯
ছবি আঁকা	...	২১
ছবির বাবা	কানাই সামন্ত	৪১
ছেলেবেলায়	...	৪৭
জরৎকারুর কথা	উপেন্দ্রকিশোর রায়	১৫৫, ১৯৫
ঝনঝনিয়ে ঢাল তলোয়ার	নির্মলেন্দু গৌতম	১২৯
তিনটি ছড়া	বিমল দত্ত	১৬০
ধাঁধা	...	৮৭, ১৩৫
নতুন বছর	সুরুচি সেনগুপ্ত	১৯৩
নতুন প্রতিযোগিতা	...	২৩৯
ন্যায্য জবাব	শশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী	১৫৩
নিখিলবঙ্গ কবিতা সংঘ	নলিনী দাশ	২২১
টিপাটিপির কথা	রমলা কর	২০৯
টোপাকুল	প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	২২০
পঞ্চুলাল	প্রিয়ম্বদা দেবী	১৪, ৪৬, ৯০, ১৪৮
পাখির গান	উপেন্দ্রকিশোর রায়	২৭
প্রতিযোগিতার লেখা	...	৫৮

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর	জীবন সর্দার	৫, ৭০, ৯৮, ১৬১, ২৩৫
প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড়	সত্যজিৎ রায়	১১৫
বাতাবিলেবু রাজকন্যা	অমিতাকুমারী বসু	১৮১
বাদুড় বিভীষিকা	সত্যজিৎ রায়	১৬৫
বাংলার খেলা	খেলার সাথী	১১৪
বিলির বিপদ	এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়	১৩৭
বীর ও শিশু	ননীগোপাল মজুমদার	৭৭
ভেলকির গল্প	শিবানী রায়চৌধুরী	২৪
মহাপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৮
রকেট রকেট	তুষার চট্টোপাধ্যায়	৬১
লালবাড়ির ঘুলঘুলিতে	গৌরী চৌধুরী	১০৮
লাস্কর	...	২১৩
শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা	উপেন্দ্রকিশোর রায়	২;
সম্পাদকের চিঠি	...	২৩৮
সন্দেশখালির ছন্দ	রেবতীভূষণ ঘোষ	১৪৭
সাভোর প্রান্তরে	অমল বন্দ্যোপাধায়	১৩৯
স্টোনহেঞ্জের রহস্য	...	১৪৩
স্বপ্ন চোখে জুড়ছিল	শৈলশেখর মিত্র	১
হট্টমালার দেশে	প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার	৩২, ৮০, ১৩০, ১৭৫, ২০৩, ২৩০
হাত পাকাবার আসর	...	৩৬, ২০৯
হারকিউলিসের গল্প	কমলা চট্টোপাধ্যায়	৯

মামদো পুতুল আসছে তেড়ে
কাঠের ঘোড়া খটখটাং,
সামনেওয়ালা জলদি ভাগো
নইলে পরে চিতপটাং ॥

ছড়া ও ছবি । সুকুমার রায়

৩য় বর্ষ । ৩য় সংখ্যা।

জুলাই ১৯৬৩ । আষাঢ় ১৩৭০

তেপান্তরের মাঠ

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

তোমার আমার মনের মণিকোঠায়
আজও আছে তেপান্তরের মাঠ।
সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর পারে
ঢেউখেলানো মায়া-পাহাড়
ক্ষীরসাগরের ধারে
অচিন দেশে তেপান্তরের মাঠ ॥

পথহারানো রাজপুত্তুর-রাজকন্যের দল
মনের মাঝে আজও যেন করছে আনাগোনা।
গহীন বনে গহন রাতে জ্বলে
অজগরের মাথার মানিকখানা ॥

গা-ছমছম জটেবুড়ী বটগাছটার ডালে
বেঙ্গমা আর বেঙ্গমীদের
ছায়ায় ঘেরা বাড়ি,
পক্ষিরাজের পিঠের ওপর চড়ে
এক নিমেষেই
সেথায় যেতে পারি !!

কাজির বিচার

উপেন্দ্রকিশোর রায়

রামকানাই ভাল মানুষ—নেহাত গোবেচারা। কিন্তু ঝুটারাম লোকটি বেজায় ফন্দিবাজ। দুইজনে দেখা-শোনা আলাপ-সালাপ হল। ঝুটারাম বললে, 'ভাই, দুজনেই বোঝা বয়ে খামখা কষ্ট পাই কেন? এই নাও, আমার পুঁটলিটাও তোমায় দিই—এখন তুমি সব বয়ে নাও—ফিরবার সময় আমি বইব।' রামকানাই ভালমানুষের মতো দুজনের বোঝা ঘাড়ে করে চলল।

গ্রামের কাছে এসে তাদের খুব খিদে পেয়েছে; রামকানাই বলল, 'এখন খাওয়া যাক—কী বল?' ঝুটারাম বলল, 'বেশ তো, এক কাজ করো। খাবারের হাঁড়ি দুটোই খুলে কাজ নেই—মিছামিছি দুটোই নষ্ট করবে কেন? এখন তোমারটা থেকে খাওয়া যাক—ফিরবার সময় আমার খাবারটা খাওয়া যাবে।' রামকানাই তাই করল।

ঝুটারাম বলল, 'ভাই, তোমার বাড়ি কে কে আছে?' রামকানাই তার বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, ছেলেপিলে সকলের কথা বলতে লাগল—তার মেয়ে কত বড় হয়েছে—তার ছেলে কী করে—সব কথা বলল। রামকানাই যত কথা বলে, ঝুটারাম ততই আরও প্রশ্ন করে, আর গপাগপ ভাত মুখে দেয়। রামকানাই গল্পেই মত্ত, তার যখন হুঁশ হল—ততক্ষণে খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ঝুটারাম খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গম্ভীরভাবে হাতমুখ ধুয়ে বলল, 'ভাই, একটি কথা। তুমি যে আমায় খাওয়ালে সে এমন বিশ্রী রান্না, যে কী বলব! তুমি এমন খারাপ লোক তা আমি জানতাম না, নেহাত তুমি বন্ধু মানুষ, তোমায় আর বেশী কী বলব; কিন্তু এর পর আর তোমার সঙ্গে আমার ভাব রাখা চলে না। আমি চললাম।' এই বলে সে ভরা-হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে হনহন করে চলে গেল। রামকানাই বেচারার পেটও ভরে নি—ঝুটারামের ভাগ থেকে যে খাবার আশা ছিল তাও গেল। সন্ধ্যার সময় পেটে খিদে নিয়ে এতখানি পথ হেঁটে কী করে সে বাড়ি ফিরবে—তাই ভেবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কাজির পেয়াদা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে রামকানাইকে বলল, 'কাঁদ কেন?' রামকানাই তাকে সব কথা বলল। পেয়াদা বলল, 'এই কথা। চলো দেখি, কাজিসাহেবের কাছে। তিনি এর বিচার করবেন।' কাজির কাছে হাজির হতেই হুজুর বললেন, 'কী চাও?' রামকানাই তাঁকেও সব শোনাল। কাজি শুনে বললেন, 'হাঃ—হাঃ—হাঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—এমন মজা তো কখনও শুনি নি! আরে, তোকে দিয়ে জিনিস বইয়ে, আবার তোরই ভাত খেয়ে গেল? তোর আক্কেল ছিল কোথায়?—হাঃ হাঃ হা—বোলাও ঝুটারামকো!' পেয়াদা ছুটল, লোক-লশকর সবাই ছুটল—তিন মিনিটের মধ্যে ঝুটারামের ঝুঁটি ধরে কাজির সামনে দাঁড় করাল।

কাজি বললেন, 'আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও! গাঁয়ের মোড়লকে ডাকো, শেঠজিকে ডাকো, কোটাল

বড্ডি গুরুমশাই --ঢাক পিটিয়ে সবাইকে ডাকো, এমন মজার কথাটা সবাই এসে শুনে যাক।' দেখতে দেখতে ঘর ভরিয়ে ভিড় জমিয়ে লোকের দল হাজির হল। তখন কাজি বললেন, 'বাবা ঝুটারাম, এবার তুমি বলো দেখি, তোমাতে আর এঁতে কী হয়েছিল?' ঝুটারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমি কিচ্ছু জানি না। ওই হতভাগা আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে খানিকটা খাবার খাইয়েছিল-- সেই থেকে আমার মাথা ঘুরছে আর কেমন কেমন করছে।'

এই কথা শুনে রেগে চীৎকার করে কাজি বললেন, 'পাজি, আমার মজার গল্পটা মাটি করলি। খাবার খেলি আর মাথা ঘুরল, এ কি একটা কথা হল? পেয়াদা, দেখ তো ওর কাছে কী আছে। সব কেড়ে রাখ। ব্যাটার গল্পের মধ্যে যদি একটুকু রস থাকে। ওসব ওই রামকানাইকে দিয়ে দে। ও যা বলেছে, সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তার মধ্যে মজা আছে। আরে--হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হেঃ।'

জলহস্তীর জলকুস্তি ফোটো। শঙ্কর সেন

তোমরাও আসতে পার

জয়ন্ত চৌধুরী

[জুন সংখ্যার পর]

ফাঁক পেয়ে এইমাত্র মুখ-হাত ধুয়ে দাঁত মেজে ফিরে এসে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি খালি ধূ ধূ কালচে পাথুরে জমি—মাঝে মাঝে একটু হালকা রঙ। নিশ্চয়ই সেগুলো বৃষ্টির জলে ধোয়া রুক্ষ মাটির তৈরী নীচু জমি। মাঝে মাঝে নদী—সরু সুতোর মতো। একটা বাঁধ নজরে পড়ল; নিশ্চয়ই বাঁধ, কেননা একদিকে আঁকাবাঁকা নদী, তারপরেই অনেকখানি চওড়া জল, মাঝখানে সোজা একটা দেশলাইয়ের কাঠির মতো দেখতে পাঁচিল। নীচে এখন বড় বড় হ্রদ চোখে পড়ছে।

মাইকে বললে, আমরা সিরিয়ার উপর দিয়ে চলেছি। আধ ঘন্টার মধ্যেই বৈরুট পৌছব। একটু একটু বসতির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত খালি কালচে জমির উপর হালকা মাটি-রঙের দাগ—আঁকাবাঁকা ছোট-বড় জলধারা। ঠিক যেন কেউ বড় বড় ডালপালাওয়ালা গাছের ছবি খোদাই করেছে। কোনো গাছের ডালপালা অনেক, কোনোটা বা সিড়িঙ্গে—তবে সবই শীতকালের গাছ, পাতা নেই।

মাইকে বলছে, 'ডান দিকে তাকাও, ওই দামাস্কাস শহর।'—বাঃ, ছবি আঁকলে লোকে বলবে অস্বাভাবিক হয়েছে। ছোট্ট একটা পাহাড়, তার কোলে কোলে রাস্তা, ঘর-বাড়ি—আর চৌখুপি সব সবুজ ক্ষেত। খানিক পরেই আধুনিক দামাস্কাস—রাস্তা, খাল, ছোট্ট ছোট্ট বাড়ির জটলা। কী সুন্দর কী করে বোঝাব?—এবার লেবাননে ঢুকছি বললে। বেল্ট বাঁধতে বলছে, পাহাড়ের কাছে, টালমাটাল খাবে খুব নাকি প্লেনটা।

* * *

একটা পর্বতশ্রেণী পার হলাম। ঝাঁকুনি-টাকুনি কিছুই লাগল না। পাহাড় পেরোতেই যেন সিনেমার ছবি বদলে গেল।—পাহাড়ের এপারে খালি সবুজ আর সবুজ—মানুষের তৈরি সবুজ। সবুজ যে এত রকমের হয় কে জানত! সবুজ পার হয়ে আবার একসার পাহাড়—মানে ওটা মধ্যবর্তী উপত্যকা। বাড়িঘরও বেশ,—সব যেন রাসের পুতুল সাজিয়ে রেখেছে। পাহাড়গুলো নেড়া-নেড়া, একটু একটু কুচো চুল আছে, তাও অর্ধেক 'ইকুনে' খেয়েছে!—বলছে, বৈরুটে নামা হচ্ছে। লিখতে লিখতে দেখি সমুদ্দুরের ওপর এসে পড়েছি! নীচে কালচে রঙ—একটু একটু ঝিকঝিক করে চমকাচ্ছে

আলোয় তাই, না হলে জল বলে বোঝা শক্ত। ঐ ভূমধ্যসাগর। কেউ বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, মনে হল সমুদ্রটা ক্রমশ দূরের দিকে যেন উঁচু হয়ে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। (বৈরুটে পদার্পণ—চাকার্পণ করা গেল) আর সত্যি সত্যি দিক্‌চক্রবালের কাছে পৃথিবীর গোলাকৃতির আভাস পরিষ্কার বোঝা গেল।

* * *

এইমাত্র বৈরুট এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ থেকে ঘুরে এলুম। বৈরুট হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, মানে কেনাকাটা যত ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে করা যায়। কিন্তু আমি আর এখন জিনিস নিয়ে করব কী? তবু সবাই দল বেঁধে বেরুলাম প্লেন থেকে—একটু হাত-পা মেলা হল। প্লেনের সিঁড়ি থেকে লাউঞ্জ পর্যন্ত বাসে করে নিয়ে গেল। সেখানে অটোমেটিক লিফ্‌টে দোতলার বারান্দায়। সেখানে চা খাবার জায়গা আর বাজার। কী অদ্ভুত সুন্দর সাজানো যে সিনেমার সেটকেও হার মানায়। অবিশ্যি রুচি অনেক ভাল। সেইখানে যত সাহেব-মেম, গ্রীক, লেবানিজদের সঙ্গে আমি দিব্যি ঘুরে ঘুরে দোকান দেখলুম, জিনিসপত্রের দর জিগেস করলুম।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এমনিতে যেন কিছুই অসাধারণ বা আশ্চর্য মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে যেন এই রকমই তো হবার কথা ছিল! ভেবেচিন্তে তবে আশ্চর্য হতে হচ্ছে—আশ্চর্য!—শুধু ভাবছিলুম গতকাল রাত্তিরে এবং তার আগে ৩৬ বছরের দিনরাত্তিরে যে পরিবেশে যে আবহাওয়ায়, যে সঙ্গে বা সাহচর্যে, যে খাদ্যে, যে ভাষায় এবং যে মনোভাব নিয়ে বাস করে এসেছি,—আজ সকালেই তার এত বদল?—বৈরুটের ঘড়িতে ৭-৫ মিঃ; কলকাতায় তখন বেলা কত?

আবার সমুদ্র পাচ্ছি একটু,—দূরে নীচুতে পাহাড়, তার পাশ থেকে সমুদ্র,—আমাদের প্লেনের তলা পর্যন্ত—আর পাহাড়ের কাছাকাছি সমুদ্রের ওপর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একস্তর স্তূপ-মেঘ—আমরা তারও ওপরে। আগে সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসবার সময়ে একটা জাহাজ (তা ছাড়া আর কী হতে পারে?) দেখেছিলাম—ঠিক যেন খুব ছোট্ট একটা কাগজের কুঁচি!

বৈরুটের লোকেদের চেহারা বেঁটে ছোটখাট অথচ গাঁট্টাগোঁট্টা—খুব কড়া দাড়ি-গোঁফ! আসলে বৈরুট আসবার আগে যে সমুদ্রের কথা বলেছি, ওটা ঠিক সমুদ্র নয়—সমুদ্রের কোনো অংশ হতে পারে, বা ডেডসীর কিছুটা জলভর্তি অংশ। বৈরুট থেকে ইস্তাম্বুল যাবার পথে আসল ভূমধ্যসাগর পেলাম—মাঝখানে সাইপ্রাস্ দ্বীপ পার হলাম। কত রকমের কত দৃশ্য আর বর্ণনা করব? তোমরা দেখতে পেলে না বলে মন খারাপ লাগছে।

সমুদ্রের জল দেখলে মনেই হয় না ওটা জল—কোনো নড়ন-চড়ন নেই, নীলচে কালো শ্লেট পাথরে যেন ঢেউখেলানো খাঁজকাটা যেমনকার তেমনি খাঁজ, একটুও বদল হচ্ছে না—স্থির, স্তম্ভিত। তার ওপর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। তারও ওপরে আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে দেখছি—নীচে

জল, তার ওপর মেঘ—জলের ওপর সেই মেঘেরই ছায়া! ক্রীটের ওপর পাহাড়ের সারি, তার ওপর মেঘ সাদা ধবধবে; মনে হয় পাহাড় ফেটে থোকা থোকা তুলো ফুটে বেরিয়েছে। জায়গায় জায়গায় এত মেঘের জটলা যে পাহাড় ঢেকে গেছে।

কফি?—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

ছোট্ট ট্রেতে কাগজের তোয়ালে পাতা, তার ওপর চামচে, ডিশের ওপর ইয়া বড় একটা কেক-জাতীয় ফাঁপা-ফাঁপা বস্তু, এক প্যাকেট চিনি, ছোট্ট কাগজের গেলাসভর্তি ক্রীম!—চাল্লাও!

সূর্যের আলো কিভাবে পৃথিবীতে পড়ে, পড়ে কিভাবে আলো-আঁধারির সৃষ্টি করে, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মেঘ, বাষ্প, ধুলো এই সবের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে ওপরকার আকাশে কেমন আলোর খেলা চলে- তা এই প্রথম টের পেলাম।

নীচে ত্যাড়াবাঁকা, চৌকো, লম্বাটে সব জ্যামিতিক ঘর কাটা দেখা যাচ্ছে,- তার মানে ইস্তাম্বুল এসে গেল, কলকাতার ঘড়িতে এখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। আবার একটু জল—ডান দিকে কিনারা দেখতে পাচ্ছি,—নিশ্চয়ই 'মর্মর উপসাগর'। এর তীরেই ইস্তাম্বুল- তাই তো? সামনের ডান দিক ঘেঁষে এত মেঘের পর মেঘ যে তাতে সূর্যের আলো পড়ে রুপোর মতো ঝকঝক করছে। ও দিকে নীচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ওফ্! কানে তালা আর কিছুতেই ছাড়ছে না—ঠিক যেমন গভীর জলে ডুব দিলে হয়। তার ওপর প্লেনটা ঝপাত করে নীচে নামল। সঙ্গে সঙ্গে কান একেবারে বন্ধ।

ইস্তাম্বুল এসে গেল। এখন একেবারে মেঘের ভিতর দিয়ে চলেছি, ঠিক রান্নাঘরের উনুনের ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। সূর্যের আলোও মাঝে মাঝে কমে যাচ্ছে। ইস্তাম্বুলে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? নাঃ, পরিষ্কার।

একটা স্টীমার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; নিশ্চয়ই এটা মর্মর উপসাগর। অনেকগুলো স্টীমার যাতায়াত করছে, একটা-আধটা নয়। (প্লেন কিন্তু বেশ দোলা দেয়—হাতের লেখার যা অবস্থা হচ্ছে) ওই! আবার মাইক বলছে—বেল্ট লাগাও!

ইস্তাম্বুল।

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে

গৌরী চৌধুরী

মণিভদ্র

। বৃহল্লাঙ্গুল ।

ভবদেব আরম্ভ করল—

একটি মাঝারি গোছের রাজ্য। রাজার নাম চন্দ্র। হাতিশাল ঘোড়াশাল তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে রাজবাড়ির বাগানে একটি বানরের দল, আর বাগানের পাশেই সবুজ মাঠে একটি ভেড়ার পাল।

প্রতিদিন সকাল-বিকেল রাজপুত্ররা এসে বানরদের নিজের হাতে করে খাওয়ায় আঙুর-বেদানা, মণ্ডা-মিঠাই, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। বানরেরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে খায়, আর গাছের ডালে দাপাদাপি করে বেড়ায়।

পাশের সবুজ মাঠে গিয়ে ভেড়াদের পিঠে চড়ে খেলা করে, ছুটোছুটি করে খোকা-রাজপুত্রেরা। তারপর প্রাসাদে ফিরে যায়।

যেদিকটায় মাঠ আর বাগান, সেইদিকটায় হচ্ছে প্রাসাদের পাকশাল। প্রকাণ্ড একতলা বাড়ি। লম্বা দালানের কোলে সারি সারি ঘর। দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে। হাতা-খুন্তি-বেড়ি হাতে কোমরে গামছা বেঁধে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরছে, রাঁধছে, গল্প করছে, বকাবকি করছে চল্লিশ-পঞ্চাশটি রাঁধুনী। কোনো ঘরে মন মন দুধের ক্ষীর হচ্ছে, কোনো ঘরে পিঠে-পায়স-খাজা-গজা, কোনো ঘরে শুধু ভাজাভুজি, কোথাও শুধু মাছ, কোথাও শুধু মাংস, একটা ঘরে হচ্ছে ছত্রিশ রকমের পোলাও। মাঝখানের বড় ঘরে সারি সারি বঁটি পেতে দাসীরা ঘ্যাঁচাঘ্যাঁচ কুটনো কুটছে—জালার মতো বড় বড় কুমড়ো, পাশবালিশের মতো লাউ, মাদলের মতো মোচা, থামের মতো থোড়, মুলো-বেগুন-পালংশাক, উচ্ছে-পলতা, সিম-বরবটি, আঁচকলা-কাঁচকলা, নটেশাক-ডেঙোডাঁটা, আদা, এঁচোড়, বাঁশের কোঁড়, পাকাকুল, সজনেফুল। লকলকে কুমড়োডগা তুলে নিয়ে একজন বলছে—কুটব? কুটব? অন্যজন বলছে—কোটো, কোটো, কুটে ফেল। রাজা খেতে বাসেন ভালো। বড় বড় পটোলের ঝুড়িটা দেখিয়ে একজন ওধার থেকে হাঁকছে—কুটব? কুটব? এ বলছে—কুটো না, কুটো না। রাজা মুখে তোলেন না।

পাশের ঘরটায় দাসীদের বড় মেয়েরা বড় বড় রুপোর থালায় ফল কেটে কেটে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে রাখছে রঙের পর রঙ মিলিয়ে। নতুন দাসীর মেয়ে বলছে—আম ছাড়াব গোটা গোটা না চাকলা চাকলা? পুরোনো দাসীর মেয়ে বলছে—ছাড়িও না আম। এমনিতে আম ছোঁন না রাজা। রানীমা নিজের হাতে খাইয়ে দিলে তবেই খান। তা রানীমা তো এখন বাপের বাড়ি। ঘরের ওপাশে দাসীদের ছোট মেয়েরা প্রকাণ্ড সোনার থালায় পান সাজছে—এলাচ কর্পূর কেয়াখয়ের দিয়ে, ঝিনুকের চুন গোলাপজলে গুলে।

তার পাশের ঘরে দশজন তাগড়াই পালোয়ান শিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঘসর ঘসর বাটনা বাটছে—হলুদ, লঙ্কা, আদা, সরষে, ধনে, জিরে, মরিচ, মান। পোস্ত, পুদিনা, চই, ধনেপাতা, কাঁচা আম। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বসে আরও পাঁচজন পালোয়ান হামানদিস্তেয় ঠক্ ঠঞ্ খটাং খঞ্ করে গুঁড়োচ্ছে ভাজা মশলা, গরম মশলা, খয়ের, গোলমরিচ, সৈন্ধব নুন আর মেজ রাজপুত্রের হজমীগুলির জন্যে বিটনুন আর জোয়ান।

কোণের গোল ঘরটিতে রানীর পাঁচসখী শ্বেতপাথরের মেঝেয় বসে চুড়ির টুং-টাং শব্দ তুলে স্ফটিকের গেলাসে তৈরি করছে দুধ-বাদাম-মিছরি-মরিচ, তরমুজ, ফলসা, কমলালেবু, আনারসের শরবত।

রান্নাবাড়ির ছাদের উপর এলোচুল রোদে মেলে রানীর মাসী পিসী খুড়ী জেঠী সই-মা আর ধাই-মা আম কুটছেন, তেলে ফেলছেন, আর পাথর পাথর বড়ি দিচ্ছেন —ভাজা বড়ি, ঝোলের বড়ি, ঝালের বড়ি, কুমড়ো বড়ি। মুসুর ডালের তিসির-বড়ি, পালংশাকের সবুজ বড়ি। পানের বোঁটায় ছোট্ট বড়ি, পাঁচ আঙুলে বুড়ো-বুড়ী। বুড়ীর কপালে সিঁদুরের কোঁটা, ধান-দুব্বো গোটা গোটা। জোড়া শাঁখে ফুঁ। উ···লু···উ···লু।

উনুনে উনুনে ছ্যাঁক-ছোঁক, টগবগ, বুড়বুড়, সোঁ-সাঁ কলবল শব্দ আর সারা রান্নাবাড়ি তেল ঘি মশলা এলাচ কপ্পুর জাফরানের গন্ধে ম ম।

সে গন্ধ দালান পেরিয়ে, রাস্তা ছাড়িয়ে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় মাঠের দিকে যেখানে রোদে-ছায়ায় পিঠ পেতে, পা মুড়ে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার দল। যেই গন্ধ নাকে যায়, অমনি মুখের ঘাস মুখে রেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ভেড়ারা, তারপর চনবনিয়ে ওঠে, তারপর রাখালের তাড়া খেয়ে আবার মাথা নীচু করে ঘাস খেতে আরম্ভ করে।

এইভাবেই চলছিল। একদিন এতটুকু এক বাচ্চা ভেড়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে—মা ঘুমোচ্ছিল আর রাখাল এদিকে পিঠ ফিরিয়ে হাঁ করে শঙ্খচিল দেখছিল, সেই সুযোগে—হেলতে দুলতে মাঠ পেরিয়ে এসে হাজির হল রান্নাবাড়িতে। সোজা একটা ঘরে ঢুকে নারকোল-দেওয়া লাউএর ঘণ্টের কাঁসি থেকে একমুখ তরকারি তুলে নিল। রাঁধুনী দুজন ওপাশ ফিরে একজন শুকতুনিতে ফোড়ন দিচ্ছিল আর একজন ঝোল সাঁতলাচ্ছিল। যখন এদিকে ফিরল, তখন বাচ্চা ভেড়া দ্বিতীয়বার মুখ দিয়েছে কাঁসিতে। হৈ-হৈ করে উঠল দুজনে। একজন খুন্তি ছুঁড়ে মারল। বাচ্চা ভেড়া তাড়াতাড়ি করে আধগরস তরকারি তুলে নিয়ে ছুটল মাঠের দিকে। যখন পিছন ফিরে দেখল কেউ আসছে না, তখন নিশ্চিন্তমনে তারিয়ে তারিয়ে খেতে খেতে চলল। তার মা ততক্ষণে জেগে উঠেছে। ওকে আসতে দেখে জিগ্যেস করল, হ্যাঁরে, কোথায় গিয়েছিলি? আমি ভেবে মরি। বাচ্চা বলল, এই একটু গিয়েছি ওদিকে। মা কাছে এসে বলল, ওদিকে মানে? তে মুখে কিসের গন্ধ রে? বাচ্চা বলল, মাঠের ঐ দিকট একরকমের নতুন ঘাস গজিয়েছে—কেমন বেগুনী বেগু ফুল। তার গন্ধ। মা বললে, আর অমন একলা এক যাস নি। নে, এখন শুয়ে পড়। বাচ্চা ভেড়া মা কোল ঘেঁষে লক্ষীছেলের মতো শুয়ে পড়ল। ত জিভ থেকে জল ঝরে ঝরে ঘাসমাটি ভিজিয়ে দি লাগল।

তারপর থেকে রোজ একবার করে,—কো কোনোদিন আবার দুবারও—বাচ্চা ভেড়া মায়ের চো রাখালের চোখ এড়িয়ে রান্নাবাড়িতে যায়, নিত্যি ন রান্না চাখে, আর রাঁধুনীরা হাতের কাছে যা পায় ত ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মারে—হাতা, খুন্তি, বেড়ি, সাঁড়া তাড়ু, বেলন, গেলাস, বাটি, হামানদিস্তের ডাঁটি কোনোদিন গায়ে লাগে, কোনোদিন লাগে না। ভে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে আসে। তার পরের দিন আবা যায়।

বাগানের ঘোড়ানিমগাছের উঁচু ডালটায় বসে বাচ ভেড়ার কাণ্ডকারখানা রোজ লক্ষ্য করে বানরদে দলপতি বৃহল্লাঙ্গুল। সেখান থেকে রান্নাবাড়ির ভেত পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই গো থেকে শেষ পর্যন্ত সবই দেখে বৃহল্লাঙ্গুল।

কদিন দেখে দেখে আপনমনে মাথা নেড়ে একদি বৃহল্লাঙ্গুল বললে, এ তো ভালো কথা নয়। পেটু বাচ্চাটা দেখছি এখান থেকে আমাদের বাস ওঠাল।

নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, রাজবাড়ির বাগানে চিক্কণ চিক্কণ গাছের ডালে আনন্দে খেলা করে বেড়া তার ছেলেমেয়ে ভাগ্নে-ভাগ্নী নাতিপুতিরা। রাজপুত্রদে হাত থেকে তুলে তুলে খাচ্ছে ভালো ভালো ফল। ব দুঃখ হল। এই এত সুখ ছেড়ে চলে যেতে হবে? কি কী আর করা যাবে। প্রাণের চেয়ে তো আরাম ব নয়।

রাজপুত্ত্ররা চলে যেতেই বৃহল্লাঙ্গুল ডাক দিলে সবাইকে। খেলা ফেলে উঠে এল বানরেরা। কী ব্যাপার? হঠাৎ ডাক?

সবাইকার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ডালের খাঁজে ভালো করে বসে বৃহল্লাঙ্গুল বলতে লাগল, শোনো, তোমরা দেখ নি কিন্তু আমি দেখেছি এক পেটুক ভেড়া রোজ রোজ রাজার পাকশালায় চুরি করে খেতে যায়। আর রাঁধুনীরা তাকে যা খুশি তাই ছুঁড়ে মারে। একদিন হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে কোনো রাঁধুনী ভেড়াটাকে জ্বলন্ত চেলাকাঠ ছুঁড়ে মারবে। ভেড়ার উঠে সমস্ত ঘোড়াশালে আগুন লেগে যাবে। ঘোড়ারা কেউ আগুনে পুড়ে মরবে, কেউ আধপোড়া হয়ে ছটফট করবে। রাজবাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যাবে। রাজা বৈদ্যদের ডাকিয়ে এনে জিগ্যেস করবেন—ঘোড়াদের বাঁচানোর উপায় কী? বৈদ্যরা পুঁথিপত্তর ঘেঁটে গম্ভীর-মুখে বলবেন,—মহারাজ, শালিহোত্র বলেছেন, বানরের চর্বিই ঘোড়ার পোড়া ঘায়ের একমাত্র ওষুধ। তখন দামী দামী ঘোড়াদের বাঁচানোর জন্যে আমাদের ধরতে আসবে রাজার লোক। ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে। এ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং

লোম জ্বলে উঠবে। ভেড়া চেঁচাতে চেঁচাতে পাশেই ঘোড়াশালে গিয়ে ঢুকবে আর ঘোড়াদের খাবার জন্যে রাখা শুকনো ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেবে। ঘাস জ্বলে আর এখানে নয়। চলো, আজই আমরা বনে চলে যাই।

বৃহল্লাঙ্গুলের কথা শেষ হতেই খিলখিল করে হেসে

উঠল বানরেরা। দাঁতের ফাঁকে আটকে যাওয়া আঙুরের বীচিটা বার করতে করতে বড় ছেলে এগিয়ে এসে বলল, বনে যেতে হয় আপনি যান। আমরা যাব না। এমন স্বর্গের আরাম ছেড়ে আমরা যাব ঐ তেতো কষা কটু বুনো ফল খেয়ে মরতে ?

এক ভাগ্নে বলে উঠল, আপনার না হয় একটাও দাঁত নেই, সব পড়ে গেছে। কিন্তু আমাদের তো এখনো আছে ? তাছাড়া আমরা এখনো বুড়ো হই নি, বুদ্ধিও আপনার মতো এত পরিষ্কার হয় নি। বনে আমরা যাব না।

ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে লাল হয়ে উঠল বৃহল্লাঙ্গুলের মুখ। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বললে, বেশ—যেও না। আমি চললুম।

তার পরের দিন রাজপুত্রেরা বানরদের খাওয়াতে এসে দেখলে বুড়ো বানরটা নেই, তার বদলে ঘোড়ানিমের শূন্য ডালে স্থির হয়ে বসে আছে একটি শকুনি।

এর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই রাঁধুনীর চেলাকাঠ খেয়ে জলতে জলতে বাচ্চা ভেড়া গিয়ে ঢুকল ঘোড়াশালে। ঘোড়াশাল জলে উঠল। ঘোড়ারা পুড়ে ঝলসে দড়ি ছিঁড়ে পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল। ভোরবেলাকার শিশির-ধোওয়া ফুলে সাজিখানি সাজিয়ে রঞ্জনফুলের কাঁকন দুখানি ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে শিউলিবিছানো যে পথটি রাজকন্যার আঙিনায় গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই পথ ধরে চলছিল মালিনীমেয়ে, ঘোড়ার ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গেল কাঁটাগাছের তলায়। বেণুমতীর জলে স্নান সেরে টিকি দুলিয়ে গম্ভীর স্বরে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দিরের দিকে চলেছিলেন রাজার পুরোহিত, ঘোড়ার লেজের ঝাপটা এসে লাগল মুখে, চোখে হাত দিয়ে বসে পড়লেন পথের উপর। পাততাড়ি হাতে পাঠশালায় যাচ্ছিল ছেলের দল, ঘোড়ারা তাদের মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ঝড়ের মতো উড়ে চলে গেল। ব্যাপারীরা শশব্যস্তে দোকানপাটে ঝাঁপ ফেলে দিলে, পথচলতি লোক ভয়েময়ে উঠে দাঁড়াল গৃহস্থের দাওয়ায়। শহরময় হুলস্থূল কাণ্ড। রাজার কানে খবর গেল। পাত্রমিত্র সভাসদ নিয়ে রাজা হায় হায় করতে করতে ছুটে এলেন। তারপর—ডাক্ বদ্যিকে, ডাক্ রাখালকে, ডাক্ রাঁধুনীকে।

খিড়কির দরজা চুলসরু ফাঁক করে, একবার বাঁ পা একবার ডান পা বাড়িয়ে চোখ বুজে চট করে নেবে পড়ে, গিন্নীর আঁচলের আড়ালে আড়ালে দশবার থেমে দশবার চমকে ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে বদ্যি এলেন গুটিগুটি। মুখে হাসি, হাতে বাঁশি, কালোকোলো রাখাল এল কোঁকড়া চুলে ময়ূরের পালক হেলিয়ে। রাঁধুনীকে কোথাও পাওয়া গেল না।

গনগনে চোখে রাখালের দিকে তাকিয়ে রাজা শুধোলেন, কেমন রাখালি করিস? ভেড়া কোথায় যায়, খেয়াল থাকে না ?

কোঁকড়া চুল দুলিয়ে গানের মতো গলায় রাখাল বলল, আমি কী করব? ওর মা-ই ওকে সামলাতে পারে না। আমি কী করে পারব শুনি? আর বাচ্চারই বা দোষ কী? আপনার রান্নাবাড়ি থেকে যা গন্ধ বেরোয়, বুড়ো বুড়ো লোকেদেরই মাথার ঠিক থাকে না। এই তো সেদিন দেখলুম মন্ত্রীমশায়—

মন্ত্রীমশায় রেগে অস্থির হয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, অ্যাই—

রাজা গোঁফের আড়ালে হাসি লুকিয়ে বললেন, যা যা, পালা এখান থেকে।

চৈত্রের অশথপাতার মতো বদ্যি কাঁপছিলেন এক-কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রাজা সেদিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, বদ্যিমশায়।

চমকে উঠে বদ্যির হাত থেকে পড়ে গেল পাঁজিপুঁথির পোঁটলাখানা। পুঁথির বাঁধন আলগা হয়ে চরক সুশ্রুত পালকাপ্য শালিহোত্রের পাতা এখান-সেখান উড়ে বেড়াতে লাগল। বদ্যি তখন কী করবেন ভেবে পান না—কাঁপবেন, না পাতা কুড়োবেন, না রাজার হুকুম শুনবেন। রাজার দিকে একবার চেয়ে থতমত খেয়ে তিন লাফ দিয়ে শালিহোত্রের উড়ন্ত পাতাখানা যেই

ধরেছেন, অমনি রাজা বললেন, বিদ্যিমশায়, ঘোড়ার পোড়াঘায়ের ওষুধ কী?

হাতে-ধরা পাতাখানার দিকে একনজর তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বদ্যিমশায় বললেন, মহারাজ, বানরের চর্বি।

বানরের চর্বি? সে তো হাতের কাছেই রয়েছে। ভাগ্যিস বড় রাজপুত্রের শখ হয়েছিল বানর পোষার। অ্যাদ্দিনে কাজে লাগল।

রাজার হুকুমে তক্ষুনি পঞ্চাশজন লোক লাঠি সড়কি তীরধনুক জাল নিয়ে ছুটল বাগানে। গাছের ডালে ডালে লেজ ঝুলিয়ে বসে বানরেরা তখন ভাবছিল—কী হল আজ? এত বেলা হয়ে গেল, রাজপুত্রেরা খাবার নিয়ে এখনও তো এল না! এমন সময় দূর থেকে একটা হৈ-হল্লা শোনা গেল। কী হচ্ছে ভালো করে বোঝবার আগেই সমস্ত বাগান জাল দিয়ে ঘিরে ফেলল রাজার লোকেরা। প্রথম তীরটি শাঁ করে এসে বিঁধলে বৃহল্লাঙ্গুলের বড় ছেলের কপালে। উল্টে পড়ে গেল সে। তারপর ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শা বল্লম তীর এসে বিঁধতে লাগল বানরদের চোখে মুখে গায়ে মাথায়। অসহায় আর্তনাদে ভরে গেল বাগান। প্রত্যেকটি বানরকে খুঁচিয়ে পিটিয়ে মেরে কেটে চর্বি বের করে নিল রাজার লোক। একটি বানরও বাঁচল না।

এ খবর যথাসময়ে কানে গেল বৃহল্লাঙ্গুলের। বনে কাঠ কাটতে গিয়ে দুজন কাঠুরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিল। বৃহল্লাঙ্গুল পাশের গাছের ডালে বসে কান খাড়া করে সব শুনলে। তার বুক যেন ফেটে গেল।

এর পর থেকে বৃহল্লাঙ্গুলের খাওয়া গেল, ঘুম গেল, দিন নেই, রাত্তির নেই, একমনে গালে হাত দিয়ে বসে কেবল ভাবে— কী করে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়?

ভাবতে ভাবতে বনের মধ্যে দিয়ে একদিন চলেছে বৃহল্লাঙ্গুল। একটানা অনেকক্ষণ চলার পর খুব তেষ্টা

পেল তার। চোখ তুলে দেখে সামনেই একটি হ্রদ। হ্রদে নামতে যাবে, হঠাৎ যেন কেমন-কেমন মনে হল। বৃহল্লাঙ্গুল মনোযোগ দিয়ে হ্রদের ধারের কাদা পরখ করে দেখল অসংখ্য জানোয়ারের পায়ের দাগ ডাঙা থেকে হ্রদের দিকে চলে গিয়েছে, উল্টোমুখে একটিও দাগ নেই। তার মানে, জলে নামার পর আর ওঠে নি একজনও। নিশ্চয় কোনো রাক্ষুসে কুমির-টুমির আছে ভেবে বৃহল্লাঙ্গুল আর জলে নামল না, ডাঙায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে একটি পদ্মের নাল ছিঁড়ে নিয়ে সেইটি মুখে লাগিয়ে চোঁ চোঁ করে জল খেতে লাগল।

অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, এমন সময় জলের মধ্যে থেকে উঠে দাঁড়াল একটি রাক্ষস। বিকট মুখ, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হাঁ। আর তার গলায় দুলছে একটি আশ্চর্য রত্নমালা, প্রত্যেকটি রত্ন তারার মতো জ্বলজ্বল করছে। রাক্ষস এক-হাঁ হেসে বলল, কে ভাই তুমি? এতখানি বয়স হল, এত বুদ্ধি তো কারো দেখি নি আজ পর্যন্ত। ভারী খুশী হয়েছি তোমার ওপর। কী চাও বলো।

বৃহল্লাঙ্গুল তার রত্নমালাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললে, কত খেতে পার?

রাক্ষস বলল, জলের মধ্যে পেলে একশ, হাজার, দশ হাজার, উঁহু, লক্ষ প্রাণী খেতে পারি এক গরসে। ডাঙায় উঠলে শেয়াল দেখলে পালিয়ে আসি।

বৃহল্লাঙ্গুল দাঁড়িয়ে উঠে বলল, দু-একদিনের মধ্যেই তোমাকে একটি বড় রকমের ভোজ দোব। তবে তোমার ঐ রত্নমালাটি আমাকে একটু ধার দিতে হবে। ভয় নেই, নিয়ে নেব না। হারিয়েও ফেলব না।

রাক্ষস গলা থেকে হার খুলে নিয়ে বলল, এই নাও। তুমি যে হারিয়ে ফেলবে না তা আমি জানি। তুমি যাও। আমি বসে রইলুম।

বৃহল্লাঙ্গুল সেই হারটি গলায় ঝুলিয়ে রাজার বাগানে গিয়ে গাছে চড়ে বসে রইল। রাজার লোকেরা দেখতে পেয়ে হৈ-হৈ করে উঠল—ওমা, সেই বুড়োটা আবার ফিরে এসেছে। গলায় আবার একটা হার পরেছে দেখো।

রাজা চন্দ্রের কাছে খবর গেল। তিনি লোক পাঠিয়ে ধরে আনালেন বানরকে। জিগ্যেস করলেন, এ হার কোথায় পেলে?

বানর বলল, মহারাজ, আপনার রাজ্যের উত্তর-সীমানায় যে গহীন বন, সেই বনের মধ্যিখানে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। রবিবার দিন ভোরবেলা সূর্য অর্ধেক উঠেছে অর্ধেক ওঠে নি, ঠিক সেই সময়টিতে সেই হ্রদে ডুব দিলে ঠিক এই রকমের রত্নমালা গলায় দুলিয়ে উঠে আসা যায়। আপনার যদি বিশ্বাস না হয়, সঙ্গে একজন লোক দিন, আমি তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

রাজার চোখ চকচক করছিল। এরকম রত্ন তাঁর ভাণ্ডারে একটিও নেই। তাড়াতাড়ি বললেন, না না, অবিশ্বাস করার কী আছে? তোমার গলাতেই তো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি। তা—যে ডুব দেবে, তারই হবে?

—হাঁ মহারাজ, তবে কিনা ঠিক ঐ সময়টিতে ডুব দেওয়া চাই।

কথা ছড়িয়ে পড়ল রাজপুরীতে। অন্তঃপুরের সমস্ত মেয়েরা, রাজপুত্রেরা, কিঙ্কর-কিঙ্করী, প্রজা-পরিজন সব সেজেগুজে এসে দাঁড়াল। সবাইকে নিয়ে রাজা চললেন বনের দিকে। চতুর্দোলের মধ্যে তাঁর কোলের উপর চড়ে চলল বানর।

হ্রদের তীরে পৌঁছে বানর বলল, মহারাজ আপনাতে-আমাতে এইখানটায় বসি। ওরা ডুব দিয়ে রত্নমালা নিয়ে উঠে আসুক। তারপর আমি আপনাকে জলের তলায় নিয়ে গিয়ে দেখাব সেই জায়গাটা যেখানে লক্ষ লক্ষ রত্নমালা পড়ে রয়েছে। ওদের এবার ডুব দিতে বলুন। সকলে একসঙ্গে ডুব দেওয়া চাই কিন্তু। একটু আগে পরে হলে হবে না। ঐ তো সূর্য উঠতে আরম্ভ করেছে। এই অর্ধেক হয়েছে, এইবার—

একসঙ্গে সমস্ত লোক ঝপাং করে জলে ডুব দিল।

তারপর অনেকক্ষণ হয়ে গেল। হ্রদের পশ্চিম কোণে পদ্মের বন দুলতে দুলতে একসময় স্থির হয়ে দাঁড়াল। নিঝুম হয়ে গেল চারিদিক। বসে থেকে থেকে শেষ

পর্যন্ত রাজা একটু অধৈর্য হয়ে বানরকে বললেন – কই হে, কেউ যে আর-ওঠে না।

বানর এক লাফে গাছে উঠে বলল, কেউ আর উঠবেও না।

রাজা দাঁড়িয়ে উঠে বিবর্ণ হয়ে বললেন, তার মানে?

—তার মানে সব রাক্ষসের পেটে গেছে। যেমন বিনা দোষে আমার বংশ ধ্বংস করেছিলে, তেমনি তোমার বংশ ধ্বংস-করলুম আমি। এবার বুঝে দেখো কেমন লাগে। দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক!

একা একা রাজ্যে ফিরে এলেন রাজা চন্দ্র।

গলা থেকে রত্নমালা খুলে নিয়ে রাক্ষসের হাতে দিয়ে বানর বললে, এই নাও।

শ্রীধর বললে, আশ্চর্য বুদ্ধি বানরের।

ভবদেব বললে, আর আশ্চর্য লোভ ঐ রাজা চন্দ্রের। বলেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল সে।

শ্রীধর মাথা নীচু করে রইল।

আস্তে আস্তে অন্ধকার পাতলা হতে লাগল। পাখি ডাকতে লাগল চারিদিকে। পূর্বদিকে আলো ফুটল। শ্রীধরের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। মৃদু অস্ফুট গলায় বলল, এইবার তোমার শেষ গল্পটি বলো, ভবদেব। সময় তো হয়ে এল।

ভবদেবের চোখের কোণে টলটল করতে লাগল ভোরের শিশির। কাঁপা গলায় বলতে আরম্ভ করল সে—

এক হ্রদে থাকত এক ভারুণ্ড পাখি। তার ঘাড়ে দুটি মাথা ছিল। একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে ভারুণ্ড বালির ওপর কুড়িয়ে পেলে একটি লাল টুকটুকে ফল। মুখে দিয়ে দেখলে, অদ্ভুত সুন্দর খেতে। স্বর্গের বাগান থেকে কিভাবে খসে পড়েছে হয়তো—এই ভেবে সে চোখ বুজিয়ে ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগল ফলটি। তখন তার অন্য মুখটি বললে—খুব ভালো জিনিস খাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে? আমায় একটু দাও না?

প্রথম মুখ বললে, উঁহু, দিতে পারব না। ফুরিয়ে এসেছে। আর একটুখানি মাত্র আছে। বাসায় ফিরে বৌকে দেব। তোমার মুখ ভার করার কী আছে বাপু? শেষ পর্যন্ত সেই এক জায়গায় গিয়েই তো পৌঁছচ্ছে ফলের রস?

দ্বিতীয় মুখ গম্ভীর হয়ে রইল।

আর একদিন বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে ভারুণ্ড কুড়িয়ে পেলে একটি কালো কুচকুচে ফল। দ্বিতীয় মুখ ফলটি তুলে নিয়ে খেতে গেল।

প্রথম মুখ হাঁ-হাঁ করে উঠল, ও কী করছ? ও যে বিষফল। ফেলে দাও, ফেলে দাও।

দ্বিতীয় মুখ বলল, একা একা অমৃতফল খাবার বেলায় মনে ছিল না?

বলে বিষফলটি কামড়ে খেয়ে ফেলল। ভারুণ্ড মরে গেল।

শ্রীধর বলল, হ্যাঁ, আমি হচ্ছি ঐ ভারুণ্ড পাখির দ্বিতীয় মুখ। কিন্তু বাকীটুকু মেলে না। তোমরা তো অমৃতের ভাগ আমাকে দিতে চেয়েছিলে, আমিই নিই নি! এইবার আমার শেষ গল্পটি তোমায় শুনিয়ে দিই—

এক শহরে থাকতেন ব্রহ্মদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ। কী একটা কাজে একবার গ্রামে যাবার দরকার হল তাঁর। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে বেরোবার মুখে মাকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, হ্যাঁ রে, একা যাবি? ব্রহ্মদত্ত হেসে বললেন, আমি কি এখনো তোমার সেই খোকাটি আছি মা? কাকে আবার সঙ্গে নেব? পথে কি জুজুবুড়ো আছে যে ধরে নেবে. না রাক্ষসখোক্কস আছে যে খেয়ে ফেলবে?

মা বললেন, ওরে না রে, ঠাট্টা নয়। একা-একা বেরোতে নেই।

ব্রহ্মদত্ত বললেন, এ কথা আগে জানলে একটা যাহোক ব্যবস্থা করতুম। এখন তো আর কোনো উপায় নেই মা। সব যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। কাকে কোথায় পাব এখন?

মা বললেন, তবে একটু দাঁড়া। আমি এক্ষুনি আসছি।

বলে পুকুর থেকে একটি কাঁকড়া ধরে এনে, ভাঁড়ারের তাকে একটা খালি কর্পূরের ঠোঙা পড়ে ছিল, তার মধ্যে কাঁকড়াকে পুরে ব্রহ্মদত্তের হাতে দিয়ে বললেন, নিদেন পক্ষে এটাকেই সঙ্গে নে।

ব্রহ্মদত্ত মার কাণ্ড দেখে একটু হেসে ঠোঙাটিকে গামছার এক প্রান্তে বেঁধে নিয়ে চলতে শুরু করলেন।

ভাদ্রমাসের রোদ্দুর চড়তে লাগল ক্রমশ। ব্রহ্মদত্ত ভাবলেন, ওঃ, ভারী ভুল হয়ে গেল তো, ছাতাটা আনলুম না। এখন রোদের চোটে প্রাণ যে যায়। কী করি?

অনেকটা পথ কষ্টেসৃষ্টে চলার পর সামনে একটি ঝাঁকড়া বটগাছ দেখতে পেয়ে তার তলায় চাদরটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন ব্রহ্মদত্ত। আর শোওয়ামাত্রই ঘুম এসে গেল। কর্পূরের ঠোঙা-বাঁধা গামছাটা পড়ে রইল এক পাশে, ব্রহ্মদত্ত ঘুমোতে লাগলেন।

এমন সময় গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল একটি সাপ। ব্রহ্মদত্তের কাছাকাছি আসতেই কর্পূরের গন্ধ পেয়ে সাপ চলল সেইদিকে। গামছা ফুঁড়ে কর্পূরের ঠোঙাটি মুখে পুরতেই কাঁকড়া দাঁড়া দিয়ে কামড়ে ধরল তার মুখ।

ব্রহ্মদত্তের ঘুম ভাঙল খানিকটা পরে। উঠে দেখলেন, একটা সাপ পাশেই মরে পড়ে রয়েছে, আর কাঁকড়াটা গুটি-গুটি পালাচ্ছে। সব বুঝতে পেরে ব্রহ্মদত্ত বলে উঠলেন, ভাগ্যিস্, মার কথা শুনেছিলুম!

ভাই ভবদেব, ব্রহ্মদত্তের মায়ের মতন আমিও তোমাকে অনুরোধ করছি, কখনও একা যেও না। তাহলেই আমার মতন অবস্থা হবে।

এই বলে কাঁদতে লাগল শ্রীধর। ভবদেবও কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়াল।

বিচারক থামলেন।

মণিভদ্র বললেন, আর শ্রীধর সেই নির্জন পাহাড়ে ঐ দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে একা-একা বসে রইল শতাব্দীর পর শতাব্দী? আন্তরিক অনুতাপেও তার নিষ্কৃতি মিলল না? কে বানিয়েছে এ গল্প? বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মণিভদ্র—নিশ্চয় আপনার মত কোনো একজন বিচারক? আপনারা কি ভাবেন একমাত্র কঠিন শাস্তি দিয়েই কঠিন অন্যায়ের প্রতিকার হয়? আপনি, আমি, ঐ নাপিত—আমরা সকলেই কি জীবনের কোনো-না-কোনো মুহূর্তে শ্রীধর নই? তবে?

বিচারক তাঁর দু হাত ধরে বললেন, আপনি শান্ত হোন। এ তো গল্প।

মণিভদ্র বললেন—না, গল্প নয়। এটা যদি বা গল্প হয়, দেখুন তো একবার সামনে ঐ দূরের দিকে তাকিয়ে, শূলবিদ্ধ হতভাগ্য নাপিতের মৃতদেহের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে তার স্ত্রী—এ-ও কি গল্প?

বিচারক স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তরীয়ের প্রান্তটি তুলে ধরে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলেন মণিভদ্র।

॥ 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র'র 'মণিভদ্র' অধ্যায়টি শেষ ॥

প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর

সমুদ্রতীর

জীবন সর্দার

তারপর যেতে যেতে শেষে সেই ছোট্ট নদীটার সঙ্গে দেখা। নদীটা পেরিয়েই ফ্রেজারগঞ্জ, তারপর সমুদ্রতীর।

ছোট্ট নদীটা পেরোবার না ছিল নৌকো, না ছিল পুল। সাঁতরে নদী পার হলাম, আর হেঁটে হেঁটে পৌঁছে গেলাম সমুদ্রতীরে।

সমুদ্রতীরে হাওয়া ছিল খুব কিন্তু ঢেউ ছিল না একদম। সমুদ্রতীরে বালিও ছিল না—যেমনটা দেখেছি অন্য অন্য সব বেলাভূমিতে। এখানে শক্ত মাটি, কোথাও নীল, কোথাও পোড়া মাটির রঙ। ভেজা মাটিতে অনেকটা পথ হেঁটে এলাম, পায়ের ছাপ কোথাও পড়ল না।

সমুদ্রের বাঁধের উপর নারকেলগাছের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। দূরে যতদূর চোখ যায় ঘোলা জলের শেষ নেই। এখানেই গঙ্গানদীর মোহনা, যত ঘোলা জল সেই বয়ে আনছে। আমাদের ডানদিকে মাইলকয়েক দূরে সাগরদ্বীপ, তার সামনে সমুদ্রের ভিতর ঘন জঙ্গলে ঢাকা জম্বুদ্বীপ। তীরে বসে দূরের দিকে কেবল চেয়ে থাকলে কত যে ভাবনা মনে ভিড় করে আসে! আমি ভাবছিলাম :

নদীর মোহনার কাছে নদীই যত মাটি আর বালি এনে জমা করে। কিন্তু অন্য জায়গায় সমুদ্রতীরে এত বালি কোথা থেকে এল? সমুদ্রতীরে বালি আর কিছু নয়—পাথরের গুঁড়ো। সমুদ্রের ঢেউ পাথরে উপর পড়ে, পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়। পাথর ভেঙে যায়, গুঁড়ো হয়। যে বালুরাশি আজকে তুমি দেখতে পাও, তা হতে অনেক, অনেক বছর,—যত বছর তুমি ভাবতে পার তার চেয়েও অনেক বছর—লেগেছে। আজও এই পাথর ভাঙার বিরাম নেই।

*

বসে থাকতে আমার আর ভালো লাগছিল না। উঠে দাঁড়ালাম। আমার নড়াচড়ার শব্দে কাঁকড়াগুলো গর্তে গিয়ে ঢুকল। গর্ত থেকে টেনে ওদের বার করা সোজা কাজ নয়।

চুপচাপ একটু বসে থাকলে কাঁকড়াগুলো নির্ভয়ে চলতে শুরু করে। চার-জোড়া পা নিয়ে ওরা

সোজা চলে না, চলে পাশাপাশি। মাথা, গলা, বুক, পেট—সব একটা খোলের মধ্যে—আলাদা কিছু বোঝা যায় না। শুধু চোখ দুটো মুখ থেকে উপরে ড্যাব ড্যাব করে। চোখ দুটো এমনভাবে রয়েছে পিছনের দিকটাও ওরা ভালভাবে দেখতে পায়।

খাবার নিয়ে কিংবা কারণে অকারণে নিজেদের মধ্যে লড়াই ওদের লেগেই আছে। কত যে ওরা খেতে পারে দেখে আমার অবাক লাগে। সমুদ্রের ছোট ছোট পোকামাকড় তো খাচ্ছেই, মরা পচা সমুদ্রের অন্য প্রাণীও খেতে ওরা বাদ দিচ্ছে না।

চিল্কা-হ্রদের তীরে বিচিত্র সব কাঁকড়া দেখেছি। নীল, গোলাপী, কালো, ডোরাকাটা আর বিন্দু-ওয়ালা বড় ছোট অনেক ধরনের কাঁকড়া হয়। কিন্তু সব-চেয়ে মজা লাগবে 'সন্ন্যাসী কাঁকড়া'কে দেখে। এক জাতের কাঁকড়া, খুঁজেপেতে সমুদ্রের কোনো খালি শামুকের খোলা যোগাড় করে, তারই ভিতর থেকে যায়। খোলাটাকেই সে ঘর করে নেয়। সেখান থেকে কখনও বেরোয় না, ঘর নিয়েই চলে বেড়ায়।

*

কাঁকড়া দেখতে দেখতে অনেটা দূর এগিয়ে গিয়েছিলাম সমুদ্রের দিকে। খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল সমুদ্রের জলকে গুটি-গুটি ডাঙার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে। জোয়ার এসে গিয়েছে। আমি কিছুক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবেছিলাম হয়তো জলের অনেক গাছ জোয়ারের টানে ভেসে ভেসে আসবে। কিছুই এল না।

তীরভাঙা ঢেউ যেখানে নেই, সেই শান্ত সমুদ্রের জলেই বেশী গাছগাছড়া দেখেছি। কোনো কোনো গাছ জলে ভেসে বেড়ায়, কোনো জাতের আবার মাটি বা পাথর চাই আঁকড়ে ধরার জন্য। সমুদ্রের এই গাছগুলো এত শক্ত করে আঁকড়ে থাকে যে বড় বড় ঢেউ তাদের ছিঁড়ে ফেলতে পারে কিন্তু উপড়ে নিতে পারে না।

জলের আগাছাগুলোর গা বড় পিছল। কেন বলতে পার? ভাঁটার জল যখন সরে যায়, পিছল থাকার ফলে ওদের গা বাতাসে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে পারে না। গা শুকোলেই মরণ।

সমুদ্রের গাছগাছড়া একটা বিন্দুর মতো ছোট থেকে বট-অশথের মতো বড় হতে পারে। ডাঙায় যেমন, জলেও তেমনি শস্যভোজী প্রাণীর অভাব নেই। সমুদ্রে এত গাছপালা না থাকলে তাদের কী উপায় হত!

সমুদ্রের জল বেড়ে বেড়ে কখন আমার হাঁটু ছুঁয়েছে বুঝি নি। পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই চমকে উঠলাম। একটা শামুক পিলপিলিয়ে আমার পা বেয়ে উঠছিল। সমুদ্র-শামুক চ্যাপ্টা একটা পা নিয়ে গুটি-গুটি যেখানে খুশি চলে বেড়ায়। ভয় পেলে নরম বালি বা ভেজা মাটির তলায় লুকিয়ে পড়ে। ওদের খোলটার উপরে দুটো সরু মুখ। ওরা এক মুখে জল নিয়ে অন্য মুখে বের করে দেয়। জলের সঙ্গে যদি কোনো ছোট পোকা বা অন্য কোনো খাবার ভিতরে ঢোকে তা আর বেরিয়ে আসতে পারে না—সোজা চলে যায় পেটে। এমনি করেই ওরা খাবার খায়।

সমুদ্রতীরের ঝিনুক-শামুক-কড়িগুলোর রূপ আর রঙ দেখে চোখ ফেরানো যায় না। বেলাভূমিতে ঘুরে ঘুরে ঝিনুক কুড়োনোর বাতিক সমুদ্রতীরে গেলে সবারই হয়। আসলে ওরা মরা ঝিনুকের খোল। সমুদ্রের এই জাতের প্রাণীগুলোকে সহজেই দুটো ভাগে ফেলতে পার। এক জাতের একটামাত্র খোল, অন্য জাতের (যেমন ঝিনুকের) খোলের দুটো ভাগ।

ঝিনুকেরা খোল দুটো একটুকু ফাঁক করে বাইরে থেকে জল টেনে নেয়। জল পেলেই ওদের 'খাওয়া আর হাওয়া'র কাজ মেটে। শামুকেরা তবু চলতে পারে, ঝিনুকেরা চলতেই পারে না। বন্দী ঝিনুকের কান্না জমে জমে কী করে মুক্তো তৈরী হয় সে কথা অন্য সময় তোমাদের বলব।

*

জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলেডিঙিগুলো তীরের কাছে চলে এল। তাদের সঙ্গে উড়ে উড়ে এল গাংচিলেরা। ডাঙায় যেখানে জেলেরা জাল নামাল, অনেক লোকের ভিড়ের সঙ্গে আমিও সেখানে মিশে গেলাম। ওদের জালে ছোটবড় নানান মাছের সঙ্গে ধরা পড়েছে দু-একটা 'জেলি-মাছ'।

জেলি-মাছ মোটেই মাছ নয়। মাছের মতো ওদের আঁশ, কাঁটা, পাখনা, লেজ বা মাথা কিছুই নেই। জেলির মতো থলথলে আর জলে থাকে বলেই হয়তো ওদের ওই নাম হয়েছে।

আমি তন্ময় হয়ে সমুদ্র থেকে তোলা নানা রঙের মাছগুলো দেখছিলাম। ভিড়ের ভিতর কে যেন আমার হাত ধরে টানলে। ফিরে তাকালাম। ও নীলাঞ্জন!

সে আমাকে বললে, আজকে তুমি অকারণ যেমন খুশি সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়িয়েছ। সমুদ্রতীরে প্রকৃতি-পড়ুয়াদের নিয়ম একটুও মান নি।

আমি জিগগেস করলাম, কী সেগুলো ?

ডেরার পথে চলতে চলতে সে আমাকে এই নিয়মগুলো শেখালে :

১। সমুদ্রতীরের মাটি বালি বা পাথর কেমন তা দেখতে হবে। আর দেখতে হবে তাদের সঙ্গে সমুদ্রতীরের প্রাণীদের কী সম্পর্ক।

২। সমুদ্রতীরে বা তীরের কাছে জলে কোন্ কোন্ প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে ? কোথায় তারা থাকে, কী তারা খায়, কী ভাবে খায়—সব খবর জানতে হবে।

৩। সমুদ্রের উদ্ভিদ আর প্রাণীদের কী সম্পর্ক ? কী ভাবে তারা মানুষের উপকার বা অপকারে আসে তাও জানতে হবে।

৪। জ্যান্ত বা মরা—সমুদ্রের কোনো কিছুই হাত দিয়ে প্রথমে ছোঁবে না।

ঠিক শুনেছি ঘড়ির আওয়াজ ঘুমজড়ানো চক্ষে
নইলে ওঠা কঠিন হত ভোরে আমার পক্ষে।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালায়

প্রকৃতি-পড়ুয়া বন্ধুরা,

আমরা এক মজার পাঠশালায় ভর্তি হয়েছি। তার খবর তোমাদের না দিয়ে পারছি না। 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা'। এই দেশে এমনি পাঠশালা এই প্রথম। শুনেছি বিদেশে এমনি ধরনের কিছু সংঘ আছে। যেমন লণ্ডনের X. Y. Z. Club (Exceptional Young Zoologists' Club)।

১৯শে জুন জীবন সর্দারের চিঠি পেলাম। কলকাতার চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষমশাই আমাদের ডেকেছেন। ২৩শে জুন রবিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনিই আমাদের এই পাঠশালার অধ্যক্ষ। প্রকৃতিপাঠের সত্যিকারের হাতেখড়ি তিনিই দেবেন।

শনিবার বিকেলে লাফাতে লাফাতে 'সন্দেশ' দপ্তরে হাজির হলাম। ইচ্ছে—জীবন সর্দারের কাছ থেকে সব ব্যাপারটা জেনে নেওয়া। আমার মতো আরও কয়েকজন পড়ুয়া হাজির ছিল। আমরা ঘিরে বসে জীবন সর্দারের কাছ থেকে অনেক নতুন কথা শুনলাম। মনে হল, কত অজস্র ছোটোখাটো জিনিস আমাদের চোখের সামনে হামেশাই ঘটছে অথচ আমরা তা লক্ষ্য করি না। তাঁর অনেক কথা পরে আমাদের কাজে লেগেছিল। কেন আমাদের এমনি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে কারণও বললেন : নিজে করে না দেখলে কোন শেখাই শেখা নয়।

পরদিন ২৩শে জুন সকালে 'সন্দেশ' দপ্তর থেকে রওনা হলাম 'আজীবনগরে'। ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল। যেতে যেতে ঘাস, মাটি, গাছ আর মেঘ নিয়ে সঙ্গী-পড়ুয়াদের সঙ্গে জীবন সর্দারের অনেক আলোচনা হল।

আজীবনগরের সদর দরজায় আরো দুজন পড়ুয়া অপেক্ষা করছিল। আমরা পড়ুয়ারা হলাম ছ জন, যারা চিড়িয়াখানা যাব বলে চিঠি দিয়েছিলাম। ভেতরে ঢুকে আমাদের কাজ হল ঘণ্টাখানেক ঘুরে আসা। যা চোখে পড়বে দেখা। আমাদের সঙ্গী হলেন পশু-চিকিৎসালয়ের একজন চিকিৎসক।

চিকিৎসক মশাই আমাদের সাদা কাক সাদা কেন, সন্ন্যাসী কাঁকড়ার স্বভাব কী, লাজুক বাঁদর লাজুক কেন—এমনভাবে সবার স্বভাব বোঝাতে বোঝাতে নিয়ে গেলেন। পাখির-গ্রাম আর হাতির স্নান দেখে আমরা এক শরবতের দোকানে বসলাম। তখন বুঝি নি, পরে বুঝলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করা হচ্ছে। কেননা যা দেখে জেনে এলাম তাদের সম্পর্কে আমাদের নানান প্রশ্ন করা হয়েছিল সেখানে বসে।

তারপর অধ্যক্ষমশাইয়ের ঘরে পাঠশালা বসল। ভয়ে বুক দুরু দুরু করছিল। ভাবছিলাম তিনি হয়তো বলবেন, তোমাদের দ্বারা কিস্‌সু হবে না। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সে ভুল ভেঙে গেল। তিনি খুব ভাল লোক। প্রথমেই বললেন যে তোমাদের কোনো বই দেখা চলবে না। প্রকৃতিই একটা বই। নিজেরা দেখে যা জানবে বুঝবে সেইটুকুই মেঠো খসড়ায় টুকে রাখবে।

আমরা একে একে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আমাদের নানানভাবে জেরা করে আমাদের উৎসাহ, কার কোন্ দিকে ঝোঁক সব জেনে নিলেন। তারপর সেই অনুসারে আমাদের এক-এক জনকে এক-এক কাজ দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন কীভাবে কী দেখতে হবে।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিল অরূপ মজুমদার, বয়স তার ছয়। সেও বাদ পড়ে নি। স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে সে কী কী পশুপাখি দেখতে পায় তা জানাতে হবে।

উঃফ! কী যে ভাল লেগেছিল সেদিন কী বলব তোমাদের। আরো ভালো লাগছে এখন অবসর সময়ে পাঠশালার টাস্ক নিয়ে মেতে থাকতে।

অধ্যক্ষমশাই বললেন, আরো অনেক পড়ুয়া চাই। আর আমরাই নাকি বৈজ্ঞানিকদের অনেক নতুন নতুন খবর জোগাড় করে দিতে পারব যা আগে কেউ জানত না।

তোমরা যারা এই পাঠশালায় ভর্তি হতে চাও তারা জীবন সর্দারকে চিঠি লিখতে পার। ভালোবাসা নিও।

সুদীপ চক্রবর্তী

জানতে চাই

(১) সাপ আলো দেখলে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? পূর্ণিমার রাত্রে সাপ কি বেরোয় না? (২) বহুরূপী (সরীসৃপ) কী করে রঙ পালটায়?—শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২।

(৩) টিকটিকির লেজে কিছু লাগলে লেজ খসে যায় কেন?—দীপংকর সান্যাল। ৩৪।

(৪) বাড়ির আনাচে কানাচে যত অশ্বত্থ গাছ চোখে পড়ে ওদের ফুল বা ফল তত চোখে পড়ে না। অশ্বত্থগাছের এই ব্যাপক বিস্তৃতি কী করে হয়?—অশোক চট্টোপাধ্যায়। ৩৭।

(৫) বিকেলের মেঘ আর সন্ধ্যার হালকা অন্ধকার সরিয়ে মাঝে মাঝে এক ধরনের হলুদ উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভরে যেতে প্রায়ই দেখি। অনেকে একে 'কনে-দেখা' আলো বলেন। এই ধরনের আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী?—সমীপেন্দ্র লাহিড়ী। ১৪।

যা দেখেছি

স্কুলে একটা গাছে বাবুই পাখি দেখেছি। সে দুটো পাতা, একটু খড় দিয়ে কী করল। খেলা করে ফিরে এসে দেখি তুলো এনেছে আর এনেছে ঝরা পালক।—জুলু সেন। ৪১

অনুগামীর আশা

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উষার আলো-আঁধারে কবে পড়ে না ভালো মনে   তোমার সনে আমার পরিচয়,
ভরিয়া দিলে দু হাত মম তোমার ফুলবনে,   শৈশবেরে করিলে মধুময়।
আধেক শত বরষ গত হয়েছে তার পরে   আমার মতো অযুত-শত শিশুরে ধরি করে
নিয়েছ ডাকি আড়ালে থাকি তোমার খেলাঘরে,—   হারানো যুগে দিয়েছ খুলি দ্বার;
বেতের বনে অতি যতনে দিয়েছ হেলাভরে   কঠিন পথ সহজে করি পার।

তোমার ঋণ শুধিব হেন শকতি আজও নাহি,   অদেখা মোর হে সখা প্রিয়তম!
আজিও দেহ জুড়ায় স্নেহসায়রে অবগাহি,   হে পিতামহ, প্রণাম লহো মম।
দেখায়ে পথ, জ্বালিয়া আলো—গিয়েছ তুমি আগে,   সে পথে যেতে মেতেছে মন তোমার অনুরাগে,
তোমার লেখা তোমার রেখা—আজিও ভালো লাগে,—   পুরানো দিনে আজিও লয় টানি।
জীবনপ্রাতে বসেছ যাতে—এ মনে আজও জাগে   অটল হয়ে সে রাজাসনখানি।

বয়স যত বেড়েছে তত জেনেছি গুণে কত   ছিলে যে তুমি ভূষিত; ভালোবাসি
শিশুর মন তুষিতে শুধু আস নি, নেছ ব্রত   বাড়ায়ে যেতে দেশের যশোরাশি।
সকলকলাপারঙ্গত, হে গুণী, মোরে ছলি   একদা কোলে নিয়েছ তুলি, আপন জন বলি
বেসেছি ভালো, এখন বলো চরণে অঞ্জলি   কেমনে দিব সভয়ে দূরে রহি?
এ আশা শুধু, আশিসে তব তোমার পথে চলি   কাটিবে বেলা তোমার বাণী বহি।

উপেন্দ্রকিশোর স্মরণে

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

॥ তিন ॥

এখন শুধু রাতটা একবার হলে হয়।

রাখাল আর ভুতোর হাতগুলো বুঝি নিশপিশ করতে থাকে সিঁধকাঠি নাড়বার জন্যে। এমন সুবিধে কি আর হয়। একটা থালা সরাতে পারলেই তো জন্মের মতো আর ভাবনা নেই। পায়ের ওপর পা দিয়ে দিন চলে যাবে। একটার বদলে এখানে তো থালার কাঁড়ি—সোনার থালার পাহাড়!

একটা থালার সোনা বেচলেই তো পায়ের ওপর পা। এতগুলো সোনা পেলে কী যে হবে সে বিষয়ে ভুতোর রীতিমত ভাবনা ধরে যায়!—এত ঐশ্বর্যি নিয়ে করব কী বল্ তো!

কী যে করবে তা রাখালও ভাল করে ভেবে পায় না। তবু ভুতোর ওপর সে চটে উঠে দাঁত খিঁচোয়—শোনো কথা! সোনা নিয়ে করব কী! রাজার মতো খাব দাব ফুর্তি করব।

রাজার মতো খাওয়াটা যে কী ভুতোর সে বিষয়ে ঠিক ধারণা নেই। তবু এইমাত্র যে রকম খাবারের নমুনা চেখে এসেছে রাজার খাবার সেই রকম একটা কিছু হবে বলে সে ধরে নেয়, কিন্তু সোনার কাঁড়ি তাতেও যদি না ফুরোয়!—তখন!

তখন তাল তাল করে সোনা জমাব, বুঝেছিস! ঘরভর্তি সোনা—রাখাল তাকে বুঝিয়ে দেয়!

শুধু জমাব।—কিন্তু চুরি যদি কেউ করে নেয়!—ভুতো জিজ্ঞাসা করে।

রাখাল খেঁকিয়ে ওঠে—বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা। আমাদের কাছ থেকে চুরি করবে সোনা! সাত-ডুব দীঘির তলায় যখ দিয়ে পুঁতে রাখব না!—কে ছোঁবে সে সোনা!

সোনা যদি পুঁতেই রাখল তবে তাতে আর লাভ কিসের, ভুতো ঠিক বুঝতে পারে না। তবু রাখালের কাছে দাঁতখিচুনি খাবার ভয়ে আর সাহস পায় না কিছু জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু রাত যেন আর হতে চায় না। এদিক ওদিক ঘুরে আজব দেশের নানা তাজ্জব ব্যাপার দেখেও রাখাল আর ভুতোর সময় যেন আর কাটে না। আর খুব বেশী মেলামেশা করে সব জায়গা দেখাশুনো করতে তারা ভরসাও পায় না। কোথায় কে চিনে রেখে দেবে কে জানে। তারা ঘোরাঘুরি করে,—কিন্তু আনাচে কানাচে।

রাত যদি বা হল তবু এ পোড়া রাজ্যের মানুষগুলো যেন ঘুমোতে জানে না। এখানে গান ওখানে বাজনা, সেখানে হাসি হট্টগোল:—আড়াই প্রহরে চাঁদ না ডোবা পর্যন্ত তাদের ফুর্তির আর কামাই নেই।

জ্যোৎস্না গিয়ে সব অন্ধকার হবার পর ক্রমশ সব যেন নিশুতি হয়ে এল।

রাখাল ভুতোকে ঠেলা দিয়ে বলে—এইবার!

ভুতো রাস্তায় ঝোপের ধারে একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল—উঠে হাত তুলে বলে—কী!

রাখাল চাপা গলায় যতদূর সম্ভব খিঁচিয়ে ওঠে—কী তা জান না আহাম্মুখ! এইবার যেতে হবে না!

ওঃ, তা হবে বটে!—ভুতো উঠে পড়ে কিন্তু কেমন যেন তার গা নেই। রাখালের সঙ্গে হোটেলখানার দিকে যেতে যেতে একবার বলেও ফেলে—আচ্ছা, আজ আর কষ্ট না করলে হয় না?
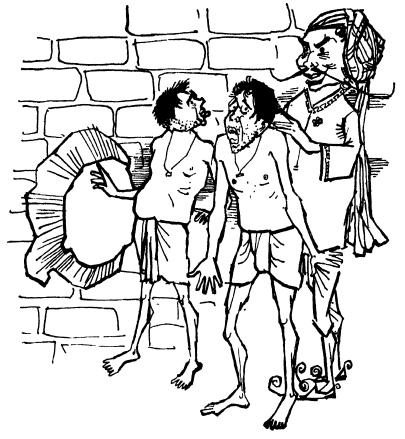
অ্যাঁ!—রাখাল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। হল কী ভুতোর! ব্যাঙের জলে ব্যাজার! বেড়ালের মাছে অরুচি! মুখে বলে—বলিস কী ভুতো!

ভুতো যেন বড় লজ্জায় পড়ে যায়—না, এই বলছিলাম, ও হোটেলখানা তো আছেই, সোনার থালাও যাচ্ছে না। দু-চার দিন বাদে যখন খুশি সরালেই তো হত, ততদিন ঘুরেফিরে জায়গাটা একটু দেখে নিতাম। একবার পুঁটলি বাঁধলেই তো গা-ঢাকা দিতে হবে, আর দেখাশোনা তো হবে না।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ফেলে ভুতো হাঁপাতে থাকে, রাখাল প্রথমে হতভম্ব তারপর তেতে আগুন হয়ে বলে,—তবে থাক তুই এইখানে, আমি একাই চললাম।

সিঁধকাটিটা কেড়ে নিয়ে সে সত্যিই হনহন করে এগিয়ে চলে। ভুতোকে এবার পিছু নিতেই হয় ভয়ে ভয়ে। ধমক খাবার ভয়ে আর কথাটি পর্যন্ত কয় না।

হোটেলখানার ঠিক পেছন দিকটিতে তারা গিয়ে ওঠে। তারপর বেশ অন্ধকার ঘুপচি একটা কোণ দেখে কাজ শুরু করে দেয় রাখাল। গুণীর হাতে সিঁধকাঠি যেন মাখনের গায়ে ছুরির মতো চলে, দেখতে দেখতে পুরু দেওয়ালের অনেকখানি পাতলা হয়ে গেল।

রাখাল নিজের বাহাদুরিতে খুশী হয়ে ওঠে। ভুতোর ওপর রাগটা তার এতক্ষণে পড়ে এসেছে। তাকে ডেকে বলে,—আর কটা খোঁচা দিলেই একেবারে কাজ হাসিল। তুই ততক্ষণ একবার চারদিক ঘুরে দেখে আয় দেখি। কোথাও কেউ জেগে আছে কিনা!

রাখালের রাগ পড়েছে দেখে খুশী হয়ে ভুতো টহল দিতে বেরোয়। না, কোথাও কেউ জেগে নেই। কিন্তু চারিদিক ঘুরে হোটেলখানার সামনে এসে সে একেবারে অবাক!

হোটেলখানার দরজা তো হাট্‌! কেউ বেরিয়েছে নাকি ভেতর থেকে! তাহলেই তো সর্বনাশ।

একেবারে নিঃসাড়ে সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। কারু কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যায় রাখালের কাছে ব্যাপারটা জানাতে।

রাখাল তখন কাজ প্রায় হাসিল করে এনেছে। ভুতোকে দেখে খুশী হয়ে চুপিচুপি বলে—পা বাড়িয়ে দেখ দিকি ভুতো।

ভুতো সভয়ে বলে—পা বাড়াবে কী? হোটেলখানার দরজা খোলা তা জান!

দরজা খোলা! বলিস কিরে!

ভুতোর আর জবাব দেওয়া হয় না। তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। তার ঠিক আগে রাখালের পেছনে একটা লোক কখন এসে দাঁড়িয়েছে সে টেরই পায় নি।

ভয়ে অবশ হাতপাগুলোর একটু সাড় ফিরতেই চোঁ চাঁ দৌড় দেবে, না ভালোয় ভালোয় ধরা দেবে ভুতো যখন ঠিক করতে পারছে না, তখন লোকটা হঠাৎ বলে—বাঃ বাঃ, খুব হাতের কেরদানি তো! এই পাথরের মতো দেওয়ালে এমন নিটোল ফাঁক!—কিন্তু এ আবার কী খেলা ভাই? রাত দুপুরে দেওয়াল ফুটো?

খানিকক্ষণ আর কারও সাড়াশব্দ নেই। এখন হাতে হাতে ধরা পড়ার পর আর রক্ষা আছে! ভুতোর তো জিভটা অসাড়, পা দুটোর মনে হয় শেকড় গজিয়েছে।

সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায় রাখালের দিকে। বিপদে রাখালই তার ভরসা। কিন্তু রাখালেরই কি আর মাথার ঠিক আছে।

সে যাকে বলে ভ্যাবাচ্যাকা অর্থাৎ সোজা ভাষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

একবার সিঁধকাটিটা শক্ত করে ধরে ভাবে, এক ঘা বসিয়ে দিয়েই সব ল্যাঠা দেবে চুকিয়ে। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হবে কি। ফ্যাসাদ বরং বাড়তেই পারে।

কিন্তু—কিন্তু ব্যাপারখানা কী!

লোকটার ধরন-ধারন দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো! কোথায় হৈ চৈ বাঁধিয়ে লোক ডেকে মারধর করে একটা কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করে তুলবে, না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সিঁধের ফোকরটা পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত।

আবার শুধোয় কিনা,—সত্যি ভাই, কী করছিলে বলো তো!

মনে মনে রাখাল এবার রীতিমত চটেই যায়। বাগে পেয়ে ঠাট্টা হচ্ছে—না! হাতে নাতে ধরে ফেলেছিস, যা করবার হয় কর। হাত-কড়া দে, না হয় দু ঘা কসিয়ে-ই দে লোকজন ডেকে। অমন দু-চার ঘা খাওয়া রাখালদের সওয়া আছে। কিন্তু ঠাট্টা আবার কিসের?

রাগে রাখালের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—কী আর করছিলাম, তোমাদের দেওয়াল কেমন মজবুত তাই দেখছিলাম।

লোকটা এক মুখ হেসে বলে,—ওঃ, তাই তো বটে! তোমরা বুঝি স্থাপত্য-বিশারদ?

স্থাপত্য-বিশারদ! ঠাট্টার পর আবার গালাগাল! তাও আবার এমন দাঁতভাঙা গাল। রাখাল আগুন হয়ে উঠে বলে—কী?

না, না, আমি বলছি—লোকটা যেন একটু অপ্রতিভ হয়েই বলে,—তোমরা বুঝি বাড়িঘর কেমন মজবুত তদারক করে বেড়াও?

এ আর সত্যি সহ্য হয় না।

রাখাল জ্বলে উঠে বলে,—না!

না?—লোকটা অবাক—তবে?

তবে কী যেন জান না?—ন্যাকা আর কী?—রাখাল চেঁচিয়ে ওঠে,—আমরা চোর, হ্যাঁ সিঁধেল চোর, একশবার হাজারবার চোর,—এখন কী করবে করো!

লোকটা এবার হো হো করে হেসে ওঠে। হাসি তার আর থামতে চায় না। হাসতে হাসতেই বলে—বুঝেছি, বুঝেছি। তোমরা নির্ঘাত···

তাকে আর কথা শেষ করতে হয় না। রাখাল সিঁধকাঠিটা তুলে ধরে শাসিয়ে বলে,—খবরদার! আমরা হট্টমালার দেশের লোক, যদি ফের বলেছ তো দিয়েছি এক বাড়ি! এখানে নেমে অবধি শুধু হট্টমালা আর হট্টমালা-ই শুনছি। আর যদি কেউ বলেছে······রাখাল একেবারে মারমুখো।

লোকটা চুপ করে, কিন্তু হাসি তার থামে না। খানিক বাদে একটু সামলে বলে,—আচ্ছা ভাই, কিছু বলব না। এখন চলো ভেতরে তো যাই।

ভুতো এতক্ষণ এদের কথাবার্তায় কেমন যেন থই পাচ্ছিল না। এইবার ভাবগতিক দেখে সাহস করে রেগে উঠে বলে—যদি না যাই?

—না গেলে আর কী করছি বলো। তবে গেলে ভাল হত। আমাদের দিক্‌দারেরও এই এক রোগ কিনা! একসঙ্গেই চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করা যেত।

চিকিচ্ছে! চিকিচ্ছে আবার কিসের! আর দিক্‌দারই বা কে! কথাগুলো যত গোলমেলেই হোক, রাখাল আর ভুতো ভেতরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে,—কারণ তাদের কথাবার্তার মধ্যে কয়েকজন ইতিমধ্যে এসে জমা হয়ে গেছে। এদের হাত ছাড়িয়ে পালানোটা ঠিক সুবিধে হবে না।

ভেতরে যেতে যেতে ভুতো কিন্তু মনের ধুকফুকুনি আর চেপে রাখতে পারে না। বলে,—দিক্‌দার আবার কে?

একজন জবাব দেয়—আরে দিক্‌দারকে চেন না, বড় বাগানের সেরা গুণী। যার আপেলাম আর জাম্পিচ খেয়ে দেশের লোকের প্রাণ ঠাণ্ডা!

তার হয়েছে কী?—জিজ্ঞেস করে রাখাল।

যা হয়েছে বড় সাংঘাতিক। এই সেদিন বড় মালীর নাকটা ফাটিয়ে দিলে না এক ঘুঁষিতে!

তাহলে বড় মালীর নাকের চিকিচ্ছে হচ্ছে বলো,—বলে রাখাল।

আহা, তার আবার চিকিচ্ছে কী! একটু মলমেই ঠাণ্ডা। চিকিচ্ছে দরকার দিক্‌দারের!

নাক ফাটল বড় মালীর আর চিকিচ্ছে হবে দিক্‌দারের? এরা বলে কী!—রাখাল সত্যি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

তা আর কার হবে? কথায় কথায় লোকের গায়ে হাত তোলা—এ কি সোজা রোগ! তোমাদেরও কিন্তু ওই এক ব্যায়রাম। আর একটু হলে দিয়েছিলে মাথাটা ফাটিয়ে! তাই তো বলি, দিক্‌দারের সঙ্গে তোমাদের চিকিচ্ছে দরকার।

রাখালের মুখে আর কথা নেই। নিজের মাথাটা ঠিক আছে কিনা এবার তার ঘোরতর সন্দেহ হয়। ভুতোর কথা তো ধর্তব্যিই নয়। তার মাথা-ই নেই তো মাথা খারাপ।

খাবার দোকানে তারা ঢোকবার পর সেখানে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। তারা চুরি করেছে, না তাজ্জব এক কেরামতি দেখিয়েছে, লোকগুলোর ভাবগতিক দেখে বোঝবার জো নেই।

দোকানের মালিক—আলবাত সে দোকানের মালিক—রীতিমত খাতির করেই তাদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসায়!

আরে এ যে চেনা মুখ—এই সকালেই না·········

তাকে আর কথাটা শেষ করতে দেয় না ভুতো।—হ্যাঁ, সকালেই এখানে খেয়ে গেছি। তা হয়েছে কী! দাম বুঝি আর কেউ এখানে বাকী রাখে না।

যে লোকটা তাদের চুরি ধরে ফেলেছিল, সে দোকানীর কানে কানে কী যেন বলে।

দোকানী নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—ঠিক তো! বাকী থাকে বই কি। কিন্তু এবেলা তো ভাই সদর দিয়ে এলেই পারতে। কী দরকার ছিল অত কষ্ট করে দেওয়াল ফুটো করবার!

রাখাল হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে রেগে গিয়ে—ছিল, ছিল—দরকার ছিল। দরকার ছিল তোমার ওই সোনার থালাগুলো চুরি করা! সদর দিয়ে এলে সেগুলো দিতে তুমি?

দোকানী অবাক হয়ে বলে,—বাঃ, এ আর এমন কী কথা। থালাগুলো চাইলে কি আমি দিতাম না। কিন্তু কী করতে ভাই মিছিমিছি ওগুলো নিয়ে, শুধু বোঝা বওয়াই সার তো!

রাখাল আর ভুতো খানিক হতভম্ব হয়ে সকলের দিকে তাকায়। তারপর রাখাল হঠাৎ ভুতোর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—আর একবার আঙুলটায় কামড় দে দেখি ভুতো!

ভুতো খুশী মুখে দাঁত বার করতেই কিন্তু রাখাল হাতটা টেনে নিয়ে বলে,—আচ্ছা এখন থাক—একটু ভাবতে দে!

[ক্রমশ
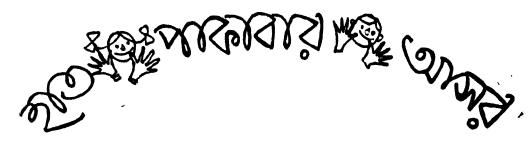
জগবন্ধুর শিক্ষালাভ

সুভাষচন্দ্র ঘোষ। ২২৪। কলকাতা। বয়স ১৬

দুষ্টু-সরস্বতীর প্রধান ভক্ত জগবন্ধুর ওরফে জগাইয়ের নাম বোধহয় উত্তর কলকাতার কোন স্কুল-কর্তৃপক্ষেরই অজানা নয়। তার বারো বছর বয়সে সে সাতবার স্কুল বদল করেছে। অবশেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যালয়-এ এসে সে যেন স্থির হয়ে গেল। দীর্ঘ তিনটি বছর কেটে যেতে তার বাবা তো যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু সেদিন হঠাৎ কী করে যে আবার বাতাসে দুরন্তপনা জেগে উঠে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই কাহিনীটি বলছি—

সেদিন ছিল পয়লা তারিখ। জগবন্ধুর ক্লাশে পণ্ডিতমশাই সংস্কৃত পড়াচ্ছেন। পণ্ডিতমশাই পড়াচ্ছিলেন : 'সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।' সঙ্গে সঙ্গে তার বাংলা অর্থও বললেন—'সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, যা অপ্রিয় তা সত্য হলেও বলবে না। অপ্রিয় সত্য কথা শুনলে অনেকে দুঃখ-কষ্ট পায়, অনেকে রেগে যায়, আবার অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেই জন্যে কখনও অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না। চুপ করে থাকবে, তবুও অপ্রিয় সত্য কথা বলবে না।' —এই অবধি শুনে জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টারমশাই, অপ্রিয় সত্য কথা না বলে মিথ্যে কথা বলব ?' গুরুমশাই বললেন, 'না তা বলবে না। অপ্রিয় সত্যও বলবে না, মিথ্যেও বলবে না, চুপ করে থাকবে।' শ্লোকের মানেটা এতক্ষণে জগবন্ধুর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

সেদিন ছুটির পর জগবন্ধু ট্রামে করে বাড়ি যাচ্ছে। ট্রামের মধ্যে দেখে পণ্ডিতমশাই রয়েছেন। ট্রামে ভীষণ ভিড়। জগবন্ধু ছোট ছেলে তো, ঠেলেঠুলে কোনোরকমে ভিতরে ঢুকল। দরজার কাছেই পণ্ডিতমশাই দাঁড়িয়ে আছেন—জগবন্ধুর সামনেই। হঠাৎ জগবন্ধু দেখে একটা লোক ব্লেড দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের পাঞ্জাবি কাটছে। জগবন্ধু হাঁ করে দেখতে লাগল। লোকটা পাঞ্জাবির পকেটের নীচে একটা ফুটো করে ফেলল। তার পরেই ভিতরের টাকাটা নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে গেল।

জগবন্ধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিতমশাইয়ের খেয়াল হল পকেটে সারা মাসের মাইনেটি নেই। তিনি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। এমন সময় কণ্ডাক্টর এসে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে টিকিট চাইল। পণ্ডিতমশাইয়ের পকেট খালি—তিনি চেঁচামেচি শুরু করলেন। ট্রামের যাত্রীরাও নানা মন্তব্য করতে লাগল। কেউ বলে, 'কী আর করবেন মশাই, দিনকালই এইরকম।' আবার কেউ বলে, 'আপনার পকেট

কাটল, আপনি বুঝতেও পারলেন না! কী রকম লোক মশাই আপনি?' এতক্ষণে জগবন্ধু কথা বললে 'পণ্ডিতমশাই, যে চুরি করেছে সে এখন ট্রামেই নেই।' পণ্ডিতমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে জানলে?' জগাই বললে, 'আমি যে লোকটাকে আপনার পকেট কাটতে দেখলাম। সে ব্লেড দিয়ে আপনার পকেটে ফুটো করল, তারপর টাকাগুলো বার করে পকেটে নিয়ে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল।—এই কিছুক্ষণ আগেই।' পণ্ডিতমশাই চিৎকার করে বললেন, 'আমায় তখন বললে না, হতভাগা!' জগাই বললে, 'আপনি যে পড়িয়েছেন—সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ, ন ব্রুয়াৎ সত্যম্‌প্রিয়ম্‌। আপনার সারা মাসের মাইনে চুরি যাওয়াটা তো অপ্রিয় জিনিস। সেই জন্যেই অপ্রিয় কথাটা সত্য হলেও বলি নি। তাছাড়া যে চুরি করেছে, তাকে ধরিয়ে দেওয়াটা—সেটাও তো একটা অপ্রিয় কাজ। তাই চুপ করে ছিলাম।—কারণ আপনিই তো স্যার পড়িয়েছেন, অপ্রিয় কথা সত্য হলেও বলবে না। চুপ করে থাকবে।'

পণ্ডিতমশাই উত্তর শুনে রাগে কাঁপতে লাগলেন। এমন সময় একটা স্টপেজ—এইখানেই তাঁকে নামতে হবে। তিনি আর দেরি না করে ট্রাম থেকে নেমে পড়লেন। নামবার সময় বলে গেলেন—'উল্লুক বদমাইশ ফাজিল ছেলে, কাল একবার ইস্কুলে যেও। তোমার গুরুভক্তি বার করছি। অন্তত একগাছা বেতও যদি তোমার পিঠে না ভাঙি তো আমি পণ্ডিত-ই নই।'

পরদিন পণ্ডিতমশাই ক্লাশে এলেন—হাতে একগাছা বেত নিয়ে। কিন্তু ক্লাশে এসে দেখেন যার জন্যে বেত আনা, সে-ই ইস্কুলে আসে নি। সেইদিন থেকে জগাই সেই ইস্কুলে আর যায় নি।

স্বর্গীয় পিতার প্রতি

শ্যামলী দে সরকার। ১৬১৮। কলকাতা। বয়স ১৬

আমায় ফেলে চলে গেলে, যখন বয়স ছয়—
সেই থেকে হায়, ভুলে গেছি তোমার পরিচয়!
কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে—কোন সে সুদূর দেশ?
সেথাও কি গো সহ্য কর আমার মতোই ক্লেশ?
সবার বাবাই আদর করে, সবায় ভালবাসে।
আমায় তো কই ডাক না গো তোমার কোলের পাশে!
আমার মনের ব্যথাটি হায়, বোঝ না কি তুমি—
আদর কেন কর না গো মুখটি আমার চুমি!
কত কথা বলব তোমায়, দাও না কেন সাড়া?
'পিতৃহারা' হয়ে আমি হলুম 'সর্বহারা'।
ভগবানের এই কি দয়া, হায় রে আমার প্রতি?
অন্য কারও না-হয় যেন আমার মতো ক্ষতি॥

রবিন পাখির গল্প

গৌতম চৌধুরী। ২৪৪৪। কলকাতা। বয়স ১৩

বহুকাল আগে, যখন পৃথিবী সবে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময়ে উত্তর দিকের দেশে একটা বড় আগুনের কুণ্ড ছিল। এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও আগুন ছিল না। সেইজন্য পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে লোকজন, পশুপাখি প্রচণ্ড শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য নিজেকে গরম করতে এবং রান্নাবান্না ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় কাজ করতে এখানে আসত। এই আগুনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল এক শিকারী আর তার ছেলের উপর।

একদিন শিকারী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে তখন তার ছেলেকে এই আগুনের কুণ্ড দেখার জন্য রেখে গেল। তাকে সারাদিনই বনের মধ্যে গিয়ে আগুনের কুণ্ডের জন্য কাঠ, লতাপাতা ইত্যাদি আনতে হয়েছিল। সারাদিনই সে কাঠ,

লতাপাতা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিল, নিভতে দেয় নি। কিন্তু সারাদিন এই সব করে সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে, সে শীগগিরই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেইখানে একটা দুষ্টু সাদা ভাল্লুক ছিল। সে সবসময়ই এই আগুনের কুণ্ডকে নিভিয়ে ফেলতে চাইত। যখন শিকারী ও তার ছেলে পাহারা দিত তখন ভাল্লুকটা কিছু করতে পারত না। সে যখন দেখল যে কেউই আগুন পাহারা দিচ্ছে না তখন খুব খুশী হয়ে উঠল। সে ভাবল এটাই আগুন নিভিয়ে ফেলবার সুবর্ণ সুযোগ। সে আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি তার গোদা গোদা পা নিয়ে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। এমনি করতে করতে আগুন নিভে গেল। যখন আর একটাও আগুনের কণা দেখা গেল না তখন সে খুব খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সেইখানে একটা গাছের উপর একটা রবিন-পাখি থাকত। গাছের উপর বসে বসে সে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছিল। আগুন নিভে যাওয়াতে পৃথিবীর লোকের যে খুব কষ্ট হবে এটা বুঝতে পেরে তার খুব দুঃখ হল। তখন কুণ্ডটার কাছে এল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা খুব ছোট্ট আগুনের কণা। এই কণা থেকে যে করেই হোক আগুন জ্বালিয়ে তুলতেই হবে। এই বলে তার সে তার ছোট্ট বুকটা সেই আগুনের কণার উপরে দিয়ে তার ছোট্ট ছোট্ট পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বলে উঠল। আগুন যতই জ্বলে উঠতে লাগল ততই তার বুক পুড়ে যেতে লাগল। কিন্তু সে এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। ইতিমধ্যে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সে উঠে আগুনের কাছে এল। রবিন ছেলেটিকে দেখে গাছে উড়ে গেল। গাছে বসে সে দেখল যে তার সেই পোড়া জায়গাটা সুন্দর লাল পালকে ছেয়ে গেছে।

সেই থেকে প্রত্যেক রবিন পাখির বুকের খানিকটা লাল। রবিন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পৃথিবীর লোকের উপকার করেছিল বলে আজও উত্তর দিকের প্রত্যেক লোক তাকে খুব ভালবাসে। [বিদেশী গল্প অবলম্বনে]

বাবুয়ার কাণ্ড

শুভঙ্কর ঘোষ। ২৭০৩। কলকাতা। বয়স ১৩

ছোট্ট ছেলে বাবুয়া। বছর ছয়েক বয়স হবে। সেই কখন সকাল বেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল, এখনও ফেরে নি। এদিকে খাবার সময় হয়ে গেছে। তার মা তো ভেবেই অস্থির, কী হল, এখনও ফিরল না! এদিকে বাবুয়ার যা দুরবস্থা। এতদূর হেঁটে এসে বাড়ি ফেরবার পথটাই আর খুঁজে পাচ্ছে না। বাবুয়ার খিদে পেয়েছে, বেচারী কেঁদেই আকুল, না পারছে কিছু খেতে, না পারছে বাড়ি ফিরে যেতে। একটা খাবারের দোকানের সামনে সে এসে দাঁড়াল, একটি পয়সাও নেই যে কিছু কিনে খাবে।

আ রে! নর্দমার কাছে পুটলির মতো কী পড়ে? বাবুয়া তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খুলে দেখল—অনেক টাকা। সে গুনতে শিখেছে; গুনে দেখল দশটা দশ-টাকার আর পাঁচটা পাঁচ-টাকার নোট। খুব খুশী! এমন সময় বাবুয়া দেখল এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে কী যেন খুঁজতে খুঁজতে আসছেন। এ কী। মনে হচ্ছে যেন তারই দিকে আসছেন। বাবুয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে একশ-পঁচিশ-টাকা-বাঁধা একটা রুমাল দেখতে

পেয়েছে কিনা। বাবুয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে পুঁটলিটা তাঁকে দিয়ে দিল। ভদ্রলোক আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। বললেন— 'খোকা, তুমি আমার এত উপকার করলে, তোমার কী চাই বলো।' বাবুয়া সমস্ত কথা বলে বলল যে তার ভীষণ খিদে পেয়েছে, আর সে বাড়ি ফিরে যেতে চায়। ভদ্রলোক সামনেই খাবারের দোকান পেয়ে বাবুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন আর তাকে পেট ভরে খাওয়ালেন। তারপরে একটা ট্যাক্সি করে তাকে বাড়ি পৌছে দিলেন। বাবুয়ার মা ছেলেকে পেয়ে খুব খুশী; ভদ্রলোককে অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। ভদ্রলোক বাবুয়ার মাকে সমস্ত কথা বলে বললেন যে এরকম উপকার তিনি কোনদিন ভুলবেন না। বাবুয়ার কাছে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ঠেকল। কী থেকে কী হল, তারপর আবার যেমন কে তেমনি বাড়িতে ফিরে এল। হঠাৎ নিজের ভুলের জন্য যে সে নিজের বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই মনে পড়ে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি গিয়ে বিছানায় উঠে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। মা এসে বকে দিয়ে গেলেন—খবরদার তুমি আর বাড়ি থেকে একলা একলা বেরুবে না।

দীঘি

ফাল্গুনী রায়। ১৬১১। কলকাতা। বয়স ৯

স্বচ্ছ দীঘির জল,
করে শুধু টলমল।
মাছেরা সাঁতার দিয়ে,
জল কেটে যায় ধেয়ে।
পদ্মদীঘি নাম তার
পদ্মফুলের কী বাহার।

অদ্ভুত ভুত

রাখী চট্টোপাধ্যায়। ২৪৪৮।। কলকাতা। বয়স ১১

আমরা একবার শিলিগুড়িতে গিয়ে উঠলাম বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। কী সুন্দর বাড়ি, চারিদিকে খোলা মেলা মাঠ আর ঘরগুলো বড় বড়। দেখেই মনে হয়, পুরনো আমলের জমিদারবাড়ি। রাত্রি বেলা খেয়েদেয়ে যখন ঘুমুতে যাচ্ছি, তখন রাত্রি দশটা হবে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বলে বেশ একটু ঠাণ্ডাও অনুভব করছি। আমার বোন আর আমি একটা ঘরে ঘুমুচ্ছি, বেশ ভয় ভয়ও করছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই, হঠাৎ আমার বোন ইলা চিৎকার করে উঠল, ওরে বাবারে, ভূত রে! বলেই একেবারে অজ্ঞান। আমি উঠে দেখি যে দরজার পাশে কে একজন কালোমতো। এগিয়ে যেতে সাহসে কুলোল না। ততক্ষণে মা পাশের ঘর থেকে চীৎকার শুনে উঠে এসেছেন। ঠিক সময়ে খাটের তলা থেকে শব্দ এল মিঁউ। কারও আর বুঝতে বাকি রইল না যে একটা কালো বেড়াল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর ইলার যখন জ্ঞান হল তখন ভোর হয়ে এসেছে।

ছুটির দুপুর

চৈতালী সরকার। ২৪৬৩। কলকাতা। বয়স ৮

সারা দুপুর ঘুরে বেড়াই যেদিন থাকে ছুটি
কী খাই কী খাই কুলের আচার গুড় না পাঁউরুটি?
অনেক ভেবে কুলের জারে হাত দিয়েছি যেই
জানলা দিয়ে দাদা বলে গাঁট্টা খেলি এই!
আমি বলি দাদা তুমি বলবে না তো জানি
না হয় তুমি ভাগে বেশী পাবে অনেকখানি।
দুইজনেতে মজা করে চাটতে লাগি হাত
খোকন চেঁচায় চোর ধরে আজ করব বাজিমাত।

অজয়বাবু ও তাঁর মেয়ে

সুজিত মুখোপাধ্যায়। ২৬৩০। হালতু। বয়স ৯

এক বাড়িতে অজয়বাবু বলে একজন ভদ্রলোক আর তাঁর মেয়ে বুলু থাকত। একদিন তিনি বুলুকে বললেন, 'একটা কাজ করবি মা?' বুলু বলল, 'কী কাজ বাবা?' তিনি বললেন, 'আমার জন্যে একটা সন্দেশ কিনে রাখবি?' এই বলে তিনি আপিসে চলে গেলেন। বুলু সন্দেশ আপিস থেকে একখানা সংখ্যা কিনে বাড়িতে এল। বিকেলে অজয়বাবু আপিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে খেতে চাইলেন। তখন বুলু তাদের বাড়িতে যে কাজ করে তাকে বলল, 'কেষ্ট, বাবু খেতে চাইছেন।' তখন কেষ্ট খাবার হাতে নিয়ে এল অজয়বাবুর কাছে। অজয়বাবুর খেতে খেতে মনে পড়ে গেল সন্দেশের কথা। তখন তিনি বললেন, 'বুলু আমার সন্দেশটা দে তো।' বুলু বলল, 'তাকে আছে বাবা।' বাবা বললেন, 'কোন্ তাকে?' বুলু বলল, 'ও ঘরের তাকে।' তখন তিনি বললেন, 'তাকে রেখেছিস কেন? পিঁপড়ে ধরে গেছে বোধহয়। তুই এনে দে।' তখন বুলু ও ঘরের তাক থেকে সন্দেশ এনে দিলে। অজয় বাবু বললেন, 'এ তো পত্রিকা সন্দেশ। আমি বললাম খাবার সন্দেশ আনতে আর তুই পত্রিকা সন্দেশ আনলি।' তখন বুলু বলল, 'বাবা, তুমি পড়ে দেখো ঠিক খাবার সন্দেশের মতোই লাগবে। তখন অজয়বাবু পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে খালি হাসেন। পড়া শেষ হলে তাঁর মনে হল সন্দেশ খেয়েছেন। তখন বুলু বলল, 'বাবা, তুমি আমাকে সন্দেশের গ্রাহক করে দাও।' সেই থেকে বুলু সন্দেশের গ্রাহক হয়ে গেল।

আমি পলাশ

বাণী সরকার। ৬১২। বসিরহাট। বয়স ১৩

আমাকে চিনলে না তো? আমি কে বলছি শোনো। আমি হলাম খুকুদের বাগানের পলাশ গাছ। দুঃখ কী জান ভাই, সারাটা বছর ভাবি কখন এই সময়টা আসবে। যাকে তোমরা বল বসন্তকাল। বছরের এই একটুখানি সময় আমার আগুন-রাঙা রূপ সকলেরই চোখে পড়বে। ভেবো না নিজের রূপের গর্ব করছি। কিন্তু ভাই, সুখ কত দিনের! একটি একটি করে যখন আমার লাল সহস্র সহস্র ফুল ঝরে পড়বে! ঝরতে ঝরতে যখন শেষ হয়ে যাবে তখনকার অবস্থা ভেবো। তখন হয়তো আমার দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না।
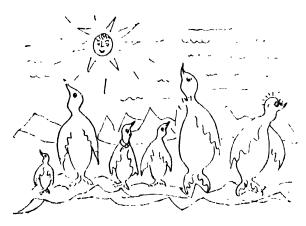
কফি হল কালি

মেশাতেই দুধ কফির গেলাসে
বাবুনু হল যে জব্দ,
সঙ্গীরা তার বোবা-নিশ্চুপ—
মুখে নাই সাড়া-শব্দ!

কোন্‌খান থেকে কী হল কাণ্ড—
কফিতে মেশাতে দুধ যে,
হল বিলকুল কালি-সমতুল—
ব্যাপারটা অদ্ভুত যে!

তোমাদের বলি চুপি চুপি, শোনো—
সুনু আর নানু দু বোনে
বাবুনুর সাথে কৌতুকছলে—
কারসাজি করে গোপনে।

কফির বদলে আয়োডিন-জল—
আর জলে গোলা ময়দা,
রেখে দিয়েছিল টেবিলের পরে
আর ক'রে কিছু কায়দা—

নিজেরাও ছিল সঙ্গে সঙ্গে—
যাতে এ না খায় বাবুনু।
কোন্ কায়দায় দুধ যে মেশাবে—
ভাইয়েরে দেখায় তা সুনু।

বাবুনু ভেবেছে আয়োডিন-জল
কফির লিকার টাটকা—
'ময়দা-গোলা' ভেবেছে সে দুধ,
লাগে নি কো মনে খটকা

আয়োডিন সাথে শ্বেতসার জাতি-
ময়দা মেশার ফলেতে,
সাথে সাথে হল রসায়নী ক্রিয়া,
কাচের গ্লাসের জলেতে।

তাই বদলাল জলের বর্ণ—
কফি হল কালো কালি যে!
মজা দেখে হল সবে খুব খুশী
দিল কষে হাততালি যে!

[তোমরা যদি বা কর এই মজা,
সাবধানে রেখো আয়োডিন।
আয়োডিন বিষ সে কথা জান তো—
মুখে দিও না তা কোনোদিন।]

চাঁদের কথা

নতুন দেশ আবিষ্কার করতে হলে এখন আর আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে কিংবা অস্ট্রেলিয়ার জনশূন্য প্রান্তরে যেতে হয় না। ভূপৃষ্ঠে খুব কম জায়গাই বাকি আছে যেখানে মানুষ গিয়ে যা কিছু জানবার সব জেনে আসে নি,—তা সে হিমালয়ের দুরারোহ শিখরই হোক, কিংবা অলঙ্ঘ্য দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দুই হোক। এখন ক্রমশ এমন দাঁড়াচ্ছে যে নতুন দেশ বলতে বোঝাতে শুরু করেছে পৃথিবীর বাইরে কোনো দেশ।

মহাকাশ সম্বন্ধে যখন কেউই প্রায় কিছুই জানত না, তখনো মানুষের চাঁদ সূর্য তারা নিয়ে সে কী কৌতূহল। গোড়ায় তাদের দেবদেবী বলে লোকে পুজো করত, এখনো যেমন কেউ কেউ করে। তারপরে ক্রমে বৈজ্ঞানিকরা নানান তথ্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে লাগলেন। মানুষ ক্রমে সৌর-মণ্ডলের কথা শিখল, গ্রহ আর তারার রহস্য বুঝল : তারাদের নিজের আলো থাকে আর গ্রহরা সূর্যের কাছ থেকে ধার-করা আলো নিয়ে অমন সুন্দর রূপ ধরে।

ক্রমে আরো জানল মানুষ,—আমাদের এই সৌরমণ্ডলের মতো আরো লক্ষ লক্ষ সৌরমণ্ডল আছে, তার অনেকগুলি এমন অবিশ্বাস্য রকম দূরে যে সেখানকার একটু আলোর রেখা পৃথিবীতে পৌঁছতে হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ বছরের বেশি লেগে যায়। এ সব দূরদূরান্তরের সূর্যের খানকতক আমরা দেখতে পাই সাধারণ তারার মতো আর বেশির ভাগকে খালি চোখে দেখাই যায় না।

আমাদের আকাশের প্রধান যে দুটি বস্তু, তারা হল সূর্য আর চন্দ্র। আমাদের সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র এই অগ্নিময় গোলা, অর্থাৎ সূর্যকে নিয়ে মানুষ যত না মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি রহস্যময় মনে হয়েছে চাঁদকে। কী নিখুঁত নিয়ম মেনে সে বাড়ে কমে, পূর্ণিমায় যেমন তার উজ্জ্বল রূপ, আবার অমাবস্যায় তেমনি ভয়াবহ তার অনুপস্থিতি। তার প্রভাবে সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা বাড়ে কমে; লোকে বলে মানুষেরও রোগভোগ বাড়ে কমে ; পাগলদের পাগলামি বাড়ে ; এমনি কত কি। তার খানিকটার হয়তো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, বাকি সব মনগড়া কুসংস্কার।

চাঁদের উদ্দেশে হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর কবিরা কত না কবিতা লিখেছেন, ঠাকুমা-দিদিমারা কত না আশ্চর্য আশ্চর্য রূপকথা শুনিয়েছেন। কী সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ, কী স্নিগ্ধ মধুর তার রুপোলি আলো, কী রহস্যময় তার গায়ের কালো আঁকিবুঁকি। সবচেয়ে আশ্চর্য যে তার ওই একটা পিঠই আমরা দেখতে পাই, অপর পিঠে কী আছে আমাদের দেখবার উপায় নেই।

নানান দেশে চাঁদকে কেন্দ্র করে নানান গল্প গড়ে উঠেছে। হিন্দুরা চাঁদের কলা দেখে গোটা একটা শাস্ত্রই তৈরি করে ফেলেছে, কবে কী খেতে হয়, কী করতে হয়, কী উৎসব হয়, কবে ষষ্ঠী, কবে একাদশী। চাঁদের গায়ের কালো দাগ দেখে সেকালে নরওয়ে-সুইডেনের চাষারা বলত ঐ তো জ্যাক

আর জিল, দুই ছেলে মেয়ে বলিষ্ঠ হাতে জল আনতে যাচ্ছে। মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা বলত চাঁদে একটা অদ্ভুত জানোয়ার বাস করে, তাকেই দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বনবাসীরা বলত নাকি একটা খরগোশ থাকে ওখানে। কেউ বা দেখত ব্যাঙ, কেউ কুকুর, বেড়াল, নেকড়ে বাঘ। জাপানীরা বলত, সুন্দর একটি মেয়ে ওখানে নির্বাসিত হয়ে আছে। সেকালে ইংল্যাণ্ডের লোকে বলত একটা বুড়ো থাকে। আমাদের দেশেও চাঁদের দেশের চরকা-কাটা বুড়ির বিষয়ে কত ছড়া লেখা হয়েছে।

তবে এখন সকলেই জানে ওসব কিচ্ছু নয়, চাঁদের গা-ভরা পাহাড় খালি চোখে অমন দেখায়। দূরবীন দিয়ে দেখলে পরিষ্কার দেখা যায় ছোট বড় কত পাহাড়। অনেকগুলো গোল-গোল, মাঝখানটাতে গর্ত, মনে হয় নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরি।

বহুদিন থেকেই পণ্ডিতরা বলে আসছেন চাঁদটা একটা নিভে-যাওয়া পৃথিবীর মতো, একেবারে হিমশীতল, না আছে বাতাস, না আছে প্রাণের সাড়া। হয়তো কোনো কালে ভূপৃষ্ঠের উপরে যখন এত শক্ত আবরণ পড়ে নি, সেই সময়ে পৃথিবীর গা থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে, মাধ্যাকর্ষণশক্তির ফলে সেই অবধি সমানে চারদিকে ঘুরে যাচ্ছে। অন্যান্য গ্রহ-তারার আকর্ষণ-শক্তির জন্য টুপ করে আবার পৃথিবীতেও পড়ছে না; পৃথিবীর আকর্ষণে ছিটকে মহাশূন্যে বেরিয়ে যেতেও পারছে না।

গত বছর দশেক ধরে চাঁদ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল বিষম বেড়ে গেছে, কারণ দ্রুত বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রকেটে করে চাঁদে যাওয়া একটা পাগলের কল্পনা থেকে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে রকেটে করে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে চাঁদের না-দেখা ও পিঠের ছবিও তোলা হয়েছে, আর কত যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। এতদূর পর্যন্ত শোনা গেছে যে আমেরিকার কোনো কোনো বড় লোক চাঁদে নাকি জমি কিনতেও প্রস্তুত আছেন।

সে যাই হোক, এরকম আশা করা যায় যে বছর দশেকের মধ্যে চাঁদে লোক নামানো হয়তো সম্ভব হবে। অবিশ্যি সব নির্ভর করছে চাঁদের পৃষ্ঠদেশের অবস্থা কী রকম তার উপরে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল যে সোভিয়েট রাশিয়ার কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক এইরকম মত প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীর মতো প্রাণধারী না হলেও, হয়তো চাঁদটা একেবারে মরা গ্রহ নয়। তার ভিতরকার আগুন একেবারে নিভে না-ও গিয়ে থাকতে পারে, কারণ মাঝে মাঝে নাকি বৈজ্ঞানিকদের মনে হয়েছে এক-আধটা আগ্নেয়গিরি থেকে ধোঁয়ার মতো বেরোচ্ছে।

এই চাঁদের সম্পর্কে আজকাল অনেক কথা জানা গিয়েছে। তার কিছু কিছু এখানে দেওয়া গেল। চাঁদের ব্যাস বা ডায়ামিটার (diameter) হল মাত্র ২১৬০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের $\frac{১}{৪}$, কিন্তু ওর ভর কিংবা ম্যাস (mass) হল পৃথিবীর $\frac{১}{৮০}$। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণশক্তি এত কম যে যদি বা বহু কোটি বছর আগে চন্দ্রপৃষ্ঠে বাষ্পীয় অনুকণা থেকেও থাকে, সে সবই এতদিনে ছুটে বেরিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

এর ফলে পৃথিবীর চারধার যে-রকম একটা বাতাবরণ দিয়ে আবৃত, চাঁদে সে রকম কিছু নেই। কাজেই জলও নেই, বাতাসও বয় না। চাঁদের চারধারের শূন্যময় পরিবেশে শব্দ-তরঙ্গও সম্ভবত প্রবাহিত হতে পারে না; সূর্যের প্রখর তেজও নিবারণ করবার মতো জলীয় বাষ্পে মিশ্রিত বাতাসের খোলস নেই, পৃথিবীর চারদিকে যেমন আছে। যেখানে সূর্যের আলো পড়ছে সেখানে তাপমাত্রা ২১৪° ডিগ্রি ফারেনহাইট উঠতে, কিংবা যেখানে ছায়া সেখানে ২১৪° ডিগ্রি ফারেনহাইট নামতেই বা বাধা কিসের।

চাঁদটা পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে ঘণ্টায় ২,২৮০ মাইল বেগে আর গড়ে ২৩৯,০০০ মাইল দূরত্ব রেখে।

পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের ২৯½ দিন লাগে; নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পাক খেতেও ঐ সময়ই লাগে। তার মানে সর্বদাই একটু একটু ঘুরতে থাকে, যার ফলে সর্বদা একই পিঠ আমাদের ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখা যায়।

তাকিয়ে দেখলে চাঁদ আর সূর্যকে সমান মাপের দেখায়। আসলে কিন্তু সূর্যটা ৪০০ গুণ বড় আর পৃথিবী থেকে চাঁদ যত দূরে তার চেয়ে ৪০০ গুণ দূরে অবস্থিত।

বলো তো?

১। কোন্ টেবিলের একটাও পায়া নেই?
২। কী করলে হাত তুলতুলে নরম থাকে?
৩। ক' গজ থাকলে তবে কাগজ হয়?
৪। কোন্ বানানটা সব সময় ভুল?
৫। কী জিনিস দিলেও রাখতে হয়?

১। টাইমটেবিল ২। কিছুই না ৩। একটা 'গজ'
৪। 'ভুল' ৫। কথা।

পলাশগড়ের রহস্য

নলিনী দাশ

॥ তিন ॥

শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবার তোর প্ল্যান কী বল।'

'মোটামুটি যা প্ল্যান করেছি তা তোকে খুলে বলছি। তবে বুঝতেই তো পারছিস, অপ্রত্যাশিতভাবে কখনো যদি কিছু ঘটে যায় তা তো আগে থেকে বোঝা যাবে না, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে আর কি।'

সব্যসাচী পকেট থেকে একখানা ছেঁড়া ম্যাপ বার করে আমাকে বোঝাতে লাগল—'এই দেখ, এই রাঁচী থেকে ওই ঝাড়সুগুডা পর্যন্ত যে পাকা রাস্তাটা এসেছে এটাই হল পলাশগড় যাবার আসল পথ। প্রধান রাস্তাটা পাকা, এ পথে নিয়মিত বাস চলাচল করে, মোটর আর গোরু গাড়িও সব সময় যাতায়াত করে। রাঁচীর দিকটা বেশি নির্জন এবং পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা, তাই বাবা ঝাড়সুগুডা দিয়ে যেতে বলেছিলেন, যদিও ওদিকে রাস্তা কিছুটা বেশি। এই দেখ, এইখানে রাঁচী-ঝারসুগুডা রোড থেকে উত্তরঘেঁষা উত্তর-পশ্চিমে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে, এই হল পলাশগড় যাবার একমাত্র মোটরের রাস্তা। ছোটবেলা থেকে গড়ের আশপাশের পাহাড় বনে হেঁটে এবং ঘোড়ায় করে ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে আমরা কিন্তু আরো কয়েকটা পথ আবিষ্কার করেছি। যদিও পায়ে চলা পথ, তবু আমার
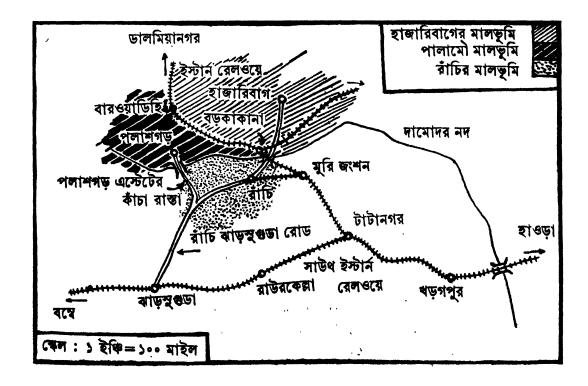
বিশ্বাস যে সাবধানে চললে হয়তো আমি কোন গুরুতর দুর্ঘটনা না ঘটিয়েও ওই পথে জীপ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

আমি তার কথা শুনছিলাম আর মধ্যে মধ্যে হুঁ-হুঁ করছিলাম। তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, জ্বলন্ত মুখচোখ দেখে আমার মনেও তার সাহস ও সংকল্প কিছুটা সঞ্চারিত হচ্ছিল।

সে বলে চলল, 'আমাদের মস্ত বড় সৌভাগ্য যে এই মালগাড়িটা বরকাকানার দিকে চলেছে। সেখানে হয়তো আমরা ঈস্টার্ন রেলওয়ের প্যাসেঞ্জার ট্রেন পেয়ে যাব এবং ভদ্রলোকের মতন টিকিট কেটে যেতে পারব।'

সেদিন আমাদের ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন ছিল তা স্বীকার করতেই হবে। ঠিক সব্যসাচীর পরিকল্পনামতো আমরা ঐ মালগাড়িতে করেই বড়কাকানার কাছাকাছি পেঁছিলাম। লোকালয়ে পেঁছিবার আগেই আমরা চুপিচুপি নেমে পড়লাম। তারপর টুরিস্ট সেজে হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে বড়কাকানা স্টেশনে এসে ঢুকলাম। আমাদের দেখলে কেউ সন্দেহজনক কিছু ভাবত না, নিশ্চয় মনে করত যে আমরা সারা রাত ট্রেনের ধকল সহ্য করে রাজরাপ্পা জলপ্রপাত দেখতে এসেছি। দ্বিতীয় সৌভাগ্য হল এই যে বড়কাকানা পেঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঈস্টার্ন রেলওয়ের একখানা গাড়ি পেয়ে গেলাম। পালামৌ পার হয়ে উত্তরে ঘুরে এটা ডালমিয়ানগরের দিকে চলে যাবে। খাওয়াদাওয়ার সময় হল না, কোনোমতে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি ধরলাম। পথে কিছু কলা আর চিনেবাদাম খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল।

ম্যাপে দেখেছিলাম যে এই লাইনের বারওয়াডিহি স্টেশন থেকে মোটামুটি দক্ষিণে পলাশগড় খুব বেশি দূর নয়। কিন্তু এই দিকে কোনো রাস্তাঘাট না থাকাতে লোকে এই দিক দিয়ে সেখানে যায় না।

মুখে কোনো কথা স্পষ্টভাবে না বললেও সব্যসাচী যে কোনো এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনে মনে ব্যাকুল হয়ে পড়ছিল, সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। বারওয়াডিহি পেঁছে সে খাওয়া বা বিশ্রামের জন্য একটুও সময় নষ্ট করতে রাজি হল না, মরিয়া হয়ে একখানা জীপের সন্ধানে ঘুরতে লাগল। আবার আমাদের ভাগ্য সদয় হল। চৌধুরীমশায়ের নামে এক আড়তদার কিছু অর্থের বিনিময়ে তার একখানা জীপ আমাদের হাতে সমর্পণ করতে রাজি হল। কথা রইল যে সুবিধামতন সব্যসাচী তার গাড়িখানা ফেরত পাঠাবে।

জীপ চালিয়ে রওনা হয়ে সব্যসাচী বলল, 'এবার তুই জীপে বসে বসেই কিছুটা বিশ্রাম করে নে, কেমন! এখন থামতে গেলে তো আমাদের চলবে না।'

আমি বললাম, 'সেসব তোকে ভাবতে হবে না, এখন গাড়ি চালানোর দিকে মন দে তো! একে তো পুরনো ঝরঝরে একখানা জীপ, তাছাড়া চালাবি তো বেপথে আর বিনা পথে। দিনের আলো থাকতে থাকতে পেঁছিবার চেষ্টা কর দেখি।'

'ও', এইজন্যে তোর এত চিন্তা?' বলেই সে বেসুরো গলায় গান জুড়ে দিল—

'ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

বলতে ভুলে গেছি, অন্যদিকে সব্যসাচী যতই অসাধারণ ভালো হোক না কেন, তার গলা দিয়ে গানের গ'ও বেরোয় না। যদিও সেজন্যে স্নানের ঘরে মাঝে মাঝে গলা ছাড়া তার বন্ধ হয় না। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম, 'দোহাই তোর, আমার উপরে ভুবনের ভার থাকুক আর নাই থাকুক, তোর উপরে এই জীপ চালানোর সম্পূর্ণ ভার আছে সেটা ভুলে যাস নে। ওই দেখ, তোর গান শুনে ওই গোরুগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে।'

এবারে সে স্টীয়ারিং ধরেই এমন হো-হো করে হেসে উঠল যে আমি সত্যি সত্যিই ভীত হয়ে ভাবলাম

ারওয়াডিহি থেকে বেশি দূর না যেতেই আমাদের না অপঘাত-মৃত্যু ঘটে! সেই সাংঘাতিক জীপ যাত্রার কথা কি ীবনে কোনোদিন ভুলব? বিশ্রাম তো মাথায় উঠল। কতবার যে পাহাড়ের গায়ে পায়ে-চলা পথ বেয়ে জীপে ক্ষরে উঠবার বা নামবার সময় ইষ্টনাম জপ করে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসলাম তার সীমাসংখ্যা নেই।

ঝোপজঙ্গল ভেঙে আমাদের জীপ ছুটে চলল। থেকে থেকে কাঁটাগাছের ডালের চাবুক খেয়ে আমাদের হাতমুখের ছালচামড়া উঠে যেতে লাগল। বার বার খানাখন্দ, পাথর আর বড় গাছ এসে অপ্রত্যাশিতভাবে পথ রোধ করে দাঁড়াল; তবু বাহাদুর ছেলে সব্যসাচী শেষ মুহূর্তে ঠিকমতন প্রত্যেকবার সামাল দিয়ে এগিয়ে চলল।

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মিও মিলিয়ে গেল। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করল আর শেষ চড়াইটুকুর মুখে এসেই হঠাৎ বিশ্রী একটা শব্দ করে আমাদের জীপখানার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। আমরাও যে গাড়ি উলটে পড়ে মরি নি এটুকুই আমাদের সৌভাগ্য। এই ঘনায়মান অন্ধকারের মুখে, পাহাড়-বনের বুকে দুখানা টর্চের আলো মাত্র ভরসা করে ইঞ্জিন মেরামত করবার চেষ্টা যে নিতান্ত বাতুলতা তা আমরা তখনি বুঝতে পারলাম। তা ছাড়া সব্যসাচী এক মিনিট সবুর করতে পারছে না। দুজনে দুখানা স্যুটকেস হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটেই শেষ টিলাটার উপর উঠতে লাগলাম আর সে আমাকে সমস্ত অঞ্চলটা ভালো করে চিনিয়ে দিল। চারিদিকে রুক্ষ পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটি উপত্যকার ঠিক মাঝখানে পলাশগড় রাজপ্রসাদ। গোল একখানা কাঁসির ভিতরটার মতন আশ্চর্য সমতল আর উর্বর এই ছোট্ট উপত্যকা। উত্তর-পশ্চিম কোণের পাহাড় সবচেয়ে উঁচু। সেখান থেকে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনা কুলকুল করে সমস্ত উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। উপত্যকার চারিদিকেই পাহাড়, কেবল এই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সামান্য একটু ফাঁক। পাহাড়ের উপর দিয়ে বহু বৎসরের পুরাতন এক পাথরের দেয়াল ঘুরে এসে এই দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় এক বিরাট সিংহদরজায় মিলেছে। পলাশগড় আসবার একমাত্র খাস রাস্তাটি রাঁচী-ঝাড়সুগুডা রোড থেকে বেরিয়ে ঝরনার পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্বের ঐ সিংহদরজা দিয়ে ঢুকেছে। ঠিকভাবে এলে আমাদের এই পলাশগড় এস্টেটের খাস রাস্তা দিয়ে আসতে হত, নিশ্চয় আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য লোক থাকত। সমস্ত দিনটা কাবার করে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা উত্তর দিক থেকে পাহাড় ভেঙে এসে দেয়ালের সামনে পৌঁছলাম। এত বিলম্বের দরুন চৌধুরীমশাই কি খুব চিন্তা করছেন? ঝাড়সুগুডায় অপেক্ষা করে করে নিরাশ হয়ে তাঁর গাড়ি কি ফিরে এসেছে? মনে মনে সব্যসাচী কী ভাবছে কে জানে, মুখে সে কেবল বলল, 'এবার পাঁচিল টপকাতে হবে।'

অবশ্য আমরা ইচ্ছে করলে পাঁচিলের পাশ দিয়ে হেঁটে সমস্ত উপত্যকা বেষ্টন করে তারপর সিংহদরজা দিয়ে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু সব্যসাচী অত ঘুরতে রাজি নয়। তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য সে অধীর হয়ে পড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে সে তার বাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছিল তা আমার খুব ভালো করে জানা, বহুবার শুনে শুনে একেবারে প্রত্যক্ষ পরিচিতের মতন চেনা।

উপত্যকার ঠিক মাঝখানে, মধ্যযুগের দুর্গের ধরনে পাথর দিয়ে তৈরী তাদের 'রাজবাড়ি'। দ্বিতীয় একখানা প্রাচীর এই বাড়িকে ঘিরে রেখেছে। চার কোণে চারটি বড় দরজা আছে, তার ভিতর দিয়ে ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করবার আর পথ নেই। পাহাড়ী ঝরনাটা দুর্গের কাছে এসে তিন ভাগ হয়েছে। দুই ভাগ দুই দিক দিয়ে ঘুরে এবং এক ভাগ বাড়ির মধ্য দিয়ে এপার-ওপার গিয়ে আবার তিন ভাগ একসঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সিংহদরজার দিকে বয়ে গেছে। চার দিকের চার দরজার সামনে ঝরনার উপরে চারটি কাঠের সাঁকো আছে। ঠিক সেকালের দুর্গের মতন, মজবুত শিকল দিয়ে টেনে সাঁকোগুলিকে ইচ্ছামতন তুলে রাখা যায়।

অবিশ্যি, তার যে খুব বেশি সার্থকতা আছে তা বলা যায় না, কারণ ঝরনার জল বেশি গভীর নয়—হেঁটেই পার হয়ে যাওয়া যায়। বহুবার বর্ণনা শুনে শুনে আমি সমস্ত বাড়িটাই স্পষ্ট কল্পনা করে নিতে পারি।

মস্তবড় দোতালা চারমহল বাড়ির কেবল পুবদিকের একটি মহলেই বর্তমানে সব্যসাচীরা বসবাস করে। এই দিকটায় আধুনিক সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। উত্তর দিকের মহলে থাকে ঠাকুর-চাকর-কর্মচারী এবং গবেষণাগারের কর্মীর দল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের দুটো মহলের সমস্তটা জুড়ে লাইব্রেরি এবং গবেষণাগার। এখন অবিশ্যি পুজোর ছুটি, কাজ বন্ধ থাকবে, কর্মীরা হয়তো বাড়ি চলে গেছে। তবু এই বিখ্যাত লাইব্রেরি ও গবেষণাগার দেখবার জন্য আমি খুবই উৎসুক ছিলাম। সব্যসাচীও তো প্রায় এক বছর পরে বাড়ি আসছে। উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নাকি এরোপ্লেন তৈরি করবার কারখানা-ঘর হয়েছে, মূলবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় দরজা ভেঙে এরোপ্লেন বেরোবার জন্য টানেল তৈরী হয়েছে। আর তারপরে বাড়ির বাইরে ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ছোট রানওয়ে হয়েছে যাতে নতুন তৈরী বিমানগুলি টানেল দিয়ে বেরিয়ে সেই রানওয়ে থেকেই উড়তে পারে। বলতে গেলে একটি ছোট বিমান-বন্দর আর কি! এই সমস্ত কিন্তু সব্যসাচীও স্বচক্ষে দেখে নি, বাপের চিঠিতে তার বর্ণনা শুনেছে মাত্র।

কোনোমতে ক্লান্ত দেহকে টেনে নিয়ে আমরা প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা শুরু করলাম। কাজটা যে প্রকৃতপক্ষে খুব কঠিন ছিল তা বলা যায় না। বহুদিনের পুরনো দেয়ালের পাথরগুলি ভাঙা ও অসমান, তার মধ্যে মধ্যে পা রাখবার মতন যথেষ্ট খাঁজ পাওয়া যায়। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যে ক্লান্ত দেহে ওঠা নিতান্ত সহজ ছিল না। সব্যসাচীর উত্তেজনা যেন আর সংযমের বাঁধ মানছিল না। আমাকে পিছনে ফেলে সে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে প্রাচীরের মাথায় পৌঁছে গেল আর তখনই চাপা আর্তনাদ করে উঠল—'ও কী হল? কী হয়েছে? চারদিকে সব অন্ধকার কেন?' ততক্ষণে আমিও উঠেছি। পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেও আমরা তারার আলোয় দূরের জমিদারবাড়িটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কোথাও কোনো আলো দেখতে পেলাম না। মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীন পরিত্যক্ত কোনো ঐতিহাসিক দুর্গ অথবা কোনো জনহীন অভিশপ্ত পুরীতে এসে পড়েছি। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন অজ্ঞাত কী এক রহস্যে থমথম করছিল।

সব্যসাচী আবার বলল, 'সমস্ত বাড়ি ঘিরে পাঁচিলের মাথায় মাথায় সারারাত বাতি জ্বলে, বাড়ির দরজায় দরজায় আর বাইরের সিংহদরজায় বড় বড় আলো জ্বলে, আজ কেন সব অন্ধকার?' আমি বললাম, 'তোদের তো নিজেদের পাওয়ার হাউস, নিশ্চয় কোনো কারণে তার কলকব্জা বিগড়ে গিয়ে পাওয়ার হাউস বন্ধ আছে। তাই বাতি জ্বলছে না।' পাওয়ার হাউস নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল কারণ আমরা তার শব্দ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কলকব্জা বিগড়েছে এই সমাধান সব্যসাচী মেনে নিল না। সে বলল, 'তাহলে বাবার ঘরে তাঁর হ্যাজাকবাতি জ্বলছে না কেন? তিনি তো কখনও রাত বারোটার আগে ঘুমোন না। দরজায় দরজায় বড় বড় তেলের বাতি আছে। রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে ঘরে লণ্ঠন আর ল্যাম্প আছে, সেগুলোরও কি কলকব্জা বিগড়ে গেছে?'

এই সব প্রশ্নের উত্তর কেই বা দিতে পারে? অমঙ্গলসূচক যে সব বিশ্রী চিন্তা আমাদের দুজনেরই মনের পিছনে আনাগোনা করছিল তা অনুচ্চারিতই রইল তবু দুজনেই বুঝে নিলাম যে নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক কিছু একটা ঘটেছে।

আমাদের আজ আরও অনেক আগে এসে বাড়ির গাড়ি চড়ে সোজা সিংহদরজা দিয়ে ঢোকবার কথা ছিল। আমাদের বিলম্ব দেখে চৌধুরীমশাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করবার জন্য রাঁচী ও ঝাড়সুগুডায় লোক পাঠাবেন এটা খুবই

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তবু নিশ্চয় আমাদের অভ্যর্থনার কোনো ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত বাড়ি এমন অভিশপ্ত রাজ-পুরীর মতন অন্ধকার, নির্জন, পরিত্যক্ত থাকবে কেন?

তবে কি আমাদের খুঁজতে বেরিয়ে তিনি নিজেই কোনো বিপদে পড়েছেন? শত্রুপক্ষ যে কী ভয়ানক কৌশলী ও শক্তিশালী তার বহু প্রমাণ তো আমরা নিজেরাই পেয়েছি। তারা কি এইখানে এসেও তাঁকে আক্রমণ করেছে? বাড়িভরা এত লোকলস্কর—সকলকে কি তারা খুন করেছে? বন্দী করে রেখেছে? সেই অন্ধকার রাত্রে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, আমাদের যে কতরকম সাংঘাতিক সম্ভাবনার কথা মনে আসছিল তা গোনা যায় না। কিন্তু মুখে আমরা কেউই কিছু বললাম না।

হঠাৎ যেন গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সব্যসাচী বলল, 'নাঃ, থেমে থাকলে তো আর চলবে না, এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু, কী ব্যাপার ঘটেছে তা যখন আমরা সঠিক বুঝতে পারছি না, তখন খুবই সাবধানে আমাদের কাজ করতে হবে।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে ভূতের মতো আমরা রওনা হলাম। আমাদের পরনে জামা কাপড় কয়লায় আর ময়লায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, মুখ হাতের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। সুতরাং সেই অন্ধকারের মধ্যে বেমালুম 'অদৃশ্য' হয়ে যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল। মাঠ পার হয়ে আমরা বাড়ির কাছে এসে পৌছলাম। মনে হল যেন বাড়ির সবগুলি দরজা-জানালা ভিতর থেকে কে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে। ধীরে ধীরে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে এলাম। তিনদিকের তিন বড় দরজা, এরোপ্লেন বেরোবার টানেলের মুখের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ।

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার? বাড়িতে কোথাও কোনো লোক নিশ্চয় আছে। নাহলে দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ করেছে কে? কিন্তু লোকজন যদি থেকেই থাকে তাহলে তারা এরকম ভূতের মতো ঘোর অন্ধকারে বসে আছে কেন? কে এরা? সব্যসাচীদের নিজেদের লোক, না শত্রুপক্ষের লোক? এ সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক না জেনে দরজায় ধাক্কা দিতে সাহস হল না। এই ভিতরের প্রাচীরটি যেমন উঁচু তেমনি মসৃণ ও অক্ষত। পাঁচিল বেয়ে ওঠা যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব এই দুর্গের মতন বাড়ির দরজা-জানলা ভাঙবার চেষ্টা করা। তাছাড়া কোথায় কোনো শত্রু-পক্ষের লোক আছে না জেনে কোনো শব্দ করাও নিরাপদ নয়। একটু চিন্তা করবার পরে সব্যসাচী বলল, 'একটি মাত্র পথ আছে, সেটি যেমন দুর্গম তেমনি অসুবিধাজনক। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকবার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় যখন আপাতত দেখছি না তখন আমাদের সেই পথেই ঢুকতে হবে।' আমরা আমাদের সুটকেস দুটোকে পরস্পরের পিঠে বেঁধে নিলাম।

অবিশ্যি, তার যে খুব বেশি সার্থকতা আছে তা বলা যায় না, কারণ ঝরনার জল বেশি গভীর নয়—হেঁটেই পার হয়ে যাওয়া যায়। বহুবার বর্ণনা শুনে শুনে আমি সমস্ত বাড়িটাই স্পষ্ট কল্পনা করে নিতে পারি।

মস্তবড় দোতালা চারমহল বাড়ির কেবল পুবদিকের একটি মহলেই বর্তমানে সব্যসাচীরা বসবাস করে। এই দিকটায় আধুনিক সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যের-ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। উত্তর দিকের মহলে থাকে ঠাকুর-চাকর-কর্মচারী এবং গবেষণাগারের কর্মীর দল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের দুটো মহলের সমস্তটা জুড়ে লাইব্রেরি এবং গবেষণাগার। এখন অবিশ্যি পুজোর ছুটি, কাজ বন্ধ থাকবে, কর্মীরা হয়তো বাড়ি চলে গেছে। তবু এই বিখ্যাত লাইব্রেরি ও গবেষণাগার দেখবার জন্য আমি খুবই উৎসুক ছিলাম। সব্যসাচীও তো প্রায় এক বছর পরে বাড়ি আসছে। উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে নাকি এরোপ্লেন তৈরি করবার কারখানা-ঘর হয়েছে, মূলবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় দরজা ভেঙে এরোপ্লেন বেরোবার জন্য টানেল তৈরী হয়েছে। আর তারপরে বাড়ির বাইরে ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি ছোট রানওয়ে হয়েছে যাতে নতুন তৈরী বিমানগুলি টানেল দিয়ে বেরিয়ে সেই রানওয়ে থেকেই উড়তে পারে। বলতে গেলে একটি ছোট বিমান-বন্দর আর কি! এই সমস্ত কিন্তু সব্যসাচীও স্বচক্ষে দেখে নি, বাপের চিঠিতে তার বর্ণনা শুনেছে মাত্র।

কোনোমতে ক্লান্ত দেহকে টেনে নিয়ে আমরা প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা শুরু করলাম। কাজটা যে প্রকৃতপক্ষে খুব কঠিন ছিল তা বলা যায় না। বহুদিনের পুরনো দেয়ালের পাথরগুলি ভাঙা ও অসমান, তার মধ্যে মধ্যে পা রাখবার মতন যথেষ্ট খাঁজ পাওয়া যায়। তবু সেই অন্ধকারের মধ্যে ক্লান্ত দেহে ওঠা নিতান্ত সহজ ছিল না। সব্যসাচীর উত্তেজনা যেন আর সংযমের বাঁধ মানছিল না। আমাকে পিছনে ফেলে সে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে প্রাচীরের মাথায় পৌঁছে গেল আর তখনই চাপা আর্তনাদ করে উঠল—'ও কী হল? কী হয়েছে? চারদিকে সব অন্ধকার কেন?' ততক্ষণে আমিও উঠেছি। পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেও আমরা তারার আলোয় দূরের জমিদারবাড়িটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কোথাও কোনো আলো দেখতে পেলাম না। মনে হচ্ছিল যেন প্রাচীন পরিত্যক্ত কোনো ঐতিহাসিক দুর্গ অথবা কোনো জনহীন অভিশপ্ত পুরীতে এসে পড়েছি। সমস্ত আবহাওয়াটা যেন অজ্ঞাত কী এক রহস্যে থমথম করছিল।

সব্যসাচী আবার বলল, 'সমস্ত বাড়ি ঘিরে পাঁচিলের মাথায় মাথায় সারারাত বাতি জ্বলে, বাড়ির দরজায় দরজায় আর বাইরের সিংহদরজায় বড় বড় আলো জ্বলে, আজ কেন সব অন্ধকার?' আমি বললাম, 'তোদের তো নিজেদের পাওয়ার হাউস, নিশ্চয় কোনো কারণে তার কলকব্জা বিগড়ে গিয়ে পাওয়ার হাউস বন্ধ আছে। তাই বাতি জ্বলছে না।' পাওয়ার হাউস নিশ্চয়ই বন্ধ ছিল কারণ আমরা তার শব্দ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কলকব্জা বিগড়েছে এই সমাধান সব্যসাচী মেনে নিল না। সে বলল, 'তাহলে বাবার ঘরে তাঁর হ্যাজাকবাতি জ্বলছে না কেন? তিনি তো কখনও রাত বারোটার আগে ঘুমোন না। দরজায় দরজায় বড় বড় তেলের বাতি আছে। রান্নাঘরে, চাকরদের ঘরে ঘরে লণ্ঠন আর ল্যাম্প আছে, সেগুলোরও কি কলকব্জা বিগড়ে গেছে?'

এই সব প্রশ্নের উত্তর কেই বা দিতে পারে? অমঙ্গলসূচক যে সব বিশ্রী চিন্তা আমাদের দুজনেরই মনের পিছনে আনাগোনা করছিল তা অনুচ্চারিতই রইল তবু দুজনেই বুঝে নিলাম যে নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক কিছু একটা ঘটেছে।

আমাদের আজ আরও অনেক আগে এসে বাড়ির গাড়ি চড়ে সোজা সিংহদরজা দিয়ে ঢোকবার কথা ছিল। আমাদের বিলম্ব দেখে চৌধুরীমশাই ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করবার জন্য রাঁচী ও ঝাড়সুগুড়ায় লোক পাঠাবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। এমন কি অন্য একখানা গাড়ি নিয়ে তিনি নিজেই আমাদের আনতে বেরিয়ে পড়বেন, এটাও কিছু

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তবু নিশ্চয় আমাদের অভ্যর্থনার কোনো ব্যবস্থা থাকবে। সমস্ত বাড়ি এমন অভিশপ্ত রাজপুরীর মতন অন্ধকার, নির্জন, পরিত্যক্ত থাকবে কেন?

তবে কি আমাদের খুঁজতে বেরিয়ে তিনি নিজেই কোনো বিপদে পড়েছেন? শত্রুপক্ষ যে কী ভয়ানক কৌশলী ও শক্তিশালী তার বহু প্রমাণ তো আমরা নিজেরাই পেয়েছি। তারা কি এইখানে এসেও তাঁকে আক্রমণ করেছে? বাড়িভরা এত লোকলস্কর—সকলকে কি তারা খুন করেছে? বন্দী করে রেখেছে? সেই অন্ধকার রাত্রে, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে, আমাদের যে কতরকম সাংঘাতিক সম্ভাবনার কথা মনে আসছিল তা গোনা যায় না। কিন্তু মুখে আমরা কেউই কিছু বললাম না।

হঠাৎ যেন গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সব্যসাচী বলল, 'নাঃ, থেমে থাকলে তো আর চলবে না, এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু, কী ব্যাপার ঘটেছে তা যখন আমরা সঠিক বুঝতে পারছি না, তখন খুবই সাবধানে আমাদের কাজ করতে হবে।'

অন্ধকারে নিঃশব্দে ভূতের মতো আমরা রওনা হলাম। আমাদের পরনে জামা কাপড় কয়লায় আর ময়লায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছে, মুখ হাতের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। সুতরাং সেই অন্ধকারের মধ্যে বেমালুম 'অদৃশ্য' হয়ে যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল। মাঠ পার হয়ে আমরা বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম। মনে হল যেন বাড়ির সবগুলি দরজা-জানালা ভিতর থেকে কে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে। ধীরে ধীরে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে এলাম। তিনদিকের তিন বড় দরজা, এরোপ্লেন বেরোবার টানেলের মুখের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ।

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার? বাড়িতে কোথাও কোনো লোক নিশ্চয় আছে। নাহলে দরজা-জানলা ভিতর থেকে বন্ধ করেছে কে? কিন্তু লোকজন যদি থেকেই থাকে তাহলে তারা এরকম ভূতের মতো ঘোর অন্ধকারে বসে আছে কেন? কে এরা? সব্যসাচীদের নিজেদের লোক, না শত্রুপক্ষের লোক? এ সব প্রশ্নের উত্তর সঠিক না জেনে দরজায় ধাক্কা দিতে সাহস হল না। এই ভিতরের প্রাচীরটি যেমন উঁচু তেমনি মসৃণ ও অক্ষত। পাঁচিল বেয়ে ওঠা যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব এই দুর্গের মতন বাড়ির দরজা-জানলা ভাঙবার চেষ্টা করা। তাছাড়া কোথায় কোনো শত্রু-পক্ষের লোক আছে না জেনে কোনো শব্দ করাও নিরাপদ নয়। একটু চিন্তা করবার পরে সব্যসাচী বলল, 'একটি মাত্র পথ আছে, সেটি যেমন দুর্গম তেমনি অসুবিধাজনক। কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকবার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় যখন আপাতত দেখছি না তখন আমাদের সেই পথেই ঢুকতে হবে।' আমরা আমাদের স্যুটকেস দুটোকে পরস্পরের পিঠে বেঁধে নিলাম।

পকেটে ঢোকালাম টর্চ। বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে যেখানে ঝরনা তিনভাগ হয়েছে, ঠিক সেইখানে গিয়ে সব্যসাচী বলল, 'ঝরনার জলের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। খুবই কষ্ট অবশ্য হবে কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

এবার আমাদের অভিযানের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। ঝরনার একভাগ একটা সুরঙ্গ দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকছে, তারই মধ্যে দিয়ে আমরা গভীর অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছি। তলায় মেঝে এত পিছল যে প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে যাব। কলকল শব্দে সজোরে জলস্রোত ছুটে চলেছে, পদে পদে আমাদের ভাসিয়ে নিতে চায়। মাথা এক ইঞ্চি বেশি উঁচু করলে সুরঙ্গের ছাদে ঠুকে যায় আর এক ইঞ্চি বেশি নীচু করলেই জলের মধ্যে নাক ডুবে যায়।

তবু সেই ঘোর দুঃস্বপ্নের মতো কয়েক গজ পথও কোনো এক সময়ে শেষ হল। আবার মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম আর প্রাণ ভরে বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু হাঁপ ছাড়বার সময় কোথায় আমাদের? সেই অন্ধকারেই হাতড়ে সুটকেস খুলে জামাকাপড় পালটে ফেলতে হল। দেয়ালের গায়ে একটা খালি আলমারিতে সব্যসাচী আমাদের ভিজে জামা জুতো আর সুটকেস লুকিয়ে রাখল। আমার টর্চটা ঝরনার জলে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু ওরটা অক্ষত ছিল। তবু সেটা ব্যবহার করা নিরাপদ নয়, তাই আমরা অন্ধকারের মধ্যেই আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম। সব্যসাচীর মস্ত বড় সুবিধা হল এই যে বাড়ির প্রতিটি ইটকাঠ তার চিরপরিচিত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি না জানা থাকাতে খুবই সতর্ক থাকতে হয়েছিল। যেখান দিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিলাম সেটা উত্তর মহলের একটা ফালতু ঘর। আর সামনে ঢালা বারান্দা, একধারে রান্নাঘর, ভাঁড়ার এবং গুদামঘর এবং অন্যদিকে লোকজন থাকবার ঘর। কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রত্যেকটি ঘরের সামনেই বড় বড় তালা লাগানো! সন্তর্পণে আমরা পূর্ব মহলের দিকে এগোতে লাগলাম। দুই মহলের মধ্যেকার দেউড়িতে গুটি দুই-চার প্রহরী টুলে বসে ঢুলছিল। অন্ধকারে, থামের আড়ালে থেকে সব্যসাচী তাদের কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে দেখল, তারপরে ইসারায় আমাকে দূরে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এরা তো দেখেছি নতুন আমদানী, সত্যিই আমাদের লোক কিনা তাই বা কে জানে!'

তার অর্ধসমাপ্ত প্রশ্নের উত্তর না জেনেও আমরা সাবধান হলাম। পা টিপে টিপে পাশের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলাম। তারপরে উত্তরের বারান্দা থেকে পূর্ব মহলের বারান্দায় এলাম। এটাই হল চৌধুরী মশায়ের বর্তমান বাসস্থান, পূর্ব মহলের একতলায় খাবার, বসবার ও আপিস ঘর ও অন্যান্য বাইরের ঘর আর দোতলায় সারি সারি শোবার ঘর। সব্যসাচী যেন আর এক মুহূর্তের বিলম্বও সহ্য করতে পারছিল না, তার মনের উৎকণ্ঠা উদ্বেগ তার প্রতিটি অধীর পদক্ষেপের মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। দোতলায় পৌঁছে সে আমাকে পিছনে ফেলে রেখে, নিঃশব্দে ছুটে সবগুলি ঘর পার হয়ে একটা বিশেষ ঘরের দরজার কাছে চলে গেল। ঘর খোলাই ছিল, অন্ধকারে হাতড়ে আমরা ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম, তারপরে অতি সতর্ক ভাবে টর্চটা একটু জ্বাললাম।

ঘর একেবারেই খালি। খাটে পরিপাটি করে বিছানা পাতা আছে, পায়ের কাছে রাতের কাপড় ভাঁজ করে রাখা, খাটের পাশে এক জোড়া চটি, মাথার কাছে ছোট একখানা টেবিলে এক গ্লাস জল ঢাকা আছে, সুন্দর একখানি ল্যাম্প, একটি ঘড়ি আর একখানা আধুনিক বিজ্ঞান পত্রিকার নূতন সংখ্যা সাজিয়ে রাখা আছে। কিন্তু ঘরে কোনো জনমানুষ নেই।

এক মুহূর্তের জন্য সব্যসাচী অভিভূত হয়ে পড়েছিল, বাপের শূন্য বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে সে এক মিনিটের জন্য মুখ ঢেকেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে দাঁড়িয়ে উঠল তখন তার চোখ দুটো ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে।

অতি সতর্কভাবে টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা সমস্ত ঘরটা লক্ষ্য করে দেখলাম। একটা বড় ঘড়িতে রাত প্রায়

দশটা বেজেছে, আমাদের হাতঘড়ির সঙ্গে সময়টা ঠিক মিলে যাচ্ছে। কিন্তু টেবিলের ছোট ঘড়িটা সাতটা বেজে থেমে রয়েছে। এটা ছাড়া ঘরে কোথাও কোনও রকম বিসদৃশ এলোমেলো জিনিস নেই। চৌধুরীমশাই রাত্রে এসে শোবেন বলে তাঁর বিছানাটি পর্যন্ত পাতা রয়েছে, ঠিক মনে হচ্ছে যেন যে কোন মুহূর্তে তিনি সামনের দরজাটি খুলে ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকবেন। তবে কি অনর্থক আমরা কতগুলি আবোল তাবোল কল্পনা করছি? তিনি এখন নিরাপদে ও নিশ্চিন্তমনে তাঁর গবেষণাগারে পড়াশুনার কাজে মগ্ন রয়েছেন?

পরক্ষণেই মনে হল যে সেটা অসম্ভব। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে লাইব্রেরি বা গবেষণাগারে কাজ করাও যেমন অসম্ভব, শুধু শুধু সমস্ত বাড়ি ঘর অন্ধকার করে রাখাও তেমনি অদ্ভুত!

তাছাড়া আরও প্রশ্ন আছে। ঘরের বাইরের দিকের সব জানালা এঁটে বন্ধ কেন? ছোট ঘড়িটা সাতটা বেজে থেমে আছে কেন? এ কি সন্ধ্যা সাতটা না সকাল সাতটা? এই বিছানা পাতা হয়েছিল আজ, না গতকাল? এই রকম সহস্র প্রশ্ন আমাদের মনে জাগছিল কিন্তু তার জবাব দেবে কে? সন্তর্পণে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা বারান্দা দিয়ে দক্ষিণ মহলের দিকে চললাম।

আগেই বলেছি যে দক্ষিণ ও পশ্চিম মহলের সমস্তটা দিয়ে চৌধুরী মশাই বিরাট লাইব্রেরি ও গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন। বাড়ির অন্যান্য মহলের সঙ্গে এটা বড় বড় দরজা দিয়ে যুক্ত ছিল, ইচ্ছা করলেই সেই দরজা বন্ধ করে এই অংশটি একেবারে আলাদা করে ফেলা যেত। আজ বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে আমরা দেখলাম যে সেই বিরাট দরজা মস্ত বড় তালা দিয়ে বন্ধ, আর এগোবার উপায় নেই। পূর্ব মহল ও উত্তর মহল পার হয়ে পশ্চিম মহলের দরজায় গিয়ে দেখলাম যে সেখানেও এক বিরাট তালা ঝুলছে। তবে কি লাইব্রেরি বা গবেষণাগারে কেউ নেই? না কি তাদের সেখানে বন্দী করা হয়েছে?

অন্ধকারের মধ্যে চুপিচুপি আমরা উত্তর ও পূর্ব মহলের আগাগোড়া তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম কিন্তু তিন কোণের তিন দরজায় প্রহরী ছাড়া কোনো জনমানুষের সন্ধান পেলাম না। তালাবন্ধ ঘরগুলির মধ্যে যে কেউ থাকতে পারে এমন কোনো আভাসও পেলাম না। দক্ষিণ-পশ্চিম মহলে ঢোকবার কোনো পথও পেলাম না। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে, নিরুৎসাহ মনে আমরা দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। মনে হল যেন এইখানেই আমাদের অভিযানের শেষ হল।

কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু হঠাৎ নতুন এক উত্তেজনায় সব্যসাচীর চোখ আবার জলজল করে উঠল। সে বলল, 'দেখ, গবেষণাগারে বাবা আছেন কিনা সঠিক না জেনে আমি হার মেনে ফিরে যেতে প্রস্তুত নই। ওখানে যাবার একটিমাত্র পথ আছে, কিন্তু সাংঘাতিক বিপজ্জনক। পারবি তুই আমার সঙ্গে যেতে? না কি—'

'পারব, পারব, পারতেই হবে, তুই চল!' সে আমার কানে কানে বলতে লাগল, 'ছোটবেলায় খেলতে খেলতে হঠাৎ আমাদের বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করত, তিনি কী করছেন জানবার জন্যেও কৌতূহল হত। কিন্তু তিনি তো ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়াশুনা, কাজকর্ম করতেন, এই জন্য আমরা ওই মহলে যাবার একটা গোপন রাস্তা আবিষ্কার করেছিলাম। জানি না সে পথ এখনো খোলা আছে কিনা, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে।'

সতর্কভাবে আমরা এগিয়ে চললাম।

গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমরা দুজনে যেন সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর এক উপন্যাসের ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে প্রাণ হাতে করে দ্রুতবেগে ছুটে চলে এসেছি। তবু এর পরের কয়েকটা মিনিটের তুলনায় আগের সমস্ত অভিজ্ঞতাই মামুলি এবং সাধারণ বলে মনে হতে লাগল।

খেলাধুলা এবং জিমন্যাসটিকে সব্যসাচীর তুলনা মেলা ভার এবং আমিও নিতান্ত মন্দ ছিলাম না। তবু সেদিন যা করতে হয়েছিল তা আমাদের পক্ষেও অসাধ্য সাধন। আদ্যোপান্ত চিন্তা না করে উত্তেজনার মাথায় এগিয়ে গিয়েছিলাম বলেই আমরা পেরেছিলাম।

বাড়ির ঐদিকের সিঁড়িগুলো সব দোতলাতেই এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম মহলের বাইরে কোনো বারান্দা ছিল না, দেয়াল গেঁথে সব ঘরে পরিণত করে দেওয়া হয়েছিল। আবার কারখানা-ঘরটা ছিল মস্ত বড় উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়, সুতরাং পূর্ব ও উত্তর মহলের দোতলার বারান্দা থেকে অনেকটা দূরে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার পাঁচিল ডিঙিয়ে, সামান্য একটু কার্নিস আশ্রয় করে প্রায় টিকটিকির মতো আমরা অতি সাবধানে ধীরে ধীরে কারখানা-ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। একবার যদি পা ফসকাত, তাহলে পাথরের উঠোনে পড়ে হাত পা মাথা চুরমার হয়ে যেত। সামান্য একটু শব্দ যদি হত তাহলেই প্রহরীরা জেগে উঠত; এমনিই যদি কোনো প্রহরী খুব সজাগ থাকত, তাহলে টর্চের আলো ফেললেই স্পষ্ট আমাদের দেখতে পেত।

কিন্তু সেরকম কোনো দুর্ঘটনাই ঘটল না; রুদ্ধশ্বাসে, ক্ষতবিক্ষত হাতে পায়ে কিন্তু নিরাপদে আমরা কারখানা-ঘরের ধারে এসে পৌঁছালাম। কিন্তু এখনো শান্তি নেই! সব্যসাচীর ছোটবেলায় এই কারখানা-ঘরটা ছিল না। এই কার্নিশ ধরেই তারা তাদের গুপ্ত পথের দরজায় পৌঁছতে পারত। কিন্তু এখন কারখানার দেয়াল আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। সব্যসাচীর মনে একটা নতুন সন্দেহ দেখা দিল, এত উঁচু কারখানা-ঘরটা তৈরী হয়েছে, তবু তাদের গুপ্ত পথ কি এখনো আছে। নিশ্চয়ই এই কারখানা-ঘর তৈরির সঙ্গে সঙ্গে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে! তার মানে কি ঐ কার্নিশ বেয়েই আবার ফিরে যেতে হবে? কল্পনা করেও আমার হাত পা ভয়ে হিম হয়ে এল। কিন্তু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মৃদু স্বরে সব্যসাচী বলল, 'এক পাও পিছিয়ে যাব না, যেমনভাবে হোক আমাদের এগোতেই হবে।'

প্রায় বাদুড়ের মতো ঝুলে ঝুলে, কোনোমতে একখানা পাইপ ধরে আমরা কারখানার ছাদে পৌঁছালাম। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে দেখলাম যে ছাদটা ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। খুশী হয়ে সব্যসাচী বলল, 'আমার গুপ্তদরজার মুখ তো বাইরেই আছে!' অতি সতর্কভাবে সেই ঢালু ছাদ বেয়ে বসে বসে আমরা গবেষণাগারের দেয়াল ধরে ধরে এগোতে লাগলাম। আমার চোখে তো সমস্ত দেয়ালটাই নীরন্ধ্র বাধার মতো ঠেকছিল, কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতেই সব্যসাচী তার মধ্যে কী যেন খুঁজতে লাগল।

একটা কাঠের ঝিলমিল দেওয়া ভেন্টিলেটারের গায়ে সে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতে লাগল—'খুট খুট'। ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে এই সামান্য শব্দটুকুও যেন সাংঘাতিক জোরে শোনা গেল মনে হল। ভয়ে আমরা থেমে গেলাম। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না, আবার দুজনে মিলে ধাক্কা দিলাম—'খুট-খুট-খুট! একবার ভয়ে থামি, আবার ধাক্কা দিই! তারপরেই মনে হল যেন ঝিলমিলের একটা অংশ একটু নড়ছে। আস্তে আস্তে ভিতর দিকে ঢুকে যাচ্ছে। নতুন উৎসাহে আমরা আবার ঠেলা দিলাম। 'খট-খট্টাস—' সজোরে ঝিলমিলটা ভিতরে ঝুলে পড়ল।

ছবি। প্রসাদ রায়॥ মানচিত্র। বিশ্বনাথ শীল

[ক্রমশ

শপিং ব্যাগ

সমর দে

একদিন দাদার সঙ্গে ধর্মতলার চাঁদনি চকে এসে, চমৎকার সব প্লাস্টিক্ শীটগুলো দেখে মিনির খেয়াল চাপল—সুন্দর একটি 'শপিং ব্যাগ' তৈরি করবে।

তাই সে কিনে নিল নিজের পছন্দমত দুটি রঙের প্লাস্টিক্ শীট। সেই সঙ্গে ছোট্ট একটি পাঞ্চ আর অনেকগুলো 'আইলেট' যা দিয়ে সে আটকিয়ে নেবে প্যাটার্ন করে কেটে নেওয়া এক-একটি প্লাস্টিক্ পীস্। এ ছাড়া ব্যাগটাকে হাতে ঝুলিয়ে নেবার জন্যে প্লাস্টিকের দুটি বড় বড় চুড়ি।

তারপর এক সারি হালকা রঙের আর এক সারি গাঢ় রঙের ত্রিভুজ আকারে কাটা প্যাটার্নগুলো দিয়ে সত্যিই যখন সে ব্যাগটি তৈরি করলে, তখন সেটি নেবার জন্যে বাড়ির সবারই কী আগ্রহ!

দাড়ির মামলা

সুকোমল বসু

বুড়ো রাজা মারা গেলে
রাজা হল তারই ছেলে।
ছোকরা রাজা—মেজাজ চড়া
করল আইন কড়া-কড়া!
বাপের কালের মন্ত্রীমশাই
তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধা যে নাই!
একদিন রাজা মন্ত্রীকে কয় :
'কাজে কেন বিলম্ব হয়?'
কথায় কথায় তর্ক ওঠে
রাজা গেল ভীষণ চটে,
মন্ত্রীমশার দাড়ি ধরে
টান লাগাল ভীষণ জোরে!
হতভম্ব মন্ত্রীমশাই!
ছোকরা রাজার দাড়ি তো নাই,—
নইলে না হয় সেটাই ধরে
শোধ তুলতেন তেমনি করে।
তাই তো শুধু ভেংচি কেটে—
বাড়ির দিকে গেলেন হেঁটে!

ভাবনায় পড়েন মন্ত্রীমশাই
রাজাটা যে আস্ত কশাই
এ বার বুঝি মুণ্ড কাটে
না হয় ঝোলায় ফাঁসিকাঠে!

কাজীর কাছে মন্ত্রীমশাই
ধন্না দিলেন : 'আর গতি নাই,
রক্ষা করুন বুদ্ধি দিয়ে
প্রাণটা শুধু দিন বাঁচিয়ে।'
ঘটনা সব শুনে কাজী
বললে, 'রাজা নিজেই পাজি,
আমার 'পরেও তার ব্যবহার
জঘন্য, সে আস্ত চামার।
যান ফিরে যান মন্ত্রীমশাই
ভাবনা করার কারণই নাই।
রাজার চেয়ে আইন বড়
ও বিষয়ে আমিই দড়।'

ও দিকেতে রাজা হাঁকে :
'ধরে আনো মন্ত্রীটাকে
দড়ি বেঁধে টেনে আনো
রাজার মুখে জিভ ভ্যাঙানো!'

কাজীর বিচার হল শুরু ;
গদি থেকে কুঁচকে ভুরু—
বলল এবার ছোকরা-রাজা
'বলুন কাজী, কী হয় সাজা!
হতভাগা মন্ত্রী ব্যাটা
হাড়-হাভাতে ভীষণ ঠ্যাটা
আমার দিকে জিভ ভেঙিয়ে
বাড়িতে তার ঢুকল গিয়ে।'
কাজী বলে, 'রাজামশাই,
মন্ত্রীর তো দোষ কিছু নাই,

আপনি বলেন মাঝে মাঝে
—বিলম্ব হয় তারই কাজে।
বার করে জিভ মন্ত্রীমশাই
দেখিয়ে দিলেন কারণটা তাই ;
ছ্যাতলা-পড়া জিভখানি তার
নিদর্শন যে অজীর্ণ তাঁর।
পেটের রোগে ভোগেন প্রায়ই
দেরির জন্যে রোগই দায়ী !
বদ্যিরা সব জিভটা দেখেই
ধরে থাকেন রোগের যে খেই !
আপনি মন্ত্রীর টানেন দাড়ি
অপমান সে বেজায় ভারি !
তবু যে তিনি মারেন নি চড়
ধৈর্য তাঁহার বিস্ময়কর !
এই ধৈর্যের জন্যেই তাঁর
পাওয়া উচিত রাজ-উপহার।
থাকতে আপনি দেশের রাজা
এমন গুণী পাবে সাজা ?'

রাজা গেল বোকা বনে
মন্ত্রীকে কয় সঙ্গোপনে :
'সে দিন দাড়ি টানার দরুন
আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'
দাড়িতে তাঁর হাত বুলিয়ে
মন্ত্রীর গলায় দেয় ঝুলিয়ে
গজমোতিহার আদর করে
চোখ দুটি যায় জলে ভরে।
রাজা বলে মন্ত্রীকে তার—
'লাগুন এসে কাজে আবার।'

মন্ত্রী এলেন রাজার বাড়ি
কামিয়ে ফেলে লম্বা দাড়ি !
দাড়ির হল মানহানি যে
সেটা ফেলে—এলেন নিজে !

লর্ডস এজবাস্টন গড়ের মাঠ

লীগের দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। প্রথম পর্ব শেষ হয়ে দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ফিরতি লীগের খেলা শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে দু-দুটো চ্যারিটি ম্যাচ হয়ে গেল। প্রথমটি মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল, দ্বিতীয়টি মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং। প্রথমটিতে মোহনবাগান তিন গোলে জয়ী, দ্বিতীয়টিতে দু দলই গোল্লা। বহু উৎসাহী দর্শক গাছের মগডালে উঠে খেলা দেখেছে, কেউ কেউ ডাল ভেঙে পড়ে হাত-পা ভেঙেছে, ল্যাম্পপোস্টের মাথায় দেড় পায়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে দেখতে অনেক লোক নিজেদের অজান্তে সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো বাহবা পেয়েছে। তবু খেলা দেখা চাই— এমনি নেশা এমনি তাগিদ ফুটবলের।

খেলার মান যা-ই হোক, এবারের ফুটবল লীগ কিন্তু উত্তেজনার বারুদে ঠাসা। ডিটেকটিভ গল্পের মতো। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব অঘটন ঘটে যাচ্ছে যা আগে থেকে ভাবা যায় না। প্রথম পর্বে সবচেয়ে চমক লাগিয়েছে নবাগত পোর্ট কমিশনার্স দল গত বছরের রানার্স ইস্টার্ন রেলকে দু-দু গোলে হারিয়ে দিয়ে। পরের খেলাতে রেলদল রাজস্থানের সঙ্গে ড্র করে আর-একটা পয়েন্ট নষ্ট করেছে। তারপর এরিয়ানের সঙ্গে ফিরতি খেলায় ২—১ গোলে হেরে গিয়ে লীগের দৌড়ে রেলদল মোহনবাগানের চাইতে একটা ম্যাচ কম খেলে ছ পয়েন্ট পিছিয়ে পড়েছে। এখন মনে হচ্ছে এদের লীগবিজয়ের আশা দূর অস্ত্। কিছুটা কমজোরী টীম মহমেডান স্পোর্টিং-এর কাছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-বিজয়ী বি. এন. রেলের পরাজয়ও কেউ আশা করে নি। যাই হোক, পয়েন্টের দিক থেকে এরাই এখন পর্যন্ত মোহনবাগানের কাছাকাছি রয়েছে। প্রথম পর্বের শেষ খেলায় ইস্টবেঙ্গল অনেক ভালো খেলে, অনেক সুযোগ এমনকি পেনাল্টি নষ্ট করে বি. এন. রেলের কাছে হেরে গেছে। এটি তাদের তৃতীয় পরাজয়। ফলে, লীগ-দৌড়ে এরাও মোহনবাগানের চাইতে দুটো ম্যাচ কম খেলে সাত পয়েন্ট পিছনে আছে। অবিশ্যি ইস্টবেঙ্গল শেষ রাত্রে ওস্তাদের মার মারলেও মারতে পারে। ফিরতি খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফকে তিন গোলে হারিয়ে অপমানের শোধ তুলে মনের জোর ফিরে পেলে বিচিত্র কী! এখন পর্যন্ত মোহনবাগানই মাত্র একবার হেরে লীগের পুরোভাগে রয়েছে। কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচ ড্র করে মোহনবাগান লীগবিজয়ের ম্যারাথন রেসে একটা বড় রকমের হোঁচট খেল। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়। ফিরতি লীগেও তো অঘটন ঘটতে পরে। বড় টীমগুলো পূর্ব পরাজয়ের বদলা নিতে পারে আবার ডিগবাজিও খেতে পারে। আর ছোট টীমগুলো তো হামেশাই ভেলকিবাজি দেখাচ্ছে।

বাঘা বাঘা টীমের যম এরিয়ান দল হাওড়া ইউনিয়নের কাছে পাঁচ গোলে হেরে গিয়ে নিজেদের সুনামের মুখে চুনকালি মাখিয়েছিল; পরে ইস্টার্ন রেলকে হারিয়ে মুখরক্ষা করেছে। ফিরতি খেলায় পুলিশের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের সুনীল নন্দী মরসুমের পঞ্চম হ্যাটট্রিক করেছেন। হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বি. এন. রেলের রাজেন্দ্রমোহন করেছেন ষষ্ঠ হ্যাটট্রিক। এর আগে যে চারজন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছেন তাঁরা হলেন মোহনবাগানের মঙ্গল পুরকায়স্থ, ইস্টবেঙ্গলের অসীম মৌলিক, বি. এন. রেলের বলরাম আর হাওড়া ইউনিয়নের পি. দত্ত। লীগ কোঠার প্রথম চারটি দলের মধ্যে দলগতভাবে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গোল দিয়েছে মোহনবাগান, সবচেয়ে কম গোল দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল আর সবচেয়ে বেশি গোল খেয়েছে ইস্টার্ন রেল, কম গোল খেয়েছে মোহনবাগান।

এখানে যখন ভ্যাপসা গরমেও ফুটবলের আসর জমজমাট ওখানে তখন কনকনে শীত, ঝিরিঝিরি আর ধোঁয়া-ধোঁয়া 'ফগ'-এ ক্রিকেটের চরম উত্তেজনা। ওখানে বলতে ইংলণ্ডে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এবার এসেছে ইংলণ্ড সফরে। ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডকে দশ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে। প্রায় ইনিংস পরাজয়েরই শামিল। লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হয়েছে চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় টেস্ট সম্পর্কে ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি ওয়ালটার রবিন্স বলেছেন, 'এরকম খেলা আমি দেখি নি আর ভবিষ্যতে দেখবার আশাও করি না।' এ থেকেই বোঝা যাবে কেমন জবর খেলা হয়েছিল লর্ডস মাঠে। ১৯৬০ সালে ব্রিসবেন মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়ার টাই-টেস্টের চরমতম উত্তেজনার পর এমন উত্তেজনা আর অন্য কোন টেস্ট ক্রিকেটে দেখা যায় নি। শেষ মুহূর্তে এমন অবস্থা হয়েছিল যে দু-দলই জিততে বা হারতে পারত, এমনকি সমান সমান রান করে আর-একটা টাই-টেস্টের নজির সৃষ্টি করতে পারত। হলের শেষ ওভারের শেষ বলে এলেনের স্টাম্প ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারত কিংবা এলেন ওভার বাউণ্ডারি মেরে ইংলণ্ডকে জেতাতে পারতেন। কিন্তু কোনোটাই সম্ভব হয় নি। উঁচু দরের এই খেলায় কোনো দলই জেতে নি, জিতেছে ক্রিকেট। এই খেলায় হলের বলে ইংলণ্ডের নামী ব্যাটসম্যান কলিন কাউড্রের হাত ভেঙেছে। সিরিজের বাকি টেস্টগুলোতে তাঁর খেলার দফা রফা। বি. বি. সি.র টেলিভিশনে খেলার ধারাবিবরণী দিয়েই ভদ্রলোককে খুশী থাকতে হবে।

ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এজবাস্টন মাঠে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচও সবে শেষ হল। এই খেলায় ইংলণ্ড ২১৭ রানে জয়ী হয়েছে। ফ্রেডি ট্রুমানের মারাত্মক বোলিংই ইংলণ্ডকে এই জয়ের মুকুট পরিয়েছে। ট্রুম্যান যা সাংঘাতিক বল করেছেন স্মরণকালের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেটে তার নজির নেই। দুই ইনিংসে তিনি ১১৯ রানে ১২টি উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখিয়েছেন তিনি। যে জাদুকর ক্রিকেট টীমে নিদেন পক্ষে পাঁচ-ছ-জন সেঞ্চুরি করার মতো ব্যাটসম্যান রয়েছেন সেই দলের সবাই মিলে একটা সেঞ্চুরি করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ট্রুম্যান ৪৪ রান দিয়ে ৭টি উইকেট ছিনিয়ে নিয়েছেন। শেষ দিকে একসময় আবার মাত্র ৪ রানের বদলে ৬ উইকেট।

ঝড়বৃষ্টির দাপটে পাঁচ দিনের খেলায় সাকুল্যে প্রায় দুদিন সময় নষ্ট হয়। এরই মধ্যে ইংল্যণ্ডের পক্ষে কলিন কাউড্রের বদলী খেলোয়াড় ফিল শার্প চমৎকার মারের খেলা খেলে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮৫ রানে নট আউট থাকেন। নবম উইকেটে শার্পের জুটি লকও ৫৬ রান করে ইংলণ্ডের পক্ষে নতুন রেকর্ড করেন। ৩০৮ রানে পিছিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। ঘণ্টায় ৬৬ রান তুলতে পারলে জেতা যাবে এই দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে দলের বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানেরা বেপরোয়া ব্যাট চালাতে থাকেন। ফলে মাত্র ৯১ রানে ইনিংস শেষ। খেল খতম। যাই হোক, 'হারি জিতি নাহি লাজ'—এই মনোভাব নিয়ে নির্ভয়ে বীরের মতো ওঁরা খেলেছেন।

এই টেস্ট সিরিজে দু দলেরই এখন সমান সমান অবস্থা। আর দুটো খেলা বাকি। লীডস মাঠে ২০শে জুলাই তারিখে চতুর্থ টেস্ট আরম্ভ হচ্ছে আর পঞ্চম টেস্ট ৫ই অগস্ট থেকে শুরু হবে ওভাল মাঠে। ওই দুই খেলার ফলাফলই বলতে পারবে কার কপালে 'রাবার'-এর শিকে ছিঁড়বে।

১৭. ৭. ৬৩
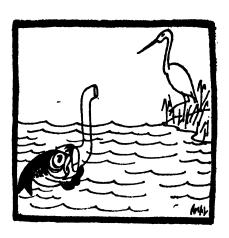
ডাঙার কাছে ঘুরে বেড়াই পেরিস্কোপের জোরে,
বকের এখন সাধ্যিও নেই আমায় নেয় ধরে।

পত্রবন্ধু হতে চাই

জয়শ্রী ভট্টাচার্য

বয়স ১১। ৩৫/৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা ২০। ষষ্ঠ শ্রেণী। ডাকটিকিট।

সুচিত্রা মিত্র

বয়স ১৩। অবধায়ক শ্রী বি. কে. মিত্র, উকিল। পোঃ অঃ চাইবাসা, সিংভূম, বিহার। দশম শ্রেণী। গানবাজনা, সেলাই, খেলাধূলা ও ফোটোগ্রাফি।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ রায়

বয়স ১৫। রাস্তা নং ৩৬, কোয়ার্টার নং ৪০/সি, আমলাদহি। পোঃ অঃ চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান। দশম শ্রেণী বিজ্ঞান। খেলাধুলা, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহশীল।

যুগলকান্ত ভট্টাচার্য

বয়স ১৬। গ্রাম ও পোঃ অঃ গোপালনগর, মেদিনীপুর। এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। ক্রিকেট, ক্যারম, বিজ্ঞান-সাহিত্য, ডাকটিকিট ও রুশ ভাষা শিক্ষা।

বিরাজেন্দ্রপ্রসাদ সরকার

বয়স ৯। ৬/১ বি মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬। পঞ্চম শ্রেণী। ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া, ডাকটিকিট, খেলাধুলা, জাদুবিদ্যা।

দিলীপ সমাজপতি

বয়স ১২। ১২/১ এল চণ্ডীতলা লেন, কলকাতা-৪০। নবম শ্রেণী বিজ্ঞান। ফুটবল, ক্রিকেট, ডাকটিকিট।

রীতা রায়

বয়স ১২। ৮৫।১।৪ ইব্রাহিমপুর রোড, কলকাতা-৩২ সপ্তম শ্রেণী। বই পড়া, দেশভ্রমণ, পল্লীগীতি।

শুক্লাভারতী পালিত

বয়স ১৪। ১৪৮/বি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬ নবম শ্রেণী। নাচ, গানবাজনা, অভিনয়, খেলাধুলা, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা, ক্রিকেটারদের ছবি সংগ্রহ, কোটেশন্ লেখা।

পূর্ণিমা সেনগুপ্ত

বয়স ১০। পি ১৪৭ নিউ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-১০ ষষ্ঠ শ্রেণী। গল্প লেখা, খেলাধুলা, গানবাজনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু।

আদিত্যনারায়ণ সেনগুপ্ত

বয়স ৮। পি ১৪৭ নিউ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-১০ তৃতীয় শ্রেণী। ছবি আঁকা, খেলাধুলা, গল্প লেখা।

তপন ভট্টাচার্য

বয়স ১৬। ৪/৯০ চণ্ডীতলা লেন, কলকাতা-৪০। দশম শ্রেণী বিজ্ঞান। শিকার করা, সাঁতার কাটা, গল্প ও কবিতা ...।

বিজনকু...

বয়স ১২। ২২ পুস...

ছবি আঁকা, ক্রিকেট, ফোটোগ্রাফি।

দেবব্রত মণ্ডল

বয়স ১৫। অবধায়ক শ্রী কানাইলাল মণ্ডল, ৪/৩ উল্টাডাঙা রোড, কলকাতা-৪। দশম শ্রেণী কলা। কবিতা, গল্প, সাহিত্য, অভিনয়, ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার।

অঞ্জলি দাস

বয়স ১৩। গ্রাম ও পোঃ অঃ পশ্চিমবার, মেদিনীপুর।

গল্পের বই পড়া (বিশেষ করে ইংরাজি বই), ছবি আঁকা, নিজের হাতে জিনিসপত্র তৈরি করা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু।

অঞ্জন ভট্টাচার্য

বয়স ১০। সি. আই. টি. বিল্ডিংস্, ব্লক কে, ফ্ল্যাট-৩ ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ষষ্ঠ শ্রেণী। খেলাধুলা, ক্রিকেট, ডাকটিকিট, আবৃত্তি, জাদুবিদ্যা, ডিটেকটিভ গল্প পড়া।

তাপসকুমার বসু

বয়স ১৫। অবধায়ক, শ্রী কমলকৃষ্ণ বসু, আর. জি. কলোনি, শ্রীরামপুর, হুগলী। দশম শ্রেণী। ডাকটিকিট, অটোগ্রাফ, ফুটবল, বিজ্ঞানবিষয়ক বই, বিতর্ক, গল্প লেখা।

অমলকুমার সাহু

বয়স ১৫। ১ পদ্মনাথ লেন, কলকাতা-৪। দশম শ্রেণী কলা। ডাকটিকিট সংগ্রহ।

বিপ্লবকুমার চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১৬। ৩২বি রাধাকান্ত জিউ স্ট্রীট, কলকাতা-৪ ত্রিবার্ষিক প্রথম বর্ষ। খেলাধুলা (বিশেষত ফুটবল), গানবাজনা, ডাকটিকিট, অভিনয়।

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১২। অবধায়ক শ্রী সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১/১৪ রূপচাঁদ মুখার্জী লেন, কলকাতা-২৫। নাচ, গানবাজনা, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গল্প লেখা।

ইন্দ্রাণী দত্ত

বয়স ১২। ৬ তারক দত্ত রোড, কলকাতা-১৯। সপ্তম শ্রেণী। অটোগ্রাফ, ছবি আঁকা, দেশভ্রমণ, গল্পের বই পড়া, সাঁতার, অভিনয়, সাইকেল চড়া।

একে টেকো, তায় বুড়ো, চোখে ক্ষীণ দৃষ্টি,
দূরবীণে ধরে ফেলি আছে কোথা ফিস্টি।

প্রতিযোগিতা

[২।৬৩]

এই গল্পের গোড়াটুকু ১২০ শব্দে বলতে পার?

এতক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বনমালী উপর দিকে তাকাল। দূরে আকাশটা ছোট একটা নীল চীনেমাটির থালার মতো দেখাচ্ছে, কোমরে বাঁধা মোটা দড়িগাছি সরু হতে হতে একেবারে সুতোর মতো হয়ে তারপর মিলিয়ে গেছে। যত নীচে নামছে বাতাসটা ভারী হয়ে আসছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, সেই সঙ্গে নাকে আসছে একটা স্যাঁতসেতে সোঁদা গন্ধ। অথচ কুয়োর পাথরবাঁধানো দেয়ালের গায়ে যেখানেই আলো ফেলছে খটখটে শুকনো মনে হচ্ছে। একেবারে নিরেট দেয়াল, কোথাও এতটুকু ফাঁক ফোকর নেই যে সাপ কি কাঁকড়াবিছে কি তার চেয়েও ভয়ংকর বড় বড় ইঁদুর, যারা সুবিধে পেলেই ধারালো দাঁত দিয়ে দড়িটা কেটে দিতে পারে।

একবার যদি কাটে তবেই হয়ে গেল। কুয়োর তলা আরও কত নীচে কে জানে! সেখানে পড়লে হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাবে, নয়তো ওইখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে যতদিন না না-খেয়ে প্রাণটা যায়।

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল এই কথা ভেবে। সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে নীচের দিকে একবার জগু ময়রার টর্চের আলো ফেলল। আবার সেই রকম কী যেন ঝিকমিক করে উঠল। হয়তো ঢিপি-ঢিপি মোহর, তাল-তাল হীরে। একবার হাতে পেলে আর কোনো ভাবনা থাকবে না, বাকী জীবনটা পায়ের উপর পা তুলে টাকার থলির উপর বসে ক্ষীর-সর খেয়ে কাটানো যাবে। আর ভোরে উঠে কাস্তে বগলে মাঠে ছুটতে হবে না। ও কী! ওটা কী! কুয়োর তলায় ফোঁস ফোঁস করে কী? ও কিসের বিশ্রী গন্ধ?

নীচের দিকে টর্চ ফেলতে ভয় হয়! বাতাস ক্রমে আরও

ভারী হয়ে আসে। দূরে আকাশের নীল থালাটাকে কত ছোট কত ফিকে দেখায়। ওর নীচে এখনও রোদ ওঠে, পাখি ডাকে, সবুজ ঘাসে ছোট ছোট হলদে ফুল ফোটে, ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস বয়। আর দেরি নয়। কী হবে সোনাদানা দিয়ে! মাটি কোপালে মাটিতেই তো সোনা ফলে।

আর নীচে তাকায় না বনমালী—প্রাণপণে দড়ি বেয়ে আকাশের নীল থালার দিকে উঠতে থাকে।

[শেষ

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

১। ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সের যে-কোনো ছেলে-মেয়ে এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে।

২। এই পৃষ্ঠার মার্জিনের দাগকাটা লম্বা ফালিটি হল কুপন। নির্দিষ্ট জায়গায় নাম, ঠিকানা আর জন্মদিন লিখে গোটা কুপনটি দাগ-বরাবর কেটে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে। রচনার নীচে নাম-ঠিকানা দেওয়া নিষিদ্ধ—এই বিষয়ে ভুল হলে লেখা বাতিল হবে। খামের উপর লিখে দিতে হবে : 'প্রতিযোগিতা ২।৬৩'।

৩। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ শনিবার ২৪ অগস্ট, ১৯৬৩।

৪। ১ম পুরস্কার ১৫ টাকা, ২য় ১০ টাকা, ৩য় ৫ টাকা।

সন্দেশ
প্রতিযোগিতা ২।৬৩
আগস্ট ১৯৬৩

প্রতিযোগীর নাম..........................
বয়স..........
জন্মদিন : সন.......... তারিখ.......... মাস..........
ঠিকানা..
....

১

প্রত্যেক লাইনে একই শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে

(১) খাবার দেবার জন্য — — হয়েছে।

(২) রাস্তায় সঙ্গী — ছেলেমানুষকে — যায় না।

(৩) —, — মাছ তো আনলে না!

(৪) সুন্দর চিঠির শেষে মানান— —খানা।

(৫) যেমনি কথা —, — সুদ্ধ লোক অমনি খেপে গেল।

(৬) জামার এইখান দিয়ে — —।

(৭) আলমারি — — রাখাই দায়।

২

১ থেকে ৯—এই নটি অঙ্ককে দু ভাগে সাজাতে হবে। এদিকের ভাগে থাকবে বিজোড় সংখ্যা-গুলি, ওদিকের ভাগে জোড় সংখ্যাগুলি। অঙ্কগুলিকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে দু ভাগেরই যোগফল সমান হয়। যেভাবে খুশি সাজাতে পার, যে-কোনো চিহ্ন ব্যবহার করতে পার।

[ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৯ই অগস্ট ১৯৬৩। যারা দুটো ধাঁধারই সঠিক উত্তর দিতে পারবে শুধু তাদেরই নাম ছাপা হবে।]

গত মাসের ধাঁধার উত্তর : ১। ডিম, ২। ৮১টি চকোলেট

নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে

বাঙলার বাইরে থেকে—২৪৩৩ সুপ্রতীক দাস (শিলং), ২৪৯৩ বাণী, নচিকেতা ও অনিরুদ্ধ সাধু (ইজ্জতনগর, উত্তরপ্রদেশ), ২৬০৫ নীলাঞ্জনা রায় (নয়াদিল্লী)॥ (**কলকাতা বাদে**) **পশ্চিমবাঙলা থেকে**—১৭৫ শুদ্ধসত্ত্ব বসু (চন্দননগর), ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর), ৮৪২ কৃষ্ণা, স্বাতী

ও দীপংকর মুখোপাধ্যায় (কুলটি), ১৩৫৫ দীপক ভট্টাচার্য (হাওড়া), ১৬৭৬ বাবন, কুচন, জগন, বাঘন ও চন্দন ঘোষ (বৈদ্যবাটী), ২৪৬৭ পার্থমিত্রা ঘোষ (হাওড়া), রীতা ও ইরা সামন্ত (মংপু) ॥ **কলকাতা থেকে**—৬ পার্থ ও বুবুল রায়চৌধুরী, ৫৯২ সুমনা চক্রবর্তী, ৬৩১ দীপংকর দাশগুপ্ত, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ২৬৫৪ অসিত ও মলয় প্রামাণিক, ২১২৮ অনুরাধা নাগ, ২২১৫ সহদেব মুখোপাধ্যায়, ২২৩৭ উষা ও স্বাতী ভট্টাচার্য, ২৬৪৩ তাপসকুমার বসু, ২৬৯৬ সুবীর ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭১৬ মধুরা ভট্টাচার্য, ২৭৩৭ রীতা ও রীনা বসু ॥

বৈশাখের প্রতিযোগিতার উত্তর

বাঃ—তোমরা অনেকেই দেখছি প্রতিযোগিতার চরিত্রগুলিকে ঠিক চিনে নিয়েছ। কিন্তু নাম লিখতে একটু-আধটু ভুল করেছ কেন কেউ কেউ ? এর পরের বারে আরও অনেকের উত্তর একেবারে ঠিক হওয়া চাই—কেমন ?

১। কালো-ঝোল্লাপরা বিচারক পেঁচাকে অবশ্য সকলেই চিনেছ—সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'-তে একে দেখেছি।

২। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র বেঙ্গম-বাচ্চা দুটিও সকলের পরিচিত, কিন্তু তাদের পিঠে লাল কমল আর নীলকমলকে সবাই দেখতে পাও নি।

৩। নীলকমলের হাতে বড় খোক্কসকেও সেই 'ঠাকুরমার ঝুলি'তেই দেখেছিলাম।

৪। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোলে'র গোষ্ঠমামাকে চিনতে পেরেছ প্রায় সবাই—কিন্তু শুধু মামা লিখলে তো চলবে না, নাম লেখা চাই।

৫। হট্টিমাটিম্‌টিম্‌কেও সবাই জান। 'খুকুমণির ছড়া'র ছড়াগুলি যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলন করেছিলেন।

৬। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের 'টুনটুনির বই'য়ের মজন্তালী সরকারকেই বা কে না জানে !

৭। অরুণ-বরুণ আর কিরণমালা তিনটি ভাইবোনকেও তোমরা 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে পেয়েছিলে।

৮। বিছার ঘাড়ে ছাগলের মাথা লাগানো এই বিচিত্র জীবটিকে দেখেছিলে 'আবোল তাবোলে'। চিনেছ একে সবাই—কিন্তু নামটা লিখতে পার নি কেন অনেকে ? ওর নামটা বইয়ে লেখা না থাকলেও সহজেই বোঝা যায়। কেউ কেউ ঠিক বুঝেছ। অন্যরা বুঝতে পার নি ? ওর নাম বিছাগল।

৯। এরা দুটি তো 'আবোল তাবোলে'র সেই ডানপিটে দুই ভাই।

১০। 'খুকুমণির ছড়া'র হুম্বর-মুম্বর—দুই তালগাছে দুই পা দিয়ে একে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ?

১১। এ যে 'আবোল তাবোলে'র হাতগণনার সেই নন্দ খুড়ো অথবা নন্দ গোঁসাই।

১২। একে নিশ্চয় চিনেছ—না মানুষ, না জন্তু না পেঁচা, না ভূত—এ হল সেই 'হ-য-ব-র-ল'র হিজিবিজবিজ।

১৩। গালফোলা গোবিন্দর মাকে অবশ্য দেখেছ 'খুকুমণির ছড়া'তে।

১৪। আর লড়াই-ক্ষ্যাপাকে দেখেছ 'আবোল তাবোলে'। উঁহু, শুধু 'ক্ষ্যাপা' বা 'পাগলা' লিখলে চলবে না, ওর নাম হল পাগলা-জগাই।

১৫। পনেরো নম্বর হল 'টুনটুনির বই'য়ের সেই উকুনে বুড়ী।

১৬। সব শেষে ষোলো নম্বর 'হ-য-ব-র-ল'র সেই দেড়হাত-লম্বা টেকো বুড়ো। যদিও দুই বুড়ো ঠিক একই রকম দেখতে—তবু ছবিটা যে উধোর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'সন্দেশে'র গন্ধে বুঝি উড়ে এল মাছি,
কেন ভনভন হাড় জ্বালাতন, ছেড়ে দাও না বাঁচি!
নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দাও, শেষটা দেবে ফাঁকি—
সুযোগ বুঝে সুড়ুত করে হুল ফোটাবে নাকি?

ছড়া ও ছবি। সুকুমার রায়
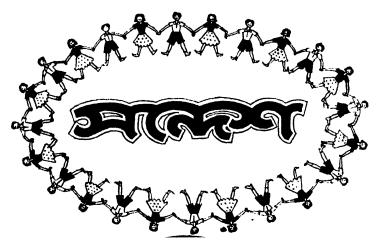
৩য় বর্ষ । ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৭০ । অগস্ট ১৯৬৩

ছবি-আঁকিয়ে

সামসুর রাহমান

আমার রঙের বাক্স থেকে
ঢালব এমন নীল,
আকাশ পাতাল খুঁজলে তবু
পাবে না তার মিল।
আমার তুলির ছোঁয়ায় শাদা
পাতায় পড়বে দাগ ;
হরিণ যাকে ভয় পাবে না
গড়ব তেমন বাঘ।
রঙের ছোপে উঠবে হেসে
পাথর-কাটা পথ,
চিলেকোঠায় থামবে এসে
সুজ্জিমামার রথ।

মেঝের চকে আঁকতে পারি
আকাশছোঁয়া ঘর,
দেয়াল জুড়ে ভলগা নদী
কিংবা শুকনো থর।
ছাদে ওঠে ঝলমলিয়ে
সোঁদরবনের গাছ,
আঁচড় কেটে ধরতে পারি
সবুজ পরীর নাচ।
আমার রঙের খেলা এমন
রাতকে করে দিন,
খাতার কোণে ঝলসে ওঠে
কঙ্গো ইন্দোচীন॥

গরুড়ের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

একবার মহামুনি কশ্যপ পুত্রলাভের জন্য খুব ঘটা করিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন। দেবতা এবং মুনিগণ সকলে মিলিয়া সেই যজ্ঞে কাজ করিতে আসেন।

যজ্ঞের সকল কাজ ইহাদিগের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হইল। যাঁহারা কাঠ আনিবার ভার লইলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইহাদের মধ্যে বালখিল্য-নামক একদল মুনিও ছিলেন।

এই বালখিল্যদিগের মতন আশ্চর্য মুনি আর কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। দেখিতে ইহারা নিতান্তই ছোট ছোট ছিলেন। কত ছোট, তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কেহ বলিয়াছেন যে তাঁহারা 'অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ' (অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের মতো ছোট) ছিলেন। কিন্তু এ কথা যে একেবারে ঠিক নয়, তাহার প্রমাণ এই একটা ঘটনাতেই পাওয়া যাইতেছে :

ইহাদের দলে কয়জন ছিলেন, জানি না। কিন্তু দেখা যায় যে কশ্যপ মুনির যজ্ঞের জন্য কাঠ কুড়াইতে গিয়া, তাঁহারা সকলে মিলিয়া অতি কষ্টে একটি পাতার বোঁটামাত্র বহিয়া আনিতেছিলেন! তাহাও আবার, পথে এক দুর্ঘটনা হওয়াতে, তাঁহারা যজ্ঞস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন নাই!

দুর্ঘটনাটা একটু ভারী রকমের! গোরুর পায়ের দাগ পড়িয়া, পথে ছোট ছোট গর্ত হইয়াছিল, সেই গর্তগুলিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়াছিল। পাতার বোঁটা লইয়া ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, বালখিল্য ঠাকুরেরা সেই বোঁটাসুদ্ধ সকলে সেই গর্তের একটার ভিতর গড়াইয়া পড়িয়াছেন; তারপর আর তাহার ভিতর হইতে উঠিতে পারেন না!

এই সময়ে ইন্দ্র পর্বতপ্রমাণ কাষ্ঠের বোঝা লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুনি-

দিগের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আশ্চর্য বোধ হইল, আর হাসি পাইল। পিপীলিকার মতন মুনি-গণকে দেখিয়া তাঁহার একেবারে গ্রাহ্য বোধ না হওয়াতে, সেই হাসি আর তিনি থামাইতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার উপর আবার একটু-আধটু ঠাট্টাও যে না করিয়াছিলেন, এমন নহে। শেষে আবার উঁহাদিগকে ডিঙাইয়া চলিয়া আসেন।

মুনির সম্মান তো আর শরীরের লম্বা-চওড়া দিয়া হয় না; তাঁহাদিগের সম্মান আর ক্ষমতা, তাঁহাদের তপস্যার ভিতরে ভিতরে। বালখিল্যদিগের মতন তপস্বী খুব কমই ছিল। আর তাঁহাদের ক্ষমতা যে কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়ও তাঁহারা তখনই দিলেম।

ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া, তাঁহারা, উঁহার চেয়ে অনেক বড় আর-এক ইন্দ্র জন্মাইবার জন্য, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এ কথা জানিবামাত্রই ইন্দ্রের ভয়ের আর সীমা নাই! তিনি তাড়াতাড়ি কশ্যপের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'বাবা, এখন আপনি না বাঁচাইলে, আর উপায় দেখিতেছি না।'

ইন্দ্র কশ্যপের পুত্র (বারজন আদিত্যের মধ্যে যাঁহার নাম শক্র, তিনিই ইন্দ্র), সুতরাং পুত্রের জন্য তাঁহার দয়া না হইবে কেন? কশ্যপ ইন্দ্রের সকল কথা শুনিয়া বালখিল্যদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মুনিগণ, আপনাদের তপস্যা বৃদ্ধি হউক। আমি একটি কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশীর্বাদ করুন, যেন আমার কাজটি হয়।'

সত্যবাদী বালখিল্যগণ তখনই বলিলেন, 'আপনার কার্যসিদ্ধি হইবে!'

তাহা শুনিয়া কশ্যপ তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'দেখুন, ব্রহ্মা আমার এই পুত্রটিকে ইন্দ্র করিয়া দিয়াছেন। এখন আপনারা যদি ইহাকে যজ্ঞ করিয়া তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে তো ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হইয়া যায়! আপনাদের যজ্ঞ বৃথা হয়, ইহা কখনই আমার ইচ্ছা নহে। আপনারা যে একটি ইন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইবেই। তবে আমি এই চাহি যে, সেই ইন্দ্র— আমাদিগের ইন্দ্র না হইয়া পাখির ইন্দ্র হউক। দেখুন, ইন্দ্র মিনতি করিতেছেন, আপনারা তাহার উপর সন্তুষ্ট হউন।'

ধার্মিকের রাগ বেশীক্ষণ থাকে না। সুতরাং কশ্যপের কথায় বালখিল্যগণ তখনই আহ্লাদের সহিত ইন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। তারপর তাঁহারা কশ্যপকে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, 'আমরা দুইটি জিনিসের জন্য এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম; নূতন একটি ইন্দ্র, আপনার একটি পুত্র। এ অবস্থায় আপনার যাহা ভালো বোধ হয়, তাহা করুন।'

সুতরাং স্থির হইল যে, এই নূতন ইন্দ্রটি যেমন পাখির ইন্দ্র হইবে, তেমনি কশ্যপের পুত্রও হইবে। সেইরূপ পুত্রই গরুড়, সে পক্ষিগণের ইন্দ্র।

গরুড়ের শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড ছিল, আর তাহা সে ইচ্ছামত ছোট বড় করিতে পারিত। আগুনের মতো লাল আর উজ্জ্বল তাহার গায়ের রং ছিল। সে বিদ্যুতের মতন বেগে ছুটিতে পারিত আর যখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পারিত। জন্মমাত্রেই সে আকাশে উড়িয়া আনন্দে চিৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে দেবতারা গরুড়কে দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহা বুঝি আগুন। তাই তাঁহারা ব্যস্ত-ভাবে অগ্নির নিকটে গিয়া বলিলেন, 'আজ কেন তোমার এত তেজ দেখিতেছি ? তুমি কি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার ইচ্ছা করিয়াছ ?'

এ কথা শুনিয়া অগ্নি বলিলেন, 'আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। উহা আগুন নহে, কশ্যপের পুত্র গরুড়। ইনি দেবতাদিগের উপকারী বন্ধু, সুতরাং আপনাদের কোনো ভয় নাই।'

তখন তাঁহারা সকলে গরুড়ের নিকট গিয়া, তাঁহার নানারূপ প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন যে 'বাপু, তোমাকে দেখিয়া আমরা বড়ই ভয় পাইয়াছি, আর তোমার তেজে অস্থির হইয়াছি। সুতরাং তুমি দয়া করিয়া তোমার শরীরটাকে একটু ছোট করো, আর তেজ একটু কমাও।'

তাহাতে গরুড় বলিল, 'এই যে মহাশয়, আমি এখন ছোট হইয়া গিয়াছি। আপনাদের আর ভয় পাইতে হইবে না।' এই বলিয়া সে তাহার মাতা বিনতার নিকট চলিয়া গেল।

বিনতার দিন যে তখন কী দুঃখে যাইতেছিল, তাহা না বলিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না। বাসন মাজা, জল টানা প্রভৃতি দাসীর যে কাজ, তাহা তো তাঁহাকে করিতেই হইত। ইহার উপর আবার কদ্রু যখন-তখন বলিয়া বসিতেন, 'আমি অমুক জায়গায় যাইব, আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া চলো।'

একদিন বিনতা গরুড়ের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় কদ্রু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখো বিনতা, সমুদ্রের মধ্যে একটা অতি সুন্দর দ্বীপ আছে, সেখানে অনেক নাগ বাস করে। আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে হইবে।'

তখনই কদ্রু বিনতার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, আর কতগুলি সাপ (কদ্রুর পুত্র) গরুড়ের পিঠে গিয়া চড়িল। তাহাদিগকে লইয়া দুজনকে সেই দ্বীপে যাইতে হইল।

দ্বীপে গিয়া সাপেরা কিছুকাল আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই গরুড়কে বলিল, 'তুমি আকাশে উড়িতে পার, তোমার তো না-জানি ইহার চেয়ে কতই ভালো ভালো জায়গার কথা জানা আছে। সেই সকল জায়গায় আমাদিগকে লইয়া চলো।'

ইহাতে গরুড় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, সাপেরা কেন আমাকে এমন করিয়া আজ্ঞা দিবে, আর আমাকেই বা কেন তাহা মানিতে হইবে, তাহা বলো।'

বিনতা বলিলেন, 'বাছা, পণে আমি হারিয়া উহাদের দাসী হইয়াছি, তাই উহারা আমাদিগকে এমন করিয়া খাটাইয়া লয়।'

ইহাতে যে গরুড়ের মনে খুব কষ্ট হইল, তাহা বুঝিতেই পার। সে তখনই সাপদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'হে সর্পগণ, কী হইলে তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পার ?'

সর্পেরা বলিল, 'যদি তুমি অমৃত আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিব।'

এ কথায় গরুড় তাহার মাকে বলিল, 'মা, আমি অমৃত আনিতে চলিলাম ; পথে কী খাইব, বলিয়া দাও।'

বিনতা বলিলেন, 'বাছা, সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার নিষাদ (শিকারী, ব্যাধ) বাস করে, তুমি তাহাদিগকে খাইও। কিন্তু সাবধান! কখনও যেন ব্রাহ্মণকে খাইও না।'

গরুড় বলিল, 'মা, ব্রাহ্মণ কী রকম থাকে? আর সে কী করে? সে কি বড়ই ভয়ানক?'

বিনতা বলিলেন, 'যাহাকে খাইলে তোমার পেটের ভিতরে ছুঁচের মতো ফুটিবে, গলায় আগুনের মতো জ্বালা হইবে, তিনিই জানিবে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের বড় অদ্ভুত ক্ষমতা, নিতান্ত বিপদে পড়িলেও তাঁহাকে মুখে দিও না। যাও বাছা, তোমার মঙ্গল হউক!'

এইরূপে মায়ের নিকট বিদায় লইয়া গরুড় অমৃত আনিতে যাত্রা করিল। খানিক দূর গিয়াই সে দেখিল যে, তাহার ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু আহার না করিলে আর চলে না। তখন সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, নিকটেই একটা নিষাদের-গ্রাম দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিবামাত্র, সে সেই গ্রামের পথে তাহার সেই বিশাল মুখখানি মেলিয়া রাখিয়া, দুই পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। কী ভীষণ বাতাসই সে করিয়াছিল! বাতাসে ঝড় বহিয়া, ঘূর্ণি বায়ু ছুটিয়া, ধূলা উড়িয়া গ্রামখানি সুদ্ধ একেবারে তাহার মুখের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত, এখন মুখ বন্ধ করিয়া তাহা গিলিলেই হয়।

নিষাদের গ্রাম খাইয়া গরুড়ের পেট একটুও ভরিল না; লাভের মধ্যে, গলা জ্বলিয়া বেচারার কষ্টের একশেষ হইল! সে এমনিই ভয়ানক জ্বালা যে, আর একটু হইলেই হয়তো গলা পুড়িয়া যাইত! গরুড় ভাবিল, 'কী আশ্চর্য! একগাল জলখাবার খাইলাম, তাহাতে কেন এত জ্বালা! তবে বা কোন্‌খান দিয়া একটা ব্রাহ্মণ আমার পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গেল! মা তো ব্রাহ্মণ খাইলেই এমনি জ্বালা হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন!' এই ভাবিয়া সে বলিল, 'ঠাকুর মহাশয়! আপনি শীঘ্র বাহিরে আসুন, আমি হাঁ করিতেছি।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমার স্ত্রীও যে আছে! আমি একেলা কেমন করিয়া বাহির হইব?'

গরুড় বলিল, 'শীঘ্র আপনার স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে আসুন। বিলম্ব হইলে হজম হইয়া যাইবেন।'

ব্রাহ্মণকে তাড়া দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তিনি খুবই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন। গরুড়ের গলাও তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হইল। তখন ঠিক একসঙ্গে, ব্রাহ্মণও বলিলেন, 'কী বিপদ!' গরুড়ও বলিল, 'কী বিপদ!'

আগামী সংখ্যায় শেষ হবে। 'মহাভারতের গল্প' থেকে পুনর্মুদ্রিত।

তোমরাও আসতে পার

জয়ন্ত চৌধুরী

[জুলাই সংখ্যার পর]

ইস্তাম্বুল থেকে প্লেন ছাড়বার সময়ে ডান দিকে রইল কৃষ্ণসাগর, তারই তীর ঘেঁষে উড়ে চলেছি জার্মানির মু্যনিক-এ। মেঘের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে।

প্লেন ছাড়বার আগে খানিকটা গড়গড় শব্দ হয়, মোটর গাড়িতে স্টার্ট দেবার পর যেমন একটু নড়নচড়ন বোঝা যায় পায়ের তলায়, সীটের ভেতরে, তেমনি টের পাওয়া যায়। তারপর অনেকখানি গড়িয়ে গড়িয়ে চলে বাসের মতো সামান্য ঝাঁকুনি লাগে—তারপর একবার থামে। তারপর প্রচণ্ড জোরে-স্পীড নিয়ে চলতে চলতে এক লাফে যেন মাটি থেকে উঁচুতে উঠে পড়ে। এত জোরে চলে যে পিঠটা সীটের হেলান দেবার জায়গায় সেঁটে ধরে। আর এত তাড়াতাড়ি উঁচুতে ওঠে যে বসবার জায়গার মধ্যে ডুবে যেতে হয়।

ইস্তাম্বুলের এয়ারপোর্টের ব্যাঙ্কে এক ডলার ভাঙালুম। তাতে কত জানি লিরা পেলাম, আর পঞ্চান্ন সেণ্ট। সেই লিরা থেকে স্ট্যাম্প আর কার্ড কিনে রইল পড়ে কিছু লিরা, সেই লিরা নিয়ে দোকানে জিজ্ঞেস করলাম এই দিয়ে কী কিনতে পারি? ওরা বললে ওর সঙ্গে পাঁচ সেণ্ট যোগ করলে এক প্যাকেট টার্কিশ সিগারেট পাওয়া যেতে পারে।—তাই-ই করলাম।—এখন গ্রীসের ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

লাঞ্চ এসে গেল। ইচ্ছে ছিল পরে খাব। বললুম, 'একটু বাদে খেলে হবে?' বললে,—'আজ্ঞে না, কিছু মনে যদি না করেন, তা হয় না।' অগত্যা!—পাঁউরুটি, বিরাট মাংসের টুকরো, স্যালাড, মাখন, কেক। পেস্ট্রি, ক্রীম, ফল, নুন-মরিচের ছোট্ট কৌটো তো আছেই। আর চিনির প্যাকেট। মাংসটা মুরগীর বা অন্য কোনো বড় পাখিরও হতে পারে। ফল বলতে সবুজ আর লাল রঙের গোল গোল (পাতিলেবুর মাপের) গোটা দশ-বারো। খেয়ে দেখলাম লালটা তরমুজের টুকরো গোল করে কাটা—সবুজটা খেতে খরমুজার মতো।

এখন নীচে ধূসর-খয়েরী পাথুরে জমি, মাথার ওপর ঝকঝকে বেগুনী-নীল আকাশ আর দিগন্ত বরাবর না-খয়েরী, না-নীল—কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে। কলকাতায় এখন বেলা ২-৪০ মিঃ। এখানে এখন আন্দাজ সাড়ে এগারোটা।

একটু একটু করে সবুজ সবুজ ক্ষেত, আর ঘন কালো-সবুজ গাছপালা—সেই সঙ্গে ছোট্টখাট্ট নদী, সরু সরু রাস্তার মতো দেখা যাচ্ছে—মিউনিক এগিয়ে আসছে। প্লেনটা ইতিমধ্যে ঘরবাড়ি হয়ে গেছে।

ব্যাস, তলাটা একদম সাদা মেঘে ঢেকে গেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। নীচের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে তলায় অনন্ত সাদা বরফের সমুদ্র।—বারে, বাঃ, দেখতে দেখতে আবার সব পরিষ্কার—একদম সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বেশ উঁচু আর লম্বা পাহাড় তার তলায় সবুজ সমতল। পাহাড়ের চুড়োগুলো কী চোখা-চোখা ; নীচে কয়েকটা হ্রদ। আল্পস্-এর উত্তরে—এটা হল জার্মানির 'ব্ল্যাক ফরেস্ট' অঞ্চলের কাছাকাছি।

কী উঁচু দিয়ে যাচ্ছি! মাঝখানে নীচে টুকরোটাকরা মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছে জমি বা পাহাড়ের চুড়ো কতো নীচুতে! ডান দিকে আবার মেঘের মেলা—স্তূপ—মেঘের দল উঁচু উঁচু হয়ে উঠেছে। আমাদের দিকটা ফাঁকা।—আহা, এবার কী সবুজ, আর কী সবুজ! বনের সবুজ, ক্ষেতের সবুজ ; ঘন সবুজ আর ফিকে সবুজ! যাঃ, আবার সব ধোঁয়াটে মেঘে ঢেকে গেল। প্লেন কাত হয়ে বাঁ দিকে মোড় নিচ্ছে।

নীচে সবুজ ক্ষেত,—আর মাঝে মাঝে লাল-লাল রঙের ঢালু-ছাদ বাড়ি। এত পরিষ্কার আর গোছানো যে মনে হচ্ছে জ্বলজ্বলে রঙ দিয়ে কে সব এঁকে রেখেছে! এদিকের আকাশে মেঘ রয়েছে দেখছি—নীচে রোদ্দুরের আলো নেই। আমাদেরও ওপরে কালো মেঘ রয়েছে। মাঝে মাঝে প্লেনের ডানায় চকমক করে বিদ্যুতের ঝলক দেখতে পাচ্ছি। হায়! হায়! একটা নদী এমন চওড়া আর এঁকেবেঁকে গেছে না!—বেল্ট বাঁধতে বলছে।

মিউনিক আর ফ্রাঙ্কফুর্ট—দু জায়গাতেই নামতে হল, জার্মানিতে পা ঠেকাবার ইচ্ছেও ছিল। তা ছাড়া এই দু জায়গাতেই পাসপোর্ট আর স্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট পরীক্ষা করাতে হয়। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে একে একে এখানকার পুলিশের কাছে পাশ হয়ে তবে আবার প্লেনে ফেরা। জার্মানির যা দৃশ্য চোখে পড়েছে, তাতে দেখলাম সর্বক্ষণই বাগানঘেরা লাল টালির ঢালু-ছাদের বাড়ি উঁচু-নীচু, দু-তলা, তিনতলা—স-ব। একটাও সমতল ছাদ বা শহুরে বাড়ি চোখে পড়ে নি। মিউনিকে এক বুড়োবুড়ী পাশে এসে জুটল। আলাপ হল।—যা বললে, শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গেল—'তুমি' কি ফিলিপাইন থেকে আসছ? ওরা 'কলকাতা' নামটার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নয়। ফ্রাঙ্কফুর্টেই নেমে গেল—আবার ফাঁকা পাওয়া গেল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লণ্ডন যাত্রার আগেই মাইকে বললে—'লণ্ডনে গত ঘণ্টা চার-পাঁচ বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘে ঢাকা আকাশ, ঠিক সময়ে নামা যাবে কিনা বলা যায় না—কারণ দৃষ্টি একদম চলছে না।'

প্লেন উড়ল। সারাক্ষণ পৃথিবী মেঘের তলায় ঢাকা। একেবারে ঠাস জমাট সাদা মেঘে—কোথাও ফাঁক নেই। নীচে যে আর কিছু থাকা সম্ভব, মনেই হয় না। প্রায় এসে পড়েছি তবু এখনও সেই একই অবস্থা।—নীচে পুঞ্জ পুঞ্জ জমাট মেঘের কুণ্ডলী—যতদূর দেখা যায়। আমরা তারও ওপর দিয়ে যাচ্ছি চব্বিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। আমাদের প্লেনের গায়ে কড়া রোদ্দুর, অথচ নীচের পৃথিবীতে অন্ধকার

আর ঝমঝমে বাদলা। প্লেন ফ্রাঙ্কফুর্ট ছাড়বার পরেই--টী! (মাঝখানে লাঞ্চের আগে একটা খাবার খাই নি) একটা রুটি, একদলা মাখন, নুন-মরিচ, চিনি, ক্রীম—চায়ের পেয়ালার মাপে চাকা চাকা ছ-সাতখানা নানান ধরনের মাংসের টুকরো, তার ওপর ক্রীম আর কড়াইশুঁটি ছড়ানো, তার পাশে কী একটা নরম নরম মিষ্টি পুডিং-জাতের বিরাট একটা লম্বাটে বরফি : বীন টম্যাটো শাক ইত্যাদি এক গাদা--একটা মস্ত বড় চকোলেট-কেক। এবারে আর কফি নিই নি, চা। আর পাতে কিছু ফেলেও রেখেছি। এইবার লণ্ডন আসব-আসব করছে। মেঘের ওপর সূর্যের গোল ছায়া আর তার চারপাশে গোল হয়ে রামধনুর রঙ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে--লণ্ডনের কাছে আকাশ পরিষ্কার। ওই টেমস নদী, তার ওপর টাওয়ার অভ লণ্ডন ব্রিজ!--না, আর কিছু দেখা গেল না। আবার মেঘ। বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। খানিকটা দেখা যাচ্ছে, এতক্ষণে খাস লণ্ডন পার হয়ে গেছে। এইবার নামছি—প্লেনের ডানায় বৃষ্টির ছাট দেখতে পাচ্ছি। 'বেল্ট বাঁধো—বেল্ট বাঁধো—লণ্ডন।' জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি রানওয়ের কংক্রিটের রাস্তা সাঁ-সাঁ করে পেছিয়ে যাচ্ছে আমাদের নীচে। চাকা ঠেকল,—একটু সামান্য ধাক্কা। তারপর অনেকখানি ট্যাক্সি-ইং করে (মানে চাকায় চলে) প্লেন থামল। ব্যাস, লণ্ডন এসে গেলাম। সিঁড়ি লাগল। বাইরে বেশ জোর বৃষ্টি।

লণ্ডন যাত্রা শেষ। পরের সংখ্যায় ওয়াশিংটন যাত্রা শুরু

সত্যজিৎ রায়

পটলবাবু সবে বাজারের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়েছেন এমন সময় বাইরে থেকে নিশিকান্তবাবু হাঁক দিলেন, 'পটল আছ নাকি হে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দাঁড়ান, আসছি।'

নিশিকান্ত ঘোষ মশাই নেপাল ভট্‌চাজ্যি লেনে পটলবাবুর তিনখানা বাড়ি পরেই থাকেন। বেশ আমুদে লোক।

পটলবাবু থলে নিয়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার? সকাল-সকাল?'

'শোনো, তুমি ফিরছ কতক্ষণে?'

'এই, ঘণ্টাখানেক! কেন?'

'তারপর আর বেরোনোর ব্যাপার নেই তো? আজ তো ট্যাগোর্‌স্‌ বার্থডে। আমার ছোটশালার সঙ্গে কাল নেতাজী ফার্মেসিতে দেখা হল। সে ফিলিমে কাজ করে—লোকজন যোগাড় করে দেয়। বললে কী জানি একটা ছবির একটা সীনের জন্য একজন লোকের দরকার। যেরকম চাইছে, বুঝেছ—বছর পঞ্চাশ বয়স, বেঁটেখাটো, মাথায় টাক—আমার টক করে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তোমার হদিস দিয়ে দিলুম। বলেছি সোজা তোমার সঙ্গে এসে কথা বলতে। আজ সকালে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। তোমার আপত্তি নেই তো? ওদের রেট হিসেবে কিছু পেমেণ্টও দেবে অবিশ্যি...'

সকালবেলা ঠিক এই ধরনের একটা খবর পটলবাবু আশাই করেন নি। বাহান্ন বছর বয়সে ফিল্মে

অভিনয় করার প্রস্তাব আসতে পারে এটা তাঁর মতো নগণ্য লোকের পক্ষে অনুমান করা কঠিন বৈকি। এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার!

'কী হে, হ্যাঁ কি না বলে ফেলো। তুমি তো অভিনয়-টভিনয় করেছ এককালে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে, 'না' বলার আর কী আছে? সে আসুক, কথাটথা বলে দেখি! কী নাম বললেন আপনার শালার?'

'নরেশ। নরেশ দত্ত। বছর ত্রিশেক বয়স, লম্বা দোহারা চেহারা। দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে বলেছে।'

বাজার করতে গিয়ে আজ পটলবাবু গিন্নীর ফরমাশ গুলিয়ে ফেলে কালোজিরের বদলে ধানিলঙ্কা কিনে ফেললেন। আর সৈন্ধব নুনের কথাটা তো বেমালুম ভুলেই গেলেন। এতে অবিশ্যি আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এককালে পটলবাবুর রীতিমত অভিনয়ের শখ ছিল। শুধু শখ কেন—নেশাই বলা চলে। যাত্রায়, শখের থিয়েটারে, পুজোপার্বণে পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁর বাঁধা কাজ ছিল অভিনয় করা। হ্যাণ্ডবিলে কতবার নাম উঠেছে পটলবাবুর। একবার তো নীচের দিকে আলাদা করে বড় অক্ষরে নাম বেরুল তাঁর—"পরাশরের ভূমিকায় শ্রীশীতলাকান্ত রায় (পটলবাবু)।" তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়েছে বেশি, এমনও সময় গেছে এককালে।

তখন অবিশ্যি তিনি থাকতেন কাঁচরাপাড়ায়। সেখানেই রেলের কারখানায় চাকরি ছিল তাঁর। উনিশ শ চৌত্রিশ সনে কলকাতার হাডসন অ্যাণ্ড কিম্বার্লি কোম্পানিতে আরেকটু বেশি মাইনের একটা চাকরি, আর নেপাল ভট্চাজ্যি লেনে এই বাড়িটা পেয়ে পটলবাবু সস্ত্রীক কলকাতায় চলে আসেন। ক-টা বছর কেটেছিল ভালোই। আপিসের সাহেব বেশ স্নেহ করতেন পটলবাবুকে। তেতাল্লিশ সনে পটলবাবু সবে একটা পাড়ায় থিয়েটারের দল গড়ব-গড়ব করছেন এমন সময় যুদ্ধের ফলে আপিসে হল ছাঁটাই, আর পটলবাবুর ন বছরের সাধের চাকরিটি কর্পূরের মতো উবে গেল।

সেই থেকে আজ অবধি বাকি জীবনটা রোজগারের ধান্দায় কেটে গেছে পটলবাবুর। গোড়ায় একটা মনিহারি দোকান দিয়েছিলেন, সেটা বছর পাঁচেক চলে উঠে যায়। তারপর একটা ছোট বাঙালি আপিসে কেরানিগিরি করেছিলেন কিছুদিন, কিন্তু বড়কর্তা বাঙালি সাহেব মিস্টার মিটারের ঔদ্ধত্য আর অকারণ চোখ-রাঙানি সহ্য করতে না পারায় নিজেই ছেড়ে দেন সে চাকরি। তারপর এই দশটা বছর ইনসিওরেন্সের দালালি থেকে শুরু করে কী-না করেছেন পটলবাবু! কিন্তু যে-অভাব, যে-টানাটানি, সে আর দূর হয় নি কিছুতেই। সম্প্রতি তিনি একটা লোহালক্কড়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন; তাঁর এক খুড়তুতো ভাই বলেছে সেখানে একটা ব্যবস্থা করে দেবে।

আর অভিনয়? সে তো যেন আর-এক জন্মের কথা! অজান্তে এক-একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবছা আবছা মনে পড়ে যায়, এই আর কি। নেহাত পটলবাবুর স্মরণশক্তি ভালো, তাই কিছু ভালো ভালো পার্টের ভালো ভালো অংশ এখনো মনে আছে! —'শুন পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবঝঙ্কার, স্বপক্ষ আকুল

মহারণে। জিনি শত পবন-হুঙ্কার, পর্বত-আকার গদা করিছে ঝঙ্কার—বৃকোদর সঞ্চালনে!' ...ওঃ! ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

নরেশ দত্ত এলেন ঠিক সাড়ে-বারোটার সময়। পটলবাবু প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে নাইতে যাবার তোড়জোড় করছিলেন, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'আসুন, আসুন!' পটলবাবু দরজা খুলে আগন্তুককে প্রায় ঘরের ভিতর টেনে এনে তাঁর হাতল-ভাঙা চেয়ারটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন—'বসুন!'

'না, না। বসব না। নিশিকান্তবাবু আপনাকে আমার কথা বলেছেন বোধহয়...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি অবিশ্যি খুবই অবাক হয়েছি। এতদিন বাদে...'

'আপনার আপত্তি নেই তো?'

পটলবাবুর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

'আমাকে দিয়ে...হেঁ হেঁ...মানে, চলবে তো?'

নরেশবাবু গম্ভীরভাবে একবার পটলবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'বেশ চলবে। খুব চলবে। কাজটা কিন্তু কালই।'

'কাল? রবিবার?'

'হ্যাঁ। ...কোন স্টুডিওতে নয় কিন্তু। জায়গাটা বলে দিচ্ছি আপনাকে। মিশন রো আর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে ফ্যারাডে হাউসটা দেখেছেন তো? সাততলা বিল্ডিং একটা? সেইটের সামনে ঠিক সাড়ে-আটটায় পৌঁছে যাবেন। ওইখানেই কাজ। বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যাবে আপনার।'

নরেশবাবু উঠে পড়লেন। পটলবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কিন্তু পার্টটা কী বললেন না?'

'পার্ট হল গিয়ে আপনার...একজন পেডেস্ট্রিয়ানের, মানে পথচারী আর কি! একজন অন্যমনস্ক, বদমেজাজী পেডেস্ট্রিয়ান। ...ভালো কথা, আপনার গলাবন্ধ কোট আছে কি?'

'তা আছে বোধহয়।'

'ওটাই পরে আসবেন। ডার্ক রং তো?'

'বাদামী গোছের। গরম কিন্তু।'

'তা হোক না। আর আমাদের সীনটাও শীতকালের, ভালোই হবে...কাল সাড়ে-আটটা, ফ্যারাডে হাউস!'

পটলবাবুর ধাঁ করে আরেকটা জরুরী প্রশ্ন মাথায় এসে গেল।

'পার্টটায় ডায়ালগ আছে তো? কথা বলতে হবে তো?'

'আলবত! স্পীকিং পার্ট। ...আপনি আগে অভিনয় করছেন তো?'

'হ্যাঁ...তা, একটু-আধটু...'

'তবে! শুধু হেঁটে যাবার জন্য আপনার কাছে আসব কেন? সে তো রাস্তা থেকে যে-কোন

একটা পেডেস্ট্রিয়ান ধরে নিলেই হল ! …ডায়ালগ আছে বৈকি এবং সেটা কাল ওখানে গেলেই পেয়ে যাবেন। আসি…'

নরেশ দত্ত চলে যাবার পর পটলবাবু তাঁর গিন্নীর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খুলে বললেন।

'যা বুঝছি— বুঝলে গিন্নী—এ পার্টটা হয়তো তেমন একটা বড় কিছু নয়; অর্থপ্রাপ্তি অবিশ্যি আছে সামান্য, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, থিয়েটারে আমার প্রথম পার্ট কী ছিল মনে আছে তো ?—মৃত সৈনিকের পার্ট। স্রেফ হাঁ করে চোখ বুঁজে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা; আর তার থেকেই আস্তে আস্তে কোথায় উঠেছিলাম মনে আছে তো ? ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের হ্যাণ্ডশেক মনে আছে ? আর আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চারু বিশ্বাসের দেওয়া সেই মেডেল ? অ্যাঁ ? এ তো সবে সিঁড়ির প্রথম ধাপ ! কী বল ? অ্যাঁ ? মান যশ প্রতিপত্তি খ্যাতি, যদি বেঁচে থাকি ভবে; হে মোর গৃহিণী, এ সবই লভিব আমি !…'

পটলবাবু বাহান্ন বছর বয়সে হঠাৎ তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে উঠলেন। গিন্নী বললেন, 'কর কী ?'

'কিচ্ছু ভেবো না গিন্নী। শিশির ভাদুড়ী সত্তর বছর বয়সে চাণক্যের পার্টে কী লাফখানা দিতেন মনে আছে ? আজ যে পুনর্যৌবন লাভ করেছি !'

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল ! সাধে কি তোমার কোনদিন কিচ্ছু হয় না ?'

'হবে হবে ! সব হবে ! ভালো কথা—আজ বিকেলে একটু চা খাব, বুঝেছ ? আর সঙ্গে একটু আদার রস, নইলে গলাটা ঠিক…'

পরদিন সকালে মেট্রোপোলিটান কোম্পানির ঘড়িতে যখন আটটা বেজে সাত মিনিট তখন পটলবাবু এস্‌প্লানেডে এসে পৌছোলেন। সেখান থেকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ও মিশন রো-র মোড়ে ফ্যারাডে হাউসে পৌছতে লাগল আরো মিনিট দশেক।

বিরাট তোড়জোড় চলেছে আপিসের গেটের সামনে। তিন-চারখানা গাড়ি, তার একটা বেশ বড়—প্রায় বাস-এর মতো—তার মাথায় আবার সব জিনিসপত্তর। রাস্তার ঠিক ধারটায় ফুটপাথের উপর একটা তেপায়া কালো যন্ত্রের মতো জিনিস; তার পাশে কয়েকজন লোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরা-ফেরা করছে। গেটের ঠিক মুখটাতে একটা তেপায়া লোহার ডাণ্ডার মাথায় আরেকটা লোহার ডাণ্ডা আড়াআড়িভাবে শোয়ানো রয়েছে, আর তার ডগা থেকে ঝুলছে একটা মৌমাছির চাকের মত দেখতে লোহার জিনিস। এ ছাড়া ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে জনা ত্রিশেক লোক, যাদের মধ্যে অবাঙালিও লক্ষ্য করলেন পটলবাবু; কিন্তু এদের যে কী কাজ সেটা ঠাহর করতে পারলেন না।

কিন্তু নরেশবাবু কোথায় ? একমাত্র তিনি ছাড়া তো পটলবাবুকে কেউই চেনেন না !

দুরুদুরু বুকে পটলবাবু এগিয়ে চললেন আপিসের গেটের দিকে।

বৈশাখ মাস ; গলাবন্ধ খদ্দরের কোটটা গায়ে বেশ ভারী বোধ হচ্ছিল। গলার কলারের চারপাশ ঘিরে বিন্দু বিন্দু ঘাম অনুভব করলেন পটলবাবু।

'এই যে অতুলবাবু—এদিকে !'

অতুলবাবু ? পটলবাবু ঘুরে দেখেন আপিসের বারান্দার একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে নরেশবাবু তাঁকেই ডাকছেন। নামটা ভুল করেছেন ভদ্রলোক। অস্বাভাবিক নয়। একদিনের আলাপ তো ! পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার নামটা বোধহয় ঠিক নোট করা নেই আপনার। শ্রীশীতলাকান্ত রায়। অবিশ্যি পটলবাবু বলেই জানে সকলে। থিয়েটারেও ওই নামেই জানত।'

'ও ! তা আপনি তো বেশ পাংচুয়াল দেখছি।'

পটলবাবু মৃদু হাসলেন।

'ন বচ্ছর হাডসন কিম্বার্লিতে চাকরি করিছি ; লেট হই নি একদিনও। নট এ সিঙ্গল্ ডে।'

'বেশ, বেশ। আপনি এক কাজ করুন। ওই ছায়াটায় গিয়ে একটু ওয়েট করুন। আমরা এদিকে একটু কাজ এগিয়ে নিই।'

তেপায়া যন্ত্রটার পাশ থেকে একজন ডেকে উঠল, 'নরেশ !'

'স্যার ?'

'উনি কি আমাদের লোক ?'

'হ্যাঁ স্যার। ইনিই···মানে, ওই ধাক্কার ব্যাপারটা···'

'ও। ঠিক আছে। এখন জায়গাটা ক্লিয়ার করো তো ; শট্ নেব।'

পটলবাবু আপিসের পাশেই একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বায়স্কোপ তোলা তিনি এর আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর কাছে সবই নতুন। থিয়েটারের সঙ্গে কোন মিলই তো নেই ! আর কী পরিশ্রম করে লোকগুলো। ওই ভারী যন্ত্রটাকে পিঠে করে নিয়ে এখান থেকে ওখানে রাখছে একটি একুশ-বাইশ বছরের ছোকরা। বিশ-পঁচিশ সের ওজন তো হবেই যন্ত্রটার !

কিন্তু তাঁর ডায়ালগ কই ? আর তো সময় নেই বেশি। অথচ এখনো তাঁকে যে কী কথা বলতে হবে তাই জানেন না পটলবাবু।

হঠাৎ যেন একটু নার্ভাস বোধ করলেন পটলবাবু। এগিয়ে যাবেন নাকি তিনি ? ওই তো নরেশবাবু ; একবার তাঁকে গিয়ে বলা উচিত নয় কি ? পার্ট ছোটই হোক আর বড়ই হোক, ভালো করে করতে হলে তাঁকে তো তৈরি করতে হবে সে পার্ট ! নাহলে এতগুলো লোকের সামনে তাঁকে যদি কথা গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হতে হয় ? আজ প্রায় বিশ বচ্ছর অভিনয় করা হয় নি যে !

পটলবাবু এগিয়ে যেতে গিয়ে একটা চীৎকার শুনে চমকে থেমে গেলেন।

'সাইলেন্স !'

তারপর নরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল—'এবার শট্ নেওয়া হবে! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন! কথাবার্তা বলবেন না, জায়গা ছেড়ে নড়বেন না, ক্যামেরার দিকে এগিয়ে আসবেন না!'

তারপর আবার সেই প্রথম গলায় চীৎকার এল—'সাইলেন্স! টেকিং!' এবার পটলবাবু লোকটিকে দেখতে পেলেন। মাঝারি গোছের মোটাসোটা ভদ্রলোকটি তেপায়া যন্ত্রটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন; গলার একটা চেন থেকে দূরবীনের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইনিই কি পরিচালক নাকি? কী আশ্চর্য, পরিচালকের নামটাও যে তাঁর জেনে নেওয়া হয় নি!

এবারে পর পর আরো কতগুলো চীৎকার পটলবাবুর কানে এল—'স্টার্ট সাউণ্ড!' 'রানিং!' 'অ্যাকশন!'

অ্যাকশন কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই পটলবাবু দেখলেন চৌমাথার কাছ থেকে একটা গাড়ি এসে আপিসের সামনে থামল, আর তার থেকে একটি মুখে-গোলাপী-রং-মাখা স্যুট-পরা যুবক দরজা খুলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে নেমে হনহনিয়ে আপিসের গেট পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল। পরক্ষণেই পটলবাবু চীৎকার শুনলেন 'কাট্', আর অমনি সাইলেন্স ভেঙে গিয়ে জনতার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল।

পটলবাবুর পাশেই এক ভদ্রলোক তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করলেন, 'ছোকরাটিকে চিনলেন তো?'

পটলবাবু বললেন, 'কই, না তো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'চঞ্চলকুমার। তরতরিয়ে উঠছে ছোকরা। একসঙ্গে চারখানা বইয়ে অভিনয় করছে।'

পটলবাবু বায়স্কোপ খুবই কম দেখেন, কিন্তু এই চঞ্চলকুমারের নাম যেন শুনেছেন দু-একবার। কটিবাবু বোধহয় এই ছেলেটিরই প্রশংসা করছিলেন একদিন। বেশ মেক-আপ করেছে ছেলেটি! ওই বিলিতি স্যুটের বদলে ধুতি-চাদর পরিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়িয়ে দিলেই একেবারে কার্তিক ঠাকুর। কাঁচরাপাড়ার মনোতোষ ওরফে চিনুর চেহারা কতকটা ওইরকমই ছিল বটে; বেড়ে ফীমেল পার্ট করত চিনু!

পটলবাবু এবার পাশের ভদ্রলোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'আর পরিচালকটির নাম কী মশাই?'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি তাও জানেন না? উনি যে বরেন মল্লিক—তিনখানা ছবি পর পর হিট করেছে!'

যাক। কতগুলো দরকারী জিনিস জানা হয়ে গেল। নইলে গিন্নী যদি জিগ্যেস করতেন কার ছবিতে কার সঙ্গে অভিনয় করে এলে, তাহলে মুশকিলেই পড়তেন পটলবাবু।

নরেশ একভাঁড় চা নিয়ে পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন স্যার, গলাটা একটু ভিজিয়ে আলগা করে নিন। আপনার ডাক পড়ল বলে!'

পটলবাবু এবার আসল কথাটা না বলে পারলেন না।

'আমার ডায়ালগটা যদি এই বেলা দিতেন তো —'

'ডায়ালগ? আসুন আমার সঙ্গে।'

নরেশ তেপায়া যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেল, পিছনে পটলবাবু।

'এই শশাঙ্ক!'

একটি হাফশার্ট-পরা ছোকরা এগিয়ে এল নরেশের দিকে। নরেশ তাকে বলল, 'এই ভদ্রলোক ওঁর ডায়ালগ চাইছেন। একটা কাগজে লিখে দে তো। সেই ধাক্কার ব্যাপারটা...'

শশাঙ্ক পটলবাবুর দিকে এগিয়ে এল।

'আসুন দাদু...এই জ্যোতি, তোর কলমটা একটু দে তো। দাদুকে ডায়ালগটা দিয়ে দিই।'

জ্যোতি ছেলেটি তার পকেট থেকে একটা লাল কলম বার করে শশাঙ্কর দিকে এগিয়ে দিল। শশাঙ্ক তার হাতের খাতা থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে কলম দিয়ে তাতে কী জানি লিখে কাগজটা পটলবাবুকে দিল।

পটলবাবু কাগজটার দিকে চেয়ে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে—'আঃ'।

আঃ?

পটলবাবুর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কোটটা খুলে ফেলতে পারলে ভালো হয়। গরম হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠেছে।

শশাঙ্ক বলল, 'দাদু যে গুম মেরে গেলেন? কঠিন মনে হচ্ছে?'

এরা কি তাহলে ঠাট্টা করছে? সমস্ত ব্যাপারটাই কি একটা বিরাট পরিহাস? তাঁর মতো নিরীহ নির্বিবাদী মানুষকে ডেকে এনে এত বড় শহরের এত বড় রাস্তার মাঝখানে ফেলে রংতামাশা? এত নিষ্ঠুরও কি মানুষ হতে পারে?

পটলবাবু শুকনো গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন বলুন তো?'

'শুধু "আঃ"? আর কোন কথা নেই?'

শশাঙ্ক চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী দাদু? এ কি কম হল নাকি? এ তো রেগুলার স্পীকিং পার্ট! বরেন মল্লিকের ছবিতে স্পীকিং পার্ট—আপনি বলছেন কী মশাই? আপনি তো ভাগ্যবান লোক মশাই! জানেন, আমাদের এই ছবিতে আজ অবধি প্রায় দেড়শ লোক পার্ট করে গেছে যারা কোন কথাই বলে নি। শুধু ক্যামেরার সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। অনেকে আবার হাঁটেও নি, স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকেছে। কারুর কারুর মুখ পর্যন্ত দেখা যায় নি। আজকেও দেখুন না—এই যে ওঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন, ল্যাম্পপোস্টটার পাশে; ওঁরা সবাই আছেন আজকের সীনে, কিন্তু একজনেরও একটিও কথা নেই। এমনকি আমাদের যে নায়ক—চঞ্চলকুমার—তারও আজ কোন ডায়ালগ নেই। কেবলমাত্র আপনার কথা, বুঝেছেন?'

এবার জ্যোতি বলে ছেলেটি এগিয়ে এসে পটলবাবুর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'শুনুন দাদু—

ব্যাপারটা বুঝে নিন। চঞ্চলকুমার হলেন এই আপিসের বড় চাকুরে। সীনটায় আমরা দেখাচ্ছি যে আপিসে একটা ক্যাশ ভাঙার খবর পেয়ে উনি হন্তদন্ত হয়ে এসে দৌড়ে আপিসে ঢুকছেন। ঠিক সেই সময় সামনে পড়ে গেছেন আপনি—একজন পেডেস্ট্রিয়ান—বুঝেছেন? লাগছে ধাক্কা—বুঝেছেন? আপনি ধাক্কা খেয়ে বলছেন 'আঃ', আর চঞ্চল আপনার দিকে দৃক্‌পাত না করে ঢুকে যাচ্ছে আপিসে। আপনাকে অগ্রাহ্য করাতে তার মানসিক অবস্থাটা ফুটে বেরুচ্ছে—বুঝেছেন? ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট ভেবে দেখুন!'

এবার শশাঙ্ক এগিয়ে এসে বলল, 'শুনলেন তো? যান, এবার একটু ওদিকটায় যান দিকি! এদিকটায় ভিড় করলে কাজের অসুবিধে হবে। আরেকটা শট্ আছে, তারপর আপনার ডাক পড়বে।'

পটলবাবু আস্তে আস্তে আবার পানের দোকানটার দিকে সরে গেলেন। ছাউনির তলায় পৌঁছে হাতের কাগজটার দিকে আড় দৃষ্টিতে দেখে আশপাশের কেউ তাঁর দিকে দেখছে কিনা দেখে কাগজটা কুণ্ডলী পাকিয়ে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আঃ!'

একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পটলবাবুর বুকের ভিতর থেকে উপরে উঠে এল।

শুধু একটি মাত্র কথা—কথাও না, শব্দ—আঃ!

গরম অসহ্য হয়ে আসছে। গায়ের কোটটার মনে হয় যেন মনখানেক ওজন। আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না; পা অবশ হয়ে গেছে।

পটলবাবু এগিয়ে গিয়ে পানের দোকানের ওদিকের আপিসটার দরজার সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। সাড়ে-নটা বাজে। করালীবাবুর বাড়িতে শ্যামাসংগীত হয় রোববার সকালে; পটলবাবু নিয়মিত গিয়ে শোনেন। বেশ লাগে। সেইখানেই যাবেন নাকি চলে? গেলে ক্ষতিটা কী? এইসব বাজে, খেলো লোকের সংসর্গে রবিবারের সকালটা মাটি করে লাভ আছে কিছু? আর অপমানের বোঝাটাও যে বইতে হবে সেই সঙ্গে।

'সাইলেন্স!'

ছুর্! নিকুচি করেছে তোর সাইলেন্সের। যা-না কাজ, তার বত্রিশ গুণ ফুটুনি আর ভড়ং। এর চেয়ে থিয়েটারের কাজ—

থিয়েটার···থিয়েটার···

অনেক কাল আগের একটা ক্ষীণ স্মৃতি পটলবাবুর মনের-মধ্যে জেগে উঠল। একটা গম্ভীর সংযত অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বরে বলা কতগুলো অমূল্য উপদেশের কথা··· 'একটা কথা মনে রেখো পটল। যত ছোট পার্টই তোমাকে দেওয়া হোক, তুমি জেনে রেখো তাতে কোন অপমান নেই। শিল্পী হিসেবে তোমার কৃতিত্ব হবে সেই ছোট্ট পার্টটি থেকেও শেষ রসটুকু নিংড়ে বার করে তাকে সার্থক করে তোলা। থিয়েটারের কাজ হল পাঁচজনে মিলেমিশে কাজ। সকলের সাফল্য জড়িয়েই নাটকের সাফল্য।'

পাকড়াশী মশাই দিয়েছিলেন এ উপদেশ পটলবাবুকে। গগন পাকড়াশী। পটলবাবুর নাট্যগুরু

ছিলেন তিনি। আশ্চর্য অভিনেতা ছিলেন গগন পাকড়াশী, অথচ দম্ভের লেশমাত্র ছিল না তাঁর মনে। ঋষিতুল্য মানুষ, আর শিল্পীর সেরা শিল্পী।

আরো একটা কথা বলতেন পাকড়াশী মশাই—'নাটকের এক-একটি কথা হল এক-একটি গাছের ফল। সবাই নাগাল পায় না সে-ফলের। যারা পায় তারাও হয়তো তার খোসা ছাড়াতে জানে না। কাজটা আসলে হল তোমার — অভিনেতার। তোমাকে জানতে হবে কী করে সে ফল পেড়ে তার খোসা ছাড়িয়ে তার থেকে রস নিংড়ে বার করে সেটা লোকের কাছে পরিবেশন করতে হয়।'

গগন পাকড়াশীর কথা মনে হতে পটলবাবুর মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে এল।

সত্যিই কি তাঁর আজকের পার্টটার মধ্যে কিছুই নেই? একটিমাত্র কথা তাঁকে বলতে হবে—'আঃ'। কিন্তু একটি কথা বলেই কি এক কথায় তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

আঃ, আঃ, আঃ, আঃ, আঃ—পটলবাবু বার বার নানান সুরে কথাটাকে আওড়াতে লাগলেন। আওড়াতে আওড়াতে ক্রমে তিনি একটি আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করলেন। ওই আঃ কথাটাই নানান সুরে নানান ভাবে বললে মানুষের মনের নানান অবস্থা প্রকাশ করছে। চিমটি খেলে মানুষে

যেভাবে আঃ বলে, গরমে ঠাণ্ডা শরবত খেয়ে মোটেই সেভাবে আঃ বলে না। এ-দুটো আঃ একেবারে আলাদা রকমের; আবার আচমকা কানে সুড়সুড়ি খেলে বেরোয় আরো আরেক রকম আঃ। এ ছাড়া

আরো কতরকম আঃ রয়েছে—দীর্ঘশ্বাসের আঃ, তাচ্ছিল্যের আঃ, অভিমানের আঃ, ছোট করে বলা আঃ, লম্বা করে বলা আ—ঃ, চেঁচিয়ে বলা আঃ, মৃদুস্বরে আঃ, চড়া গলায় আঃ, খাদে গলায় আঃ, আবার 'আ'-টা খাদে শুরু করে বিসর্গ টায় সুর চড়িয়ে আঃ—আশ্চর্য! পটলবাবুর মনে হল তিনি যেন ওই একটি কথা নিয়ে একটা আস্ত অভিধান লিখে ফেলতে পারেন।

এত নিরুৎসাহ হচ্ছিলেন কেন তিনি? এই একটা কথা যে একেবারে সোনার খনি। তেমন তেমন অভিনেতা তো এই একটা কথাতেই বাজিমাত করে দিতে পারে!

'সাইলেন্স!'

পরিচালক মশাই ওদিকে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন। পটলবাবু দেখলেন জ্যোতি ছোকরাটি তাঁর কাছেই ভিড় সরাচ্ছে। ছোকরাকে একটা কথা বলা দরকার। পটলবাবু দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

'আমার কাজটা হতে আর কতক্ষণ দেরি ভায়া?'

'অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন দাদু? একটু ধৈর্য ধরতে হয় এসব ব্যাপারে। আরো আধ ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করুন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! অপেক্ষা করব বইকি! আমি এই কাছাকাছিই আছি।'

'দেখবেন আবার সটকাবেন না যেন।'

জ্যোতি চলে গেল।

'স্টার্ট সাউণ্ড!'

পটলবাবু পা টিপে টিপে শব্দ না করে রাস্তা পেরিয়ে উলটো দিকের একটা নিরিবিলি গলিতে ঢুকে পড়লেন। ভালোই হল। হাতে সময় পাওয়া গেছে কিছুটা! এরা যখন রিহার্সাল-টিহার্সালের বিশেষ ধার ধারছে না, তখন তিনি নিজেই নিজের অংশটা কিছুটা অভ্যাস করে নেবেন। গলিটা নির্জন। একে আপিসপাড়া—বাসিন্দা এমনিতেই কম—তায় রবিবার। যে-কজন লোক ছিল সবাই ফ্যারাডে হাউসের দিকে বায়স্কোপের তামাশা দেখতে চলে গেছে।

পটলবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে আজকের এই বিশেষ দৃশ্যের বিশেষ 'আঃ' শব্দটি আয়ত্ত করতে আরম্ভ করলেন। আর সেই সঙ্গে আচমকা ধাক্কা খেলে মুখটা কিরকম বিকৃত হতে পারে, হাতদুটো কতখানি বেঁকে কিরকম ভাবে চিতিয়ে উঠতে পারে, আঙুলগুলো কতখানি ফাঁক হতে পারে, আর পায়ের অবস্থা কিরকম হতে পারে—এই সবই একটা কাঁচের জানালায় নিজের ছায়া দেখে ঠিক করে নিতে লাগলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই পটলবাবুর ডাক পড়ল; এখন আর তাঁর মনে কোন নিরুৎসাহের ভাব নেই। উদ্বেগও কেটে গেছে তাঁর মন থেকে। রয়েছে কেবল একটা চাপা উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ; তিরিশ বছর আগে স্টেজে অভিনয় করার সময় একটা বড় দৃশ্যে নামবার আগে যে ভাবটা তিনি অনুভব করতেন, সেই ভাব।

পরিচালক বরেন মল্লিক পটলবাবুকে কাছে ডেকে বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। আমি প্রথমে বলব "স্টার্ট সাউণ্ড"। তার উত্তরে ভেতর থেকে সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট বলবে "রানিং"। বলামাত্র ক্যামেরা চলতে আরম্ভ করবে। তারপর আমি বলব "অ্যাকশন"। বললেই আপনি ওই থামের কাছটা থেকে এইদিকে হেঁটে আসতে শুরু করবেন, আর নায়ক এই গাড়ির দরজা থেকে যাবে ওই আপিসের গেটের দিকে। আন্দাজ করে নেবেন যাতে ফুটপাথের এই এরকম জায়গাটায় কলিশনটা হয়। নায়ক আপনাকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে যাবে আপিসে, আর আপনি বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বলে আবার হাঁটতে শুরু করবেন। কেমন?'

পটলবাবু বললেন, 'একটা রিহার্সাল…?'

'না না,' বরেনবাবু বাধা দিলেন। 'মেঘ করে আসছে মশাই। রিহার্সালের টাইম নেই। রোদ থাকতে থাকতে নেওয়া দরকার শট্‌টা।'

'কেবল একটা কথা…'

'আবার কী?'

গলিতে রিহার্সাল দেবার সময় পটলবাবুর একটা আইডিয়া মাথায় এসেছিল, সেটা সাহস করে বলে ফেললেন।

'আমি ভাবছিলাম—ইয়ে, আমার হাতে যদি একটা খবরের কাগজ থাকে, আর আমি যদি সেট পড়তে পড়তে ধাক্কাটা খাই…মানে, অন্যমনস্কতার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে—'

বরেন মল্লিক তাঁর কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, 'বেশ তো, ও মশাই, আপনার হাতে যুগান্তরটা এই ভদ্রলোককে দিন তো।…হ্যাঁ। এইবার ওই থামের পাশে আপনার জায়গায় গি রেডি হয়ে যান। চঞ্চল, তুমি রেডি?'

গাড়ির পাশ থেকে নায়ক উত্তর দিলেন, 'ইয়েস স্যার।'

'গুড। সাইলেন্স!'

বরেন মল্লিক হাত তুললেন, তারপর হঠাৎ তক্ষুনি হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওহো-হ এক মিনিট। কেষ্টো, ভদ্রলোককে একটা গোঁফ দিয়ে দাও তো চট করে। ক্যারেক্টারটা পুরো আসছে না।'

'কিরকম গোঁফ স্যার? ঝুঁপো, না চাড়া-দেওয়া, না বাটারফ্লাই? রেডি আছে-সবই।'

'বাটারফ্লাই, বাটারফ্লাই। চট করে দাও, দেরি কোরো না।'

একটি কালো বেঁটে ব্যাকব্রাশ-করা ছোকরা পটলবাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতের একটা টি বাক্স থেকে একটা ছোট্ট চৌকো কালো গোঁফ বার করে আঠা লাগিয়ে পটলবাবুর নাকের নী সেঁটে দিল।

পটলবাবু বললেন, 'দেখো বাপু, ধাক্কাধুক্কিতে খুলে যাবে না তো?' ছোকরা হেসে বলল, 'ধাক্কা কেন? আপনি দারা সিংএর সঙ্গে কুস্তি করুন না—তাও খুলবে না।'

লোকটার হাতে একটা আয়না ছিল; পটলবাবু টুক করে তাতে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলেন। সত্যিই তো! বেশ মানিয়েছে তো! খাসা মানিয়েছে। পটলবাবু পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে মনে মনে তারিফ না করে পারলেন না।

'সাইলেন্স! সাইলেন্স!'

পটলবাবুর গোঁফ পরা দেখে দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল, বরেন মল্লিকের হুঙ্কারে সেটা থেমে গেল।

পটলবাবু লক্ষ্য করলেন সমবেত জনতার বেশির ভাগ লোকই তাঁরই দিকে চেয়ে আছে।

'স্টার্ট সাউণ্ড!'

পটলবাবু গলাটা খাঁকরিয়ে নিলেন। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—পাঁচ পা আন্দাজ হাঁটলে পর টলবাবু ধাক্কার জায়গাটায় পৌঁছবেন। আর চঞ্চলকুমারের হাঁটতে হবে বোধহয় চার পা। সুতরাং দুনে যদি একসঙ্গে রওনা হন, তাহলে পটলবাবুকে একটু বেশি জোরে হাঁটতে হবে, তা না হলে—

'রানিং।'

পটলবাবু খবরের কাগজটা তুলে মুখের সামনে ধরলেন। দশ আনা বিরক্তির সঙ্গে ছ আনা বিস্ময় শিয়ে আঃ-টা বললে পরেই—

'অ্যাকশন!'

জয় গুরু!

খচ খচ খচ খচ খচ—ঠন্‌ন্‌ন্‌ন্! পটলবাবু হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন। নায়কের মাথার তাঁর কপালের ঠোকাঠুকি লেগেছে। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য জ্ঞানশূন্য করে য়ছে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে আশ্চর্যভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে পটলবাবু আনা বিরক্তির সঙ্গে তিন আনা বিস্ময় ও তিন আনা যন্ত্রণা মিশিয়ে 'আঃ' শব্দটা উচ্চারণ করে জটা সামলে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

'কাট!'

'ঠিক হল কি?' পটলবাবু গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বরেনবাবুর দিকে এগিয়ে এলেন।

'বেড়ে হয়েছে! আপনি তো ভালো অভিনেতা মশাই!···সুরেন, কালো কাঁচটা একবার চোখে য়ে দেখো তো মেঘের কী অবস্থা।'

শশাঙ্ক এসে বলল, 'দাদুর চোট লাগে নি তো?'

চঞ্চলকুমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে এসে বললেন, 'ধন্যি মশাই আপনার টাইমিং! বাপের লিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়—ওঃ!'

নরেশ ভিড় ঠেলে এসে বলল, 'আপনি ওই ছায়াটায় দাঁড়ান একটু। আরেকটা শট্‌ নিয়েই আপনার ব্যাপারটা করে দিচ্ছি।'

পটলবাবু ভিড় ঠেলে ঘাম মুছতে মুছতে আবার পানের দোকানের ছায়াটায় এসে দাঁড়ালেন। মেঘে সূর্য ঢেকে গরমটা একটু কমেছে ; কিন্তু পটলবাবু তাও কোটটা খুলে ফেললেন। আঃ, কী আরাম! একটা গভীর আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির ভাব ধীরে ধীরে তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তাঁর আজকের কাজ সত্যিই ভালো হয়েছে। এতদিন অকেজো থেকেও তাঁর শিল্পীমন ভোঁতা হয়ে যায় নি। গগন পাকড়াশী আজ তাঁকে দেখলে সত্যিই খুশী হতেন। কিন্তু এরা কি সেটা বুঝতে পেরেছে? পরিচালক বরেন মল্লিক কি তা বুঝেছেন? এই সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করার জন্য তাঁর যে আগ্রহ আর পরিশ্রম, তার কদর কি এরা করতে পারে? সে ক্ষমতা কি এদের আছে? এরা বোধহয় লোক ডেকে এনে কাজ করিয়ে টাকা দিয়েই খালাস। টাকা! কত টাকা? পাঁচ, দশ, পঁচিশ? টাকার তাঁর অভাব ঠিকই—কিন্তু আজকের এই যে আনন্দ, তার কাছে পাঁচটা টাকা আর কী?...

মিনিট দশেক পরে নরেশ পানের দোকানের কাছে পটলবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে ভদ্রলোককে ার পেল না। সে কী, টাকা না নিয়েই চলে গেল নাকি লোকটা? আচ্ছা ভোলা মন তো!

বরেন মল্লিক হাঁক দিলেন, 'রোদ বেরিয়েছে! সাইলেন্স! সাইলেন্স!...ওহে নরেশ, চলে এসো, ড় সামলাও!'

ডেনিয়েল বোভে বলে একজন ইতালিয়ান অধ্যাপক কয়েক বছর আগে শারীর- ওভেষজ-বিদ্যার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এঁর মতে পৃথিবীতে খাদ্যাভাবের একটা সুরাহা হয়তো হয়ে যাবে। কেননা আজকাল যেমন কেবল চাষবাস, গোপালন, মাছধরা ইত্যাদির উপরে আমরা খাদ্যের জন্য নির্ভর করি, চিরকাল তা করতে হবে না। ক্রমে ক্রমে চাষবাসের চেয়ে রাসায়নিক উপায়ের উপর বেশি করে নির্ভর করা যাবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেসব খাদ্যগুণের দরকার, এরই মধ্যে বহু রাসায়নিক গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে সেগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। একদিক থেকে মাছ মাংস তরকারি ফল শস্য খাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভালো; কারণ ওইসব জিনিস থেকে এতটুকু পুষ্টি পেতে হলে রাশি রাশি খাবার খেতে হয়; পয়সা খরচ, হজমের কষ্ট। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে তৈরি খাবারে কেবলমাত্র পুষ্টিটুকুই থাকবে, অকেজো উপকরণ থাকবে না। তার মানে, বড়ির মতো এতটুকু খেলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হবে।

এর উপকারিতার কথা একবার ভেবে দেখো। এরোপ্লেনে নিয়ে যাবার সময়, বিশেষ করে মহাশূন্যে যাত্রা করার সময়, ছোট এক কৌটো বড়ি নিলেই হবে—ওজন কম, জায়গা জুড়ে থাকে না, রাঁধতে হয় না, বদহজমের ভয় নেই, অপচয় হয় না।

এই রকম খাদ্যপ্রাণের বড়ি বা ওষুধ তৈরির উপাদান যথেষ্ট রয়েছে—গাছপালা, সামুদ্রিক জীব, শ্যাওলা, ছ্যাতলা, এমনকি হয়তো পোকামাকড় থেকেও প্রচুর পরিমাণে যোগাড় করা সম্ভব হবে।

এ কথা শুনে ভাবিত হবার কারণ নেই। বড়ি আবিষ্কার হলেও, চপ কাটলেট কেক পান্তুয়া রান্না হবেই। তাতে যদি যথেষ্ট পুষ্টি না থাকে সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা সুস্বাদু বড়িও খেয়ে ফেলতে পারবে।

কোলা ব্যাঙ, ঢোঁড়া সাপ আর আমি

জীবন সর্দার

ছোট্ট পুকুর। পুকুরপাড়ে নারকেল গাছ। একসার। নারকেল গাছে ঠেস দিয়ে, পুকুরে ছিপ ফেলে, সকাল থেকে বসে ছিলাম।

আকাশের এ কাঁধ থেকে সূর্য ওই কাঁধে নেমে গেল। এর মধ্যে মাছ একটাও উঠল না। ছিপ গুটিয়ে উঠতে যাব—এমন সময় কাণ্ডটা ঘটল :

পুকুরঘাটে পেটমোটা একটা কোলা ব্যাঙ কোথা থেকে এসে বসল। কয়েকটা জলফড়িং ঘাটে জড়োকরা এঁটো বাসনগুলোর আশেপাশে উড়ছিল। ব্যাঙের লক্ষ্য যে তাদের দিকে বুঝতে পারলাম

গলা তুলে ব্যাঙটা বাসনগুলোর কাছে এসে বসল। একটা ফড়িং, কী কারণে জানি না, ব্যাঙটা নাকের ডগার কাছ দিয়ে একবার উড়ে গেল। ব্যাঙটা স্থির। চোখ দুটো নড়ল শুধু। আড়চো সে দেখে নিল ফড়িংগুলো কতদূরে।

আর একবার ফড়িংটা এল। কিন্তু ফিরে যেতে পারল না। একটা শব্দ শুনলাম—'ফড়াত'। ব্যাঙে জিভ টেনে নিয়েছে ফড়িংটাকে মুখের ভিতর। তার ঠোঁটের দুপাশে ফড়িঙের চারটে ডানা একপলকে জন্যে দেখলাম শুধু। ব্যাঙের গলার কাছটা কিছুক্ষণ ওঠানামা করল।

আমি বসে ছিলাম। ব্যাঙটা বসে ছিল। ফড়িংগুলো উড়ছিল। ব্যাঙটা শুধু ফড়িং দেখছি আমি ব্যাঙ ফড়িং ছাড়াও আরও কিছু দেখছিলাম। ব্যাঙটা যদি তা দেখতে পেত তবে ওর সর্বনাশ হত না।

ঘাটের কাছে একটা ছোট্ট কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল। তার গা ঘেঁষে ওত পেতে ছিল ঢোঁ সাপটা। ওকে আমি প্রায়ই দেখি পায়ের শব্দে ঘাটের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে।

চারদিক শব্দহীন। তাই সাপটা এসেছে। এসে দেখে—ব্যাঙটা। তাই হয়তো ফিরে চায় নি।

ব্যাঙ দেখছিল ফড়িংগুলোকে। সাপ দেখছিল ব্যাঙটাকে। আমি দেখছিলাম সাপ, ব্যাঙ, ফড়ি

সাপের চোয়াল

সবগুলোকে। ফড়িংগুলো উড়ে উড়ে একটু দূরে সরে গেল। ব্যাঙটা লাফিয়ে তাদের আরও একটু কাছে গেল।

আর সেই মুহূর্তেই—ঠিক সেই মুহূর্তেই—বিন্দুওয়ালা হলুদ একখানা তীর বিদ্যুৎবেগে ব্যাঙটাকে গেঁথে ফেললে। আমি চমকে উঠলাম।

তীর নয়। ঢোঁড়া সাপ। ব্যাঙটাকে মুখে করে সাপটা এঁকেবেঁকে সাঁতরে পুকুরের অন্যপাশে ঝোপের মধ্যে চলে গেল।

ব্যাঙটা চেষ্টা করলে কি কোনোমতেই সাপের মুখ থেকে পালাতে পারত না?

আগে থেকে দেখতে পেলে হয়তো পারত। কিন্তু সাপের মুখ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালানো অসাধ্য।

আমাদের যেমন উপর-নীচে দু পাটি সোজা সোজা দাঁত, সাপের দাঁত তেমন নয়। মুখের ভিতর দিকে বঁড়শির মতো বাঁকানো ওদের দাঁত। দু পাটি নয়, উপর-নীচে প্রায় সাপেরই কয়েক সারি দাঁত। সাপের মুখে তাই ঢোকা সহজ, বেরোনো অসম্ভব।

টিকটিকি, গিরগিটি, কচ্ছপ বা কুমির আর অন্য সব সরীসৃপদের মতো সাপেরও হাত-পা নেই। মুখ দিয়েই তাকে শিকার ধরতে হয়। চলতে হয় বুকে ভর দিয়ে।

চোখে সাপ ভালো দেখতে পায় না। চলতেও পারে না তাড়াতাড়ি। তাই দাঁতের গঠন অমন-ধারা হয়ে তার পক্ষে ভালোই হয়েছে। শিকার সহজে ফসকায় না। আরও ভালো হয়েছে চোয়ালটা। বড় ছোট করতে পারে ইচ্ছেমতো। অনেকটা হাঁ করে সে অনেক বড় শিকার ধরতে পারে।

যে শিকারই ধরুক না কেন, ছাল-চামড়া হাড়-মাস সব তাকে গিলে ফেলতে হয়।

ঈ বাব্বা!

কিচ্ছু ভেবো না। তার পেটে হজমের এমন রস রয়েছে যে ওই স-অ-ব সে হজম করতে পারে।

সব সে হজম করতে পারলেও জ্যান্ত প্রাণী ছাড়া সাপ আর কিছু খায় না। সাপ কী খায়, তার বেশী বড় হবে না। কোন সাপই শাকসবজী খায় না। ইঁদুর খরগোশ কাঠবিড়ালি থেকে শুরু। পাখি, পাখির ডিম, মাছ, ব্যাঙ, পোকামাকড়—সব তাদের ভোজে লাগে। তবে সব সাপ একই

ধরনের খাবার খায় না। কয়েক জাতের সাপ সাপই খেতে ভালোবাসে। অজগর সাপের পেটে বনের হরিণ শুয়র বানর প্রায়ই হজম হয়।

একবার খেয়ে সাপ বেশ কিছুক্ষণ (হয়তো কয়েকদিন) না খেয়ে থাকতে পারে। কী করে, বলছি।

সাপ শীতল-রক্তের প্রাণী বলে একবার খেলে ওদের শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি 'শক্তি' জমে যায়। ওইটুকু খরচ হতে যে সময় লাগে সে সময়টুকু ওদের আর খাবার খোঁজবার ইচ্ছে থাকে না। যেমন, পরিমাণে অল্প মিষ্টি খেয়েই আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় 'শক্তি' উঠে এলে আর কিছু খাবার ইচ্ছে থাকে না। পেট না ভরলেও।

শীতল-রক্তের প্রাণী হওয়ার জন্য ওদের মস্ত এক অসুবিধা। না শীত না গরম, কোনো কালেই ওরা স্বস্তিতে থাকতে পারে না। সমস্ত শীত ওরা গর্তে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। একেই বলে শীত-ঘুম।

সোজাসুজি সূর্যের কিরণ সাপ সহ্য করতে পারে না। গরমের দিনে তারা গর্তে, ফাটলে বা গাছের গুঁড়ির নীচে, যেখানেই একটু ছায়া পায় সেখানেই, ঢুকে পড়ে। রাত্রের ঠাণ্ডায় খাবারের খোঁজে সেখান থেকে আবার বেরিয়ে আসে।

রাতের বেলায় সাপের খাবার খুঁজতে বেরোবার অন্য আরও একটা কারণ থাকতে পারে। দিনের বেলা তারা ভালো করে দেখতে পায় না।

পরের বার সাপের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলব, যা পড়ে, সাপকে দেখে তোমাদের ইচ্ছে হবে না—

'তেড়ে মেরে ডাণ্ডা
করে দিই ঠাণ্ডা।'

●
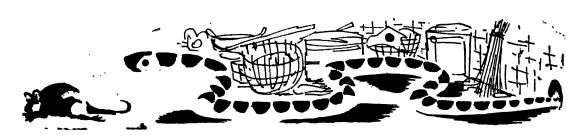
যা দেখেছি (পড়ুয়াদের চোখে দেখা বিবরণ) :

'আমি সাড়ে দশটায় স্কুলে যাই। যাবার পথে দেখি রাস্তার পাশের ডাস্টবিন থেকে কুকুরেরা খাবার খুঁজে খাচ্ছে।···মা যে চাঁপাগাছটা আগের বাড়িতে পুঁতেছিলেন, সেটা দিন দিন বড় হচ্ছে।'—অরূপ মজুমদার (বয়স ৬) পড়ুয়া নঃ ৩৬।

'আমি দেখেছি কুকুরের দাঁত ছুঁচলো ও ধারালো। নখ অল্প অল্প ধারালো, বাইরে বার-করা। বিড়ালের নখের মতো থাবার মধ্যে ঢোকানো নয়। তাই যখন হাঁটে অল্প শব্দ হয়।'—সীমা মজুমদার (বয়স ৮)। পড়ুয়া নঃ ৫১।

(১) আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ময়ূর আছে। তার পেখমের পালক গুনে দেখলাম মোট ১৮টা। (২) একটা পরীক্ষা-নলে জল দিয়ে তাতে একটা মানি প্লাণ্ট রেখেছিলাম। তিন দিন বাদে তার গাঁট থেকে সাদা রঙের শেকড় বেরিয়েছে দেখলাম। মাটিতে থাকতে শিকড় হত ধূসর রঙের।—অশোক চট্টোপাধ্যায়, পড়ুয়া নঃ ৩৭।

'পরীক্ষা করে দেখলাম আরশোলার মুখের ছুপাশের ছুটি শক্ত চোয়ালের ভেতর দিকটা করাতের মতো খাঁজ কাটা'।—সমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পড়ুয়া নঃ ১৪।

জানতে চাই

চড়াই পাখি সাধারণত কতদিন বাঁচে ? কুকুরেরা ঘাস খায় দেখেছি, কেন খায় ?—সমীপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

লজ্জাবতী লতায় হাত দিলে ওর পাতা কেন কুঁকড়ে যায়?—কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়।

কেঁচোর কি চোখ আছে ?—দীপক ঘোষ।

কোকিলকে বসন্তকাল ছাড়া অন্যসময়ে দেখা যায় না কেন ?

'চিরহরিৎ বৃক্ষের' পাতা চিরকাল সবুজ থাকে ? সে গাছের পাতা কি ঝরে না ?—প্রবীরকুমার ঘোষ।

নতুন পড়ুয়া

(৪২) বিজনকুমার বাগচী, নয়া দিল্লী। (৪৩) ইন্দ্রাণী মজুমদার, পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা। (৪৩-৪৪) সুবীর ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিহি এণ্টালি রোড, কলকাতা। (৪৫) গৌতম রায়, একডালিয়া প্লেস, কলকাতা। (৪৬) প্রবীরকুমার ঘোষ, ইটাচুনা, হুগলী। (৪৭) বিশ্বাবসু দাস, শিলং। (৪৮) সর্বাণী রায়, এলাহাবাদ। (৪৯) শক্তিব্রত ত্রিপাঠী, দেভোগ, মেদিনীপুর। (৫০) স্বাতী ভট্টাচার্য, বেচু চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা। (৫১) সীমা মজুমদার, গড়িয়াহাট রোড সাউথ, কলকাতা।

॥ চার ॥

ভুতো উদ্‌গ্রীব হয়ে, যাকে বলে দাঁত কপিয়ে বসে থাকে।

কিন্তু রাখালের আর হাত বাড়িয়ে কামড় খাবার তেমন উৎসাহ দেখা যায় না।

ভুতোকে রীতিমত হতাশ করে দোকানের মালিককে—আরে দোকানের মালিক নয় তো কে সে—রাখাল জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা বাপু, এই খাবারের দোকানটি যে সাজিয়ে বসে আছ,—কেন বলতে পার!

কেন? বাঃ, লোকে খাবে বলে।

লোকে খাবে বলে!—রাখাল একরকম দাঁত খিচিয়েই ওঠে—আহাম্মুক আর কাকে বলে। লোকে খাবে বলে তুমি দানছত্র খুলে ভূতের বেগার খেটে মরছ। যে-সে হুট করে ঢুকছে, যা খুশি খেয়ে চলে যাচ্ছে, তোমায় তো কথাটি পর্যন্ত কইতে দেখলাম না। সোনা-রুপোর থালাবাটিগুলো পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে তুমি রাজী!

দোকানীর মুখ দিয়ে এবার আর কথাই বার হয় না, আর সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ওষুধ বোধহয় ধরেছে! রাখাল রীতিমত বক্তৃতা শুরু করে দেয়—দুদিন দোকানটি আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখো দিকি! সকলের আহ্লাদপনা আমি ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। এ ভালমানুষের কাল নয়, বুঝেছ বাবু,—ভালমানুষের আজকাল ভালই নেই। নিজের গণ্ডাটি না তুললে সবাই ঠকিয়ে যাবে।

উৎসাহের মাথায় রাখাল হয়তো আরো অনেক কিছু বলত, কিন্তু সবাই হঠাৎ হেসে ওঠে—তার অমন বক্তৃতাটা শুরুতেই মাটি করে দেয়।

হাসি! এত হাসি কিসের—রাখাল আবার মারমুখী হয়ে ওঠে।—ভাল কথা বললাম তা হেসেই উড়িয়ে দেওয়া হল, না! বলি এটা পাগলাগারদ না কী! একটা মানুষের মতো মানুষ এখানে নেই।

একজন হেসে বলে—কেন, আমরা কি মানুষ নই!

হ্যাঁ,—রাখাল অবজ্ঞাভরে বলে—তোমরা আবার মানুষ! মানুষের মতো চেহারা হলেই বুঝি মানুষ হয়। বলি, কী আছে তোমাদের? সবাই দাঁত বার করে হাসতেই জান। রাগের চোটে রাখালের মুখ দিয়ে যেন আপসোসের মতো বেরিয়ে যায়—এই যে রাতদুপুরে আমরা চুরি করতে এলাম, তা একটা পাহারাওলারও চুলের টিকি তো দেখা গেল না। হত আমাদের ওখানে তো এতক্ষণে দেখতে থানা পুলিশ দারোগা মিলে কী কাণ্ডটা বাধিয়ে তুলত!

থানা পুলিশ দারোগা !—লোকগুলো এবার সত্যি হতভম্ব হয়ে তাকায়। দোকানী তো—আলবাত সে দোকানী—জিজ্ঞেস করে,—দারোগা পুলিশ ! সে আবার কী ! কী করে তারা !

শোনো কথা !—রাখালকে এবার ভুতোকেই মুরুব্বি মানতে হয়—দারোগা পুলিশ কী করে জান না। ডাণ্ডা দিয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা রাখে।

দোকানীকে ধরে এবার সে বোঝাবার চেষ্টা করে—এই ধরো তোমার এই দোকানটি যদি কেউ লুট করতে চায়, তাহলে কে সামলাবে শুনি ?

কে আবার লুট করতে চাইবে ?

নাঃ, মাথা আর ঠাণ্ডা রাখা যায় না এতে, তবু রাখাল জোর করে নিজেকে সামলে বলে,—কে লুট করতে না চাইবে বলো,—এমন দোকান, এমন সব দামী দামী মাল—কার না লোভ হয় শুনি ?

দোকানীর মুখ দেখে তবু মনে হয় ব্যাপারটা এখনও তার বোধগম্য হয় নি।

রাখাল আরো ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করে। তার পাশের লোকটিকে দেখিয়ে বলে, এই ধরো—কী নাম তোমার হে বাপু !

দোকানী নিজে থেকে জানিয়ে দেয়,—আ রে, ওকে চেন না,—ও আমাদের তিনু কুমোর ! ওর হাতের কাজ যদি......

থাক থাক—তোমার আর পরিচয় ব্যাখ্যান করতে হবে না—রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে,—এই তিনু কুমোরেরই যদি একদিন লোভ হয় তোমার দোকানটির ওপর।

বা রে, তা হবে কেন ! ও তো কুমোর !

কুমোর বলতে আর ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নয় রে বাপু। মাটি ঘেঁটে ঘেঁটে অরুচি যদি ধরে একদিন—

দোকানী তার কথার মাঝখানে বলে ওঠে, তা আবার ধরে নাকি !

ধরে না !—রাখাল আবার খেঁকিয়ে ওঠে। ও চিরকাল কাদা ঘেঁটেই মরবে আর তুমি মজা করবে খাবারের দোকানে !

কী যে বল !—দোকানী এবার হেসে ওঠে—কাদা ঘেঁটে মজা পায় বলেই তো ও কুমোর ! আর অরুচি ধরলে ওর খাবারের দোকানে বসতে কতক্ষণ !

রাখাল এবার হতাশভাবে চারিদিকে তাকায়। এ পাগলদের দেশে একটা কি মানুষের মতো মানুষ নেই গো।

তার প্রার্থনা পূরণ করতেই বুঝি সেই সময় দোকানে একটি অদ্ভুত চেহারার লোকের আবির্ভাব হয়।

লোকটার চেহারা যত না অদ্ভুত তার চেয়ে অপরূপ তার পোশাক। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কালো ডোরা-কাটা অদ্ভুত আলখাল্লা। গোঁফকামানো মুখে কাস্তের মতো বাঁকানো পাকানো দাড়ি।

লোকটা গম্ভীর মুখে এসে দোকানের একটা কোণে বসে। হাঁক দেয়—কে আছ, জলদি।

একজন পাশ থেকে রাখালের কানে কানে বলে,—ওই তোমাদের আর-এক জুড়িদার এসেছে।

আমাদের জুড়িদার !

হ্যাঁ গো, ওই তো আমাদের দিকদার, ফলবাগানের সেরা গুণী। বেশ ছিল বেচারা, কিন্তু নতুন ফলের চারা খুঁজতে সেই-যে নদীপারের জঙ্গলে গিয়ে পালাজ্বর ধরিয়ে আনল, তারপর থেকেই কেমন মাথাটা গেছে বিগড়ে। তোমাদের মতো যত আবোলতাবোল বকে। কিছু বলতে গেলেই মারমুখো।

বটে! রাখাল মনে মনে কী যেন একটা মতলব ভেঁজে বলে,—তোমাদের দিকদারের সঙ্গে একটু পরিচয় করতে হচ্ছে তো তাহলে!

লোকগুলো হেসে উঠে বলে, —বেশ তো, করো না পরিচয়, তোমাদের মিলবে ভাল।

রাখাল আর বাক্যব্যয় না করে নিজে থেকে উঠে গিয়ে দিক্‌দারের কাছে দাঁড়ায়। তারপর অমায়িক-ভাবে হেসে বলে,—শুনছেন মশাই!

ভুরু কুঁচকে গোমড়া মুখে দিকদার রাখালের দিকে একবার তাকায়, তারপর মুখ ভেংচে বলে,—শুনছেন! কী শুনব শুনি, যত সব ষাঁড়মার্কা উজবুক! আগে বলো, হেই দিকদার!

রাখাল রীতিমত ভড়কে যায়।

দিকদার আবার ধমকে ওঠে, —কই, চুপ করে আছ যে! বলো—হেই দিকদার!

রাখাল ভয়ে ভয়ে বলে—হেই দিকদার!

দিকদার আবার ধমকে ওঠে, বলো—হেই দিকদার

দিকদার বললে, কে রে তোরা? কোত্থেকে এইচিস? ইদিকে আয়, আমার সামনে এসে জবাব দে।

ওরা ভুঁইতরাসি গাঁয়ের কথা বললে। দিকদার একটু ভেবে আবার শুধোয়, কী কাজ জানিস তোরা? করতিস কী?

ভুতো রাখালের মুখের দিকে চায়। রাখাল বুক ফুলিয়ে বলে, করব আবার কী? চুরি করতাম। সিঁদেল চোর।

তাই শুনে দোকানের মধ্যে আর যারা বসে ছিল তারা সব উঠে এসে ওদের চার দিকে ভিড় করে দাঁড়াল। চুরি? সে আবার কী? কই সিঁদেল চোর? এ দুটোকে তো সাধারণ মানুষের মতন দেখা যাচ্ছে।

রাখাল খুব জাঁক করে বলে যেতে লাগল, চুরি করব না তো কি না খেয়ে মরব? ধরা যখন পড়েছি, তখন জেলও খেটেছি। কী বলতে চাও, বলো। আমরা কিছুকে ভয় পাই নে।

দিকদারই আগে কথা বলল,—ধমকে বলল, এখানে তোমাদের ওসবের সুবিধে নেই বলে রাখলাম।

এতক্ষণে ভুতো কথা বলল, পাশের লোকটিকে বলল, নেই আবার কী? ঐ তো হোটেলখানা থেকে গোছা গোছা তুলে নিয়ে গেলেই হল।

এইবারে শ্রোতারা যেন কথাটার মানে বুঝল। একজন খুশী হয়ে বললে, তাই বল! এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গাতে নিয়ে যাওয়াকে বুঝি চুরি বলে?

ভুতো বললে, ধেত। যার জিনিস তাকে না বলে নিতে হয়, না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিতে হয়।

কেন? কেন?

কেন? নইলে সে দেবে কেন?

শুনে সবাই অবাক! কেন? দেবে না কেন? তোমার দরকার হলেও দেবে না?

রাখাল বললে, আহা, আমাদের দরকার বলে তো আর সব সময় নিচ্ছি নে; নিতে ইচ্ছে হচ্ছে বলেই নিচ্ছি।

তারা বললে, কী করবে নিয়ে? দরকার নেই তো নিয়ে করবে কী?

কেন, খাব-দাব সাজব বেড়াব, একটা ঘোড়া কিনব।

সে তো এমনিও করতে পার, তার জন্যে এক জায়গার জিনিস আর-এক জায়গায় নেবে কেন?

দিকদার উঠে পড়ে বললে, বুঝলে না, ওরা হট্টমালার দেশ থেকে এসেছে। চলো তো তোমরা আমার সঙ্গে, হয়তো কিছু সুবিধে করে দিতে পারি। কিন্তু খাটতে হবে বলে রাখলাম।

ভুতো অমনি লাফিয়ে উঠেছে। রাখাল তার কাছা ধরে টেনে বললে, কত মাইনে দেবে? ক ঘণ্টা খাটতে হবে?

ভিড়ের লোকের বিস্ময়ের সীমা নেই। তারা শুধোয়, মাইনে আবার কী?

রাখাল বিরক্ত হয়ে বলে, মাইনে কী জান না? মাগনা খাটব নাকি?

ততক্ষণে দিকদারের খাওয়া হয়ে গেছে। সেও উঠে পড়েছে। কর্কশ গলায় বললে, এখানে কেউ মাইনে-টাইনে পায় না, এ কি হট্টমালার দেশ পেয়েছ নাকি? আর 'কতক্ষণ খাটব' ও আবার কী কথা? যতক্ষণ পারবে খাটবে। পেট ভরে খেতে পাবে; বালিশ বিছানা পাবে—যেমন আর পাঁচজনে পায়; কাপড়চোপড় যা যা দরকার চেয়ে নেবে। চলো।

সবাই বললে, যাও যাও, দিকদারকে চটিও না। আর অমন বাগান তোমরা বাপের কালেও চোখে দেখ নি। একবার চোখ ভরে দেখে এসো গে।

শেষ পর্যন্ত গেল ওরা, একটা আস্তানা না হলে তো চলে না! আর এদের হাবভাব দেখে মনে হয় সবাই কাজ করে, এমনি এমনি হয়তো কেউ থাকতেই দেবে না।

ভিড় থেকে পাঁচ-সাত জনা ওদের সঙ্গ নিল, তারাও নাকি দিকদারের সঙ্গে ঐ বাগানের কাজ করে।

দিকদার হনহনিয়ে এগিয়ে চলল। কেমন যেন রাশভারী লোকটা—কাজের কথা ছাড়া মুখে দুটো ভালো কথা নেই।

খানিকটা এগিয়ে ভুতো তার পাশের লোকটাকে বললে, কেউ মাইনে পাও না তো চলে কী করে? ওরা না হয় থাকতে খেতে দিল, কাপড়-চোপড়ও দিল। আরো খরচ আছে তো!

সে তো অবাক! আরো খরচ মানে?

রাখাল এরকম বোকার মতন কথা শুনে রেগে গেল।—আরো খরচা থাকে না মানুষের? ধর একদিন বাইস্কোপ দেখবার শখ হল। তার জন্যে টিকিট কিনতে হবে না?

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হেসে ফেলল,—বাইস্কোপ দেখতে আবার পয়সা লাগবে কেন?

র বসে দেখে এলেই পারে। বাগানেই তো বাইস্কোপ আছে। ভুতো রাখাল সত্যি অবাক হয়ে গেল। দেশটা তো মন্দ না। ভুঁইতরাসির লোকরা যে শুধু গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে বাইস্কোপ দেখে তা নয়, র ওপর কষ্ট করে সদরে গিয়ে তবে সে-না দেখতে হয়! মন্দ নয় এ জায়গাটা।

তারা চার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। দিকদার এতদূরে এগিয়ে গেছে যে তাকে আর দেখা যায় না।

[ক্রমশ

ত্রা পাল

স ১৩। অবধায়ক শ্রী আর. এস. পাল, ৬১/জে/১ রাজা ঠাকুর রোড, কলকাতা-৩১, নবম শ্রেণী, জ্ঞান। ডাকটিকিট, ছবি আঁকা, সাঁতার, খেলাধুলা, ল্পের বই পড়া, নাচ, গান (রবীন্দ্রসংগীত), কবিতা বা র লেখা।

ন্দা সরকার

য়স ৮। ১৩১বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২। ল্পের বই, ডাকটিকিট, গান শোনা।

ীপংকর সান্যাল

য়স ৯। ১ মাতৃমন্দির, চেম্বুর; বম্বে-৭১। পঞ্চম মান। ক্রিকেট, ফুটবল, গিটার বাজানো, ডাকটিকিট, ছবি আঁকা, াদুবিদ্যা, যুদ্ধের ছবি দেখা।

রবিন্দ চক্রবর্তী

য়স ১৫। অবধায়ক ডাঃ ডি. এন. চক্রবর্তী, বড়ডুবি, টী এস্টেট, পোঃ ডুমডুমা, আসাম। দার্জিলিং অথবা বোম্বাইয়ের পত্রবন্ধু চাই। ডাকটিকিট, বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ, ক্রিকেট, টেনিস, গল্পের বই পড়া।

মিতালি মিত্র

বয়স ১৩। ৩বি, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৪। অষ্টম শ্রেণী। ডাকটিকিট, গল্পের বই পড়া।

শম্পা দাস

বয়স ১১। অবধায়ক শ্রীরমেন্দ্রনাথ দাস, ১০ কৃপানাথ লেন, কলকাতা-৫। সপ্তম শ্রেণী। গান বাজনা, ডাকটিকিট, কবিতা লেখা, বিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়া, অঙ্ক কষা।

হৈমন্তী মিত্র

বয়স ১৬। অবধায়িকা শ্রীযুক্তা যূথিকা মিত্র, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। উচ্চ মাধ্যমিক কলা। প্রবন্ধ পড়া ও লেখা, গান বাজনা (কলকাতার জয়ন্তী দত্তর পত্রবন্ধু হতে চাই)।

ভাস্কর মিত্র

বয়স ১১। অবধায়িকা শ্রীযূথিকা মিত্র, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। ষষ্ঠ শ্রেণী। ব্যাডমিণ্টন, ক্যারাম, ডাকটিকিট, ছবি আঁকা, ডিটেকটিভ ও যুদ্ধের গল্প পড়া, মহাপুরুষদের জীবনী সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু।

সুবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১২। ৮ ডিহি এণ্টালি রোড, কলকাতা-১৪। অষ্টম শ্রেণী। ক্রিকেট, ফুটবল, ম্যাজিক শেখা, ছবি আঁকা, ট্রানজিস্টার রেডিও সম্বন্ধে আগ্রহশীল।

সৌরেন্দ্র বড়াল

বয়স ১৫। ৭৬/২এ, বিধান সরণি (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) কলকাতা-৬। এই বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। গল্পের বই পড়া, সংগঠনমূলক কাজ, খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গানবাজনা, অভিনয়।

পারমিতা চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১২। ১ সাউথ এণ্ড পার্ক, কলকাতা-২৯। অষ্টম শ্রেণী। ডাকটিকিট, সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, টেনিস।

সোমা মুখোপাধ্যায়

বয়স ১২। অবধায়ক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৯।২৪বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা-১৪। সপ্তম শ্রেণী। রবীন্দ্রসংগীত, গল্পের বই পড়া, অভিনয়, ধাঁধা।

কৃষ্ণা ঘোষ

বয়স ১২। ১৫ সর্দার শঙ্কর রোড, কলকাতা-২৬। সপ্তম শ্রেণী। গানবাজনা, গল্পের বই পড়া, নাচ, ডাকটিকিট, খেলা, অভিনয়।

সলিলকুমার দাস

বয়স ১৪। অবধায়ক শ্রী এইচ. সি. দাস। লিচি গার্ডেন, মজফরপুর-১৮, উত্তর বিহার। হেডফোন, ট্রানজিস্টার রেডিও, টেলিগ্রাফি, নিজের হাতে ছোটখাট জিনিস তৈরী করা। (কলকাতার সলিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রবন্ধু হতে চাই)

বুলু দাস

বয়স ১১। অবধায়ক শ্রী এইচ. সি. দাস। লিচি গার্ডেন, মজফরপুর-১৮, উত্তর বিহার। ছবি আঁকা, গান বাজনা, নাচ।

মিনির দাদা মুকুলের ভারি শখ, সন্ধ্যায় শেয়ালদার ওল্ড মার্কেট থেকে খুঁজে-পেতে সস্তায় কিছু জিনিস কেনা। বিশেষ করে, তার নিজে হাতে কাজ করার রকমারি সাজসরঞ্জামগুলো।

সেদিন, সে এক পুরোনো আমলের স্টেরিও-স্কোপিক ভিউয়ার কিনে এনেছে। কিন্তু, তার ফটোগুলো সব সেকেলে, আর অস্পষ্টও বটে।

তবে মুকুল জানে, স্টেরিওস্কোপের জোড়া, জোড়া ফটো দেখতে প্রায় একই রকমের হলেও —দুটি ফটো এক অ্যাঙ্গলে তোলা নয়! যার দরুন, দুটো ফটো আশ্চর্যভাবে এক হয়ে মিলে গিয়ে—চোখে থ্রী-ডাইমেন্‌শনাল ছবি দেখায়।

কাজেই, সে তার নিজের ইচ্ছামতো ফটো তুলে সবাইকে অবাক করে দিতে পারবে—যদি সে ব্রাউনী ক্যামেরাটিকে ট্রাইপডের উপরে দুটো কাঠের-বাতা-লাগানো বোর্ডের উপর রেখে, পর পর দুবার এক্সপোজার্ দেয় ব্রাউনীটা একটু সরিয়ে নিয়ে।

তাই ছবিতে আঁকা ডট-চিহ্নিত জায়গায় ক্যামেরাটা আবার বসিয়ে—বহু মজার দৃশ্য তুলে আনলে সে এক দিনে।

হুলোর গল্প

যতীন্দ্রনাথ পাল

সারা দুপুর, একটা 'হুলো' দেখি
নীল আকাশে পা ছড়িয়ে বসে
একখানা মেঘ দুইখানা মেঘ তিনখানা মেঘ
ছোট ছোট মেঘগুলো সব পাখি—
মুখের ভেতর আপনি চলে যায়।

তারপরে সে মিটমিটিয়ে চায়—
অনেক নীচে উড়ছে নানান রংবেরঙের পাখি
সবাই তারা অবাক সুরে করছে ডাকাডাকি
ভাবল তখন 'হুলো'
ওদের মতন গোটাকতক মুখের মাঝে পেলে
হয় তা বড়ই ভাল।

নিশপিশিয়ে ওঠে যে তার ছোট্ট থাবাগুলো
নখগুলো সব প্রখর ওঠে জ্বলে।
লাফ সে দিতে গেল—

বৈকালেতে, আকাশ ছেড়ে দূরে—
কোথায় গেল পড়ে॥

কে রাজা ?

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেক হাজার বছর আগেকার কথা। এশিয়া এবং ইউরোপের যেখানে যোগাযোগ হয়েছে, পারস্যদেশের উত্তর-পশ্চিম কোণে, অক্সাস নদীর উপত্যকায়, মানুষ সেখানে সেই সবে ফসল চাষ করতে শিখেছে। জল না হলে মানুষের বাস সম্ভব নয় ; তাছাড়া, জলের ধারে বাস করার সুবিধা এই যে বুনো জানোয়াররা আসে জঙ্গল থেকে জল খেতে। জলের ধারে বাড়ি হলে তাই পিছু থেকে আক্রমণের ভয় থাকে না, বরং শিকারের সুবিধা আছে—জলপানের সময় জানোয়ারকে কাঠের খোঁচ কিংবা পাথরের সরু ফলা দেওয়া বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলার। তখনও মানুষ লোহা আবিষ্কার করে নি; এমনকি তামার পাত পিটে অস্ত্র করাও তখন মানুষ শেখে নি। কাজেই শিকার আর লড়াই দুই কাজই হত কাঠ আর পাথরের হাতিয়ার দিয়ে।

চাষ করতে গেলে আগে জমি তৈরি করতে হয়। জঙ্গলের বড় গাছ কেটে, গুঁড়ি থেকে ডালপালা ছেঁটে, বড় গুঁড়িগুলি সরিয়ে, তারপর শুকনো ডালপালায় আগুন লাগাতে হয়। তারপর সেই ছাই জমিতে বিছিয়ে দিয়ে, বর্ষার জল নামলে তাতে বীজ বুনতে হয়। সে যুগের মানুষ প্রথমে এইভাবে চাষ শুরু করে। আমাদের দেশে এখনও আসামের পাহাড়ে, উড়িষ্যার জঙ্গলে আর মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অংশে এইরকম চাষ নাগা, বন্ডো, গোন্দ প্রভৃতি উপজাতিরা করে থাকে।

অক্সাস উপত্যকায় মানুষ যখন চাষ শুরু করে বুনো জানোয়ারদের কোনো অসুবিধা হয় নি।

ঘন বনের শ্রেণী তখন এশিয়া ও ইউরোপের ভবিষ্যৎকালের তৃণভূমি ও মরুভূমি ঢেকে বহু হাজার ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। ঐ সময়ের কিছুদিন আগেও ইউরোপের উত্তর অংশ বরফে ঢাকা পড়ে ছিল, কিন্তু তারপর এসেছিল শুকনো গরমের দিন। বরফ গলে গেছে ; বনভূমি অনেক জায়গায় শুকিয়ে গিয়ে মরুভূমির পূর্বাভাস দিচ্ছে। বন্য জানোয়াররা দেখল তাদের থাকবার জায়গা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

এমন সময় মানুষ আরম্ভ করল বিস্তীর্ণ জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে শস্যের চাষ। অনেক সময় আবার আগুনে যতটা জায়গা পোড়াবার দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী দূর ছড়িয়ে পড়ত এই বন-জ্বালানো আগুন। বনের জন্তুরা প্রমাদ গুনলে। কেবল তাদের মধ্যে বুনো ভেড়ার পাল খুশী হল। তারা দলে দলে মানুষের তৈরী ক্ষেতের কাটা আর পাকা শস্য খেতে লাগল।

মানুষ প্রথমটা তার কাঠের আর পাথরের হাতিয়ার দিয়ে ভেড়া মারতে আর তাড়াতে আরম্ভ করলে। তারপর লক্ষ্য করলে যে, ফসল পাকার পর মাঠে যব আর গমের যে ডাঁটা খাড়া হয়ে থাকে

—যাকে আমরা এখন খড় বা বিচালি বলে থাকি—সেগুলি ভেড়ারা মনের আনন্দে খাচ্ছে। ভেড়ার মাংস সুখাদ্য; কিন্তু খুব বেশীদিন রেখে খাওয়া চলে না ঠাণ্ডার সময়েও। তাই মানুষ আর ভেড়া না মেরে শুরু করলে জানোয়ারের চামড়ার দড়ি দিয়ে ফাঁস তৈরি করে ভেড়া ধরা; তারপর কিছু লাঠি-পেটা করে ভয় দেখিয়ে অনেক ভেড়া খুঁটাতে বেঁধে রাখল।

দু-একদিন বাদ দিয়ে ভেড়াগুলোকে মানুষ খড় আর জল দিল। ভেড়ারা এমনি করে মানুষের পোষ মেনে গেল।

বড় গাছের খুটি পুঁতে ঘেরা জায়গায় তাদের বন্য শিকারী পশুদের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখল মানুষ। বাঘ নেকড়ে এসব জানোয়ার এভাবে ভেড়ার পাল বেহাত হওয়াতে মোটেই খুশী হল না। তার উপর মানুষ আবার খুঁজে খুঁজে মৌচাকের সন্ধান করে মধু নিয়ে যেতে লাগল। ভাল্লুক তার প্রিয় খাদ্য হারিয়ে বেজায় চটে গেল। হাতি, গণ্ডার এদেরও অসুবিধা হতে লাগল কচি ডালপালার অভাবে।

॥ ২ ॥

এমনি করে বিরোধ বাধল। মানুষও বুনো জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হল।

প্রথমেই সে ভেড়ার পালের জন্য একটা মজবুত কাঠের ঘর করলে। কাঠের গুঁড়ির দেওয়াল তৈরীই ছিল; শুধু একদিকে শক্ত ছাদ আর নীচেও আর-একটু ঘেরা দেয়াল দিলে ছাদের সামনের দিকে। সন্ধ্যার সময় এই ঘরে ভেড়ার পালকে বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করলে। এতে তার দুদিন সময় গেল; এবার বাঘকে জব্দ করার পালা।

প্রথমে মানুষ একটা মস্ত ঢোলকের মতো দুদিক-খোলা খাঁচা তৈরি করলে। কাঠিগুলো গাছের মজবুত অথচ সরু ডালের তৈরী, আর মাঝে মাঝে বেড় দিয়ে জানোয়ারের চামড়ার শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। এই ঢোলক-খাঁচাটা মানুষ একটি নীচু মোটা গাছের ডালে বাঁধলে, যাতে তার উপর সমান হয়ে বসে খাঁচাটা। গাছের ডালটা এমনভাবে বাঁক নিয়েছিল যে বাঘ সহজেই খাঁচা পর্যন্ত হেলানো গুঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে; কিন্তু মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচু, লাফিয়ে উঠতে পারবে না। খাঁচার যে মুখটা গুঁড়ির দিকে ছিল সেই ফাঁকটা ছেড়ে মানুষ একটা মোটা চামড়ার দড়ির ফাঁস লাগাল, বেড়ের উপর ফাঁসটা সরু সরু গাছের ছালের তৈরী দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল।

এবার মানুষ একটা ছোট তক্তায় চারটে ফুটো করে একটা ভেড়ার বাচ্চার চারটে পা তাতে ঢুকিয়ে দিয়ে বেঁধে দিল, যাতে বাচ্চাটা

খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু নড়তে না পারে। তারপর ভেড়াসমেত তক্তাটা ঢোলক-খাঁচার উপরের দিকের মুখে, যেদিকে ফাঁস আছে তার উলটো দিকে, গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে দিল।

ভেড়ার বাচ্চাটাকে খেতে হলে বাঘকে ঐ ঢোলক-খাঁচার ভিতর দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তার আগেই চামড়ার ফাঁসের গায়ে যে ছালের দড়ির হালকা বাঁধন আছে সেগুলি ছিঁড়ে যাবে, আর বাঘ ফাঁসে আটকে যাবে। বাঘের মুখ আর সামনের দুই পা খাঁচার ভিতরে থাকায় ফাঁসের চামড়া দাঁত দিয়ে কাটতে বা নখ দিয়ে ছিঁড়তে পারবে না।

এইসব করতে আর সাজাতে বিকেল হয়ে এল। তখন মানুষ তাড়াতাড়ি অন্যসব ভেড়াগুলিকে নতুন তৈরি ঘরে বন্ধ করে দিল; তারপর নিজের নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দুটো ধারালো পাথরের ফলা লাগানো বল্লম ঠিক করে রাখলে। কাজের চাপে মানুষ সারাদিন খাবার সময় পায় নি। এবার খানিকটা মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে খেতে লাগল; জঙ্গলের দিকে কান রাখল বাঘ কখন আসে।

সে যুগের মানুষ, তাই এতটুকু মৃদু আওয়াজও শুনতে পেল, বাঘ যখন বালিশের মতো নরম তার পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে ভেড়াদের ঘেরার কাছে এল। কয়েকদিন আগে বাঘ দেখে গিয়েছিল যে, একজায়গায় বাইরের বেড়ার গুঁড়ি একটু ঢিলে। বাঘের মতলব ছিল, সেইটা ফেলে দিয়ে ভেড়ার পাল নিঃশেষ করবে। ঢিলে খুঁটিটা মানুষ অত লক্ষ্য করে নি; তাই তেমনই ছিল। কিন্তু খুঁটিটা

ঠেলাঠেলি করে নুইয়ে বাঘ যখন ভিতরে ঢুকল তখন দেখে ভেড়া একটিও নেই। সব ভেড়া একটা নতুন ঘরে বন্ধ।

বাঘের গন্ধ পেয়ে ভেড়ার পাল চিৎকার শুরু করে দিল; বাঘও গর্জন করে ঘরের দরজা ভাঙতে চেষ্টা করল। কিন্তু তখনই থামতে হল। মানুষ দরজায় কাঁটা-লতা জড়িয়ে রেখেছে। দু-চারটে কাঁটা মাথায় আর পায়ে ফুটতেই বাঘ সরে এল। এমন সময় বেড়ার বাইরে গাছ থেকে ভেড়ার বাচ্চাটা ভয়ে ডাকতে লাগল। বাঘ তখন ঘেরা জায়গা থেকে বেরিয়ে এই নতুন শিকারটির সন্ধানে গেল। অন্ধকারে দেখলে যে গাছের একটা হেলানো ডালের উপর দাঁড়িয়ে ভেড়ার বাচ্চাটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে।

বাঘ তখন গাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। ও মা! এখানে আবার কী-একটা ঘেরা রয়েছে। বাঘের পায়ে আর মাথায় কাঁটা ফোটার ফলে বাঘ আর এটাকে ভাঙতে চেষ্টা করলে না। বিশেষত যখন দেখলে, এতে ঢোকবার একটা বড় ফাঁক আছে। বাঘ মাথাটা ঢোলক-খাঁচায় অল্প ঢুকিয়ে থাবা দিয়ে ভেড়ার বাচ্চাটাকে ধরবার চেষ্টা করলে; কিন্তু নাগাল পেল না।

সামনে সুখাদ্য; তাই একবার বাঘ আর একটু ঠেলা মেরে এগোতে চেষ্টা করলে। সঙ্গে সঙ্গে ছালের সরু দড়ির বাঁধনগুলি ছিঁড়ে গেল, বাঘের কোমরে চামড়ার ফাঁস শক্ত হয়ে আটকে গেল। বাঘ এবার হ্যাঁচকা মেরে ফাঁস ছাড়াতে চেষ্টা করতে খাঁচাসুদ্ধ ডাল থেকে উপড়ে এসে নিজে শূন্যে ঝুলতে লাগল।

মানুষ এতক্ষণ তার ঘরের চালের কাছে ধোঁয়া বেরোবার ফুটো দিয়ে দেখছিল বাঘের কী অবস্থা! এবার সে একটা জ্বলন্ত কাঠ একহাতে ও অন্যহাতে বল্লম দুটো নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। একটা বল্লম গাছে ঠেস দিয়ে রেখে একহাতে মশালটা তুলে অন্যহাতে প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে অন্য বল্লমটা বাঘের পেটে এফোঁড় ওফোঁড় করে গেঁথে দিল। তারপর দ্বিতীয়টা বাঘের সামনের পায়ের ঠিক পিছনে বুকের কাছে গেঁথে দিল। বাঘ গোটা দুই বিকট হুঙ্কার ছেড়ে প্রচণ্ড লাফ মেরে ঝুলন্ত অবস্থাতেই মরে গেল।

ভেড়ার বাচ্চাটা বাঘের হুঙ্কারেই ভয়ে মরে গিয়েছিল। মানুষ তাকে পেড়ে এনে ছাল ছাড়িয়ে আগুনে ঝলসে রেখে দিল; তার পরের দিন খাবে। এবার আগুনের ধারে গোটা দুই ভেড়ার চামড়া পেতে আর একটা গায়ে চাপা দিয়ে মানুষ শুয়ে পড়ল।

পরদিনে ভোরবেলা মানুষ চামড়ার ফাঁসটা কেটে বাঘের দেহ মাটিতে ফেললে। তারপর চামড়ার ফাঁস রেখে দিয়ে সে তার বল্লমের ফলা দুটি উদ্ধার করলে পাথরের ধারালো ছুরি দিয়ে বাঘের দেহ চিরে ফেলে। বল্লম ঠিক করে নিয়ে মানুষ এবার বাঘের চামড়া ছাড়াল; এটাতে খাসা একটা গা-ঢাকা জামা হবে। বাঘের মুণ্ডটা সে কেবল পাথরের কুড়াল দিয়ে কেটে নিল এবং একটা কাঠের খোঁচে বেঁধে জঙ্গলের ধারে একটা উঁচু ঢিপিতে নিজের বিজয়-নিশানা হিসাবে উঁচু করে পুঁতে দিয়ে এল।

বি। শ্যামল বসু

পলাশগড়ের রহস্য

নলিনী দাশ

॥ চার ॥

সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন দারোয়ানের হাঁক শোনা গেল 'কৌন হায়।'

ভয়ে আমার আর চলৎশক্তি ছিল না। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব্যসাচী তাড়াতাড়ি বলল, 'ভিতরে ঢুকে যা—সামনেই বইয়ের আলমারি পাবি, তার মাথায় নেমে দাঁড়া।'

একতলার উঠোনে পাঁচ-সাতটা লোক ছুটোছুটি করছে, তাদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, তাদের হাতের মশালের আলো আমাদের মাথার উপরের দেয়ালে ছায়া ফেলেছে। আমি ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লাম। দুপদাপ করে লোকগুলি দোতলায় উঠবার আগেই সব্যসাচীও ঘরে ঢুকে পড়েছে আর বইয়ের আলমারির মাথায় দাঁড়িয়ে আবার ঝিলমিলের টুকরোটা যথাস্থানে বেমালুম লাগিয়ে দিয়েছে।

লোকগুলো আরও কিছুক্ষণ চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি করল, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। ক্রমে আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। আমরা বই নেবার মই বেয়ে অনায়াসে লাইব্রেরিতে নেমে পড়লাম। তারপরে একটু একটু টর্চ জ্বালিয়ে এঘর-ওঘর খোঁজাখুঁজি করতে লাগলাম। সমস্ত জানলা ভিতর থেকে বন্ধ, কোথাও কোনো জনমানুষ নেই। যতক্ষণ লাইব্রেরির ঘরগুলি পার হয়ে আমরা ল্যাবরেটরিতে পৌঁছলাম ততক্ষণে টর্চের আলো নিবু-নিবু হয়ে এসেছে। একটা ঘরে ঢুকেই আমি বলে উঠলাম, 'ওখানে কে যেন বসে'! সব্যসাচী রুদ্ধস্বরে 'বাবা' বলে ছুটে এগিয়ে গেল, আর ঠিক তখনই আমাদের একটিমাত্র টর্চের আলো একেবারে নিবে গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে সব্যসাচী চৌধুরী মশাইয়ের মুখের বাঁধন খুলে ফেলল। অন্ধকারে এই অবস্থায় আড়ষ্ট হয়ে বাঁধা থাকবার পরেও তিনি এক-মুহূর্তেই মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝে নিলেন এবং আশ্চর্যরকম সহজ ও স্বাভাবিক স্বরে তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'বাঁ দিকের দেরাজের মধ্যে মোমবাতি আর দেশলাই আছে।' আমি কোনোমতে মোমবাতি জ্বালালাম। সব্যসাচী তার বাবার হাতের আর পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল আর সজোরে তাঁর হাত-পা ঘষে ঘষে রক্তচলাচল ফিরিয়ে আনতে লাগল।

গত চব্বিশঘণ্টার উপর যে সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের আসতে হয়েছে, তারই প্রতিক্রিয়ায় আমার এখন হাসতে ইচ্ছা করছে, কাঁদতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার করে নিজেদের কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কী বিচিত্র উপাদানে এই পিতাপুত্রের চরিত্র গঠিত কে জানে। সব্যসাচী যখন তাঁর পায়ের বাঁধন খুলছিল তখন নীরবে চৌধুরীমশাই কেবল তার মাথার উপর নিজের ডান হাতটি রেখেছিলেন। তারপরেই শান্ত, মৃদু স্বরে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলাম।

তিনি সব্যসাচীকে বললেন, 'ডানদিকের আলমারি খুলে স্টোভটা বের করে আন্, উপরের তাকে রুটি, মাখন, ডিম, কফি, চিনি আর দুধ আছে।' কথা কি ব্যবহারে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন নেই। মোমবাতির

ক্ষীণ আলোয় চৌধুরীমশাইয়ের উজ্জ্বল চোখের জ্যোতি সেদিন অপূর্ব বোধ হয়েছিল। ঝিলমিল দিয়ে যাতে ক্ষীণ আলোর একটি রশ্মিও বাইরে না পৌঁছয় তাই আমরা সন্তর্পণে টেবিল-চেয়ারের তলায় মোমবাতি আর স্টোভ জ্বেলেছিলাম। সেই অদ্ভুত পরিবেশে, মধ্যরাত্রে, ডিম-রুটির সঙ্গে গরম কফি যেন অমৃতের মতন উপাদেয় লেগেছিল। আরামে বসে বেশ উপভোগ করে আমরা খেলাম। যেন কারো মনে কোনো উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। নৈর্ব্যক্তিক হালকা বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে দু-একটা ব্যক্তিগত ঠাট্টা-তামাশাও চলেছিল।

খাবার পরে চৌধুরীমশাইয়ের নির্দেশ হল, 'বাঁ দিকের আলমারিতে কয়েকখানা কম্বল আর কুশান আছে, বিছানা পাতো। শোবার আগে ঐ ডানদিকের দেরাজ থেকে তুলো আর অ্যান্টিসেপ্টিক বার করো, যেখানে যেখানে কেটে-ছড়ে গেছে ভাল করে লাগিয়ে নাও।' কী আশ্চর্য, এর মধ্যে কখন যে তিনি আমাদের কাটা-ছড়া লক্ষ্য করলেন বুঝতেই পারি নি। আমাদের অভিজ্ঞতার গল্প বলবার জন্য যেমন অধীর বোধ হচ্ছিল, তেমনি কৌতূহল হচ্ছিল চৌধুরীমশাইয়ের নিজের কথা শোনবার জন্যে, কিন্তু এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছিলাম যে সবই তিনি খেয়াল করে রাখছেন, সময়মতন জিজ্ঞাসা করবেন। নির্বিকার হাসিমুখে সব্যসাচী ততক্ষণে বাসনপত্র গুছিয়ে তুলে ফেলেছে, কম্বল আর কুশান বার করেছে। হাত-মুখ ধুয়ে, ওষুধ লাগিয়ে মোমবাতি নিবিয়ে যতক্ষণে শুলাম, ততক্ষণে উপলব্ধি করলাম যে নিজেদের কাহিনী শোনাবার জন্যে যতই ব্যস্ত হয়ে পড়ি না কেন, এগুলির সত্যই আরও আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

এতক্ষণে চৌধুরীমশাই মৃদু, কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছিল রে, তোদের এত দেরি হল কেন?' যেন সামান্য একটু ট্রেন লেট হয়েছে, আমরা দু-এক ঘণ্টা বিলম্বে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছেছি। শুয়ে শুয়েই আমাদের অভিযানের আগাগোড়া বিবরণ দিলাম, তিনি মধ্যে মধ্যে দু-একটা প্রশ্ন করে আরও ভাল করে সব জেনে নিলেন। অন্ধকারে মুখের ভাব না দেখা গেলেও গলার স্বরে বুঝলাম যে ছেলের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি যেমন আনন্দিত হয়েছেন তেমনি প্রীত হয়েছেন ছেলের বন্ধুর বিশ্বস্ত ব্যবহারে। কিন্তু তিনি একটুও আশ্চর্য হয়েছেন বলে তো মনে হল না। ছেলের কাছে তিনি যেন স্বাভাবিকভাবেই এইটুকু প্রত্যাশা করেছিলেন।

এর পরে চৌধুরীমশাই শুরু করলেন তাঁর নিজের কথা। নিরুত্তাপ, শান্ত কণ্ঠস্বরে কোনো উত্তেজনা নেই, যেন একটা গল্প বলে চলেছেন। পুজোর ছুটিতে গবেষণাগার বন্ধ হল, কর্মীরা বাড়ি গেল। ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান সবাই পালা করে দেশে যাবে, কেবল অল্প কয়েকটি লোক থাকবে। চৌধুরীমশাই নিজের টেবিলে বসে শেষমুহূর্তের কয়েকটা কাজ করছিলেন আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নতুন ওভারসিয়ার ফণীবাবু নির্দেশ নিচ্ছিল। হঠাৎ অতর্কিতে সে তাঁর হাত চেপে ধরল, নতুন দুটি দারোয়ান পিছনে তৈরী হয়েই দাঁড়িয়েছিল; তারা ক্ষিপ্র হাতে ভারী চেয়ারের সঙ্গে তাঁর হাত-পা শক্ত করে বেঁধে ফেলল। চোখের পলকের মধ্যে ভদ্র ওভারসিয়ারের খোলস ছেড়ে এক ধূর্ত শয়তান বেরিয়ে এসে কৃত্রিম বিনয়ে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বলল, 'আপনি তো ভালভাবে আমাদের কোনো প্রস্তাবেই রাজী হলেন না, সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদের একটু ছলবলের আশ্রয় নিতে হল। কিছু মনে করবেন না।'

চৌধুরীমশাই নিরুত্তর।

তারা তাঁকে বোঝাতে লাগল, 'আপনার গবেষণার ফল আপনি সরকারের হাতে ছেড়ে দেবেন, কিংবা যাকে খুশি তাকে ব্যবহার করতে দেবেন; তাতে আপনার-ই বা কী লাভ আর আমরা যারা আপনার-ই খেয়ে পরে বেঁচে আছি, আমাদের-ই বা কী লাভ? তার চেয়ে আমাদের কাছে সব বিক্রি করে দিন। আপনি পণ্ডিত মানুষ গবেষণা করুন, কিন্তু ব্যাবসার দিকটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপর ছেড়ে দিন। আমরা কিছু কিছু পেটেন্ট নেব, কিছু

কিছু দাঁও বুঝে যে দেশে হোক যাকে হোক, বিক্রি করব, কিছু হয়তো চেপে যাব। তার পরে আপনি ঘরে বসে বসে দেখুন, বিনা পরিশ্রমে একেবারে লাল হয়ে যাবেন। তখন আর এই বনজঙ্গলে পড়ে থাকবেন কেন? যেখানে খুশি চলে যান—কলকাতা—দিল্লী—প্যারিস—হলিউড—ছেলেদের নিয়ে গিয়ে ফুর্তি করুন। সব ব্যবস্থা আমরা করে দেব। আপনাকে কেবল গোটাকতক সই করতে হবে।'

এই ধরনের কত প্রস্তাবই তো চৌধুরীমশাই এক বৎসর ধরে নানাভাবে শুনে আসছেন। এর একটিমাত্র উত্তরই তিনি দিয়েছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করেন নি। আজও বহু সাধ্য-সাধনার পরে তিনি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে একটি শব্দই উচ্চারণ করলেন, 'অসম্ভব!'

এর পরে ফণীবাবু গরম স্বর ধরল। সে জানিয়ে দিল যে চৌধুরীমশাই এখন সম্পূর্ণভাবে তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছেন। ওভারসিয়ার হিসাবে অনেক কিছু বিলিব্যবস্থা তার হাতে ছিল, সেই সুযোগে সে সমস্ত পুরোনো ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান-ড্রাইভারকে ছুটির প্রথম দিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কর্মীরাও সবাই বাড়ি গেছে। এখন বাকি আছে কেবল তার নিজের দলের লোক এবং নতুন লোক, যাদের কাঁচা টাকা দিয়ে হাত করা একেবারেই কঠিন হবে না। সুতরাং তাদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া ছাড়া এখন আর তাঁর উপায়ান্তর নেই।

ও! তিনি বুঝি ছেলের ভরসা করে বসে আছেন? ছেলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনটি ঝানু লোকের উপরে তার ভার দেওয়া হয়েছে, তারা আপাতত তাকে অতি নিরাপদ জায়গায় সাবধানে রেখেছে। তারপর, ভবিষ্যতেও তারা নিরাপদে থাকবে, অক্ষত দেহে বেঁচে থাকবে, না কি কোনো 'আকস্মিক দুর্ঘটনায়' প্রাণ হারাবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তাঁর নিজের সুবুদ্ধি ও বিবেচনার উপর! হাত-পা-বাধা অসহায় অবস্থায়, শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে এই রকম কথা শুনে তাঁর মনে কী ভাবের উদয় হয়েছিল সেটা চৌধুরীমশাই আমাদের কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর মুখে কেবল একটু তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠেছিল। কোনো উত্তর দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি।

এইবার ফণী ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে এই তেজ কতক্ষণ থাকে! কাল এসে আরো কড়া ওষুধের ব্যবস্থা করা যাবে। দরকার হলে আমি নিজের হাতে হাতুড়ি দিয়ে তোর শরীরের প্রত্যেকটি হাড় একটি একটি করে গুঁড়ো করব!'

নানাভাবে শাসিয়ে, তাঁর মুখ বেঁধে রেখে তারা চলে গিয়েছিল। পাওয়ার হাউস থামিয়ে তারা ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেবে জানিয়েছিল। দেখা যাবে অন্ধকারে, অনাহারে হাত-পা-বাঁধা আড়ষ্ট অবস্থায় বসে থেকে বৃদ্ধের তেজ কতক্ষণ বজায় থাকে!

কিন্তু এই অসাধারণ বৃদ্ধের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের সঠিক ধারণা না থাকাতে তাদের চালে একটা মস্ত বড় গলদ থেকে গিয়েছিল। চৌধুরীমশাইয়ের আশ্চর্য ল্যাবরেটরির সমস্ত ব্যবস্থাপত্রের কথা তাঁর কোনো কর্মীই জানত না। ফণীবাবু সদর্পে এবং সরবে তার দলবল নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মহল ছেড়ে চলে গেল। ইচ্ছা করেই তারা বেশী জোরে জোরে শব্দ করে সব দরজা জানালা বন্ধ করে মস্ত বড় বড় তালা ঝুলিয়ে দিল।

ওদিকে ফণী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবামাত্র চৌধুরীমশাই শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণপণে সেই ভারি চেয়ার সুদ্ধ নিজেকে ডানদিকে দুতিন ইঞ্চি সরিয়ে আনলেন, বহু প্রচেষ্টার ফলে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা নিজের ডান পা সামান্য একটু প্রসারিত করলেন, তারপর মেঝের সঙ্গে সংলগ্ন একটি বিশেষ সুইচের ওপরে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গোপন ব্যবস্থার ফলে বিশেষভাবে নির্মিত যান্ত্রিক তালাচাবির সাহায্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মহলের সমস্ত দরজা জানালা ভিতর থেকে দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়ে গেল; ভিতর থেকে সেই সুইচ আবার খুলে না দিলে বাইরে থেকে এই মহলে আসা আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

পরদিন সকালে ফণীবাবুর দল আবার এল। তারা ভিতরে ঢুকতে আর পারল না, তাদের বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার এবং আস্ফালন সার হল। এইভাবে সমস্ত দিন কাটল, রাতেরও অর্ধেকটা কেটে গেল। ফণীবাবুরা বার বার এসে চীৎকার করে ও গালাগালি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষে চলে গেল। চারিদিকে তারা সশস্ত্র প্রহরী বসিয়ে রাখল। তবু মনে অসীম সাহস ও বিশ্বাস নিয়ে সেই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে বসে রইলেন কতক্ষণে তাঁর ছেলে এসে তাঁকে উদ্ধার করবে। তিনি জানেন তাঁকে কেউ আটকাতে পারবে না, সে আসবেই এই ভরসায় তিনি বসে রইলেন।

সব্যসাচী ছেলেমানুষের মতন উল্লসিত হয়ে উঠল—'তাহলে তুমি ইচ্ছা করেই আমাদের ঝিলমিল দরজার মুখ খোলা রেখেছিলে, বাবা? আমার একমাত্র ভয় ছিল পাছে তুমি নতুন কারখানা-ঘর তৈরি করবার সময়ে সে পথ বন্ধ করে দিয়ে থাক!'

'তাই কি কখনো বন্ধ করতে পারি? আমি মিস্তিরিদের গোপনে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলাম যে, ঐ ঝিলমিল যেন ঠিক অমনিই থাকে আর তার পিছনে যেন কারখানার ছাদের নীচু অংশটা পড়ে। তাছাড়া কারখানার ধার দিয়ে এমন একখানা পাইপ তাদের বসাতে বলেছিলাম যেটা বেয়ে, সবাই না হোক, বাহাদুর ছেলেরা অন্তত এদিকে আসতে পারবে।'

কথাবার্তার মধ্যে কখন জানি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন আবার চোখ খুললাম, তখন দেখি যে ঝিলমিলের ফাঁক দিয়ে সকলের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে, সদ্য তৈরী কফির সুগন্ধ বেরোচ্ছে, আর সব্যসাচী আমার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর বলছে, 'বাবা, এ যে কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়!' অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। দেখতে পেলাম চৌধুরীমশাই কখন মুখ হাত ধুয়ে, বাইরে যাবার মতন জামা জুতো পরে প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। আমাদের জন্যও দুই প্রস্থ কাপড়, নতুন জুতো, সাবান, তোয়ালে বার করা হয়েছে।

তাঁর ল্যাবরেটরিতে দেখি সব রকম ব্যবস্থাই আছে। মৃদু হেসে চৌধুরীমশাই বললেন 'ঘুম হল? এবার তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

বাইরে নানা রকম গোলমাল শোনা যাচ্ছে। গোটা দুই মোটর এসে পৌঁছবার শব্দ শোনা গেল, বোধহয় 'লম্বা নাক'দের দল এতক্ষণে এসে পৌঁছল। হয়তো গতকাল মুরি আর রাচীতে আমাদের খুঁজে খুঁজে তারা হয়রান হয়ে গিয়েছিল! হয়তো ভেবেছে যে আমরা কলকাতায় ফিরে গিয়েছি। কীভাবে তাদের বোকা বানিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি সেটা ভেবে ভেবেই আমরা আর একচোট হেসে নিলাম।

হয়তো তারা আমাদের লুকিয়ে রাখা জামা, জুতো আর সুটকেস খুঁজে পাবে। চারিদিকে যদি ভালো করে খোঁজে তাহলে হয়তো ভাঙা জীপখানাও আবিষ্কার করবে। কিন্তু আমরা যে খাস ল্যাবরেটরিতে আরামে সারারাত ঘুমিয়ে, এখন বসে গরম কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি, এ কথা কি তাদের সুদূর কল্পনাতেও আসবে?

কাজের বেলা তারা যাই করতে পারুক আর নাই পারুক, আস্ফালনের কোনো ত্রুটি দেখা গেল না!

কোথা থেকে কে যেন একখানা চোঙা জোগাড় করে তার ভিতর দিয়ে চিৎকার করছে—'আর কেন অনর্থক ভোগাচ্ছিস চৌধুরী—তোর ছেলে তো জালে পড়েছে। ভাল চাস তো দরজা খোল, নাহলে তার দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না।' সব্যসাচী কী একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু চৌধুরীমশাই তাকে নিরস্ত করে শান্তভাবে বললেন, 'খেঁকী কুকুরের স্বভাবই হল সব সময় ঘেউ ঘেউ করা। তাতে কান দিতে গেলে কি আর মানুষের মতন বেঁচে থাকা চলে?'

আমি কিন্তু এদের মতন হালকা হতে পারছিলাম না, সহস্র দুশ্চিন্তা মনের আনাচে কানাচে ভিড় করে আসছিল! এখন না হয় বেশ খাচ্ছি আর ঘুমোচ্ছি, কিন্তু চারিদিকে তো ঘিরে আছে শত্রুপক্ষের লোক! এই কারাগার থেকে বেরোব কী উপায়ে? এখানে নিশ্চয় অফুরন্ত রসদ নেই! শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাব কী করে?

ঠিক যেন আমারই চিন্তার প্রতিধ্বনি করে উঠে সব্যসাচী বলল, 'এইভাবে ইঁদুরের মতন গর্তে লুকিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকব, বাবা? কিভাবে বেরোব বলো তো? আচমকা একটা পাল্টা আক্রমণ চালাব নাকি?' আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কিন্তু ওরা যে আমাদের চেয়ে দলে তিন-চার গুণ ভারি!'

চৌধুরীমশাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, 'বেশ তো, ইঁদুরের মতন গর্তে থাকতে না চাস, ঈগলের মতন আকাশে আপত্তি করবি না তো? তাহলে তারই ব্যবস্থা করা যাক।' সব্যসাচী উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'ওদের কাঁচকলা দেখিয়ে প্লেনে করে উড়ে পালাব, সে বেশ চমৎকার হবে!' আমি আবার বেসুর গাইলাম, 'কিন্তু প্লেন ওড়বার রানওয়ে যে ওদের দখলে রইল? ওরা কি আমাদের উড়ে পালাতে দেবে? বন্দুক-লাঠি-সোঁটা নিয়ে এসে প্লেন জখম করে দেবে না তো?' চৌধুরীমশাই হো হো করে হেসে উঠলেন, 'আরে, এ ছোকরা দেখছি ভারি সাবধানী! সবসময়েই বিপদের সম্ভাবনা মনে করিয়ে দেয়!' আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলাম না। সব্যসাচীরও উৎসাহ দমে গেল, প্লেনে চড়ে পালাবার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবার পরে আর সম্ভবপর মনে হল না।

ততক্ষণে গুণ্ডার দল বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়েছে। কয়েকজন লম্বা চোঙা নিয়ে এখনো চিৎকার করে চলেছে, 'তোদের রানওয়ে খুঁড়ে পুকুর বানিয়ে দেব, কারখানা ঘরে আগুন লাগাব। কী সব কলকাঠি নেড়ে দরজা বন্ধ করেছিস? ভাল চাস তো এক্ষুনি দরজা খোল। নইলে তোর যন্ত্রপাতি বইপত্রের সঙ্গে তুইও পুড়ে মরবি।'

চৌধুরীমশাইয়ের কোনো ভাবান্তর নেই! নিশ্চিন্ত মনে তিনি পরম আনন্দে আমাদের নিয়ে গিয়ে তাঁর

কারখানা-ঘরে নতুন তৈরী এরোপ্লেনখানা দেখাচ্ছেন ! এরকম অদ্ভুত গড়নের বিমান চোখে দেখা দূরের কথা, আমরা কখনো ছবিতেও দেখি নি।

উৎসাহের সঙ্গে চৌধুরীমশাই বোঝাচ্ছেন, 'এই যে ছোট প্লেনটি দেখছ, এটি সমস্ত পৃথিবীর বিমানযাত্রার ইতিহাসে এক যুগান্তর এনে দেবে। এখনো এর গুণপনা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পাই নি, তবু যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তার জোরেই আমি নিশ্চিত জানি যে এরকম বিমান আজ পর্যন্ত তৈরী হয় নি। যেমন এর প্রচণ্ড গতিবেগ তেমনি এর ভিতরকার ব্যবস্থাপত্র, তেমনি সহজলভ্য এর কৃত্রিম রাসায়নিক ফুয়েল। তাছাড়া এর আরও বিশেষ গুণ আছে যা এখনও আমার পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ হয় নি—'

মুগ্ধ হয়ে সব্যসাচী সব কিছু দেখছে আর খুঁচিয়ে প্রশ্ন করে করে সব বুঝে নিচ্ছে। আমারও তো বহুদিনের স্বপ্ন যে এই অদ্ভুত কারখানা-ঘরের সঙ্গে পরিচিত হব, কিন্তু কিছুতেই আমি মন দিয়ে সব কথা শুনতে পারছি না, কেবলি বাইরের নানা শব্দের দিকে কান দিচ্ছি। সত্যিই কি ওরা কাঠ সংগ্রহ করে চারিদিকে সাজাচ্ছে ? সত্যিই শেষ পর্যন্ত আগুন লাগাবে নাকি ? শব্দ শুনে তো সেই রকমই মনে হচ্ছে।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়ে আমি ভাবছি যে নিরাপদে বাইরে বেরোতেই যদি না পারলাম তাহলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান নিয়ে আমাদের কী লাভ হবে ? ওরা যদি গবেষণাগারের বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দেয় তাহলে আমাদের তিনজনের সঙ্গে এই অদ্ভুত প্লেনটিও চিরদিনের মতন বিলুপ্ত হয়ে যাবে !

চৌধুরীমশাই আমার মুখভাব লক্ষ্য করে বললেন, 'বাইরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কী আর করবে বলো ? তার চেয়ে এই প্লেনটিকে প্রস্তুত করতে আমাকে সাহায্য করো।'

তিনি প্লেনের যন্ত্রপাতি সব পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমরাও কাজ করতে লাগলাম। সব্যসাচী বলল, 'চল, এইবার ওদের গুঁড়ো করে আমরা প্লেন চালিয়ে দিই। নিজেরা মরবার আগে, ওদের যে কটাকে পারি পিষে মেরে ফেলি !'

বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের মুখে চোখে ছোট শিশুর মতো কৌতুকের হাসি ঝলমল করতে লাগল, তিনি বললেন, 'ও সব মারামারিতে কাজ নেই, তার চেয়ে আয় প্লেনের মধ্যে বসে কিছুক্ষণ ওড়া-ওড়া খেলি।'

পাইলটের পোশাক এবং হেলমেট পরে তিনি ককপিটে বসলেন। আমাদেরও বিশেষভাবে তৈরি হেলমেট দিলেন, কোথায় বসতে হবে, কিভাবে বেল্ট দিয়ে নিজেদের শরীরকে বাঁধতে হবে সব নির্দেশ দিলেন। তারপরে প্লেনের ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন।

সেই প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দ নিশ্চয় বাড়ির বাইরেও স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল ! পরক্ষণেই কতকগুলি অকথ্য, কুৎসিত গালাগালির স্রোত আমাদের কানে এসে আঘাত করল ! 'হাতপায়ের বাঁধনগুলো খুললি কী করে বুড়ো ? আবার প্লেনে চড়া হয়েছে—অবিলম্বে তোর প্লেনে চড়া চিরদিনের মতন ঘুচিয়ে দিচ্ছি !'

নিদারুণ রাগে সব্যসাচীর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু চৌধুরীমশাই নির্বিকার। ঘুঁষি পাকিয়ে সে তেড়ে একটি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাপের ইঙ্গিতে নিজেকে সংযত করে নিল। চাপা ক্রুদ্ধস্বরে সব্যসাচী বলল, 'পিঁপড়েগুলোকে প্লেনের তলায় পিষে মারব দরজা খুলে।' হেসে কৌতুকের স্বরে তার বাবা বললেন, 'তার চেয়ে বোকাগুলোকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যাব ছাদ খুলে !' নির্বাক বিস্ময়ে আমরা উপরে তাকিয়ে দেখলাম যে একটা বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে এতবড় কারখানা-ঘরের ছাদের প্রায় অর্ধেকটা স্লাইড করে খুলে গেল, মাথার উপরে সোজা নীল আকাশ দেখা গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমরা সেদিকে চেয়ে রইলাম।

[illegible] টেরও পেল না মাথার উপরে কী ঘটে গেল। রানওয়ের ধারে তারা তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে যে দরজা খুলে আমাদের প্লেন বেরোবামাত্র হিংস্র উল্লাসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংসলীলা শুরু করবে। কিন্তু দরজাও খুলল না, প্লেনটাও বাইরে বেরোবার কোনো চেষ্টা করল না।

হঠাৎ চকিতে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল, বললাম, 'একটা আধুনিক বিলাতি বিজ্ঞান পত্রিকায় ভবিষ্যতের একখানা প্লেনের পরিকল্পনা পড়েছিলাম, যেটা সোজা উপরের দিকে উঠতে পারে। কিন্তু সে রকম প্লেন কি আজ পর্যন্ত সত্যি তৈরী হয়েছে?' চৌধুরীমশাই নিরুত্তরে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সব্যসাচী আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'বাবা! বাবা! তুমি কী কাণ্ড করেছ! তুমি কি সত্যিসত্যিই একটা ভিটিওএল, মানে ভার্টিকাল টেক-অফ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডিং প্লেন তৈরী করেছ? তাহলে তো সত্যিই তুমি বিমান-জগতে যুগান্তর এনেছ, কেবল আমাদের দেশ কেন পৃথিবীর কোনো দেশেই এখনও এ প্লেন সম্পূর্ণ সফলভাবে তৈরী হয় নি! আশ্চর্য লোক, তুমি একটা অদ্ভুত লোক, কাউকে কিছু না জানিয়ে তুমি এই কাণ্ড করে ফেলেছ?' চৌধুরীমশাইয়ের সমস্ত মুখ চোখ যেন আনন্দে ঝলমল করতে লাগল। ছেলের এই ছেলেমানুষি উল্লাসে তিনি আজ যে তৃপ্তি পেলেন, এর পরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে সম্মান ও অভিনন্দন পেলেও ঠিক এতটা আনন্দ পাবেন কিনা সন্দেহ।

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এই নিয়েই গত এক বছর ধরে আমি গবেষণা করছি। হঠাৎ তোদের অবাক করে দেব বলে আগে কিছু বিশদভাবে জানাই নি। এখনো ভালভাবে টেস্ট করে দেখা হয় নি, আজ এই ঘোর বিপদের সময়েই প্লেনটার চরম পরীক্ষা হয়ে যাক।'

সেই অদ্ভুত ধরনের বিমানটি হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে সোজা উপরের দিকে উঠতে লাগল। এক নিমেষের জন্যে দেখতে পেলাম যেন পিঁপড়ের মতন কতগুলো লোক হতভম্ব হয়ে ছুটোছুটি করছে, পরমুহূর্তেই তাদের পিছনে রেখে আমরা বহুদূরে চলে গেলাম। প্লেন চালাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্লেনের রেডিও ট্রান্সমিটার যন্ত্রটিও চালু হল। শুনতে পেলাম যে খবর দেওয়া হল—দিল্লীতে, কলকাতায়, পাটনায়, রাঁচীতে।

গুণ্ডাগুলো জানতেও পারল না তাদের বোকা বানিয়ে আমরা রওনা হবার দু মিনিটের মধ্যেই তাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য রাঁচীর পুলিশ প্রস্তুত হচ্ছে। হয়তো তারা সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে ওঠবার আগেই তাদের হাতে হাতকড়া পরাবার জন্য পুলিশ এসে উপস্থিত হবে।

চৌধুরীমশাই কিন্তু গুণ্ডাদের কথা ভুলেই গেছেন মনে হচ্ছে। নিজের মনেই তিনি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন আর আমাদের সে বিষয়ে বলছেন, 'পলাশগড়ের যাতায়াতব্যবস্থার এবার আরো উন্নতি করতে হবে। আরো গবেষণাগার খুলব আর সঙ্গে সঙ্গে বিমান তৈরী ও চালনা শেখাবার একটা কলেজ করব। আমাদের দেশের ছেলেরা এখানে পৃথিবীর আধুনিকতম দেশের মতো ভাল ব্যবস্থার মধ্যে বিমানের বিষয়ে সব কিছু শিখবে। তোরা তিন ভাই তাড়াতাড়ি পাশ করে আয়। তোরা আর তোদের এইরকম সোনার টুকরো বন্ধুরাই তো এই প্রতিষ্ঠানের সব ভার নিবি। আমি আর কদিন থাকব? বিমানজগতে তোরাই যুগান্তর আনবি!' আনন্দের আতিশয্যে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। এই কয়েকঘণ্টার মধ্যে চৌধুরীমশাইয়ের চরিত্রের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে নিশ্চিত বুঝেছি যে তিনি যা বললেন সে তাঁর অন্তরের কথা, কাজে তার আর অন্যথা হবে না। ইচ্ছা হচ্ছে এই মুহূর্তে তাঁর পায়ের ধুলো নিই!

চৌধুরীমশাই আরো বলে চলেছেন, 'দেখ্, প্রথম দিনেই আমাদের বিমান এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করল, রওনা হবার আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা দিল্লীর কাছে পৌঁছে গেছি। বেতারে আমাদের এই অভিনব অভিযানের কাহিনী এতক্ষণে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ চেয়ে দেখ খবর পেয়ে কত লোক আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য দিল্লীর বিমানঘাঁটিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বেতারে তাঁদের সকলকে প্রীতিনমস্কার জানিয়ে এইবার আমরা খাড়া নীচের দিকে পালাম বিমান বন্দরে নামছি!'

দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রলাল রায়

কী ভীষণ মারামারি! একদিকে এক আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালী যুবক আর একদিকে একদল ফিরিঙ্গি যুবক। প্রায় আশি বছর আগেকার কথা বলছি যখন সাহেবের নামে মানুষ কাঁপত, সে খাস বিলাতি সাহেবই হোক আর ফিরিঙ্গিই হোক। ব্যাপারটা খুলে বলি। গড়ের মাঠ, মিউজিয়মের প্রাসাদ, আর তার আশপাশের জমি ঘিরে মস্ত এক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এদেশের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এসেছেন ওই প্রদর্শনী দেখতে; সঙ্গে কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই। কয়েকজন অভদ্র ফিরিঙ্গি যুবক তাঁদের পিছনে লেগেছে, নানারকম কুৎসিত ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে। মহিলারা কিছু বলতে পারছেন না, ভয়ে আর লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়েছেন। প্রদর্শনীতে উপস্থিত অনেকে এ ব্যাপার লক্ষ্য করছেন, কিন্তু সাহেবদের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। হঠাৎ একটি বাঙালী যুবক খেপে উঠে ফিরিঙ্গিদের প্রহারে উদ্যত হলেন। ফিরিঙ্গিরা তাকে গালাগালি দিতে লাগল আর প্রস্তুত হল মারামারির জন্য। বাঙালী যুবকটিকে শাসিয়ে তারা বাইরে আসতে বলল।

যুবকটি মহিলা কজনকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে প্রদর্শনীর বাইরে এসে দেখেন ফিরিঙ্গিরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। দলে তারা তখন আরো ভারী। সাত-আটজন ফিরিঙ্গির সঙ্গে যুবক একাই শুরু করলেন লড়াই। তাঁর প্রথম ঘুঁষিতে ওদের দলপতি ঘায়েল হল—নাক দিয়ে তার দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। ওরা সকলে মিলে শুরু করল ঐ যুবকটিকে প্রহার করতে। যুবক প্রাণপণে লড়তে লাগলেন—সমস্ত শরীর তাঁর রক্তাক্ত, সমস্ত কাপড়জামা গেছে ছিঁড়ে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। যুবকের অসীম সাহস দেখে বহু বাঙালী যুবক সাহস পেয়ে ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ করলে। ফিরিঙ্গিরা তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। যুবকটি যখন আধমরা অবস্থায় বাড়ি ফিরছিলেন তখন দেখলেন সেই ফিরিঙ্গির দল দূরে দাঁড়িয়ে, তাদের দলপতি তাঁকে ইশারা করে ডাকছে। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও যুবকটি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে গেলেন। ওরা কিন্তু এবার লড়াই করল না। নিজেদের ব্যবহারের জন্য লজ্জা প্রকাশ করে ক্ষমা চাইল এবং যুবকের সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রস্থান করল।

এই অসামান্য সাহসী যুবক হলেন বাংলার অমর কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যিনি লড়াই করে গেছেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে।

কবি ছিলেন তিনি, ছিলেন সংগীতরচয়িতা, ছিলেন নাট্যকার। তাঁর কলমের মুখে কখনো বার হয়েছে আগুন, কখনো দেশের দুঃখে ঝরে পড়েছে অশ্রু। দেশ যাতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়,

দেশ যাতে বড় হয়, দেশের মানুষ যাতে সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য হয়—তারই সাধনা তিনি করেছেন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। সারা ভারতবর্ষ তার প্রাণ পণ করেছে এই মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে সেই মুক্তিসংগ্রামের দিনে সকলের পুরোভাগে ছিল আমাদের এই বাংলা দেশ। এদেশের কত সন্তান আত্মাহুতি দিয়েছে সে সংগ্রামে! যাঁরা তাদের উদ্দীপনা জুগিয়েছেন—যাঁরা দেশকে জাগিয়েছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদেরই একজন। সে একদিন—সমস্ত দেশ তখন দ্বিজেন্দ্র লালের স্বদেশী গানে উদ্‌বুদ্ধ—'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ', 'ভারত আমার ভারত আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ', 'আবার তোরা মানুষ হ' প্রভৃতি স্বদেশী গানে দেশবাসীর বুকের দেশপ্রেমের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। আবার ওদিকে রঙ্গমঞ্চে তাঁর 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ সিংহ' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক নাটক দেশের সমস্ত সন্তানের মনকে আলোড়িত করে তুলেছে—স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়ার জন্য সকলে একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। আজকের স্বাধীন ভারতের অধিবাসী হিসাবে সেদিনগুলি নিশ্চয়ই আমরা ভুলব না।

যে সব বাবা-মা তাঁদের সন্তানের সত্যিকারের ভালো চান তাঁরা তাঁদের সন্তানের ত্রুটি অন্যায় সংশোধন করবার জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন—তাকে প্রাণ ভরে ভালবাসা সত্ত্বেও। দ্বিজেন্দ্রলালও তাই যেখানে অন্যায় বা ত্রুটি দেখেছেন নিজের দেশের সন্তানের মাঝে সেখানে তিনি তাঁর কলমের মুখে ভর্ৎসনা করেছেন—নানাভাবে, কখনও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, কখনও কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে গানে, তাঁর নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলালকে অনেকে হাসির গানের কবি বলে প্রাধান্য দেন। এ কথা সত্যি হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের জুড়ি নেই এদেশে। হাসির গানে কখনো তিনি ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছেন দেশের সন্তানদের—সে তাঁরা বিলেতফেরত সাহেব-ভাবাপন্ন বাঙালীই হোন, কিংবা এদেশের গোঁড়া হিন্দুই হোন। কিংবা দুটোর মাঝামাঝি খিচুড়ি—'রিফর্মড' হিন্দুই হোন। ভণ্ডামি ন্যাকামি সহ্য করেন নি কখনো।

শুধু হাসির গান—নিছক হাসির গান যেমন 'বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত,' অনেক লিখেছেন, যেগুলি পড়ে লোকে হাসিতে ফেটে পড়েছে। তবে এসব তাঁর প্রথম দিকের লেখা। পরে লিখেছেন কাব্য, নাট্যকাব্য, নাটক, বহু প্রকারের সংগীত, প্রবন্ধ। দেশকে তিনি ভালবাসতেন সমস্ত

মনপ্রাণ দিয়ে—দেশের মানুষকেও ; কিন্তু তার চেয়েও তিনি ভালবাসতেন মানুষের মনুষ্যত্বকে। তাই শেষ জীবনে গেয়েছেন—'আবার তোরা মানুষ হ'। এই মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি সারা জীবন যাতে বিশ্বের সমস্ত ভাইয়ে ভাইয়ে একদিন এক হয়ে যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের যেমন সাহস, দৃঢ়তা আর তেজের অন্ত ছিল না তেমনি অন্ত ছিল না তাঁর হৃদয়ে বন্ধুপ্রীতি, সন্তানস্নেহ, শিশুপ্রীতি। তাঁর বাড়ির সামনে যে প্রকাণ্ড জমি পড়ে ছিল তা কেনবার জন্য বহু লোক এসে অনুরোধ করেছে। অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা বিক্রি করেন নি শুধু এই কারণে যে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ খোলা জমিটুকুতে এসে বিকেলে খেলা করত।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা, স্বদেশপ্রীতি, সংগীতদক্ষতা সব-কিছুর প্রেরণা পান তাঁর পিতৃদেব স্বনামধন্য নদীয়া-মহারাজের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। দেওয়ানজি ছিলেন সচ্চরিত্র, তেজস্বী, সত্যপ্রাণ, সুরসিক, সুকণ্ঠ, দেশপ্রেমিক। তাছাড়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ভূদেবচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন তাঁর পিতার বন্ধুস্থানীয়। তাঁরা প্রায়ই আসতেন ওঁদের বাড়ি। তাঁদের দ্বারাও দ্বিজেন্দ্রলাল কম প্রভাবান্বিত হন নি।

একটা গল্প শোনা যায়। একদিন আকাশে খুব মেঘ করে এসেছে—ঝড়জল আসন্ন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন বালকমাত্র। তিনি বাড়ির সমস্ত চাকরদের ডেকে এনে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন : 'আকাশে মেঘ করিয়াছে, এখনি ঝড় উঠিবে, বৃষ্টি আসিবে—তোমরা সাবধান হও'—ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মশাই তখন দেওয়ানজির কাছে আসছিলেন। তিনি এই বক্তৃতা শুনে এসে দেওয়ানজিকে নাকি বলেছিলেন, 'দেওয়ানজি, আপনার এ ছেলে ভবিষ্যতে মস্ত বড় মানুষ হবে।' তাঁর কথা সত্য হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শহরে আর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে। মাত্র কয়েকটি বৎসর রইলেন তিনি এ সংসারে। তারপর সমস্ত দেশবাসীকে কাঁদিয়ে, প্রাণপ্রিয় দুটি পুত্রকন্যা দিলীপকুমার আর মায়াময়ীকে রেখে চলে গেলেন জীবনের পরপারে। এই ক বছরের জীবনও কম ঘটনাবহুল ছিল না—দুঃখ পেয়েছেন কষ্ট পেয়েছেন হয়তো অনেক, কিন্তু দেশ পেয়েছে তাঁর কাছে অমৃতের ধারা।

এম. এ. পাশ করে বিলাত গিয়েছেন কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য, সফলতা অর্জন করে ফিরে আসা সত্ত্বেও কৃষি বিভাগে বড় চাকরি মিলল না তখনকার গভর্নমেন্টের কর্তাদের সঙ্গে তেজস্বী ভাষায় কথা বলার জন্য। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি দেওয়া হল তাঁকে। চাকরি করার সময় সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ দ্বিজেন্দ্রের পদে পদে বিরোধ বাধতে লাগল। একবার তিনি দেশের চাষীদের খাজনাসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে স্বয়ং তৎকালীন লেফটান্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত আপীলে জজ তাঁর রায়ই বহাল রাখেন। লেফটান্যান্ট গভর্নর পরাজিত হয়ে তাঁর ক্ষতিসাধন করবার চেষ্টা করেন অন্যদিক দিয়ে, কিন্তু চাষীরা তাঁকে ডি. এল. রায়ের বদলে 'দয়াল রায়' নাম দেয়। গভর্নমেন্ট তাঁর তেজস্বিতা, দেশপ্রেম ভালো চোখে দেখতেন না বলে তাঁকে সমানে বদলি করে করে নাস্তানাবুদ করেছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুতেই দমেন নি।

বিলাতে থাকার সময় তাঁর পরমারাধ্য বাপ-মাকে হারিয়েছেন, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সুরবালাকেও হারিয়েছেন নিতান্ত অকালে। দেশ তাঁকে কম আঘাত দেয়নি—বিলাত থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে জাতিচ্যুত করে 'একঘরে' করে। কিন্তু সব বেদনা, ব্যথা, দুঃখ, জ্বালা তাঁর গভীরে প্রবেশ করে নি। দেশকে তিনি দিয়ে গেছেন স্বাধীনতার মন্ত্র, বুকভরা ভালবাসা, আর নিজের বুক শেষ জীবনে ভরিয়ে তুলেছেন ঈশ্বরপ্রীতি দিয়ে—মায়ের নামে গেয়ে গেছেন কত গান। ভালবেসেছেন প্রকৃতিকে আর দেশকে, দেশের মানুষকে—আত্মীয়-পর সবাইকে—ভালবেসেছেন সবার উপরে ঈশ্বরকে। তিনি কবি—তাই তাঁর মন সব দুঃখ-ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে। নাটক তাঁর বহু—সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার পতন, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নুরজাহান ইত্যাদি ; কাব্যগ্রন্থ—আর্যগাথা, আলেখ্য, মন্দ্র প্রভৃতি। তাছাড়া কত নাট্যকাব্য, প্রহসন, প্রবন্ধ—যার থেকে ভবিষ্যতের বংশধরেরা হয়তো তাঁর কিছুটা পরিচয় পাবে।

এ বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী—তাঁকে আমাদের সমস্ত অন্তরের ভক্তি নিবেদন করে প্রণাম জানাই।

———

ছবি। অমল চক্রবর্তী

হাত পাকাবার আসর

চোরের উপর বাটপারি

শিখর রায়। ১৭০৬। বারুইপাড়া। বয়স ৯

। চরিত্র।

চিন্তামণি—চোর

চূড়ামণি—গ্রামের লোক

কেনারাম—অন্য চোর

[চিন্তামণি রাস্তা দিয়ে একটা ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে]

চিন্তামণি—যাক, আজ ভালো দাঁও মারা গেছে। ছাগলটা হাটে নিয়ে গেলে বেশ মোটা দামে বিক্রি হবে।

[চূড়ামণির প্রবেশ]

চূড়ামণি—কী ভাই, তোমার ছাগলটা কি বিক্রি করবে নাকি?

চিন্তামণি—হ্যাঁ, টাকার বড় দরকার কিনা।

চূড়ামণি—বেশ তো, আমার বাড়িতে আজ একটা ভোজ আছে। দাও-না আমাকে বিক্রি করে। কত নেবে?

চিন্তামণি—দেখো ভাই, এক কথার লোক আমি। পনেরো টাকার কম দিতে পারব না।

চূড়ামণি—প-নে-রো টাকা! কতই বা মাংস হবে ওটার? না ভাই, তুমি হাটে গিয়ে বিক্রি করে এসো—আমার দরকার নেই। [প্রস্থান

চিন্তামণি—না, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। হাট তো অনেক দূর। ধারে-কাছে কোথাও তো ঘর-বাড়ি নেই। ওই একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে। ছাগলটাকে আর টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে কী হবে? ওই বটগাছটায় বেঁধে রেখে একটু জল খেয়ে আসি। হাটের বেলা হল।

[ছাগলটাকে বেঁধে রেখে চিন্তামণির প্রস্থান। কেনারামের প্রবেশ]

কেনারাম—খাসা ছাগলটা! ধারে-কাছে কেউ নেই, বোধ হয় এখানে বেঁধে রেখে কোনো কাজে গেছে। এখুনি এটা নিয়ে পালাই। কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—বেশ মোটা দামে বিক্রি হবে।

[কেনারামের প্রস্থান। চিন্তামণির প্রবেশ]

চিন্তামণি—যাঃ বাবা, ছাগলটা গেল কোথায়? কেউ নিয়ে পালাল নাকি? (এখানে ওখানে দেখে) হ্যাঁ, বোধহয় সে আমাকে টেক্কা মেরেছে।

[চূড়ামণির প্রবেশ]

চূড়ামণি—কী ভাই, অমন গোমরা মুখ করে আছ কেন? হাটে যাবে না? বেলা যে ফুরিয়ে গেল! তুমি তো ছাগলটি দিলে না। আমাকে কিনতেই হবে—তাই হাটে চলছি। তা, তোমার ছাগলটা কত দামে বিক্রি করলে? মুখ দেখে মনে হয় বেশি লাভ করতে পার নি।

চিন্তামণি—না, তা পারলাম কোথায়! ছাগলটা শেষে কেনা দামেই বিক্রি করলাম।

ভাল্লুক শিকার

শীলা মিত্র। ২৩৫৪। গোয়ালিয়র। বয়স ১১

গোয়ালিয়রের বারো-তেরো মাইল দূরে 'টিগরা' বলে একটা জায়গা আছে। ২০শে মে আমি, দাদা, বাবা, মা আরও অনেকে একটা হাফটনেতে করে সেখানে গিয়েছিলাম। শিকারের জন্যে গিয়েছিলাম—ভেবেছিলাম একটা হরিণ কিংবা খরগোশ পাব। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম একটা ভাল্লুক পাহাড়ের উপর উঠছে। দিল্লী থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি গুলি করলেন। আরও দু-একজন শিকারী যাঁরা ছিলেন গুলি ছুঁড়লেন। দাদাও ছুঁড়ল। তারপর ভাল্লুকটা আমাদের ভ্যানের সামনে তেড়ে এল। সেই সময়ে তার দশা যে কী ভয়ংকর হয়েছিল কী বলব। মুখটা খোলা ছিল—মুখ দিয়ে, বুক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। হেডলাইটের আলোয় চোখ দুটো জ্বলছিল—দেখলে ভয় করে। ভাল্লুকটা সামনে থেকে পাশে যেখানে বাবা ছিলেন সেখানে এল। বাবাও গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু এত গুলি খেয়েও সেটা পড়ল না, পালিয়ে গেল। আমরা রাত্রে আর সেটার পিছনে গেলাম না। পরের দিন সকালে তার রক্তের দাগ ধরে ধরে গিয়ে দেখা গেল একটা গুহার সামনে দাগটা থেমেছে। গুহার সামনে মস্ত একটা মৌচাক। ভিতরে গিয়ে দেখলাম ভাল্লুকটা মরে পড়ে রয়েছে। অতি কষ্টে তাকে বের করে আনা হল। তখন দেখা গেল সব কটা গুলিই তার লেগেছিল। যেখানে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সেখান থেকে ওর এই নিজের 'খো' পুরো এক মাইল। ভাল্লুকটার এত শক্তি যে অত জখম হয়েও এত দূর এসেছিল।

খুদে চোর

স্মৃতিলেখা গুহ। ১৮২৪। কলকাতা। বয়স ১০

সেদিন রাত অনেক হয়েছে। মা বাবা দাদা দিদিরা—সবাই ঘুমুচ্ছে। আমার কেন যে কিছুতেই ঘুম আসছে না। ভাবছি সকালবেলা স্কুল, ভোরবেলা উঠতে পারলে হয়। হঠাৎ খুট করে কিসের আওয়াজ হল ঘরে। প্রথমে চোর ভেবে আমি বেশ একটু ভয় পেয়ে গেলাম। মাকে ডাকতে যাব, এমন সময় দেখি দুটো খুদে চোর ঘরের এদিক ওদিক করছে। ওরা আমার স্কুলের ছোট সুটকেশটার চারদিকে ঘোরাঘুরি করছে। ওরা কী করে, আমি অবাক হয়ে দেখছি। মনে হল ছোট ইঁদুরটা বড় ইঁদুরকে বলছে, 'মা, বড্ড খিদে পেয়েছে। আজ তুমি সারা দিন কিছুই খেতে দিলে না।' মা যেন বলল, 'খাবারের চেষ্টাই তো করছি। ওরা যখন জেগে থাকে তখন আমাদের গর্তে থাকতে হয়। ওরা ঘুমুলে খাবারের খোঁজে বের হই। আজ আমি দেখেছি এ বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা স্কুলের টিফিন এনে এই সুটকেশে রেখেছে। আমি সেটাই বের করার চেষ্টা করছি।' আমার তখন নিজের খিদের কথা ভেবে বেশ একটু দয়া হল। আমি আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। আমার পায়ের শব্দে ওরা তাড়াতাড়ি গর্তে গিয়ে ঢুকল। আমি আমার টিফিন থেকে খানিকটা ভেঙে ওদের দিয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে ওরা আবার ফিরে এল। আমার দেওয়া খাবার পেয়ে নাচতে নাচতে গিয়ে ঢুকল গর্তে। আমিও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

লীগের পরে শীল্ড

ফুটবল লীগের মাতামাতি দাপাদাপি এ বছরের মতো শেষ হয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপ আর রেলিগেশন নিয়ে চিন্তাভাবনার পাট চুকে গেছে। শেষে খেলার খেলার মতো খেলা খেলে মহমেডান স্পোর্টিংকে ৩-১ গোলে হারিয়ে মোহনবাগান দল এবার নিয়ে মোট এগারো বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হল। তার ওপর আবার এবার নিয়ে পর পর দুবার। একই দিনে ইস্টবেঙ্গল দল ১-০ গোলে বি. এন. আর-কে হারিয়ে লীগ রানার্স হয়েছে। দুই প্রধানের পয়েণ্টের ফারাক মাত্র ১। মোহনবাগানের পয়েণ্ট ৪৭ আর ইস্টবেঙ্গলের ৪৬। চ্যাম্পিয়নশিপের দুরপাল্লার দৌড়ে শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-বি. এন. আরই তিন প্রধান প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফিরতি লীগে এদের প্রতিটি খেলায় মাঠে দর্শক ভেঙে পড়েছে। লীগে এবারের মতো এত উন্মাদনা উত্তেজনা আর কোনো বছর দেখা গেছে বলে মনে পড়ে না। মোহনবাগান যোগ্য দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তাদের বাহবা দিয়েও ইস্টবেঙ্গলকেও রীতিমতো তারিফ করতে হয়। ফিরতি লীগে এরা খুব ভালো খেলেছে। একটাও হারে নি, উলটে মোহনবাগানকে দু-দু গোলে হারিয়েছে, হারিয়েছে বি. এন. আর-কে। বেশ সমান সমান চলছিল, কিন্তু বেচারীদের দুর্ভাগ্য, শেষ দিকে ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে খেলাটি ড্র করে বসল, সেই সুযোগে মোহনবাগান এক পয়েণ্ট এগিয়ে গিয়ে বাজিমাত করে দিল। শেষ খেলাটায় ড্র করলেও না হয় আর-এক হাত লড়া যেত মোহনবাগানের সঙ্গে।

বি. এন. আর দল শেষ দিকটায় কী রকম নেতিয়ে পড়ল, তাই বরাতে জুটল থার্ড প্রেস। অবশ্য এদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজু মোট ২৩টা গোল করে এ বছরের সবচেয়ে বেশি গোলদাতা।

২৩শে অগস্ট থেকে আই. এফ. এ. শীল্ডের খেলা শুরু হচ্ছে। এবারে ৪২টি দল শীল্ডে খেলবে। শক্তিশালী দল হিসেবে তালিকার একদিকে আছে ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ন রেল, ইণ্ডিয়ান নেভি, সেণ্ট্রাল রেল ও মহীশূর একাদশ আর অন্য দিকে আছে মোহনবাগান, অন্ধ্র পুলিস, বি. এন. আর, এম. আর. সি. আর গোয়ার সালগাওকার ক্লাব যারা গত বছর রোভার্স কাপে নামডাকের সঙ্গে খেলেছিল।

আগামী শীতে ভারতের বিশিষ্ট অতিথি এম. সি. সি. ক্রিকেট দল। এঁরা ১লা জানুয়ারি ভারতের মাটিতে পা দিচ্ছেন। এম. সি. সি. দল এখানে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে। স্থান তারিখও ঠিকঠাক : প্রথম টেস্ট (মাদ্রাজ) ১১-১৬ জানুয়ারি, দ্বিতীয় টেস্ট (কলিকাতা)—২৪-২৯ জানুয়ারি, তৃতীয় টেস্ট (বোম্বাই)—৫-১০ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ টেস্ট (দিল্লি) —১৪-১৯ ফেব্রুয়ারি, পঞ্চম টেস্ট (কানপুর) —২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ।

রথী-মহারথীদের অনেকেই আসছেন না শুনছি। ক্যাপ্টেন ডেক্সটার আসছেন না, ট্রুম্যান আসছেন না, আর কে কে আসবেন না তা পরে জানা যাবে। ভারত-সফরের ব্যাপারে এঁদের একটু গা-এলানো ভাব আছে। তবু এবার আমরা এম.সি.সি-র চৌকশ টীমই আশা করব। ভালো কথা, কলিন কাউড্রে দলের ক্যাপ্টেন হয়ে আসছেন। ভারত কাউড্রের জন্মভূমি।

প্রতিযোগিতা

[৩৬৩]

একটি ছোট্ট মেয়ে মুখে মুখে একটি ছড়া বানিয়েছে। আরো ৪ লাইন লিখে ছড়াটা সম্পূর্ণ করো দেখি।

তালগাছেতে চিলের বাসা
নিমগাছেতে কাগ।
সরষেগাছে চড়াই নাচে
ও বেড়ালি, ভাগ।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

১। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের যে-কোনো ছেলে-মেয়ে এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক না হলেও চলবে।

২। এই পৃষ্ঠার নীচে দাগকাটা লম্বা ফালিটি হল কুপন। নির্দিষ্ট জায়গায় নাম, ঠিকানা আর জন্মদিন লিখে গোটা কুপনটি দাগ-বরাবর কেটে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে। মূল রচনার নীচে নাম-ঠিকানা দেওয়া নিষিদ্ধ—এই বিষয়ে ভুল হলে লেখা বাতিল হবে। খামের উপর লিখে দিতে হবে : 'প্রতিযোগিতা ৩৬৩'।

৩। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ শনিবার ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩।

৪। ১ম পুরস্কার ১৫ টাকা, ২য় ১০ টাকা, ৩য় ৫ টাকা।

'সন্দেশ'

প্রতিযোগিতা ৩৬৩

অগস্ট ১৯৬৩

প্রতিযোগীর নাম..

বয়স..............................

জন্মদিন : সন.................তারিখ.................মাস..........

ঠিকানা..

....

ছবি। অমল চক্রবর্তী

১

শূন্য স্থান পূর্ণ করতে হবে। ১ম ও ২য় লাইনে একই শব্দ বসাতে হবে। এইরকম, ৩য়-৪র্থ লাইনে একই শব্দ, ৫ম-৬ষ্ঠ লাইনে একই শব্দ, ৭ম-৮ম লাইনে একই শব্দ, ৯ম-১০ম লাইনেও একই শব্দ :

রাখাল বালক এক মেষের —,
কুড়ায়ে রাখিত নানা পাখির —।
একদিন ঘরে খুঁজে না পেয়ে সে —,
বলিল ধরিয়া চোরে মারিবে সে —।
না ধরিতে পেরে চোরে রাগে সেই —,
ভুঁয়ে পড়ে করে শুরু হাত-পাদি —।
মা দিলেন দেখাইয়া ছিল তা —,
তেল মেখে তারপর গেলেন —।
রেখেছিল নিজে সব কাগজেতে —,
পেয়ে শেষে খুশী হয়ে খাইল সে—।

২

দোকানের নাম 'বেতার-তরঙ্গ'। এক ভদ্রলোক অনেক দরাদরি করে এক রেডিও কিনলেন। দাম ঠিক হল ৬৯ টাকা ৯৮ নয়া পয়সা। ভদ্রলোক একটা ৮০ টাকার চেক কেটে দিলেন। দোকানদার বাকীটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

সেদিন দোকানের ভাড়া দেবার দিন। দোকানদার ওই চেকখানাই বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিলেন।

দিন দুই-তিন পরে বাড়িওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। চেকখানা মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'কী ঠকানটাই ঠকেছেন মশাই—এক্কেবারে ভুয়ো চেক।'

'বেতার-তরঙ্গে'র মালিক কী বলবেন! বললেন, 'আপনার একটা অল-ওয়েভ রেডিওর দরকার বলেছিলেন না। আপাতত তাই একটা নিয়ে যান। আপনাকে খরিদ দামেই দেব। ৪৩ টাকা ৭৫ নয়া পয়সা ভাড়া হিসাবে জমা করে নেবেন।'

দোকানদারের লোকসানটা কত?

[উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বর। যারা দুটো ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে তাদেরই নাম প্রকাশ করা হবে]

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। পাতা, ছাড়া, কই, সই, পাড়া, গলা, বই। ২। ৭৯+৫$\frac{৩}{৬}$=৮৪$\frac{৩}{৬}$ (আরও সমাধান হয়)।

নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে

বাঙলার বাইরে থেকে—৩২ মধুচ্ছন্দা, অরুণিমা, সুপ্রিয় ও অরুন্ধতী ফৌজদার (চাইবাসা, বিহার), ১০৪ উজ্জয়িনী, সুচরিতা, নবনীতা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য (মুজফফরপুর, বিহার), ৮৫৩ তপনকুমার দত্ত (কৈলাশহর, ত্রিপুরা), ১৪৫৩ জগদীশ ভট্টাচার্য (আলমোড়া, উত্তরপ্রদেশ)॥ **কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গ থেকে**—১৭৫ শুদ্ধসত্ত্ব বসু (চন্দননগর, হুগলী), ১৮৫ শকুন্তলা সেনগুপ্ত (ত্রিবেণী, হুগলী), ৮৮২ স্বাধীনকুমার দাস (হুগলী), ২৩৭০ মাল্যশ্রী চক্রবর্তী (দার্জিলিং), ২৬৬৩ সন্দীপ মাইতি (কলাগাছিয়া, মেদিনীপুর), সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী (জলপাইগুড়ি)॥ **কলকাতা থেকে**—৬৩ অনিরুদ্ধ রক্ষিত, ৭০ বুলবুল ও রানা সান্যাল, ১৩৯ গোরা মুখোপাধ্যায়, ৪৪৪ কমলিকা ও ইন্দ্রজিৎ নাগ, ৬১৯ বিশ্বজিৎ দত্ত, ৬৩৬ স্বাতী পালিত ও সুমন্ত ঘোষ, ৯০৭ সুস্মিতা রায়, ১০৭১ শিবাজী বসু, ১০৯৭ ঝুমকা সেন, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬০৭ বন্দন হালদার, ২৬৫৪ অসিত প্রামাণিক, ২৬৬১ নিপুণ সেনগুপ্ত, ২৬৭৪ নূপুর সিদ্ধান্ত, ২৭৯০ জয়শ্রী সরকার, ২৭০৩ শুভংকর ও বিশাখা ঘোষ, ২৭৬৩ সব্যসাচী ও ভাস্কর বসু॥

গুপীনাথ ষাঁড়ের মতো গলা করে চেঁচিয়ে উঠল

৩য় বর্ষ । ৫ম সংখ্যা   সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ । ভাদ্র ১৩৭০

প্রশ্ন
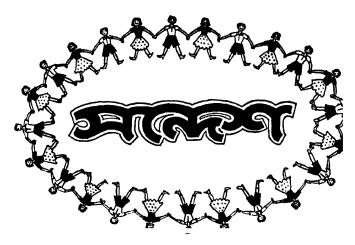
বাণী রায়

বৃষ্টি পড়ে, পাতার আড়ে
ভিজছে বুঝি চড়ুইছানা ;
ছাতার তলায় আসছে না তো,
মায়ের বুঝি আছে মানা ?
আমরা দুজন, ভাই আর বোন
ফিরছি ঘরে খেলার শেষে ;
হঠাৎ কেমন বৃষ্টি এল,
লেকের জলে বৃষ্টি মেশে ।
ভাগ্যে মাতা দিল ছাতা,
নইলে ভিজেই লোপাট হতাম :

চড়ুই পাখির নেই কি ছাতা ?
আমরা ওকে নিয়েই যেতাম,
যেখানে ওর শালের বনে
পাতার বাসা আছে বাঁধা ;
সেখানে ওর মায়ের চোখে
আছে বাঁধা হাসি কাঁদা ।
আমাদেরই মায়ের মতন,
শুধু ওদের নেইকো ছাতা,
তাইতে কি ও ভিজবে বসে
আমরা যাব ঢেকে মাথা ?

গরুড়ের কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

[অগস্ট সংখ্যার পর]

তারপর ব্রাহ্মণ গরুড়কে ধন্যবাদ দিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিল। সে সময় তাহার পিতা কশ্যপ সেই পথে যাইতেছিলেন, সুতরাং খানিক দূর গিয়াই দুজনে দেখা হইল। কশ্যপ গরুড়কে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'কেমন আছ বৎস? তোমার যথেষ্ট আহার জোটে তো?'

গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবন, আমি ভালই আছি, কিন্তু আহার তো আমার ভাল করিয়া জোটে না! মাকে সাপদিগের হাত হইতে ছাড়াইবার জন্য আমি অমৃত আনিতে চলিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন পথে নিষাদ খাইতে। নিষাদ অনেকগুলি খাইলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই হইল না! ভগবন্, দয়া করিয়া আমাকে কিছু খাবার কথা বলিয়া দিন। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, পিপাসায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে।'

এ কথা শুনিয়া কশ্যপ বলিলেন, 'বৎস, ঐ যে একটা প্রকাণ্ড সরোবর দেখা যাইতেছে, ওখানে গেলে পর্বতপ্রমাণ একটা কচ্ছপ আর তাহার চেয়েও বড় একটা হস্তী দেখিতে পাইবে। পূর্ব জন্মে ইহারা বিভাবসু আর সুপ্রতীক নামে দুই ভাই ছিল। ইহাদের পিতা কিছু টাকাকড়ি রাখিয়া যান, ছোট ভাই সুপ্রতীক সেই টাকা তাহাকে ভাগ করিয়া দিবার জন্য বড় ভাই বিভাবসুকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিত। বিভাবসু রাগী লোক ছিল, তাই সে সুপ্রতীকের পীড়াপীড়িতে অত্যন্ত চটিয়া গিয়া তাহাকে শাপ দিল যে, "তুই মরিয়া হাতি হইবি!" ইহাতে সুপ্রতীক বলিল যে, "তুমি মরিয়া কচ্ছপ হইবে।"

'এখন সেই দুই ভাই বিশাল হাতি আর প্রকাণ্ড কচ্ছপ হইয়াছে। ঐ শুনো, হাতিটা সরোবরের

কাছে আসিয়া কী ভয়ংকর গর্জন আরম্ভ করিয়াছে, আর তাহা শুনিয়া কচ্ছপটা সরোবরের জল তোলপাড় করিয়া কেমন রাগের সহিত উঠিয়া আসিতেছে, দেখো। ঐ দেখো, উহাদের কী বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল! হাতিটা ছয় যোজন উঁচু আর বার যোজন লম্বা। কচ্ছপটা তিন যোজন উঁচু, আর তাহার বেড় দশ যোজন। এ দুটাকে খাইতে পারিলে, তোমার পেটও ভরিবে, গায়েও খুব জোর হইবে।'

এই বলিয়া গরুড়কে আশীর্বাদপূর্বক কশ্যপ চলিয়া গেলেন। তারপর গরুড় এক নখে হাতি, আর এক নখে কচ্ছপটাকে লইয়া আবার আকাশে উড়িল। তখন তাহার চিন্তা হইল যে, 'কোথায় বসিয়া এ দুটাকে ভক্ষণ করা যায়।' গাছের নিকট গেলে, তাহা তাহার পাখার বাতাসেই ভাঙিয়া পড়িতে চাহে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমন একটা গাছ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, যাহার উপর গিয়া বসিতে ভরসা হয়। তারপর অনেক দূরে, অতিশয় প্রকাণ্ড কতকগুলি গাছ দেখা গেল। তাহাদের মধ্যে একটা বটগাছ ছিল, তাহা এতই প্রকাণ্ড যে, তাহার একটা ডাল এক শত যোজন লম্বা। গাছটি যেমন বড়, তেমনই ভদ্র। সে গরুড়কে ডাকিয়া বলিল, 'গরুড়, আমার এই ডালে বসিয়া, তুমি গজ-কচ্ছপ আহার করো।'

গাছের কথায় গরুড় তাহার ডালে বসিবামাত্র, ঘোরতর মট মট শব্দে ডাল ভাঙিয়া পড়িল।

যাহা হউক, গরুড় ডালটিকে মাটিতে পড়িতে দিল না। সে দেখিল যে, পিঁপড়ের ন্যায় ছোট ছোট অনেকগুলি মুনি মাথা নীচু করিয়া বাদুড়ের মতো সেই ডালে ঝুলিতেছেন। ইঁহারা সেই বালখিল্য মুনি; ইঁহারা ঐভাবে তপস্যা করিতেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া গরুড়ের বড়ই ভয় আর চিন্তা হইল, কেন না ডাল মাটিতে পড়িলে, আর ইঁহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিতেন না। সুতরাং সে দু পায়ে হাতি আর কচ্ছপ, আর ডালটিকে ঠোঁটে লইয়া আবার আকাশে উড়িল। এইরূপে বিশাল বোঝা লইয়া, বেচারা ক্রমাগত উড়িতেছে, কোথাও বসিবার জায়গা পায় না, এমন সময় সে দেখিল যে, গন্ধমাদন পর্বতে বসিয়া কশ্যপ তপস্যা করিতেছেন। কশ্যপ তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'বৎস, করিয়াছ কী? ওই ডালে বালখিল্যগণ রহিয়াছেন, উহারা যে তোমাকে এখনি শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন!'

তারপর তিনি বালখিল্যদিগকে বলিলেন যে, 'আপনারা অনুগ্রহ করিয়া গরুড়কে অনুমতি দিন। সেই এই হাতিটাকে আর কচ্ছপটাকে খাইলে লোকের উপকার হইবে।'

এ কথায় বালখিল্যগণ গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া সেই ডাল ছাড়িয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন।

তারপর গরুড় কশ্যপকে বলিল, 'ভগবন্, এখন এই ডাল কোথায় ফেলি?'

ইহাতে কশ্যপ একটা পর্বতের কথা বলিয়া দিলেন। সে পর্বতে জীব-জন্তু কিছুই নাই, উহার আগাগোড়া কেবল বরফে ঢাকা। সেই পর্বতে ডাল ফেলিয়া, গরুড় গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিল।

তারপর যখন গরুড় আবার নূতন বলের সহিত অমৃত আনিতে যাত্রা করিল, তখন তাহাকে দেখিয়া দেবগণ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে বলিলেন, 'ওটা কী আসিতেছে?'

বৃহস্পতি বলিলেন, 'কশ্যপের পুত্র গরুড় অমৃত লইতে আসিতেছে, আর তাহা লইয়াও যাইবে।'

বৃহস্পতির কথায় তখনই এই বলিয়া অমৃতের প্রহরীদিগের উপর তাড়া পড়িল যে, 'ভয়ংকর একটা পক্ষী অমৃত লইতে আসিতেছে! সাবধান! সে যেন তাহা চুরি করিতে না পারে!'

কেবল প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়াই দেবতাগণ সন্তুষ্ট রহিলেন না, তাঁহারা নিজেও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অমৃত রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্র বজ্র হাতে এবং অন্যান্য দেবতারা অসি, চক্র, ত্রিশূল, শক্তি, পরিঘ প্রভৃতি ভয়ংকর অস্ত্র লইয়া, অমৃতের চারিদিকে দাঁড়াইলে, বাস্তবিকই তাঁহাদিগকে অতি ঘোরতর দেখা যাইতে লাগিল।

কিন্তু গরুড় যে কতখানি ভয়ানক, দূর হইতে দেবতারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং সে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহারা মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া, নিজেরাই কাটাকাটি করিতে লাগিলেন। এদিকে গরুড়, বিশ্বকর্মা বেচারাকে সামনে পাইয়া, চক্ষের পলকে তাঁহার দুর্দশার এক শেষ করিয়া দিল। বেচারা কারিগর লোক, যুদ্ধ করিয়া অভ্যাস নাই, তথাপি তিনি কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

অপরদিকে গরুড়ের পাখার বাতাসে ধূলা উড়িয়া, অন্যান্য দেবতাদিগেরও অজ্ঞান হইতে আর বেশি বাকী নাই। অমৃতের প্রহরীদিগের চক্ষুও ধূলায় অন্ধ হইয়া যাইবার গতিক হইয়াছে।

এমন সময় পবন আসিয়া ধূলা উড়াইয়া দিলে, দেবতারা সাহস পাইয়া, গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অস্ত্রের ঘায়ে গরুড় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া, পাখার ঝাপটে তাঁহাদিগকে উড়াইয়া ফেলিতে লাগিল! ইহাতে তাঁহাদের নানারকম দুর্গতি হওয়ায় তাঁহারা অমৃতের মায়া ছাড়িয়া দিয়া, উৎসাহের সহিত পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব ও সাধ্যগণ পলাইলেন পূর্বদিকে, রুদ্র ও বসুগণ দক্ষিণ দিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, আর অশ্বিনীকুমার দুই ভাই উত্তরদিকে।

তারপর নয়জন যক্ষ আসিয়া গরুড়কে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহারা মারা গেলে, আর কেহ যুদ্ধ করিতে আসিল না।

তখন গরুড় অমৃতের কাছে আসিয়া দেখিল যে, উহা ভয়ংকর আগুন দিয়া ঘেরা ; সেই আগুনের শিখায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে।

গরুড় যেমন ইচ্ছা তেমনই চেহারা করিতে পারিত। সুতরাং সেই আগুন নিভাইবার জন্য সে তাহার একটা মাথার জায়গায় আটহাজার একশোটা মাথা করিয়া ফেলিল। সেই আটহাজার এক শত মুখে জল আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিলে আর তাহা নিভিতে অধিক বিলম্ব হইল না।

আগুন নিভিলে দেখা গেল যে, একখানি ক্ষুরের মতো ধারালো লোহার চাকা বনবন করিয়া অমৃতের উপর ঘুরিতেছে। অমৃতের নিকট চোর আসিলেই সেই চাকায় তাহার গলা কাটিয়া যায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, সেই চাকার মাঝখানে একটা ছিদ্র ছিল। গরুড় সেই ছিদ্র দেখিবামাত্র, মৌমাছির মতো ছোট হইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ঢুকিয়া তাহার বিপদ বাড়িল কি কমিল, তাহা বলা ভারি শক্ত। সেই চাকার নীচেই এমন ভয়ংকর দুইটা সাপ ছিল যে, তাহাদের মুখ দিয়া আগুন আর চোখ দিয়া ক্রমাগত বিষ বাহির হইতেছিল! তাহারা একটিবার কাহারও পানে

তাকাইলেই সে ভস্ম হইয়া যাইত! কিন্তু গরুড় তাহাদিগকে তাকাইবার অবসর দিলে তো! সে তাহার পূর্বেই ধূলা দিয়া তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ধূলার কাছে সাপেরা নাকি বড়ই জব্দ থাকে। বাছাদের চক্ষে পলক পড়ে না, কাজেই ধূলা ছুঁড়িয়া মারিলেই তাহাদের সর্বনাশ হয়।

গরুড় যেই দেখিল যে, সাপগুলি তাহাদের চোখ লইয়া বিপদে পড়িয়াছে অমনি সে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তখন আর তাহার অমৃত লইয়া যাইতে কোন বাধা রহিল না।

গরুড় অমৃত লইয়া আকাশে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় নারায়ণের সহিত তাহার দেখা হইল। নারায়ণ তাহার বীরত্ব দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তাহাকে বলিলেন যে, 'তুমি আমার নিকট বর লও, আমি তোমাকে বর দিব।'

এ কথায় গরুড় বলিল, 'আমি অমর হইতে, আর তোমার উঁচুতে থাকিতে চাহি; আমাকে সেই বর দাও।'

নারায়ণ বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে।'

তারপর গরুড় নারায়ণকে বলিল, 'তোমাকেও আমার বড় ভাল লাগিয়াছে তাই আমিও তোমাকে বর দিব। তুমি কী বর চাহ?'

নারায়ণ বলিলেন, 'তুমি আমার বাহন হইলে বেশ সুবিধা হইত। কিন্তু তোমাকে যে বর দিয়াছি, তাহাতে তো আর তোমার উপরে চড়িবার উপায় থাকে নাই; কাজেই তুমি আমার রথের চূড়ায় বসিয়া থাকিবে, আর জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, তুমি আমার বাহন।'

গরুড় বলিল, 'তথাস্তু!'

এই বলিয়া সে সবেমাত্র অমৃত লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য বজ্র ছুঁড়িয়া মারিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। তখন সে মনে মনে ভাবিল যে, 'এত বড় একটা অস্ত্র, এত বড় মুনির হাড় দিয়া তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, আর জগতে তাহার এত বড় নাম! এমন একটা অস্ত্র বৃথা হইলে তো বড় লজ্জার কথা হয়। সুতরাং ইহার জন্য আমার কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত হইতেছে।'

এই ভাবিয়া সে তাহার শরীর হইতে একখানি পালক ফেলিয়া দিয়া ইন্দ্রকে বলিল, 'এই নিন। আমি আপনার অস্ত্রের মান রাখিয়া গেলাম।'

ইন্দ্র তো তাহা দেখিয়া একেবারে অবাক! তিনি তখন গরুড়ের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, তাহা দেখিয়া গরুড়ও তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইল।

তখন ইন্দ্র বলিলেন যে, 'ভাই, অমৃত যাহারা খাইবে, তাহারাই অমর হইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিবে। তোমার যদি উহাতে প্রয়োজন না থাকে, তবে উহা আমাকে দিয়া যাও।'

গরুড় বলিল, 'আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং ইহা আমি কিছুতেই দিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমি যেখানে ইহা রাখিব, সেখান হইতে তখনই আপনি ইহা লইয়া আসিতে পারিবেন।' ইহাতে ইন্দ্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া, গরুড়কে বর দিতে চাহিলে সে বলিল, 'সর্পগণ আমার মাতাকে

বড়ই কষ্ট দিয়াছে, সুতরাং আমাকে এই বর দিন যে, সাপেরা আমার খাদ্য হইবে, তাহাদের বিষে আমার কিছুই হইবে না।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে। এখন তুমি অমৃত লইয়া যাও, তুমি উহা রাখিয়া দিবা-মাত্র আমি তাহা লইয়া আসিব।'

এই বলিয়া ইন্দ্র গরুড়কে বিদায় দিলে, সে অমৃতসহ তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'এই দেখো, আমি অমৃত আনিয়াছি। এই আমি উহা কুশের (সেই যাহাতে 'কুশাসন' হয়) উপরে রাখিয়া দিলাম, তোমরা স্নান-আহ্নিক সারিয়া আসিয়া উহা আহার করো।'

তারপর সে বলিল, 'তোমরা যাহা বলিয়াছিলে, আমি তাহা করিয়াছি। সুতরাং এখন হইতে আর আমার মা তোমাদের দাসী থাকিলেন না।'

নাগগণ ইহাতে সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেল, আর সেই অবসরে ইন্দ্রও আসিয়া কুশের উপর হইতে অমৃত লইয়া পলায়ন করিলেন।

সর্পগণ সে দিন খুবই আনন্দের সহিত, আর হয়তো খুব তাড়াতাড়ি, স্নান আর পূজা শেষ করিয়াছিল। কিন্তু হায়! ফিরিয়া আসিয়া তাহারা দেখিল, অমৃত নাই; খালি কুশ পড়িয়া রহিয়াছে! তখন তাহারা ভাবিল যে, 'আর দুঃখ করিয়া কী হইবে? আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছল করিয়া আমাদের নিকট হইতে অমৃত লইয়া গিয়াছে!'

তারপর, 'আহা! এই কুশের উপর অমৃত রাখিয়াছিল গো!' বলিয়া তাহারা সেই কুশ চাটিতে লাগিল। চাটিতে চাটিতে কুশের ধারে তাহাদের জিভ চিরিয়া দুইভাগ হইয়া গেল! তাই আজও সাপের জিভ চেরা দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে মাতাকে সর্পগণের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া, গরুড় মনের আনন্দে সাপ ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তখন আর তাহার পেট ভরিবার জন্য কোনো চিন্তা রহিল না। পৃথিবীর লোকেরও বোধ হয় তাহাতে সাপের ভয় অনেকটা কমিয়া থাকিবে।

শেষ ॥

তোমরাও আসতে পার

জয়ন্ত চৌধুরী

[অগস্ট সংখ্যার পর]

এবার লণ্ডন এয়ারপোর্টে আমেরিকা যাবার আগে বসে লিখছি। প্লেন এখনও ছাড়ে নি, সব চুপচাপ, শুধু খুব মৃদু বাজনার শব্দ হচ্ছে লাউডস্পীকারে। এ প্লেনটা আগের চেয়েও আরামের। সীটগুলো পেছন দিকে অনেকটা বেশী হেলে যায়। আলো আর হাওয়া খাবার কলকব্জা সামনের সীটের হেলান দেবার পেছন দিকে লাগানো।

লণ্ডনের মেঘলা ভাব, আর শিরশিরে ঠাণ্ডা দমকা বাতাস এখনও রয়েছে। এবারেও জানলার ধারে সীট পেয়েছি, আর পাশেও কেউ নেই। লণ্ডনের হোটেল থেকে সিটি আপিস, আবার সেখান থেকে এয়ারপোর্ট,—পাশপোর্টের পরীক্ষা ইত্যাদি ভয়ানক তাড়াহুড়ো আর আশঙ্কার মধ্যে করতে হল। ব্যবস্থা ঠিকই ছিল, তবে প্রতি ঘাঁটিতেই মাইকে শুনছি—'এই বাস ছাড়ল বলে।' 'এই শেষবার ডাকছি'; খানিক পরেই গুড়গুড় করতে······করতে—এই উড়লাম।

এখনও খানিকক্ষণ মাটি দেখতে পাব, তারপর ইংলণ্ড শেষ হলেই সমুদ্দুর। প্লেনের বাথরুমের কাছাকাছিই হোস্টেসরা খাবারদাবার গুছোয়। দাঁড়িয়ে কথা বলছি এমন সময় এমন প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি লাগল সারা প্লেনে যে দুজন হোস্টেস তো প্রায় কুপোকাত, আমিও কোনো রকমে দেয়ালের একটা খোঁচ ধরে পতন রোধ করলাম। ধপাস করে নীচেই পড়ছে শুধু নয়, এ-পাশ ও-পাশ এত হেলছে যে সিধে হয়ে লোকে বসে থাকতে পর্যন্ত পারছে না। একজন হোস্টেস বলছে, ওইখানে মাটিতেই বসে পড়ো,—হেঁটে নিজের সীটে যাবার তো উপায় নেই! দেয়ালে ঠেকনা দিয়ে পা শক্ত করে দাঁড়িয়েছি। এমন হেলল যে ওদের তাক-র‍্যাক থেকে জিনিসপত্র, জাগ, গেলাস মাটিতে পড়ে ছত্রাকার। একটা বাথরুমের দরজা খুলে এক বুড়ী মেমসাহেব উঁকি মারছে। 'বসে পড়ো, বসে পড়ো'—! যে হোস্টেস বসে পড়তে পেরেছিল কাছের একটা খালি সীটে, সে হাত বাড়িয়ে দিতে তাই ধরে আমিও প্রথম সারির একটা খালি সীটে বসে পড়ে বাঁচলাম।

চোখে কানে দেখতে দিলে না, পনেরো মিনিটটাক ঝুঁটি ধরে নাড়ালে। এমন ঝাঁকুনি খাই নি বাবা! ওরা অবিশ্যি বলছে এরকম বাম্পিং কম হলেও কখনো-সখনো হয়ে থাকে। মাইকে বলছে—'সাবধান সাবধান,—বেল্ট শক্ত করো। যা যা শেখানো হয়েছে মনে করো, সিগারেট নেবাও।' ঠিক মনে হচ্ছিল পুরীর সমুদ্দুরে নৌকো চেপেছি। মিনিট কুড়ি পর ঠাণ্ডা হল। এখন তাই সীটে ফিরে এসে লিখছি। নীচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর নীল আকাশ, নীচে সাদা জমাট মেঘ। একটু ফাঁকা হয়েছে, মাইকের নির্দেশে নীচে দেখলাম শ্যেন নদী দেখা যাচ্ছে। আর ঐ শ্যেন নদীর মোহানা—

ওয়েলেস-এর উপকূল—সমুদ্দুর। আটলান্টিকের এই অংশটা ইংলণ্ড আর আয়ার্লণ্ডের মাঝখানে একটু ছোট হয়ে ঢুকে পড়েছে—কিন্তু তাতেই তো দেখছি দিগন্তজোড়া !

বেশ মেঘ রয়েছে এখনো, অথচ কড়া রোদ্দুর আমার গায়ে এসে লাগছে জানলা দিয়ে।

আশ্চর্য, যখনি সমুদ্র দেখছি, লক্ষ্য করছি জল যেন নড়ে না। অথচ মসৃণ সমতলও দেখায় না। বালির ওপর যেমন জলের ঢেউ বা বাতাস জলের তরঙ্গের মতো দাগ কেটে যায় ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে নীচে কালচে-নীল বালির ওপর হাওয়া বা জলের তরঙ্গচিহ্ন। সমুদ্দুর কোথাও ঘন নীল—যেখানে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আর নীল আকাশের দেখা পাচ্ছে ; আবার কোথাও কালো—যেখানে মেঘের ছায়া পড়ছে। ওপর থেকে সূর্য, নীল আকাশ, সাদা মেঘ, তার ছায়া, জল—সব-কিছুই দেখতে পাচ্ছি বলে ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

রোদ্দুরে সমুদ্দুরটা একদম মরুভূমির মতো দেখাচ্ছে।

এবারে কানে একদম তালা ধরছে না। লণ্ডন থেকেই ধরে নি। বড় ঘুম পাচ্ছে। এখান থেকে টানা ছ ঘণ্টার পথ ফিলাডেলফিয়া। তারপর ফ্রেণ্ডশিপ এয়ারপোর্ট ওয়াশিংটন ! লাঞ্চ খেয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করতে হবে। চোখ খোলা রাখতে পারছি না। কাল রাত্তিরে লণ্ডনের হোটেলে শুতে শুতে বারোটা বেজে গিয়েছিল। সকালে সাড়ে ছটার আগেই ঘুম ভেঙে গেছে। ওদের বলেছিলুম সাতটার সময় আমার ঘরে টেলিফোন করে জাগিয়ে দিতে। ব্যাটারা মনেও রাখে ! আমি যখন দাড়ি কামাচ্ছি তখন ক্রীং ক্রীং। গিয়ে ধরতেই মেয়ের গলা—'গুড মর্নিং, ইট্‌স্ সেভন-ও-ক্লক প্লীজ। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্কু।' আমার ওই থ্যাঙ্কু, ব্যাঙ্কু, ল্যাজ গুড়াঙ্কুর অবস্থা। যাই হোক, খাবারটা দিলেই তো পারে। ঘুমব, সমুদ্দুরের বিষয় নতুন কিছুই তো উল্লেখযোগ্য পাচ্ছি না। ওই এসেছে খাবার ! লণ্ডন ছেড়েছি ঘণ্টা দুয়েক হল,—তার মানে বেলা দেড়টায়। ওখানে সকালে খাবার খেয়েছি সাড়ে আটটায় পেট ঠুসে। এবারকার খাবার ফিরিস্তি আর দেব না, নজর লাগবে। ইঞ্জিলিতে নাম হল—ক্রীম অফ মাশরুম স্যুপ (পায়েসের মতো দেখতে, খেতে ভাতের ফ্যানের মতো), ফ্লেমিশ মাটন কার্বনেড (বিরাট একখণ্ড মাংস, হাড়-ফাড় নেই, রোস্ট-মতো, ঝোল নেই, বেশ নরম—আমার খুব ভালো লাগল), বাটার্ড গার্ডেন পি (গাওয়া ঘিয়ে চমকানো সেদ্ধ কড়াইশুঁটি—একগাদা), স্যালাড (টম্যাটো, শশা, কী একগাদা পাতা, কী একটা বেরী-র মতো), অরেঞ্জ শেরবেট (শেরবেট কথাটা দেখে ভাবলাম শরবত নয় তো ? দেখি ফুলকাটা ডিশের মতো গড়া এক ধরনের বিস্কুট, সেই বিস্কুটের ডিশের ওপর মাখনের স্তর, তার ওপর গোল চাকা করে কাটা কমলালেবু—মাঝখানের ফোঁকরে লাল টকটকে একটা চেরি)। এ ছাড়া মাখন রুটি ক্রীম কফি তো আছেই।

সমুদ্রটা কোথায় যে গিয়ে দিগন্তে মিলেছে—বোঝা যায় না। দিগন্ত-বরাবর ধোঁয়ার মতো ঘোলা। নীচে নীল জলের ওপর ছাড়া ছাড়া টুকরো মেঘগুলোকে দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে। দূরের মেঘগুলো থ্যাবড়া আর প্রকাণ্ড যেন মহাদেশ ! মেঘ তো দেখছি বরাবরই থাকছে—কম বা বেশী।

না, ঘুমোতে দিলে না। পেছনকার সীট থেকে এক বুড়ো উঠে এসে হেঁ হেঁ করতে করতে পাশে

বসলেন। কী আর করি—আলাপ করতে লাগলাম। ভদ্রলোক নর্থ আয়ার্লণ্ডে থাকেন, আমেরিকা যাচ্ছেন আশি বছরের মাকে নিয়ে। মহিলাকে আমি তো ওঁর গিন্নী ভেবেছিলাম। ভারতবর্ষের কথা, মানুষের কথা, ধর্মের কথা—ইত্যাদি যত রকমের মহৎ মহৎ বিষয় পৃথিবীতে হতে পারে—মায় ইদানীংকার অর্থনৈতিক অবস্থার কারণ-টারন-সুদ্ধ সমস্ত বিষয়ে যা প্রাণ চায় গম্ভীর হয়ে বলে গেলাম আর উনি চোখ ট্যারা করে শুনে যেতে লাগলেন। ভদ্রলোক একটু ধর্মপ্রবণ। মানুষের আদর্শ-টাদর্শ নিয়ে মাথা হয়তো ঘামান না, কিন্তু মূল্য দেন। মানুষে মানুষে ভেদ নেই, সব মানুষ এক—এই সব বিশ্বাস করে আমাকে একলা বসে থাকতে দেখে সঙ্গ দিতে এলেন আর কী। মিশনারিদের কথা বললেন—আমি ভারতবর্ষে মিশনারিদের কাজ, আত্মোৎসর্গ, পরোপকার এবং সেই সঙ্গে তার খারাপ দিকটাও বললাম। কয়েকজন মিশনারির নাম বলতে খুব খুশী—বললেন, তুমি এদের কথা কেমন করে জানলে? আরও অনেক কথা হল ঘণ্টা দেড়েক ধরে—সেসব আমার কলকাতার চেনা কেউ বা বাড়ির কেউ শুনলে হাসত, আর পরে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করত। খানিক পরে ভেবে নিজেই হয়তো নিজেকে ঠাট্টা করব, এখন কিন্তু তা করতে ইচ্ছে করছে না। বললেন, 'তুমি কোথায় ইংরেজী শিখেছ?' 'কেন?' 'তোমার উচ্চারণ **ইংরেজদের** মতো দুর্বোধ্য নয়।' শুনে তো অবাক! বলে কী? বললেন—আয়ার্লণ্ডের ইংরেজী উচ্চারণ সবচেয়ে পাকা এবং সরেস। বি-বি-সি-তে যত ভালো বক্তা বা অ্যানাউন্সার আছে তাদের শতকরা আশি ভাগ নাকি আইরিশ।

উনি আমেরিকায় বেড়াবেন। ওয়াশিংটনে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে ঠিকানা নিলেন। আয়ারল্যাণ্ড দুভাগে ভাগ হয়েছে। দক্ষিণ দিকটা স্বাধীন দেশ—ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে স্বাধীনতা পেয়ে ইংরেজ রাজত্বের বাইরে চলে গেছে। উত্তর আয়ার্লণ্ড কিন্তু এখনও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অধীন। আমি ডি. ভ্যালেরার কথা বলতেই, আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে ওঁরা উত্তর আয়ার্লণ্ডের লোক। কিন্তু ডি. ভ্যালেরার কথা গুণগান নিজেও করলেন, কিছু ক্ষুণ্ণ হলেন না, তবে আমিও আর খুব বেশী উচ্ছ্বসিত হলাম না।

পেছন থেকে ওঁর আশি বছরের মা আমায় ডেকে একগাল হেসে একটা বই এগিয়ে দিলেন। আমিও হেঁ হেঁ করে থ্যাঙ্কু ব্যাঙ্কু করলাম। প্রায় ঘণ্টা চারেক হল চলেছি—আরও দু ঘণ্টা পরে প্রথম পাট, তারও কিছু পরে যাত্রা শেষ। নীচে সেই একই দৃশ্য। পেছনে হেলান দিয়ে একটু চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকি।

* * *

আধঘণ্টাটাক ছিলাম বোধহয় চুপচাপ। তারপর বিকেলের চা দিয়ে যেতে লাগল। এক স্লাইস রুটিতে মাখন মাখিয়ে তার ওপর চিজ আর শসা। আর এক টুকরো মাখন-মাখানো রুটির ওপর মাংসের স্তর, তার ওপর ছোট্ট টক-টক কী-একটা ফল, চেরি আর একটা যেন কী। একটা ছোট্ট পেস্ট্রি—আর কফি, যথারীতি ক্রীম দিয়ে। একটা প্লাস্টিকের দাঁত-খোঁটার মতো গুঁজে দিয়েছে ফল-পাকুড়গুলো গেঁথে তোলার জন্য। এরা মাখন আর মাংসটা বড্ড খায় দেখছি। (নীচে ওগুলো মেঘ

না বরফের রাজত্বের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি ? অত ঠাস, জমাট আর সাদা ঝকঝকে মেঘ হয় ?)

এইবার ছুটো ফর্ম দিয়ে গেল, ভর্তি করে রাখতে হবে। আমেরিকায় নামলে কাস্টমস-এর কাজে লাগবে। লণ্ডনেও নামবার আগে তাই করতে হয়েছে। কতবার যে পাশপোর্ট আর কাগজপত্র খুলছি—আর ক্রমশই নানা রকম (তেত্রিশ হাজার ফিট উঁচুতে আছি। ৭৫° ফা. তাপমাত্রা) কাগজপত্র, তাপ্পি, দলিল ইত্যাদি জমছে।—এই জমিতে ঢুকলাম। এমন কিছু অদ্ভুত দৃশ্য নয়। নিউইয়র্কের অনেকটা দূর দিয়ে (দক্ষিণ) আমেরিকায় প্রবেশ ঘটল। আর এক কাপ কফি নিলাম চেয়ে—আগেরটা ঠাণ্ডা ছিল। নীচে ছোট্ট ছোট্ট হাতে আঁকা জল, জমি, বাড়ি, মাঠ, বন ইত্যাদির ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। একটা,—যে-কোনো একটা—দেশের কিনারা যেখানে সাগরের ধারে এসে শেষ হয়, সেখানে তার উপকূল যে কী অদ্ভুত রকমের বাঁকাচোরা হয়ে থাকে (সাধুভাষায় বলে 'উপকূল ভগ্ন' হওয়া) উঁচু থেকে না দেখলে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে জমি লেজের মতো জলের ওপর চলে গেছে দূরে।

প্রায় আটাশ ঘণ্টা প্লেনে চড়া হল। প্লেনে চড়া একঘেয়ে হয়ে গেছে, আর যেন কোনো আকর্ষণ নেই—সমস্ত নিয়মকান্থন জানা, রাস্তা জানা, আচরণবিধি জানা—অবাক হবার কিছু বাকি নেই। দেখো, কত তাড়াতাড়ি মানুষের আশ মিটে যায়। লণ্ডন দেখে, লোকের সঙ্গে মিশে, এই ক ঘণ্টায় ওয়াশিংটন সম্বন্ধেও আর বিশেষ আকর্ষণ বোধ করছি না যেন !

কলকাতা ছাড়বার সময়ে, আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, তেমন কিছু কষ্ট হয় নি। যতখানি ব্যাকুল হব বলে আশঙ্কা করেছিলাম তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। নিশ্চিন্ত ছিলাম নিজের সম্বন্ধে। কিন্তু এখন হঠাৎ স্নুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে মনে হচ্ছে।

মেঘ এবার পাতলা হয়ে এসেছে, যথারীতি খেতের জমি, রাস্তা, বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। ফিলাডেলফিয়া এল বলে।—নামছি। একটা চওড়া নদী,—কী নদী ?

ফিলাডেলফিয়ায় নামতে হল—সেই পরীক্ষার ব্যাপার। আমেরিকায় প্রথম পদক্ষেপের মুখেই ওরা পরীক্ষা করতে চায়—বিশেষ করে হেলথ সার্টিফিকেট। এখন জানতে পারছি, আমি বাল্টিমোর এয়ারপোর্টে নামব। সেখান থেকে বাসে করে ওয়াশিংটন—পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যাত্রা। ওয়াশিংটনে বড় প্লেন বিশেষ দাঁড়ায় না।

প্লেনটা উড়েই বাঁ দিকে মোড় ফিরেছে, বাঁ দিকের ডানাটা নীচের দিকে নেমে গেছে, সারা প্লেনটাই বাঁ দিকে কাত হয়েছে বেশ। তাই বাঁ দিকের জমির শেষ প্রান্তটা অনেকটা উঁচুতে মনে হচ্ছে—সমান্তরালে তো থাকছে না।

'বাল্টিমোরে' নামছি—নদী পার হলাম একটা। পার হলাম নয়, এখনও পার হচ্ছি। এই পার হলাম। কী চওড়া নদী রে, বোধহয় 'পটোম্যাক'। ঝকঝকে রোদ্দুর, নীচে সবুজ,—একটু-আধটু বাড়িঘর কারখানা। আমেরিকাত্ব বিশেষ বোঝা যাচ্ছে না,—নিউইয়র্ক তো আর নয়!—নামছি। থামছি। যাত্রা শেষ।

॥ সমাপ্ত ॥

প্রিয়ম্বদা দেবী

কাঠুশাল

অন্তা ছুতোর। বাপ-মায়ে নাম রেখেছিল অনন্তপ্রসাদ, পাড়াপড়শীর অনুগ্রহে সে নাম হয়ে দাঁড়াল অন্তা। শুধু তাই নয়, ডাকনামও একটা জুটে গেল। সবাই তাকে ডাকত কালোজাম বলে। ছুতোর মশায়ের কালোরঙের নাকের ডগাটুকু টুকটুকে রাঙা হবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পারে নি—জাম পাকলে কিংবা টিকেয় আগুন ধরালে যেমন লালের আভা দেখা দেয়, সেইরকমটি হয়েছিল আর কী। সে দিন অন্তার হাতে কাজ ছিল না, দোকান খুঁজে দেখল বেশ একখানি চৌকোশ কাঠ কোনায় অনাদরে পড়ে আছে। কাঠখানি হাতে করে তুলে নিয়ে ভাবল—কুঁদে চড়িয়ে, তারপর তার উপর খোদাই-কাজ করে সুন্দর সুন্দর খাটিয়ার পায়া গড়বে। অন্তা ছিল কাজের লোক, মনে যদি কিছু হত সেটি করতে দেরি হত না। কাঠখানি তুলে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে যেমনি র‍্যাঁদা দিয়ে চেঁছে সমান করতে গেছে, অমনি কাঠের মধ্যে থেকে পিঁ-পিঁ করে কে যেন কেঁদে উঠল। প্রথমে অতটা কান করে নি, ছুতোরের দোকানে ছুঁচো-ইঁদুরের বসতি, কে কোথায় কখন কিচিমিচি করে উঠছে তার ঠিক কী? আবার র‍্যাঁদা জোরে চালাল, এবার আর পিঁ-পিঁ নয়, একেবারে কুঁকিয়ে কান্না—'ওগো, দোহাই তোমার, ছাল ছিলে নিয়ো না, গেলাম গো, গেলাম গো।' অন্তা ছুতোর তো আকাট, একেবারে কাঠটাঠ ছুঁড়ে ফেলে ঘরের অন্য কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। মনে মনে রামনাম স্মরণ করে খানিকটা দম নিয়ে আবার ভাবলে, 'দূর হোক ছাই! কাঠের ভিতর কি মানুষ আছে না থাকতে পারে? আবার কাজে লাগা যাক।' এবারে সে ভারি সাবধানে আস্তে আস্তে কাঠখানি চাঁছতে লাগল—এমন সময় শুনলে কে যেন হাসতে হাসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে—'ওগো কর কী? কাতুকুতু দাও কেন? বেজায় সুড়সুড়ি দিচ্ছ যে, হাসিতে আমার নাড়ী ছিঁড়ে আসছে!' এবারে অন্তা একেবারে ধড়াম করে ভুঁয়ে চিতপটাং হয়ে পড়ল, মাথায় যেন তার বাজ পড়েছে! যখন চোখ খুলল,

দেখল, ঘরের মেজেয় বসে আছে। ঠিক এই সময়ে কে যেন দুয়ার ঠেলা দিলে, অন্তা কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'কে?' উত্তর শোনা গেল, 'আমি গুপে।'

গুপে হচ্ছে অন্তার প্রতিবেশী। অন্তা যদি কালোজাম হয়, এ ব্যক্তি পাকা আমটি। টুকটুকে বুড়ো, মাথার উপর বেলের মতো চকচকে টাক। বুড়োর একটুকুতেই রাগ হত, বিশেষত পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা যদি একবার বলত 'ছানাবড়া'—তবে আর রক্ষা থাকত না। তাহলে গুপীবাবু রেগে চটে লাল হয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একটা হুলুস্থল বাধিয়ে বসত। এই কারণেই ছেলেরা তাকে ছানাবড়া বলে যখন-তখন খেপাত।

গুপী ঘরে ঢুকে দেখে অন্তারাম গালে হাত দিয়ে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো মাটিতে বসে আছে। গুপী বলল—'ও কী অন্তারাম, অমন করে ভুঁয়ে বসে কেন?' অন্তা বলল—'আবার কেন? পিঁপড়ের দলকে অ-আ শেখাচ্ছি।'

'বেশ কাজটি খুঁজে বার করেছ তো?'

অন্তা বলল, 'তারপর গুপে ভায়া, কী মনে করে?'

গুপে বলল, 'দেখ ভাই অন্তা, আজ সকালে একটা ফন্দি মাথায় এসেছে। একটা সুন্দর কাঠের পুতুল গড়তে যদি পারি তাহলে সেইটে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ালে অন্নকষ্ট আর থাকে না, ঘরেও দু পয়সা আসে!' এমন সময় কে যেন বলে উঠল 'ছানাবড়া'! আর যাবে কোথায়? গুপে রুখে উঠল, 'দেখ্ অন্তা, ভালো হবে না বলছি! তুই আমায় অপমান করলি!'

'শোনো একবার কথা! আমি আবার কখন তোমায় অপমান করলাম?'

'নাঃ, তুমি কর নি, তবে বুঝি আমি নিজেই নিজেকে অপমান করলাম!'

কথা থেকে গালাগালি, পরে হাতাহাতি, অতঃপর মারামারি শুরু হল; অন্তা-গুপের প্রাণান্ত হয় আর কী! এমন সময় দুই বুড়োই সামলে নিলে, এ ওর পিঠ থাবড়ে ভাব করলে। তখন অন্তা বললে, 'গুপে ভাই, বললি নে কী চাস?' গুপে বলল, 'দেখ ভাই, পুতুলটা গড়বার জন্য এক টুকরো কাঠ চাইছি।' অন্তা ভাবলে বাঁচা গেল, এই সুযোগে সেই ভুতুড়ে কাঠটাকে এবারে বিদায় করি। কাঠখানা তুলে যেমনি গুপেকে দিতে যাবে অমনি সেখানা ধড়মড় করে উঠল যে সেটা ছিটকে গুপের পায়ের উপর গিয়ে পড়ল। বেচারী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ ভাই, দিলি বলে কি কাঠখানা এমনি ছুঁড়েই মারলি যে খোঁড়াই করে দিলি।' অন্তা বললে, 'দিব্যি করে তোর গা ছুঁয়ে বলছি ভাই, আমি তোকে মারি নি।' গুপে বললে, 'তুমি মার নি, তবে বুঝি আমি আপনি আপনাকে মারলাম?' অন্তা বললে, 'ঐ কাঠখানাই তোমায় মেরেছে।' গুপে বললে, 'কাঠ তো মেরেছে—তুমি ছুঁড়ে দিলে তবে না সে আমায় ব্যথা দিলে?'

এমন সময় কে আবার বলে উঠল 'ছানাবড়া।' শুনে গুপী চেঁচিয়ে উঠল, 'গাধা কোথাকার—'

আবার কে বললে, 'ছা-না-ব-ড়া।' গুপে বললে, 'উল্লুক—'

আবার কে বললে, 'ছানাবড়া!'

বারবার তিনবার রসে ভরা ছানাবড়ার নাম শুনলে আমাদের মুখে জল আসত, গুপে কিন্তু রেগে আগুন হয়ে উঠল। আবার এক পত্তন কিলঘুঁষি চড়চাপড় শুরু হল। তারপর দুই বুড়ো যখন হাঁপিয়ে মরে আর কি, তখন যুদ্ধ থামল, শান্তি হল, দুজনে কোলাকুলি করে বললে, 'ভাই, কিছু মনে করিস নে যেন!' জন্ম জন্ম তারা দুজনে চিরবন্ধু থাকবে শপথ করে, গুপে কাঠখানি নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়িমুখো গেল, অন্তাও অপয়া কাঠখানাকে বিদায় করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কাঠখানি বাড়ি নিয়ে গিয়েই গুপে যন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে পুতুল গড়তে শুরু করলে। ভাবতে লাগল পুতুলটার নাম কী দেওয়া যায়। ভেবে ভেবে ঠিক করলে, নাম হবে পঞ্চুলাল। মনে মনে বলতে লাগল, 'লোকে পাঁচু ঠাকুরের মানত করে ছেলের নাম রাখলে, তার ভাগ্যি ভালো হয়। পঞ্চু নাম দিলে বাছা আমার সুখে থাকবে, এ নামের পয় আছে। আমি একজনদের জানতাম তাদের সারা গুষ্টি সবারই এ রকম নাম ছিল,—পাঁচকড়ি, পাঁচুলাল, পঞ্চানন, পাঁচী ইত্যাদি—তাদের মতো ধনী ভিক্ষুক আর দেখা যায় নি!' ছেলের নাম ঠিক হবার পর, গুপীর কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল, সে একেবারে লেগে পড়ে মেহনত করতে লাগল! প্রথমে হল মাথার চুল, তারপর কপাল, তবে হল চোখ। চোখ শেষ হলে গুপে দেখে কী—চোখ দুটি পড়ছে, পলক ফেলছে, আবার এক-একবার এক-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। এতটা মনোযোগ গুপীর তেমন ভালো লাগে নি, সে চটে বলে উঠল, 'আরে খেলে যা, অমন হাঁ করে কী দেখছিস?' কেউ কিছু বলে না, তখন ছেলের নাকটি গড়লে। গড়তে গিয়ে দেখে ও মা! নাক যে ক্রমে বেড়েই চলল; গুপে যত তাকে কেটে ছোট করে ততই সে গজিয়ে উঠে আবার বেড়ে চলে। ইতিমধ্যে ঠোঁট আর মুখ শেষ হতে না হতেই হাসি শুরু হল, বুলি ছুটল। গুপী রেগে উঠে বললে, 'চুপ রও'—কিন্তু চুপ রয় কে? তখন গুপীনাথ ষাঁড়ের মতো গলা করে চেঁচিয়ে উঠল। এবারে হাসি থামল বটে কিন্তু জিভ বার করে মুখ ভেংচানো আরম্ভ হল। কিল চড় দিলে হাতের কাজ পাছে নষ্ট হয় সেই কথা মনে করে, গুপে দেখেও দেখলে না, কাজ করেই চলল। ঠোঁটের পর দাড়ি, তারপর গলা, তারপরে কাঁধ ঘাড়, শেষে হাত পেট গা তৈরি হল। হাত যেমনি তৈরি হয়েছে অমনি গুপী দেখে কী তার টেকো মাথার টুপিতে টান পড়েছে, ফিরে দেখে তার টুপি পঞ্চুর হাতে। গুপে বললে, 'পঞ্চু, দে, আমার টুপি দে বলছি, নইলে ভালো হবে না।' দেওয়া দূরে থাকুক, সে টুপিকে আপন মাথায় দিলে—মস্ত টুপি নাক অবধি ঝুলে পড়ে দম আটকে মারা যাবার মতো হল। ছেলের এই কাণ্ডকারখানা দেখে বাপের মন ভারি দমে গেল, তার দিকে ফিরে বললে, 'হতভাগা! এখনও তো সারা শরীর গড়ে ওঠে নি, এরই মধ্যে বাপকে অমান্য! এ তো ভালো নয়।' এ কথা বলতেই গুপীর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল! তারপর যেমনি পা শেষ হওয়া অমনি গুণধস্ত ছেলে তড়বড় করে বাপের নাকের উপর দু-চারটা লাথি কষে দিলে।

পা দুখানি তৈরি হলে গুপী পঞ্চুকে হাত ধরে 'চলি চলি পা পা' করিয়ে হাঁটাতে লাগল। পা দুটি স্ববশ হবামাত্র, হাঁটা ছেড়ে ছুটোছুটি শুরু হল, তারপর না বলা না কওয়া দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে

পড়ে দে-দৌড়। গুপীনাথ পিছন পিছন ছুটে চললে, 'আরে থাম থাম, ধর ধর!' আর ধর ধর! পঞ্চু ঠিক টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলল, আর কাঠের পা দুখানি পাথরের ফুটপাথের উপর এমনি খটখট আওয়াজ বাধিয়ে দিলে যে মনে হল, দশ-বিশজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত খড়ম পায়ে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

গুপী চীৎকার করতে লাগল, 'থামাও থামাও, রোখো, রোখো',—কিন্তু পথচলতি মানুষজন একটা কাঠের পুতুলকে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে দেখে এমনি অবাক হয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল যে, তাদের দেখেই কাঠের পুতুল বলে ভুল হতে লাগল! ধরবার চেষ্টা আর কিছুই হল না।

শোরগোল শুনে একজন কামার, তার নাম বলরাম, মনে করলে আস্তাবল হতে কারো দুষ্টু টাট্টু ঘোড়া পালিয়েছে। তাকে আটক করবার জন্য কামার বাহাদুর দুই পা ফাঁক করে হাত বাড়িয়ে মাঝ রাস্তায় তৈরি হয়ে দাঁড়াল। কামারের হুঁশিয়ারি দেখে পঞ্চু মনে মনে মতলব আঁটলে যে কামারের পায়ের মধ্যে দিয়ে ফস করে গলে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কামারের শরীরখানি বিপুল হলেও, বুদ্ধিটা কিঞ্চিৎ ধারালো ছিল, পঞ্চুর মতলব আগে থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল। তাই যেই কাছে আসা অমনি সে পঞ্চুর নাকটি সাপটে ধরে তাকে গুপীর হাতে সঁপে দিলে। ছেলেকে হাতে পেয়েই বাপ তাকে কষে কানমলা দেবেন ঠিক করলেন, কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। গোড়ায় গলদ, পুত্র তাঁর কানকাটা। গড়বার সময় কানের কথা মনে ছিল না, তাই পঞ্চুলালের কর্ণকুহর থাকলেও শ্রবণমূল ছিল না; এতে শোনবার অসুবিধা হত না কিন্তু শাসন করবার জন্য গুরুজনের হাত যখন নিশপিশ করত তখন তা নিবারণের কোনো উপায় হত না। ধরা পড়ে পঞ্চু মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, দুষ্টু ঘোড়ার মতো জমে গেল, আর এক পাও চলে না। শহরে পথের মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটলে যেমন ভিড় জমে যায় তাই হল। এমন গণ্ডগোল আর এমনি বচসা চলতে লাগল যে গুপী পঞ্চুকে ছেড়ে দিলে, আর বুদ্ধিমান পাহারাওয়ালা এসে গুপীকে ধরে হাজতে নিয়ে গেল।

ছাড়া পেয়েই পঞ্চু আনন্দে চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়তে ছাড়তে বাড়িমুখো দৌড় দিলে। বাড়ি পৌঁছে ঘরের দাওয়ায় আরামে পা ছড়িয়ে বসে তাইরে নারে বলে গান আরম্ভ করলে। হঠাৎ শুনতে পেলে ঝিঁ ঝিঁ সুরে কে যেন কথা কইছে—যেন বহু কালের বুড়ো হাঁপানির রোগী। ভয় পেয়ে চাপা গলায় পঞ্চু জিজ্ঞাসা করলে, 'কে গা? কে তুমি আমায় ডাকছ?'

উত্তর শুনলে, 'আমার নাম ঝিল্লী চক্রবর্তী—আজ শতাব্দীকাল তোমার বাস্তুভিটায় বসতি করে আসছি।'

পঞ্চু বললে, 'তাহলে এক ছেড়ে দুই শতাব্দী হতেও আটক নেই; এখন এ বাড়ি আমার—মানে মানে অন্যত্র যাও, নইলে ভালো হবে না বলছি।'

ঝিল্লী বললে, 'যাব তো বটেই,—তার পূর্বে গুটিকত সত্য কথা শুনিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।'

পঞ্চু বললে, 'নাও, নাও, কী বলবে চটপট সেরে ফেলো।'

ঝিল্লী বললে, 'দেখো বাছা, যেসব ছেলে মা-বাপের অবাধ্য হয়, বাড়ি ছেড়ে পালায়, তাদের কপালে

বড় দুঃখই লেখা থাকে ! সুখের মুখ দেখা জীবনে ঘটে না, তারপর যখন দিন আর থাকে না, তখন চোখের জলে নাকের জলে সেই কথাই বার বার মনে করতে হয় ।'

পঞ্চু বললে, 'যাই বল আর যাই কর, আমি কাল ভোর হতে না হতেই পালাচ্ছি । বাড়ি যদি থাকি বাবা তো নাকে ধরে পাঠশালা পাঠাবেনই, পড়াশুনা করতে হবে ; তার চেয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালে আর গাছে পাখির ছানা চুরি করতে পারলে সুখে থাকব ।'

ঝিঁঝি তবু বললে, 'হায় হায়, এমন কাজ কোরো না, তাহলে একদিন আস্ত গাধা হয়ে দাঁড়াবে আর দেশসুদ্ধ লোকে তোমায় দেখে হাসবে ।' পঞ্চু রুখে বললে, 'চুপ কর্ প্যাঁচামুখো, তোর আর অত পণ্ডিতি করতে হবে না ।'

এই ঝিঁঝি ভারি জ্ঞানী ছিল, বয়সে আর বিদ্যায় । পঞ্চুর বেয়াদবিতে না চটে বললে, 'দেখো, যদি লেখাপড়া না কর, তবে কোনো ব্যবসা শেখো, সদুপায়ে দু পয়সা এলে খেয়েপরে থাকতে পারবে ।'

পঞ্চুলাল নবাবী চালে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, পা দোলাতে দোলাতে বললে, 'দেখো ঝিঁঝি, দুনিয়ায় যত ব্যবসা আছে তার মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার ব্যবসাটা আমার বেশ লাগে ! খাও দাও, ঘুমোও, দুটো গাল্পগল্প কর, যেখানে প্রাণ চায় যাও—এই যাকে বলে ভবঘুরে আর কি ! লেখাপড়া, কাজকর্ম এসব আমাকে দিয়ে হচ্ছে না মশায় ।' আগের মতো শান্তভাবেই আবার ঝিঁঝি বললে, 'দেখো, এ সব যারা করে, হয় তারা হাসপাতালে নয় জেলখানায় গিয়ে মরে ।'

এবারে পঞ্চুলাল চটে গেল, ঝাঁপিয়ে উঠে বললে, 'চুপ রাও! মুখে মশায়ের ভালো কথা নেই —শুধুই অমঙ্গল ডাকছে! কোথাকার অলক্ষুনে—'

ঝিঁঝি বললে, 'বাছা পঞ্চু, তোমার জন্য আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।'

পঞ্চু— 'কেন আমার উপর এ দয়া?'

ঝিঁঝিঁ—'কেন? এক তো তুমি খেলার পুতুল—তার চেয়ে দুঃখের কথা মাথাটি একেবারে নিরেট!'

এবারে রেগেমেগে পঞ্চু হাতুড়িটা ছুঁড়ে দিলে, ঝিঁঝিকে ভয় দেখাবে বলে, কিন্তু হাতুড়িটা লাগল ঠিক তার মাথার উপরে। কান্নার সুরে একটিবার ঝিঁ করেই সে মরে পড়ে গেল। মাথাটা থেঁতলে গেল, শরীরটা শুকনো খড়ের মতো মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, জন্মাবধি পঞ্চুর মুখে একদানা খাবারও ওঠে নি, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, মাথা ঘুরে উঠছে, আর দাঁড়াতে পারে না—হাতড়ে হাতড়ে ঘরময় খুঁজে দুটি গুমো চিঁড়ে আর একটু মাতা গুড় ছাড়া আর কিছুই পেলে না। সেটুকু মুখে দিয়ে খিদে কমা দূরে থাকুক, আরও যেন বেড়ে উঠল, হাই তুলতে তুলতে চোয়ালে ব্যথা ধরে গেল; একবার তো একেবারে ঘুরেই পড়েছিল, কোনোরকমে সামলে নিয়ে ভাবলে, আহা, ঝিঁঝি মশায় ঠিকই বলেছিল, বাড়ি ছেড়ে যদি না পালাই তবে আর এ দশা হয় না। বাবাকেও তবে পুলিসে ধরে না, আমিও না খেয়ে মরি নে। হায় হায়, খিদের মতো ব্যামো কি আর আছে? পঞ্চু থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠতে লাগল। যখন আর সহ্য করতে পারে না তখন ভিক্ষার চেষ্টায় বাড়ি হতে বেরিয়ে পড়ল, যদি কারো দয়া হয়, যদি কেউ একমুঠো অন্ন দেয়।

শীতের ঝোড়ো রাত, কড়কড় করে বাজ পড়ছে আর বিদ্যুৎ অনবরত এমনি চমকাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন সারাটা আকাশে আগুন লেগেছে। পঞ্চু বেচারী বজ্র বিদ্যুৎকে ভারি ডরাত। কিন্তু মনে হয় যেমনই হোক পেটের খিদেটা তার চেয়েও ভয়ানক। করে কী, কাজেই বাড়ির দরজা আবজে দিয়ে, পাড়ার দিকে দৌড় দিলে। রাস্তা সব অন্ধকার, দোকানপাট বন্ধ, পথে একটা কুকুরের নাগাল পাবার জো নেই। মনে হচ্ছিল শহরটা যেন মরে পড়ে আছে। এ স্থলে আর এ সময়ে ভিক্ষার আশা দুরাশা। ঝোড়ো কাকের মতো ভিজে, কাঁপতে কাঁপতে পঞ্চু ফের বাড়ি ফিরল। খিদেয় শ্রান্তিতে, বৃষ্টিতে ভিজে এমনি কাঁপুনিটাই ধরেছে যে দাঁড়াতে পারে না। উনানে কাঠকুটো দিয়ে একটু আগুন করে তারি পাশে শুয়ে পড়ল। শরীরটা গরম করবে বলে চুলোর পাশেই শুয়েছিল, আর পা দুখানি হিমে অসাড় হয়ে গিয়েছে বলে চুলোর মুখে এগিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। পা দুখানি কাঠের, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে তাতে আগুন লেগে পুড়ে কয়লা হয়ে উঠেছে সে বোধও তার ছিল না। সে এমনি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল যে পা দুখানি যেন আর কারো।

[ক্রমশ

সাপ—দু-চার কথা

জীবন সর্দার

খা খা খা খা বোক্‌খিলারে খা। এ···ই খা খা খা খা···।

বেদে আর বেদেনী এসেছে। নিয়ে এসেছে সাপের ঝাঁপি। বেদেনী একটা করে আধমরা সাপ বের করছে আর সুর করে চেঁচিয়ে চলেছে—খা খা খা খা।

সবগুলো ঝাঁপি সে খুলল না। কিন্তু ভিড় জমে গেল সব দিকে। ভিড়ের মধ্যে এক কোণে আমিও জায়গা করে নিলাম। বেদে ধরল বাঁশি। এক হাতে বাঁশি ধরে অন্য হাত মুঠি করে সাপের মুখের কাছে নেড়ে নেড়ে সে সাপের নাচ দেখিয়ে চলল।

সবশেষে, খুব সাবধানে, বেদেনী যাকে বার করে দিল সে কেউটে। বেরিয়েই সোজা ফণা তুলে ধরল।

বেদেনী একটু ভূমিকা করে বলল, 'তফাত যান বাবুরা, এ কালকেউটে।' তার কথায় কাজ হল।

বেদে বাঁশি বাজিয়েই চলেছে। তার হাতের মুঠি ঘুরছে সাপের মুখের কাছে। তার চোখ সাপের দিকে। সাপের চোখ কোন্ দিকে—বাঁশির দিকে, না হাতের দিকে—বোঝা যাচ্ছে না।

কেউটেটা একটু পিছিয়ে গেল বেদের কাছ থেকে। বেদে একটু এগিয়ে গেল। বাঁশি বাজছে, হাত ঘুরছে। ফোঁস করে কেউটেটা ছোবল মারল। বেদে হাতটা ঠিক সেই মুহূর্তেই সরিয়ে নিয়েছে, ছোবল পড়েছে মাটিতে।

এমনি করে কয়েকবার ব্যর্থ হল কেউটের ছোবল। এঁকেবেঁকে সাপটা আরও কিছু পিছিয়ে যাওয়াতে, বাঁশিটা নামিয়ে রেখে, ডান হাত আগের মতোই ঘোরাতে ঘোরাতে বাঁ হাতে সাপের লেজ ধরে বেদে সাপটাকে কাছে টানল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কেউটের অমোঘ ছোবল পড়ল তার বাঁ হাতের কবজিতে।

আমি চমকে উঠলাম।

বেদেনী বেদের হাতের দু জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। কিছুটা রক্ত টিপে বের করে দিল ক্ষত

থেকে। আর ছুচঁলো একটা কাঁটা দিয়ে খুঁটে খুঁটে সাপের মুখটা রক্তাক্ত করে ফেলল।

সেদিনের খেলা ওইখানেই শেষ।

এই ঘটনা থেকে তিনটি বিষয়ের দিকে আমি প্রকৃতি-পড়ুয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

এক ॥ সাপটা কী কারণে ফণা তুলে দুলছিল—বাঁশির শব্দে, না হাত-নড়া দেখে ?

দুই ॥ সাপ কি তেড়ে আক্রমণ করে ?

তিন ॥ সাপের বিষে বেদের কিছু হল না কেন ?

প্রথম প্রশ্নটার উত্তরে এক বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার ফল আর সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি।

পরীক্ষা : একটা রোল থেকে কিছুটা 'স্টিকিং প্লাস্টার' ফিতে কেটে নেওয়া হল। তা দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ একটা কেউটের মুখ আর চোখ এমনভাবে ঢাকা হল যে সে দেখতে না পায় বা কামড়াতে না পারে।

এবার সাপকে ছেড়ে দিয়ে ফণা তুলতে দেওয়া হল। তারপর তার সামনে বিউগল বাজানো হল, ক্যানেস্তারা পেটানো হল।

ফল—দেখা গেল তার সামনে যা কিছু হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না বা আমল দিচ্ছে না।

মেঝেতে চেয়ার হিড়হিড় করে টেনে নেওয়া হল, কেউ মেঝেতে শব্দ করে হেঁটে গেল।

ফল—সঙ্গে সঙ্গেই সে ফুঁসিয়ে উঠল শব্দ লক্ষ্য করে।

সিদ্ধান্ত—বাতাসে ভেসে আসা শব্দ সাপ শুনতে পায় না। কিন্তু যে তলে সে আছে সেখানে শব্দ হলে খুব ভালো বুঝতে পারে। এ বিষয়ে সকল বৈজ্ঞানিক একমত।

বেদের বাঁশি শুনে কেউটে দুলছিল না। দুলছিল—বাঁশি-নড়া আর হাত-নড়া দেখে।

*

দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তরে আমি তোমাদের অন্য এক বৈজ্ঞানিকের জীবনের একটি ঘটনা বলব। তার আগে জানা দরকার 'তেড়ে এসে আক্রমণ করা' বলতে কী বোঝায় ?

আমার মতে, সাপকে তারা করলে, বিরক্ত করলে বা আঘাত করলে তারপর যদি সে তাড়া করেও তবুও 'তেড়ে এসে আক্রমণ' বোঝাবে না। বোঝাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা।

কিন্তু কোনো সাপকে আমি কোনোভাবেই অশান্ত করলাম না, তবুও সে যদি আমাকে এসে 'কাটে' তবে তাই হবে 'তেড়ে এসে আক্রমণ' করবার সরল উদাহরণ।

সাপের বদনামটুকু সবাই গায় কিন্তু খুঁজে দেখে না তার আক্রমণ করবার ইতিহাসটুকু। যে মানুষ বিষধর মাপের কামড়ে মারা যায় সে মানুষ সে সাপের খাদ্য নয়। তাহলে বেদেকে কামড়ে দেবার কারণ কী ? বেদে যে সাপের লেজ ধরে টেনে তাকে উত্তেজিত করেছিল সে কথা তোমাদের বলেছি। তাহলে সাপের দোষ কোথায় ?

সাপের সপক্ষে একটা গল্প শোনো। বিশেষ এক জাতের পাখির খোঁজে একজন বৈজ্ঞানিক আসামের পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরছিলেন। একঝাঁক পাখি দেখতে গিয়ে তিনি আনমনে পা ফসকে গড়িয়ে

পড়ে গেলেন। গড়াতে গড়াতে যেখানে গিয়ে আটকালেন চুপচাপ সেখানে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল আঙুলের মধ্যে দিয়ে কী যেন চলে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দে ঘাড় তুলে দেখলেন আট ফুট লম্বা এক গোখুরো তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে আপনমনে চলেছে। সাপটা অদৃশ্য না হওয়া অবধি তিনি চুপচাপ রইলেন। সাপের স্বভাব যদি খারাপ হত তবে ওঁদের দুজনের ছাড়াছাড়ি এত সহজে হত না।

*

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব দেবার আগে সাপের বিষ আর বিষদাঁত সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানা দরকার।

ইনজেকশন দেবার ছুঁচ যেমন হয়, সাপের বিষদাঁতও তেমনি ধরনের। ছুঁচের ভেতর দিয়ে যেমন ওষুধ গড়িয়ে আসে সাপের বিষদাঁত দিয়েও তেমনি গড়িয়ে আসতে পারে বিষ। বিষদাঁতের সঙ্গে বিষের থলির যোগ রয়েছে এমনভাবে যে বিষদাঁত কোথাও ফোটালে থলিতে আপন হতে চাপ পড়ে আর বিষ দাঁতের মাথায় চলে আসে।
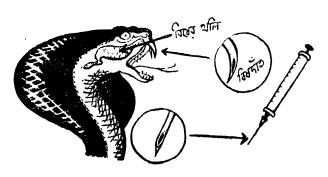
সাপের বিষ শরীরে তিনভাবে ক্রিয়া করতে পারে: রক্তের সঙ্গে, স্নায়ুর উপর এবং দেহের কোষের উপর।

কেউটে বা গোখুরো-জাতীয় সাপের বিষ দ্বিতীয় শ্রেণীর, যা পশুপাখির স্নায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

বেদের বেলায় কী কী ব্যাপার ঘটতে পারে এসো দেখা যাক :

(ক) সাপের বিষ মোটেই ছিল না, (খ) বিষের বেশি তেজ ছিল না, (গ) বিষ শরীরে যেতে পারে নি, (ঘ) বেদের শরীরে বিষ প্রতিরোধের শক্তি ছিল, এবং (ঙ) বেদে এমন মন্ত্র জানে যা দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়া যায়।

এসো, কারণগুলোকে এক-এক করে বিচার করি। বিষদাঁত আর বিষের থলি সাপুড়েরা তুলে ফেলতে পারে। বিষের থলি টিপে টিপে (দুইয়ে) সাপের বিষ বার করা যায়। ফলে কম বিষে কম জোর হবে। কেউটের ছোবল এমনভাবেও লাগতে পারে যে বেদের শরীরে বিষ ঢোকে নি, চামড়া কেটেছে মাত্র। সাপের বিষ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা বেদের দেহে না থাকলেও মনে থাকে। মনের জোর কি কম জোর?

শেষ যুক্তিটা একদম মানি না। কেন জান? বেদেরাই বলে, ওদের মন্ত্র—সাহস আর বুদ্ধি।

কেউটের ছোবলে বেদের কেন কিছু হল না তার আসল কারণ এবার শোনো। সাপটার বিষদাঁত আর থলে সবই তুলে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু বিষদাঁত ছাড়াও সাপের মুখে অন্য দাঁত থাকে; তাই

দিয়েই কেটে গিয়েছিল বেদের হাত। কোনোভাবেও সাপের মুখে যদি একটু বিষ থাকে এই ভয়ে বেদেনী তার বেদের হাতে এমন বাঁধন দিয়েছিল যাতে রক্তের সঙ্গে বিষ শরীরে ছড়াতে না পারে।

সেই বেদেটা আজও বাঁশি বাজায়, সাপ নাচায়। কিন্তু সেই সাপটাকে আর দেখি না।

নতুন পড়ুয়া

(৫২) রঞ্জনা বাগচী, কলকাতা-২০ ॥ (৫৩) দেবযানী দত্ত, কলকাতা-৫ ॥ (৫৪) অভিসার সেনগুপ্ত, কলকাতা-২৯ ॥ (৫৫) বিপুল গুহ, গাঙ্গুটিয়া চা-বাগান, জলপাইগুড়ি ॥ (৫৬) ভাস্কর গুপ্ত, কলকাতা-২৯ ॥ (৫৭) অভিজিৎ রায়, কলকাতা-১৪ ॥ (৫৮) বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৪ ॥

কোথা থেকে এল

জ্যোতিভূষণ চাকী

খিচড়ি

'খিচড়ি' অর্থে 'খেচরান্ন' বলে একটা শব্দ আছে অভিধানে। কিন্তু 'খিচড়ি' 'খেচরান্ন' থেকে আসে নি। 'খিচড়ি' শব্দেরই সাধু সংস্করণ হিসেবে তৈরী হয়েছে শব্দটি।

'খিচড়ি' এসেছে সংস্কৃত 'কৃশর' বা 'কৃসর' থেকে। 'কৃশর' মানে চাল ডাল আদা আর হিং এক-সঙ্গে করে জল দিয়ে পাক করা অন্ন। কৃসর—কিসর—কিছর—খিচর, তারপর 'ই' যোগ করে খিচরি—খিচড়ি। (শব্দের শেষে 'ই' বা 'ঈ' যোগ করার প্রবণতা বাঙলায় আছে—যেমন পিণ্ড থেকে পিণ্ডি, সত্য থেকে সত্যি, ইংরেজী বেঞ্চ থেকে বেঞ্চি)। আর বাঙলাদেশে 'খিচরি' 'খিচড়ি' হয়ে ওঠবার তো বাধাই নেই, পূর্ববঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গেরও কোনো কোনো জায়গায় 'র' 'ড়' হয়ে ওঠে ('ঘরভাড়া' হয়ে ওঠে 'ঘড়ভারা')। সংস্কৃত 'কৃশর' বা 'কৃসর'ই যে আমাদের 'খিচড়ি' সে কথা উইলসন সাহেবও বলেছেন তাঁর সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানে।

খাতা

সংস্কৃতে 'খাতক' মানে যে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে। এই খাতক বা কর্জকারী ব্যাপারীর লেনদেনের হিসাব যে বইতে লেখা থাকত তাকে বলা হত 'খাতকবহি'। খাতাবহি—খাতাবই—খাতা। খাতা খোলা মানে হিসাব খোলা, লেনদেন আরম্ভ করা। খাতাপত্তর=হিসাব কেতাব। খাতা লেখা মানে দিনের শেষে কারবারের দৈনিক কেনাবেচার হিসাব লেখা। আগে 'খাতা' শুধু হিসাবের বইকেই বলা হত, এখন—যে কোনো খাতা : হাতের লেখার খাতা, ছবি আঁকার খাতা, কবিতা লেখার খাতা। 'খাতা' শব্দটি গড়ে ওঠার ব্যাপারে আরবী 'খৎ' শব্দটির প্রভাব থাকা সম্ভব। খৎ মানে হস্তলিপি। হস্তলিপিকে যা ধরে রাখে তাই তো খাতা।

লিয়রের ছড়া

সত্যজিৎ রায়
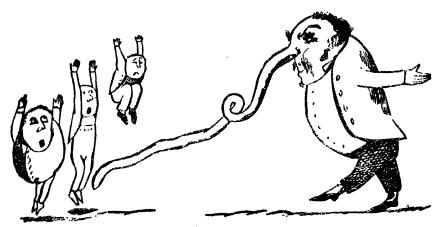
এক যে সাহেব তার যে ছিল নাক
দেখলে পরে লাগত লোকের তাক।
হাঁচতে গিয়ে হ্যাচ্চো হ্যাঁচ
নাকের মধ্যে লাগল প্যাঁচ.
সাহেব বলে, 'এইভাবেতেই থাক।'

পাগলা গোরু সামলানো যা ঝক্কি,
আমার কথা শুনবে কোনো লোক কি ?
কাছে যখন পড়বে এসে
বলবে তারে মিষ্টি হেসে,
'আমার ওপর রাগ কোরো না লক্ষ্মী !'

কেনারাম ব্যাপারীর ভৃত্য
বায়সের সাথে করে নৃত্য।
লোকে বলে, 'এইভাবে
কাকটার মাথা খাবে।
ঢং দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।'
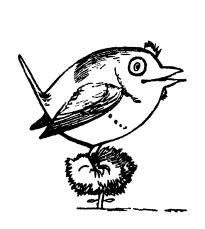
শাল্‌কের শ্যাম গাঙুলী
হেসে বলে, 'যাই, ফুল তুলি।'
গিয়ে দেখে বাগানেতে
ফুলগাছে ওত পেতে
বসে আছে রামবুলবুলি।

এ.সি. সরকারের

ম্যাজিক কবিতা

ছবি। সমর দে

মোমবাতি চিবিয়ে খাওয়া

ভোজের টেবিলে খেয়ে
ফ্রাই, চপ, কাটলেট—
যার-পর-নাই ভাই,
ভরপুর হল পেট !
তবু করি খাই খাই—
খুঁজি আরও খাদ্য,
মিটায় আমার ক্ষিদে
আছে কার সাধ্য ?
ওই দেখি মোমবাতি—
জ্বলে আলো ঝলমল।
তাই দেখে লোভী এই
রসনায় এল জল।
ধরে তাই মুখে পুরি
আগুনটা নিভিয়ে।
দমন করি হে ক্ষিদে
মোমবাতি চিবিয়ে।
লম্বা ঢেঁকুর তুলি—
গিলে এক গ্লাস জল।
আমার এ কাণ্ড দেখে,
সবে হয় চঞ্চল !

অবাক হবার মতো
কিছু এতে নাই যে।
আগেভাগে প্রস্তুত—
হয়ে থাকা চাই হে।
আপেলের দেহ থেকে
জুতসই কায়দায়,
নকল এক মোমবাতি
সহজেই গড়া যায়।
কাঠ-বাদামের শাঁস—
পলতের বদলে,
রাখা হল ঠিকমত,
আগুনেতে তা জ্বলে।
আপেলেতে গড়া বাতি-
অখাদ্য মোটে নয়।
নির্ভয়ে খেয়ে করি,
সকলের মন জয়।
করে দেখো তোমরাও,
বাহবা পাবেই ভাই।
নকল বাতিটা গড়া—
নির্ভুল হওয়া চাই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

॥ পাঁচ ॥

আর তো দেরি করা চলে না, পায়ে পায়ে রাখাল ভুতো এগিয়ে যায়।

ফুটফুট করছে পরিষ্কার পথঘাট। ধারে ধারে বড় বড় গাছ। একটা কুয়োও রয়েছে মোড়ের মাথায়। তার কাছে একরাশি ডাব নিয়ে একটা বুড়ি বসে রয়েছে গাছের তলায়।

রাখাল জিগগেস করলে, ও বুড়ি মা, ডাব কত করে?

বুড়ি একগাল হেসে বললে, যত খেতে পারবে তত করে পাবে। তবে শাঁস-টাঁস সব খেতে হবে। নষ্ট করতে পাবে না কিন্তু। খোলাগুলো হোথা ঢিপির মধ্যে ফেলো।

এ আবার কী গোলমেলে কথা। বুড়ির আস্পর্ধা তো কম নয়। ভুতো ওর কানে কানে বললে, রাগিস নে, বোধ হয় মিনি পয়সায় দিচ্ছে।

বাস্তবিক তাই। সবাই একটা করে ডাবের জল খেয়ে, শাঁস চেঁছে খেয়ে, আবার এগুতে লাগল। ভুতো মনে মনে ভাবলে, কী কাণ্ড দেখ! পয়সা লাগল না। এখানকার বড়লোকটি নিশ্চয়ই খুব দয়ালু, তাই এই রকম ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

ওই বড়লোকটির সন্ধান নিতে হবে, হয়তো কিছু লাভ হতে পারে। মুখে জিগগেস করলে, এসব ডাব-টাব কার?

তারা তো অবাক! ডাব আবার কার হবে? ডাব তো গাছে ফলে, যত যত্ন করবে তত বেশি ফলবে। ওর আবার আমার তোমার কী?

কিন্তু ওই বুড়িকে তো কিছু দিতে হয়!

কেন, বুড়িকে কিছু দেবে কেন? ওর আবার কিসের দরকার?

তা না হলে ও ডাব নিয়ে বসবে কেন?—লোকগুলো হেসে উঠল—বসবে না? বাঃ। ওই তো ওর কাজ। আহা, খেতে-টেতে হয় তো ওকে। ঘর চাই তো একটা?

তা তো চাই-ই। ও তো বাগানবাড়ির সব চাইতে ভালো ঘরে থাকে। তার চাইতে ভালো ঘর আমাদের দেশেই নেই।

ভুতো আর থাকতে না পেরে পট করে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে…

রাখাল ভুতোর কেমন যেন গোলমাল লাগছিল, কিন্তু আর কিছু জিগগেস করতে বাধো-বাধোও ঠেকছিল। দেশটাকে আগে একটু পরখ করে নেওয়া দরকার, যে যা বলে অমনি মেনে নিলে চলবে কেন।

ততক্ষণে ওরা ছায়ায় ঘেরা মস্ত একটা বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। সে কী সব ফলের গাছ! থোলো থোলো পাকা ফল ঝুলছে। নধর চেহারার গোরুবাছুর এমনি ছাড়া রয়েছে। এক জায়গায় একপাল পাঁঠার ছানা নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে কেউ নেই। টপ করে একটা তুলে নিলেই বা কে জানছে?

ভুতো রাখালের কানে কানে বললে, নিয়ে কোনো লাভ নেই রে, কী করবি?

তাই তো, এ কথাটা তো রাখালের এতক্ষণ মনেই হয় নি, এখন এসব নিয়ে করবে কী? আগে একটা আস্তানা হোক নিজেদের। তারপর দেখা যাবে হট্টমালার লোকেরা ঠাট্টার পাত্র কিনা! হট্টমালা। শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।

॥ ছয় ॥

ততক্ষণে বেলা বেড়ে উঠেছে। রাখাল ভুতোর ঘুম ঘুম পাচ্ছে। অভ্যেস তো নেই দিনে জাগবার, ওদের কাজ হয় রাত্তিরে। এমনি সময় একটা মস্ত বাড়ির সামনে ওরা এসে পৌঁছল।

এরকম বাড়ি রাখাল ভুতো চোখে দেখে নি কখনও। আগাগোড়া কাঠের তৈরী, বাড়ি ঘিরে চওড়া কাঠের

বারান্দা, তার ধারে ধারে সে কী ফুলগাছের বাহার। তার গন্ধেই মন ভালো হয়ে যায়, চোখে দেখবারও দরকার করে না।

ভুতো আর থাকতে না পেরে পট করে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে শুঁকতে লাগল। অমনি হাঁ-হাঁ করে একদল লোক ছুটে এল, যেন কত বড় অন্যায় করেছে।

ও কী করলে? ও কী করলে? মিছিমিছি ফুল ছিঁড়লে কেন?

ভুতো এমনি চমকে গেল যে জিভ কামড়ে ফেলল। তাড়াতাড়ি পথের মাঝখানে ফুলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। অদ্ভুত সব লোক—সোনার থালা নিলে কিছু বলে না, অথচ সামান্য একটা ফুল নিয়েছে তো মহাভারত যেন অশুদ্ধ হয়ে গেছে! থাক গে বাবা, কী দরকার ফুল নিয়ে।

সঙ্গের লোকেরাও ব্যস্ত হয়ে উঠল। একজন ছুটে গিয়ে ফুলটা তুলে আবার ভুতোর হাতে গুঁজে দিল। ভাই, নষ্ট করবে ওটাকে? তাছাড়া পথটা নোংরা দেখাবে যে।

রাখাল খেঁকিয়ে বললে, ফুল ছেঁড়া যে তোমাদের দেশে বে-আইনী তা ও জানবে কী করে? আর ছিঁড়েই যখন ফেলেছে, তখন আবার নষ্ট হবে না তো কি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হবে ওটাকে?

বারান্দায় একটু খাটো করে কাপড় পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, সে হেসে বললে, কেন? নষ্ট করবে কেন ভাই? কানে গুঁজে রাখলেই তো হয়।

ন্যাকা। কানে গুঁজলে নষ্ট করা করা হল না? ওর থেকে কি ঘরে পয়সা আসে নাকি।

সে বললে, বাঃ রে! দেখতে তো ভালো লাগে, গন্ধ তো নাকে আসে। তবে আর নষ্ট হল কই? এ আবার কেমন কথা তোমার ভাই?

বলতেই সঙ্গীরা একসঙ্গে ফিসফিস করে বললে, ওরা যে হট্টমালার দেশ থেকে এসেছে।

ও, তাই বলো! আচ্ছা ভাই, এদিকে এসো তো আমাদের সঙ্গে।

চারদিকে লোক গিজগিজ করছে। তবে কি এটা একটা কাছারি নাকি? জমিদারের সেরেস্তা নয় তো? কিন্তু তাই যদি হবে তো জমিদার কই? নায়েব কই? মুহুরিরা কই? প্রজারা কই? রাখাল ভুতো অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে, তবে পাছে বে-ফাঁস কিছু বেরিয়ে যায় তাই মুখে কিছু বলে না।

ওরা বাড়িটার সামনের দিয়ে ঢুকে, পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল। ছোট কাছারি, ওই একসারি ঘর, নায়েব গোমস্তা কাকেও দেখা গেল না। সবাই সাদা জামা কাপড়, একটু খাটো করে পরে, যে যার কাজ নিয়ে মেতে আছে।

মাঝখানে একটা বড় পুকুর, তার চারধারে বাগান, বাগানের ছাউনি আবার আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে তৈরী, কয়েকটা ঘর রয়েছে। জমিদারের পয়সা আছে বলতে হবে। আশ্চর্য যে এতগুলো খাটো-কাপড়-পরা, খালি-পা লোক যেখানে ইচ্ছে যাওয়া আসা করছে, অথচ কেউ কিছু বলছেও না।

ওদের দেখে দিকদার একটা কাঁচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিরক্ত হয়ে বলল, এই এতক্ষণ বাদে আসা হল? নাও, নাও, এখন কাজে লেগে যাও সব। এইটুকু বলেই সে ফিরে যাচ্ছিল, রাখাল এগিয়ে এসে বলল, চলে যাচ্ছেন কি? আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিন।

দিগদার বললে, কী জ্বালা! দেখেশুনে কাজ ঠিক করে নিতে পারবে না? রোসো, পুকুর সাফ করতে পারবে?

ওরা মাথা নাড়ে। ওরা চায় ঘরের কাজ। তার আগে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভালো। সবাই আশ্চর্য

হয়ে গেল, দিনের বেলা কেউ ঘুমোয় নাকি ? কিন্তু রাখাল যখন বুঝিয়ে বলল যে পরশু সারারাত নানান বিপদের মধ্যে কেটেছে, কাল রাতেও ঘুমোবার সুবিধে হয় নি, অমনি ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, তা হলে চলো, একটু জিরিয়ে নেবে চলো। সত্যি তো, শরীর সুস্থ না হলে খাটবে কী করে। এসো আমার সঙ্গে।

নিয়ে গেল যেন নন্দনকাননের মধ্যে দিয়ে। নন্দনকানন অবিশ্যি ভুতো রাখাল চোখে দেখে নি, কিন্তু গত বছর দোলতলার মেলায় বর্ধমান থেকে শখের থিয়েটার এসেছিল, তারা কেমন উঁচু করে তক্তাপোশ বেঁধে তার পেছনে মস্ত নন্দনকাননের ছবি টানিয়েছিল। এ তার চাইতেও বড় আর অনেক বেশি সুন্দর ; তার জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া ছিল। তবে সেদিন রাখাল ভুতো বেশিক্ষণ থিয়েটার দেখে নি। গাঁয়ের লোক ঘর ছেড়ে থিয়েটার দেখছে যখন, সেই হল ভুতো রাখালের কাজের সময়। আজ এ বাগানটাকে প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া গেল।

উঁচু করে বাঁধানো একটা জায়গা, মাথার উপর কাঠের ছাদ, চারদিকে ফুল ফুটেছে। সঙ্গের লোকটি বললে, এখেনেও মাদুর পেতে জিরুতে পার। আবার ওই ঘরগুলোর যে কোনোটাতে শুতে পার, যেমন তোমাদের ইচ্ছে। আমি ভাই কাজে চললাম। খাবার সময় ডেকে নিয়ে যাব।

তাই তো চায় রাখাল, নিরিবিলি একটু ঘুরে দেখতে চায়। বললে, ছাখ ভুতো, বাইরে পাঁচজনের মধ্যে শুলে আমাদের সুবিধে হবে না। ঘরই ভালো, কী বলিস ?

ভুতো জবাব দেয় না কেন ? ফিরে তাকিয়ে দেখে কোনা থেকে একটা মাদুর নিয়ে সে শোবার ব্যবস্থা করছে।

তুই কি খেপলি, ভুতো ? এখন শুতে আছে ? আর হয়তো সারাদিনের মধ্যে নিরিবিলি পাবি নে। চল, ঘরগুলোতে তেমন কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি।

ভুতো কিন্তু টান হয়ে মাদুরে শুয়ে পড়ে বললে, না রে, আমাদের কিচ্ছু রাখবার জায়গা-টায়গা নেই।

রাখাল নিজে একবার ঘুরেঘারে দেখল। সব ঘর খোলা, কোথাও তালাবন্ধ কিছু নেই। ঘর বোঝাই নানান রঙের কাপড়-চোপড় তোরঙ্গে ভরা, কিন্তু তার তালা নেই। লেপ বালিশের পাহাড়। ঘটি, গামছা, তেল, সাবান, তাক ভরে মজুত রয়েছে। যেন বিরাট একটা সংসার, পথের ধারে খোলা রয়েছে, আগলাবার একটা লোক নেই।

মনটা কেমন খিঁচড়ে গেল রাখালের। ফিরে এসে ভুতোকে ঠেলা দিয়ে বললে, দেদার জিনিস। ভুঁই-তরাসির বাজারে নিয়ে গিয়ে একবার ফেলতে পারলে, আর আমাদের কোনো ভাবনা থাকে না। কিন্তু নেব কী করে ?

ভুতো বললে, উঁ ? তাই তো বললাম। বলে পাশ ফিরে ঘুমুতে লাগল। রাখালই বা জেগে থেকে কী করে ? আর একটা মাদুর টেনে ভুতোর পাশে শুয়ে পড়ল। সারা গায়ে ঝিরঝির করে বাতাস দিচ্ছে, দূরে দূরে পাখি ডাকছে, গাছপালার মধ্যে থেকে একটা শিরশির শব্দ আসছে, পেছনে থানার লোক লেগে নেই, আপনা থেকেই চোখ বুঁজে আসে। রাখাল হাত পা মেলে ঘুমিয়ে পড়ল।

।। সাত ।।

যে ওদের পৌঁছে দিয়েছিল সেই ডেকে জাগিয়ে দিল। পুকুরে চান সেরে খাবার জায়গায় যাবার সময়, আর থাকতে না পেরে রাখাল শুধোয়, জিনিসপত্রের একটা গোছগাছ নেই তোমাদের ?

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বললে, কেন, নোংরা জিনিস কিছু দেখলে নাকি ? তাহলে তো দিকদার আমাদের আস্ত রাখবে না।

না, না, তা বলছি নে। তবে অমন করে সব যে খুলে ফেলে রেখেছ, কেউ যদি নিয়ে যায়?

কেন? নেবে কেন?

আহা, দরকার থাকলেও নেবে না?

তা নিক না। সেই জন্যেই তো রাখা।

রাখাল বুঝল তার কথা লোকটা বোঝে নি। আবার বললে, দরকার না থাকলেও যদি কেউ নিয়ে যায়?

পাগল নাকি? কী করবে নিয়ে?

কেন, বেচে ফেলে যদি?

সে আবার কী? এখানে তো বেচবার জায়গা-টায়গা নেই।

রাখালের একটু একটু রাগ হচ্ছিল, বললে, ধরো যদি রেগেমেগে আগুনই লাগিয়ে দিল। কিংবা কেটেকুটে নষ্ট করল। বলা তো যায় না।

সে চিন্তিত হয়ে বললে, না, না, সে যে বড় খারাপ কাজ। লোকে ওরকম করবে কেন?

আরে, সবাই কি আর ভালো লোক। ধরো যদি ওরকম করেই, তাহলে তোমরা তার কী কর? তাকে হাকিমের কাছে বেঁধে নিয়ে যাও না?

লোকটার মুখ দেখে বোঝা গেল সে এর এক বর্ণেরও মানে বোঝে নি। গম্ভীর মুখ করে বললে, ওরকম করা ভারি খারাপ। তাহলে আমরা তার ভারি নিন্দে করব।

শুনে ভুতো রাখাল হেসেই কুটোপাটি। নিন্দে করবে তো ভারি বয়েই গেল। শুধোল, ব্যস! নিন্দে করেই ছেড়ে দেবে! তাকে ফাটকে দেওয়া হবে না? সে এত ক্ষতি করবে তাকে কিচ্ছুটি বলা হবে না?

লোকটি বললে, না, না, কিচ্ছু করা হবে না কে বললে? হবে বই কি। বাঃ, তার চিকিচ্ছে হবে তো।

চিকিচ্ছে? চিকিচ্ছে কেন? তার কি ব্যামো হয়েছে যে চিকিচ্ছে করা হবে?

লোকটি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলে,—হয় নি ব্যামো?—এই যে এসে গেলুম, কোথায় কী খেতে চাও, খাও গে।

ওরা দেখলে মেলা ছোট ছোট খাবারের দোকানের মতন, সেখানে বহু লোকের আনাগোনা। ভুতো মাথা চুলকে বললে, 'যা ইচ্ছে, খাব? এমনি খাব? কেউ কিছু চাইবে না তো?

তারা খুব হাসল। খিদে পেয়েছে তা চাট্টি খাবে না? তার জন্যে আবার কে কী চাইবে?

এ দেশের লোকগুলোর বুদ্ধি দেখে রাখাল ভুতো হাঁ। ভুতোর কানে কানে রাখাল বললে, বুঝলি, এ হল চোরের সগ্‌গ! এমনটি আর কোথাও পাবি নে রে। জিনিসপত্র হাট করে খোলা, থানা-গরাদের নাম শোনে নি কেউ, একটা দারোগা-টারোগা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। তবে আর চাই কী? এখন জিনিসগুলো সরাবার একটা ব্যবস্থা কত্তে পাল্লেই আর আমাদের পায় কে। একবার দেশে গিয়ে পৌঁছুতে পাল্লেই হয়!

ভুতো বড় বড় গ্রাসে মাছভাত খেতে খেতে বললে, আবার সেখেনে ফিরে যাবি নাকি?

রাখাল আকাশ থেকে পড়ল, ফিরে যাবি নাকি মানে? ফিরে যাব না তো এত সব জিনিস নিয়ে করব কী?

ভুতো আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু দেশে গেলে হারু মোড়ল কি আর ছেড়ে দেবে? সঙ্গে সঙ্গে হাজতে ঠুসবে না?

সেও একটা কথা বটে। তার পরেই রাখাল মাথা নাড়া দিয়ে উঠল, যাঃ তোর যেমন কথা! দারোগা ধরে

শুধু তোকে আমাকে। বড়লোকদের বুঝি ধরে কখনও? তখন তো আমাদের মেলা টাকা হবে। ওই হারু মোড়লই এসে কত খোশামুদি করে দেখিস।

আর বেশি কথা বলা হল না, সবাই কাজে যাচ্ছে। সঙ্গে না গেলে আবার কোথা সন্দেহ করবে শেষটা। ভিড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকাই সব চাইতে ভালো।

দিকদারের স্বভাবটাই খিটখিটে। হঠাৎ এসে দেখা দিয়ে বলল, কী হে, এবার কিছু কাজ করবার মতলব থাকলে ঐ ছিদাম, ভজু ওদের সঙ্গে বাকশালের গাছ পাতলা করতে যাও না কেন?

বলেই তক্ষুনি চলে গেল, এরা গেল কি না গেল দেখল না পর্যন্ত। রাখালের হাসি পেল, ছিদামকে বললে, না গেলে ব্যাটা ঠিক জব্দ হয়। ছিদাম বললে, কেন? কিরকম জব্দ হয়? তুমি কাজ না করলে ও কী করে জব্দ হবে?

রাখালের কেমন জেদ চেপে গেল, বললে, বেশ যাব না, যাও। ভুতোর ইচ্ছে হয় যেতে পারে, আমি বেড়াতে চললাম। বলে গাছতলা দিয়ে রওনা দিল। ভুতো ছিদামকে জিগ্‌গেস করল, কাজ না করলে ওকে শাস্তি দেওয়া হবে না?

ছিদাম বললে, না। আসলে ওর চিকিচ্ছে দরকার। দাঁড়াও না, তারো ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু ভুতো আর দাড়াল না, পাঁই পাঁই করে ছুটে রাখালকে ধরে ফেলে বললে, ওরে অমন তড়পাস নি। ওরা তোর চিকিচ্ছে করবে বলছে। যদি আবার হাসপাতালে পোরে? যদি সুই দেয়?

হাসপাতাল শুনে রাখাল শিউরে উঠল।

তবে কি—তবে কি সেইরকম সাঁড়াশি দিয়ে আবার দাঁত তুলে দেবে নাকি? কাজেই ভুতো যেই বললে, কাজ কী, বরং চল, পাঠশালা না কী যেন বলল সেটা দেখেই আসি না। রাখাল কোনো আপত্তি না করে ওর সঙ্গে ফিরেই চলল। ভুতো শুধাল, হ্যাঁ রে, সেই ইঁট হাতে দাঁড়িয়ে রাখত গুরুমশাই তোকে, মনে আছে তোর?

রাখাল বললে, উঃফ্‌! তা আর মনে নেই। সেই যে গুরুমশাইয়ের ঠ্যাঙের ওপর ইটগুলো ফেলে চোঁ চাঁ দৌড় মারলাম, আর ওমুখো হই নি। কিন্তু কী ক্ষতিটা হল, তুই বল? আমি কি করে খাচ্ছি না? ভুতো একসঙ্গে অত কথা বলতে পারে না, তাই খালি বললে, যা বলেচিস্‌!

দুজনায় তো ফিরে এল। কিন্তু পাঠশালাটা আর খুঁজে পায় না। সেই বাগানই হোক কি বনই হোক, তারি মধ্যে ঘুরে ঘুরে দুজনে অবাক। গাছপালা যে এমন সুন্দর হতে পারে ওদের কোনো ধারণাই ছিল না।

একটা লাল কমলালেবুর মতন ফল একেবারে হাতের গোড়ায় ঝুলে রয়েছে। সেটিকে পেড়ে ছাড়িয়ে, এক কোয়া মুখে পুরে, ভুতোর মনে হল মধু! আর অবাক কাণ্ড, একটাও বীচি নেই। মুখ ফিরিয়ে যেই সে কথাটা রাখালকে বলতে যাবে, হঠাৎ দেখে একটা লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে লোকটা, সাদা ধবধবে ধুতি পরা।

ভুতো অমনি কমলালেবু সুদ্ধু হাতটা পেছনে লুকিয়ে ফেলল। বাবা! এখুনি হয়তো গর্দানই নেবে। একটা ফুল তুলেছিল বলে সবাই যা কাণ্ড লাগিয়েছিল!

কিন্তু লোকটা হেসে বললে, কেমন লাগল? এ হল দিকদার গুণমণির কেরামতি, এমন খেয়েছ কখনও? তারপর রাখালকে বলল, কই, তুমিও একটা খাও, খেয়ে বল দিকিনি আমি ঠিক বলেছি কি না! এই বাকশালের কমলামের জুড়ি ফল পাওয়া দায়। কমলাম বুঝলে তো? কমলালেবুর ডালে আমের কলম বসিয়ে, অনেক মেহনত করে তবে কমলাম ফলিয়েছে দিকদার, বললাম না ওরও জুড়ি নেই। দুঃখের বিষয় লোকটা ডাহা পাগল!

[ক্রমশ

সন্দীপকুমার মজুমদার
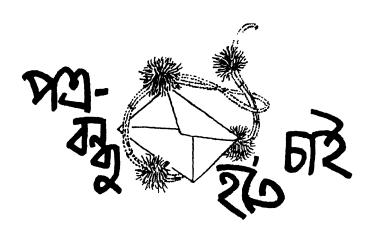
বয়স ১২। ১।১ প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলকাতা-২৫ সপ্তম শ্রেণী। গানবাজনা, ক্রিকেট, ফুটবল, অ্যাথলেটিকস ডাকটিকিট।

স্বাহা লাহিড়ী

বয়স ১২। ২০ কে, ডি, ফ্ল্যাট, বি রোড, 'টেলকো' জামশেদপুর-৪। দশম শ্রেণী। গল্পের বই পড়া, দেশ ভ্রমণ, গল্প লেখা, সেলাই, চিঠি লেখা, ব্যাডমিণ্টন।

প্রমিতা রায়

বয়স ১০। অবধায়ক শ্রী আর. রায়, পূর্বপল্লী, পোঃ অঃ শান্তিনিকেতন, বীরভূম। সপ্তম শ্রেণী, হকি, বাস্কেটবল, টেনিকয়েট, ডাকটিকিট, গান, অটোগ্রাফ, সাইকেল চড়া।

সুন্দরলাল ভট্টাচার্য

বয়স ১০। ১৩।৩ ছিদাম মুদি লেন, কলকাতা-৬। ষষ্ঠ শ্রেণী। গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, অভিনয়, আবৃত্তি।

নীলাঞ্জনা মুখোপাধ্যায়

বয়স ১১। অবধায়ক শ্রী এস. কে. মুখোপাধ্যায়, আর ব্লক ৬২০, নিউ রাজেন্দ্রনগর, নিউ দিল্লী-৫। ডাকটিকিট, ছবি আঁকা, কবিতা ও গল্প লেখা।

অভীক ভট্টাচার্য

বয়স ১১। অবধায়িকা শ্রীগৌরী ভট্টাচার্য, ৫৮ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলকাতা-২৬। সপ্তম শ্রেণী। ধাঁধা ও অঙ্ক, গান, তবলা।

অপর্ণা সেন

বয়স ১৩। ৫৫ সুবারবান স্কুল রোড, কলকাতা-২৫। অষ্টম শ্রেণী। খেলাধুলা, ক্রিকেটারদের ছবি সংগ্রহ, আবৃত্তি, গল্পের বই পড়া।

প্রদীপকুমার দে

৩ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬। নবম শ্রেণী (বিজ্ঞান) ডাকটিকিট।

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

বয়স ১০। ২৮ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪। সপ্তম শ্রেণী। গল্পের বই পড়া, মহাকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ, খেলাধুলা।

অক্ষয়কুমার দে

বয়স ১৩। ৯।বি সেক্ ব্রাদার্স কলোনি, তিনসুকিয়া আসাম। নবম শ্রেণী। ডিটেক্‌টিভ গল্পের বই পড়া, গল্প লেখা, ছবি আঁকা, ব্যায়াম।

ঈশানী গুপ্ত

বয়স ১৩। ১২৫ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯। অষ্টম শ্রেণী। ছবি আঁকা, ফার্স্ট-ডে কভার জমানো, দেশ বিদেশের পুতুল সংগ্রহ করা। খেলাধুলায়, ছবি আঁকাতে

অথবা গান-বাজনাতে আগ্রহ আছে এই রকম পত্রবন্ধু চাই।

কৃষ্ণা মুস্তাফী

বয়স ১২। অবধায়ক শ্রী এস, মুস্তাফী, সিনহা লাইব্রেরী রোড, পাটনা। ছবি আঁকা, ইংরাজী গল্পের বই পড়া, বিদেশী গান-বাজনা শোনা, দেশ-ভ্রমণ।

মণিদীপা সেনগুপ্ত

বয়স ১৩। অবধায়ক ডাঃ সবিতাভ দাসগুপ্ত, ১৩ হিলভিউ রোড, জামশেদপুর, বিহার। অষ্টম শ্রেণী। নাচ, গান, অটোগ্রাফ সংগ্রহ, গল্পের বই পড়া।

নবেন্দু গাঙ্গুলী

বয়স ১৬। এস।২৭ কোল বোর্ড কলোনী, ধানবাদ, বিহার। প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন, ক্যারাম, টেবল টেনিস, ভ্রমণ।

রুমা সেনগুপ্ত

বয়স ১৩। ২৪ কবীর রোড, কলকাতা-২৬। অষ্টম শ্রেণী। ডাকটিকিট, গল্পের বই পড়া, কোটেশন লেখা।

জগদীশচন্দ্র বসাক

বয়স ১৪। ৯১।১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯। অষ্টম শ্রেণী। ডাকটিকিট, খেলাধুলা, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ, ছবি আঁকা।

সুপর্ণা বাগচি

বয়স ১১। ২২ পুসা রোড, নয়া দিল্লী। গান-বাজনা, ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া, হাতের কাজ।

জয়শ্রী দেব চৌধুরী

বয়স ১৫। অবধায়ক শ্রী ললিতমোহন বর্মন, ইস্ট পোর্ট-ব্লেয়ার লাইন, ব্যারাকপুর। গান, গল্প লেখা, সাহিত্যচর্চা, হাতের কাজ, মহাকাশভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী।

অম্লানকুসুম সেনগুপ্ত

বয়স ১৩। অবধায়ক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। মেজিয়া, বাঁকুড়া। অষ্টম শ্রেণী। ফুটবল, ক্রিকেট, ক্যারাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১৪। ১২ পাল স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দশম শ্রেণী বিজ্ঞান। গল্পের বই পড়া, গল্প লেখা, অভিনয়, ফুটবল, ক্রিকেট।

সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১৬। আনন্দময়ী আশ্রম, পোঃ অঃ আলমোড়া, উত্তর প্রদেশ। প্রথম বর্ষ কলা। ডাকটিকিট, ম্যাজিক, ভাল গানের রেকর্ড সংগ্রহ, ছবি আঁকা।

রঞ্জনা বাগচী

বয়স ১০। ৩৫।১৩ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা—২০। পঞ্চম শ্রেণী। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আধুনিক গান সংগ্রহ, কার্ড সংগ্রহ, ডাকটিকিট।

বিক্রম দাস

বয়স ১৩। ৩১ মদন চ্যাটার্জী লেন, সি. আই. টি. বিল্ডিংস ব্লক ডি, ফ্ল্যাট নং ৬, কলকাতা—৭। নবম শ্রেণী বিজ্ঞান। ফুটবল, ক্রিকেট, ডাকটিকিট, হাসির গল্পের বই পড়া, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু।

খাল-পোলে পাজি বুড়ো

শচীন মিত্র

বিদকুটে পাজি বুড়ো খোঁজে ছুতো
কেউ একা পথে গেলে ভোঁদা ভুতো
খপ করে তাকে ধরে দেবে গুঁতো
দুই কানে বেঁধে টানে ফালি সুতো ॥

খড়খড়ে দাড়ি দিয়ে ঘষে ঘাড়ে
ফুঁ দিয়ে মাথাটাকে নাড়ে-চাড়ে
ভেলকি যে খেলে বুড়ো রোগা হাড়ে
মারপ্যাঁচে কাবু করে তবে ছাড়ে ॥

খাল-পোলে বসে বুড়ো দুপুরেতে
অল্পেতে টেকো মাথা ওঠে তেতে
কাণ্ড যে করে ফেলে কত এতে
তাই যেতে মানা করি ওখানেতে ॥

বাঁদরের বাঁদরামি

কল্পনা রায়

আমার তখন বছর পাঁচেক বয়স। কাশীতে থাকতাম। রোজ ভোরবেলা ঠাকুমাকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতাম। যেতে যে খুব ইচ্ছে করত তা নয়; কিন্তু ঠাকুমা বুড়ো হয়েছিলেন, চোখে ভালো দেখতে পেতেন না— আমি তাঁর চশমা হয়ে যেতাম।

স্নান সেরে ছোট্ট সাজিতে পুজোর ফুল, বিল্বপত্র, তুলসীপাতা ইত্যাদির ভিতর দু-চারটে চমচম, বাতাসা, শাঁকালু, কলা প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফেরা হত। এই ছিল ঠাকুমার ব্রেকফাস্ট। অবশ্য আমরাও কিছু কিছু ভাগ পেতাম।

বাড়ির পথে বাঁদরে পথ আটকাত। একহাতে সাজি চেপে ধরে আরেক হাতে ফুল-বেলপাতার তলা থেকে বেছে বেছে ফল মিষ্টি তুলে নিয়ে টপাটপ মুখে পুরে দিত। ঠাকুমা একটানা অনুনয়-বিনয় করে যেতেন: 'আর খাস নি বাবা, গোপাল আমার, দুটো-একটা বুড়ির চিবোবার জন্যেও রাখিস। কাল একাদশী গেছে, আজ দুটো বাতাসা দিয়ে জল খেতে দিস বাবা!' কে শোনে কার কথা! বাবাজী ততক্ষণে সাজি প্রায় খালি করে ফেলেছেন। এক-আধ দিন নয়—বারো মাসই ওই এক কাণ্ড।

Manika

আমাদের উঠোনটা ছিল বেশ বড় আর ঝকঝকে তকতকে। দক্ষিণ দিকে শোবার ঘর, একপাশে রান্নাবাড়ি, আরেক পাশে জেঠামশাইয়ের লাইব্রেরি। বাকী দিকটায় খাড়া পাঁচিল। রান্নাবাড়ির চওড়া দাওয়ায় কলার কাঁদি ডাব থোড় এঁচোড় গাদা করা থাকত। বাঁদরের হাত থেকে এসব আগলে রাখা ছিল এক ঝকমারি। ফাঁক পেলেই ছোঁ মারে।

একদিন হয়েছে কী—একটা বাঁদর দু-তিন বার তাড়া খেয়ে ধাঁ করে উঠোন থেকে কী একটা বগলদাবা করে রান্নাঘরের মাথায় উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে কাকীমার আর্ত চিৎকার—'ও মা গো, ও দিদি গো, খোকাকে নিয়ে গেল যে! এই শনিচর, ও গুলাবিয়া, দেখতা ক্যা খাড়া খাড়া? খোকাকে আন্ দেও না!'

শীতের সকাল, উঠোনে রোদ এসে পড়েছে, কাকীমার দু মাসের খোকা সেই রোদে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছিল, বাঁদরভায়া তাকে তুলে নিয়ে মজা দেখছে। কাকীমার কান্নাকাটি, বাকীদের তাড়াহুড়ো—কিছুতেই কিছু হয় না, সে দিব্যি কচি মানুষটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রান্নাবাড়ির মাথা থেকে লাইব্রেরির ছাদ, সেখান থেকে শোবার ঘরের মাথায় লাফিয়ে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে সকলের দিকে ফিরে মুখ ভেংচায়। শেষে ঠাকুমা এলেন। এক কাঁদি কলা উঠোনের মাঝখানে

নামিয়ে রেখে বললেন, 'ও বাবা, মানিক আমার, মাথা খাও বাবা, কলা নিয়ে খোকাকে দিয়ে যাও!' কী আশ্চর্য, সত্যি বাঁদরটা খোকাকে সন্তর্পণে তার বিছানায় নামিয়ে দিয়ে কলার কাঁদি নিয়ে উধাও হল।

হরিদ্বারে যখন প্রথম যাই, প্রথম রাত্তিরটা কী ভয়ই পেয়েছিলাম। রাতদুপুরে মনে হল, ঘরের মধ্যে বরফগলা হাওয়া ঢুকছে কোথা থেকে, লেপকম্বল ফুঁড়ে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এক এক করে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে ঘট-ঘট-ঘটাং ঠন-ঠন-ঠনাত ইত্যাদি নানারকম শব্দ কানে এল। বাবা আলো জ্বাললেন, চারদিকে তাকিয়ে দেখেন তাজ্জব ব্যাপার। রাত্রে নিজে হাতে ভেনটিলেটর বন্ধ করে শুয়েছেন। মাঝরাতে আর এই বাঘা শীতের মধ্যে ভেনটিলেটর খুলে চোর এল নাকি! আর চোরই যদি হবে, এত শব্দ করে চুরি করবে কেন!

পাশের ঘরে ঢুকে সুইচ টিপেই বাবা পাঁচ হাত ছিটকে ফিরে এলেন। কী ব্যাপার? না—এক বিরাট লালমুখো কালো বাঁদর দরজার মাথার উপর তাকে সাজানো ওভালটিন, হরলিকস, বিস্কুট, চিনি, চা, আচার, মিছরি—সব ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে ফেলেছে। আমরা তো জানি না এ ধরনের ব্যাপার হয়—নইলে এদেশের লোকের কাছ থেকে জব্দ করার উপায়টা শিখে নিতাম।

সে এক মজার দৃশ্য। এসব দেশে বাঁদরের গায়ে হাত তোলা দায়—তোমাকেই ঠেঙিয়ে শেষ করে দেবে। তাই আত্মরক্ষার জন্যে ভারি মজার উপায় বের করেছে। সরু মুখের হাঁড়ির ভিতর কিছু খাবার রেখে দেয়, বাঁদর এসেই তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে খাবারটা খাবলে নিয়ে হাত মুঠি করে। এর পর তার মুঠি-করা হাত হাঁড়ির গলা দিয়ে বেরোতে চায় না, বাঁদরও খাবারের লোভে মুঠি খোলে না। ফলে ঘটাং ঘট ঘট ঘট ঘটাং শব্দে হাঁড়িটাকে এক দিক থেকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায়—অথচ মুঠিও খোলে না, হাঁড়িও ছাড়ে না। ইতিমধ্যে পাড়ার পাঁচজন জড়ো হয়ে বস্তা-টস্তা চাপা দিয়ে বাঁদরটাকে ধরে। তারপর তার মাথা কামিয়ে, সারা গায়ে লাল নীল হলদে সবুজ নানারকম রঙ করে ছেড়ে দেয়। তখন আর তার স্বজাতির মধ্যে স্থান হয় না, অন্য বাঁদরেরা দেখলে দূর থেকে ভেংচি কেটে সরে পড়ে। সে বেচারা দলছাড়া হয়ে ঘোরে।

একদিন ওইভাবে একটা বাঁদর দলছাড়া হয়ে আমাদের রান্নাঘরের ছাদে এসে বসে ছিল। বড়ি দিতে দিতে হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়তে ঠাকুমা কেমন যেন গলে গেলেন। 'আহা, অন্যায়ের শাস্তি তো পেয়েইছে, তাই বলে কি না খেয়ে মরবে কেষ্টর জীব?' তাকে কলা-টলা দেখিয়ে ডেকে নিলেন। সেও যেন কেমন বর্তে গেল। তারপর থেকে সে বাড়িতেই রয়ে গেল। ছাড়া পেলে ঠাকুমার পায়ে পায়ে ঘোরে, বাকী সময় গলায়-বকলস-বাঁধা হয়ে উঠোনের কোণে ঝিমোয়।

হঠাৎ কদিন ধরে ঠাকুমা লক্ষ্য করেন তাঁর প্রসাদী সাজি থেকে মিষ্টিগুলো উড়ে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? সব্বাইকে জিজ্ঞেস করেন, ছোটদের ধমক-ধামক দেন, কেউ বলতে পারে না। একদিন সকালে শনিচরের চিৎকারে সবাই উঠোনে গিয়ে দেখি, বাঁদরটা তাড়াতাড়ি দু হাত দিয়ে বকলসটা

লাগাতে চেষ্টা করছে। মুখের চারপাশে চমচম বাতাসার গুঁড়ো, পায়ের কাছে একটা গাঁদাফুল। শনিচর হাউমাউ করে যা বলল তা এই : রোজই ঠাকুমা যখন সাজিটা আলগোছে ঠাকুরঘরে নামিয়ে রেখে হাত-পা ধুতে যান, তখন উর্বশী (ইতিমধ্যে তার নামকরণ হয়েছে) নিজেই বকলস খুলে মিষ্টি-টিষ্টি খেয়ে এসে আবার বকলস পরে বসে থাকে।

এদিকে উর্বশীকে আমরা সবাই ভালোবেসে ফেলেছি। রোজ সকালে সে বাবার চায়ের ভাগ পায়। ওর একটা কলাই-করা কানা-উঁচু থালা আছে। বাবা চা খেতে বসলেই সে থালাটি দু হাতে ধরে কাছে এসে দাঁড়ায়, বাবা চা ঢেলে দেন, সে সুড়ুত সুড়ুত শব্দ তুলে চা খায়। এত কাণ্ডের পর ও যে আবার চুরি করে মিষ্টি খাবে, সে কে আর ভেবেছে! ঠাকুমা কিন্তু মোটেই রাগ করলেন না, বরং উলটে বললেন, 'তা যাকগে, দুটো মিষ্টি খেয়েছে বই তো নয়!'

দোলের সময় উর্বশীকে নিয়ে মহা গণ্ডগোল। রঙ খেলা তার দু চক্ষের বিষ। আমরা বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে উঠোনময় রঙ ছড়িয়ে ভূত সেজে দোল খেলি, আর সে রেগে চেঁচিয়ে ভেংচিয়ে পাড়া মাত করে। সবাইকে সাবধান করা আছে যে ওকে রঙ দেবে না। একবার এক দুঃসাহসী ছেলে ঘন সবুজ রঙ পিচকিরিতে ভরে দূর থেকে উর্বশীকে তাক করে ছুঁড়েছিল। বাঁধা অবস্থায় উর্বশী তার জবাব দিতে পারে নি, কিন্তু ছেলেটিকে সে চিনে রেখেছিল। এখন হয়েছে কী—উঠোনের যে দিকটায় খাড়া পাঁচিলটা ছিল, তারই গায়ে কয়েকটা চৌবাচ্চা-মতো ছিল। একটাতে গেরিমাটি, একটাতে খড়িমাটি, এইসব কী কী ভেজানো থাকত। দোলের দু-চার দিনের মধ্যেই আবার সেই দুষ্টু ছেলেটির আবির্ভাব হল। হঠাৎ উর্বশী তার বকলস খুলে দুহাত ভরে খড়িমাটিগোলা নিয়ে পিছন থেকে ছেলেটির মুখখানা চেপে ধরল। সে তো প্রাণপণ চেঁচাতে শুরু করল—উর্বশী নির্বিকারচিত্তে তার মাথায় মুখে গায়ের যেখানে সেখানে খড়িমাটি মাখিয়ে ছেড়ে দিল।

আদর পেয়ে মাথায়-চড়া উর্বশী যেদিন আমাদের ছেড়ে গেল সেদিন আমাদের খুব মন খারাপ হয়েছিল। কেমন করে গেল এখনও মনে আছে।

*

ওদেশে ফল পাকবার সময় কোনো গাছ এমনি ফেলে রাখা যেত না। আম-কাঁঠালের গাছে কুসুম ধরার সঙ্গে সঙ্গে একরকম কাঁটাতারের জাল দিয়ে সব গাছ ঢেকে দিতে হত। তবু সময় বুঝে হনুমানের দল হুপহাপ করতে করতে একদিন ঠিক এসে হানা দিত। যা পারত নষ্ট করে দিয়ে অন্য বাগানে চলে যেত। তাদের এই যাওয়া-আসাটাই একটা দেখবার জিনিস। ধরো, আমাদের বাগান আর গাঙুলীদের বাগানের মাঝে হাজরা রোডের মতো চওড়া ব্যবধান। তাতে কিন্তু এদের কিছু আসে যায় না। দলপতি এক লাফে আমাদের পাঁচিল থেকে ওদের পাঁচিলে গিয়ে পিছন ফিরে বসল। এর পরে আরেকটা হনুমান লাফ দিয়ে এসে দলপতির লেজ ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর ধাড়িগুলো এক-এক করে সব কটা ওইভাবে আগেরটার লেজ ধরে একটা ব্রিজের মতো তৈরী করল। সবশেষে হনুমতীগুলো একহাতে বুকে বাচ্চা চেপে ধরে এই ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে

দলপতি এত বড় ব্রিজটা নিয়ে ছুলতে ছুলতে সময় বুঝে প্রচণ্ড লাফ দিল। সব একসঙ্গে হুড়মুড় করে আর কোনো ভালোমানুষের বাগানে গিয়ে ঢুকল।

উর্বশীর যেদিন আমাদের বাড়িতে পাঁচ বছর পূর্ণ হল, সেদিন খুব ঘটা করে তাকে গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে চর্ব্যচূষ্য দিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল। ও মা! হবি তো হ, সেইদিনই কি ওই হনুমানের দলকে আমাদের বাগানে হানা দিতে হবে? খুব খানিকটা চেঁচামেচি, 'হট হট', 'মার মার', 'তাড়া তাড়া' হট্টগোলের পর তারা তো গেল। সব শান্ত হলে আমাদের হঠাৎ নজরে পড়ল—উর্বশী নেই। উর্বশী কই? খোঁজ, খোঁজ। সারা বাড়ি চষে উর্বশীকে পাওয়া গেল না। ঠাকুমা বললেন, 'আহা, বাছা আমার, অনেককাল তো সমাজছাড়া হয়ে রইল। জানিয়ে গেলে আমাদের দুঃখ হবে, তাই চুপিসাড়ে দলের সঙ্গে কেটে পড়েছে।'

অনসূয়াকে

জয়শ্রী দেব চৌধুরী। ২৪২৫। ব্যারাকপুর। বয়স ১৫
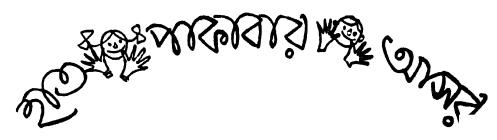
অনসূয়া,

বহুদিন পরে তোমাকে লিখতে বসেছি। দীর্ঘ নীরবতায় আশা করি আমাকে ভুলে যাও নি। কারণ বিস্মৃতির পথটা মহাকবি কালিদাসই দুর্গম করে দিয়ে গেছেন। হয়তো আজ তাই নিয়ে তোমার ক্ষোভের অন্ত নেই।

যাক, চিঠির শুরুতেই পুরনো ঝগড়াকে টেনে আনব না। একটা ছোট্ট খবর জানাতেই আজ এ চিঠির অবতারণা।

রুমনি মারা গেছে। যে রুমনির জন্যেই অনসূয়া-শকুন্তলার বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছিল, সেই রুমনি মারা গেছে। ওর মৃত্যুতেও কি সেই ফাটল জোড়া লাগবে না, অনি?

আজ রুমনির কথা মনে পড়ে আমার বুকটা কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে। ভুলতে পারছি না রুমনিকে। ভুলতে পারছি না, আমারই অবহেলায় আজ রুমনি মারা গেল। বারবার মনে হচ্ছে, আমাদের বিরোধ না ঘটিয়ে যদি রুমনিকে তোমার কাছেই দিয়ে দিতাম, তবে তো আজ এমন হত না।

মনে আছে রুমনির কথা? তখন আমরা কটকে থাকতাম। শকুন্তলা মিত্র আর অনসূয়া মুখার্জী। কী ভাব ছিল দুজনে, মনে পড়ে? বিশ্বাস করো অনু, আজ পর্যন্ত সে রকম বন্ধুত্ব আমার কারো সঙ্গে হয় নি।

সেই কটকেই পেয়েছিলাম রুমনিকে, যে এসেছিল আমাদের বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতে। সুগতাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম দুজনে। সেইখানেই দেখেছিলাম ওকে। সদ্য মাতৃহারা রুমনি করুণ সুরে কাঁদতে কাঁদতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ওকে দেখে আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। সুগতা বলেছিল জানিস, এর মা-বেড়ালটা সেদিন মরে গেল, এত খারাপ লাগছে—কত দিন যে ছিল আমাদের বাড়িতে বেড়ালটা। তারপরে একটু থেমে বলেছিল, নিবি এটাকে? আমরা সাগ্রহে বলেছিলাম হ্যাঁ—। জিজ্ঞেস করেছিলাম কী নাম এটার? সুগতা বলেছিল, এখনও নাম দিই নি। সারাটা রাস্তা রুমনি আমার কোলে চড়ে এসেছিল। তুমিই ওর নাম দিয়েছিলে 'রুমনি'।

তারপরেই বেধেছিল সংঘর্ষ। তোমাদের বাড়ির সামনে এসে তুমি হাত বাড়িয়ে বলেছিলে, দাও ওকে। আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, কেন, ও তো আমার কাছে থাকবে। তুমি বলেছিলে, উহুঁ, আমার কাছে, ওর নামটা দিল কে? আমি বলেছিলাম, চাই না তোমার নাম। ওকে কোলে

করে আনল কে? বেধে গিয়েছিল তুমুল ঝগড়া ছোট্ট রুমনিকে নিয়ে।

অবশেষে তুমি তূণের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলে, তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না। আমি বলেছিলাম, আমিও না। চলে এসেছিলাম, অবশ্য রুমনিকে নিয়েই। একরোখা ছিলাম, আর আমাদের মধ্যে কথা হয় নি।

তোমার দেওয়া নামটাই কিন্তু রেখেছিলাম। কেন? আমাদের বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে? তা কে জানে।

ঝগড়া হয়ে গেলেও দুজনের বন্ধুত্বটা কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। স্মৃতিটা ছিল—তোমার কথা জানি না—আমার মনে।

তারপর তোমরা চলে গেলে — কোথায় আমাকে জানাও নি। খবর পেয়েছিলাম দার্জিলিঙে। খোঁজ রাখতাম সুগতা-নীতাদের কাছে লেখা তোমার চিঠি থেকে। সেগুলোতে শকুন্তলার নামও উহ্য থাকত না। এদিকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কটকের। রুমনিও আর ছোট্টটি নেই, অনেক বড় হয়ে গেছে। কী যে দুষ্টু হয়ে গিয়েছিল—কী আর লিখব আজ। আর দুষ্টুমি করতে পারবে না রুমনি, কোনোদিন না। সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি আমি নিজে। সেই কথাই বলি।

কদিন ধরেই খুব বৃষ্টি হয়েছিল। ফুলে ফেঁপে মহানদী মহা নদীর আকার ধারণ করেছে। সবাই আশঙ্কা করছিল বুঝি এবারেও আসে গতবারের মতো সর্বনাশা কীর্তিনাশা বন্যা। সর্বত্রই এই নিয়ে আলোচনা। হয়তো খবরের কাগজে পড়ে থাকবে এর কথা। কিন্তু আমরা, যারা ভুক্তভোগী তারা জানি কিভাবে কেটেছিল বন্যার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহূর্তগুলো। জানতাম এ হবেই, তবু মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো না হতেও পারে।

সেদিন রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলাম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল একটা শোঁ শোঁ আওয়াজে, যেন রূপকথার সেই দৈত্য ছুটে আসছে সহস্র বাহু মেলে। বুঝতে পারলাম সে আসছে। যার জন্য কেটেছে অনেক বিনিদ্র রজনী, যাকে দিয়েছি অনেক শঙ্কা-জড়িত শিহরিত মুহূর্ত, সত্যিই সে আসছে, ছুটে আসছে বিপুল নাদে। কোথা থেকে কী হল বুঝি নি, কে আমাকে টেনে ছাদে তুলল মনে নেই—চারিদিকে শুধু জল, জল, অন্ধকারে শঙ্কিত ভীত আমরা কটি প্রাণী। বিমূঢ় অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম এক মুহূর্তেই, যখন অনুভব করলাম আমার কোলের কাছে নেই তো একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ! চেঁচিয়ে উঠলাম, রুমা আমার, রুমনি! নেই, নেই সে তো নেই! নেই তো সে ওপরে।

ফুলে ফেঁপে উঠছে মহানদী। আর ওপরে অন্ধকারে শঙ্কিত ভীত আমরা। চেয়ে দেখলাম, সবাই আছে ওপরে, নেই শুধু রুমনি। সেই শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে যেন কানে এল রুমার কাতর আর্তনাদ। তখনও হয়তো রুমনিকে নিয়ে আসা যেত। কিন্তু কী নিষ্ঠুর, কী স্বার্থপর আমি! সাহস হল না আমার নীচে যেতে, সাহস হল না একটি প্রাণকে বাঁচাতে।

মহানদী যে ছুটে আসছে।

দুদিন পরে যখন নেমে এলাম তখনও দেখলাম না রুমাকে। জলের তোড়ে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। আজ কেবল মনে হচ্ছে রুমনিকে যদি তোমার কাছে দিয়ে দিতাম তবে তো এমন হতনা।

নিজেকে দিয়ে রুমনি বোধ হয় একথাই শিখিয়ে দিয়ে গেল দুই বন্ধুর বিরোধের ফল কখনও ভাল হয় না। অতীতে যা হয়ে গেছে তা আর শোধরানো যাবে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো আমাদেরই হাতে অনসূয়া!

—শকুন্তলা মিত্র

হামটি ডামটি

অজন্তা ইলোরা সান্যাল। ১২০৮। নয়াদিল্লী। বয়স ৮

হামটি ডামটি দেয়ালেতে বসল।
রোদে গেল মাথা তেতে, ধাঁই করে পড়ল॥
ছুটে আসে সৈন্য, রাজাদের ঘোড়া।
হামটি ডামটি নাহি যায় জোড়া॥

অক্টোবর সংখ্যা

'সন্দেশে'র অক্টোবর সংখ্যা ১৬ই অক্টোবর প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যাটি যারা হাতে নেবে বলে জানিয়েছ তারা ১৭ই অক্টোবর থেকে বই পাবে।

যারা হাতে নেবার কথা এখনও জানাও নি, তারা ৫ই অক্টোবরের মধ্যে চিঠি লিখে, লোক পাঠিয়ে বা ২৩ ৮৫৯৬ এই নম্বরে ফোন করে জানিও।

যারা রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে চাও তারা পত্রপাঠ ৫৫ নয়া পয়সার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিও।

ক্যারিবিয়ানের ঢেউ

'প্রতি বছর যেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটাররা আমাদের দেশে আসে।...কুয়াশা ভেদ করে ক্যারিবিয়ানের সাতরঙা রামধনু ঝলমলিয়ে উঠল।...আহা, মনে রাখার মতো একটা দিন!' ওভাল মাঠের পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডকে আট উইকেটে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩-১ খেলায় জিতে 'রাবার' পাবার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে কথাগুলি বলেছেন ইংলণ্ডের একজন ক্রীড়া সাংবাদিক। তবু ইনিই নাকি সবচেয়ে কম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আর সবাই তো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গুণগানে একেবারে পঞ্চমুখ। কেউ বলেছেন 'কানহাই আমাদের সিধে করে দিয়েছে—আমাদের বল ইচ্ছেমতো পিটিয়ে ছাতু করেছে।' কনরাড হাণ্ট সম্বন্ধে কেউ বলেছেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিজয়সৌধের ভিত গেঁথেছেন তিনিই। কেউ গেয়েছেন ওরেলের জয়গান। কেউ বলেছেন, এখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দাবি করতে পারে যে তারাই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রিকেট টীম। ইংলণ্ড হেরে যাওয়ায় এঁরা দুঃখ করেন নি, স্বীকার করেছেন কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং, কি ক্যাপ্টেন্সি সবেতেই ইংলণ্ড এই টেস্ট সিরিজে একমাত্র তৃতীয় টেস্ট বাদে আর চারটে খেলায় একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেছে। বিশেষ করে নিজেদের পয়মন্ত মাঠ ওভালের শেষ টেস্টে। এই ওভাল মাঠেই ইংলণ্ডের মাটিতে ১৮৮০ সালে প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হয়। সেই খেলায় ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে পরাজিত করেছিল। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হারের কারণ ছিল ভিজে মাঠ। রোদঝলমল শুকনো খটখটে মাঠে খেলতে অভ্যস্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটাররা ঐ টেস্টে ইংলণ্ডের ভিজে মাঠের রুস্তমদের এঁটে উঠতে পারেন নি।

পঞ্চম টেস্ট ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্যাপ্টেন ওরেলের জীবনের শেষ টেস্ট খেলা। জীবনের এই ৫১তম টেস্টে ক্যারিবিয়ানের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়িয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত তিন 'ডব্লিউ'-এর শেষ এবং উজ্জ্বলতম 'ডব্লিউ' ওরেল ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। আর দুই 'ডব্লিউ'—উইকস আর ওয়ালকট আগেই বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের জায়গায় এসেছেন কানহাই আর সোবার্স। দুজনেই ক্রিকেট-গগনের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু ওরেলের স্থান কে পূরণ করবে? এখন পর্যন্ত তো তেমন কাউকে দেখতে পাচ্ছি নে। তাই বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'তোমার আসন শূন্য আজি...।'

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডের মধ্যে মোট টেস্ট খেলা হয়েছে ৪৫টি—ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ২২টি আর ইংলণ্ডে ২৩টি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ইংলণ্ড জিতেছে ৫ বার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ বার আর বাকি ১০টি খেলা ড্র। ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছে ৬ বার, ইংলণ্ড ১১বার আর ৬টি খেলা ড্র।

এবারের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই তিনজন খেলোয়াড় মোট চারবার সেঞ্চুরি করেছেন। ১। কনরাড হাণ্ট—দুবার: ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম টেস্টে ১৮২ রান, ওভালে পঞ্চম টেস্টে ১০৮ রান নট-আউট। ২। বেসিল বুচার: লর্ডস মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে ১৩৩ রান। ৩। গারফিল্ড সোবার্স: লীডস মাঠে চতুর্থ টেস্টে ১০২ রান। সাকুল্যে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন রোহন কানহাই (৪৯৭)। ইংলণ্ডের পক্ষে কেউই সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্রিফিথ আর ইংলণ্ডের ট্রুম্যান সবচেয়ে

বেশি উইকেট পেয়েছেন—গ্রিফিথ ৫১৯ রানে ৩২টি, ট্রুম্যান ৫৯৪ রানে ৩৪টি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯ বছর বয়সের তরুণ উইকেট কীপার ডেরিক মারে এই সিরিজে চব্বিশ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

ভারতে আগামী শীতের অতিথি এম সি সি ক্রিকেট দলের ১৫জন নির্বাচিত খেলোয়াড়ের নাম জানা গেছে। এম সি সি দল ভারতে ৫টি টেস্ট ম্যাচ এবং ৫টি তিন-দিনের অন্যান্য খেলা খেলবে। যেভাবে দল গঠন করা হয়েছে তাতে মনে হয় ব্যাটিং-এর দিকটা বেশ জোরদার হবে। বেশির ভাগ খেলোয়াড়েরই ইংলণ্ডের টেস্ট টীমে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। তবে ফ্রেডি ট্রুম্যান, টেড ডেক্সটার, ব্রায়ান ক্লোজ, ব্রায়ান স্ট্যাথাম, টনি লক, টম গ্রেভনি প্রভৃতিরা আসছেন না বলে আমরা একটু মনমরা হব বৈকি। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের পরিচয় সংক্ষেপে তোমাদের জানানো যাক :

কলিন কাউড্রে—অধিনায়ক। ডান হাতে ব্যাট করেন। ৬৭টি টেস্ট খেলেছেন।

মাইক স্মিথ—সহ-অধিনায়ক। ডান হাতে ব্যাট করেন। ২২টি টেস্ট খেলেছেন।

কেন ব্যারিংটন—ডান হাতে ব্যাট করেন। গুগলি বোলার। ৪৫টি টেস্ট খেলেছেন।

জিমি বিংকস—উইকেট কীপার। কোনো টেস্ট খেলেন নি।

বোলাস—ডান হাতে ব্যাট করেন। ২টি টেস্ট খেলেছেন।

জন এডরিচ—ন্যাটা ব্যাটসম্যান। ৩টি টেস্ট খেলেছেন।

জেফ জোনস—ন্যাটা মিডিয়ম বোলার। কোনো টেস্ট খেলেন নি।

বি নাইট—ডান হাতে মিডিয়ম বোলার। ১২টি টেস্ট খেলেছেন।

ডেভিড লারটার—ডান হাতে ফাস্ট বোলার। ৪টি টেস্ট খেলেছেন।

জন মর্টিমোর—ডান হাতে অফ ব্রেক বোলার। ৫টি টেস্ট খেলেছেন।

জেম পার্কস—উইকেট কীপার। ১১টি টেস্ট খেলেছেন।

জন প্রাইস—ফাস্ট বোলার। কোনো টেস্ট খেলেন নি।

ফিল শার্প—ডান হাতে ব্যাট করেন। ৩টি টেস্ট খেলেছেন।

টিটমাস—অফ ব্রেক বোলার। ১৬টি টেস্ট খেলেছেন।

উইলসন—ন্যাটা শ্লো বোলার। কোনো টেস্ট খেলেন নি।

১

এক ক্লাসে বারোটি মেয়ে পড়ে। তাদের নাম বিশাখা, অনুরাধা, কৃষ্ণা, শ্রবণা, ভদ্রা, শারদা, কৃত্তিকা, রোহিণী, পুষ্যা, মঘা, ফল্গুনী, আর চিত্রা। সারা বছরে মোটমাট বারো সপ্তাহ ইস্কুল খোলা থাকে— চৈত্র থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ছয় সপ্তাহ আর আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত ছয় সপ্তাহ। চৈত্র-ভাদ্র পর্বের প্রত্যেক সপ্তাহে একসঙ্গে দুজন মেয়ে ক্লাসের মনিটর হয়। আবার আশ্বিন-ফাল্গুন পর্বের প্রতি সপ্তাহে চার-চারজন মেয়ে একজোটে মনিটরি করে। কিন্তু প্রথম পর্বের এক-এক সপ্তাহে যে-দুজন করে মেয়ে মনিটরি করেছিল তারা দুজন একসঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের ঐ চারজনের দলে মাথা গলাতে পারবে না।

ক্লাস-টীচার একটি চৌখুপি ছকের উপর ১২টা খুঁটি বসিয়ে সাজিয়ে ফেললেন। ছকটা এঁকে দিতে পার?

২

লিকলিকে দুটি ভাই ঘুরে ঘুরে হল খুন।
ছোট জন যা ঘোরে বড় তার বারো গুণ॥

[শেষ তারিখ : ১৯ অক্টোবর]

দুটো ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিয়েছে

২২৫ বিশ্বদীপ ও অভিজিৎ সেনগুপ্ত (ভাগলপুর, বিহার), ২১৫৪ অনুরাধা, অনিন্দিতা ও সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় (ডালমিয়ানগর, বিহার), ৪২৪ অশোক ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর, হুগলী), ১ দীপংকর বসু (কলকাতা), ১০৯৭ ঝুমকা সেন (কলকাতা), ১৬৬৬ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা), ২৫০৭ দেবব্রত মণ্ডল (কলকাতা), ২৭৭৪ গোপা ও দীপালি পাল (কলকাতা)॥

———

ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের উপর বসিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল ॥ 'পাজি পিটার', পৃষ্ঠা ৩১৯
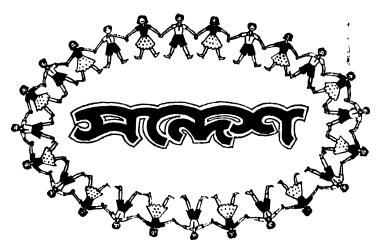
৩য় বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা অক্টোবর ১৯৬৩ । আশ্বিন ১৩৭০

ঘেণ্টুলালের চটি

সুনির্মল বসু

হাসির কথা বলতে হবে? আচ্ছা শোনো তাই
এখন বলি ঘেণ্টুলালের মজার ঘটনাই।
টাকের নীচে বিরাট টিকি—তাইতে বেঁধে ফুল
ঘেণ্টুভায়া চলেন পথে, দুলছে দোদুল দুল
লম্বা টিকি চলার তালে। তখন গরমকাল,
সামনে পড়ে পথের মাঝে একটি ছোট খাল।
বাঁশের সাঁকো, তাইতে তিনি যেমন হবেন পার
একটি চটি চট করে হায় পড়ল খসে তাঁর।
হায় হায় হায় খসল চটি খালের মাঝে ঠিক
ঘেণ্টুভায়া ব্যস্ত হয়ে খোঁজেন চারিদিক।
কিন্তু কোথায় চটিটি তাঁর, ওঠেন চটে তাই
অপর পাটি পাকড়ে তিনি ছোঁড়েন সহসাই—

খালের দিকে বেজায় জোরে, আপদ চুকে যাক
চটিবিহীন চরণ দুটি সঙ্গে তাঁহার থাক।
চাই না জুতো, চামড়া পরে দামড়া যত লোক
ঘেণ্টুলালের সাজে কি আর জুতোর তরে শোক
অপর পাটি গায়ের জোরে মারেন ছুঁড়ে তাই,
খালের জলে সাঁতার কাটে বৃন্দাবনের ভাই—
শাঁই করে সে শক্ত চটি চটাং করে জোর
আচম্বিতে গালের উপর লাগল এসে ওর।
বৃন্দাবনের নাম শোন নি? মস্ত সে জোয়ান
ভাইটিও তার মন্দ ভারি, চোস্ত পালোয়ান।
গালের উপর পড়তে চটি, অমনি রেগে কাঁই—
ঘেণ্টুলালের দিকে আবার ছুঁড়ল চটিটাই।
ঘেণ্টু ভায়া পার হয়ে পোল হনহনিয়ে যান
টাকের উপর ধপাস করে পড়ল চটিখান।
টাক জ্বলে যায় চটির ঠেলায়, তেড়ে পুনর্বার
ঘুরে দুবার ছুঁড়ে মারেন শূন্যে চটি তাঁর।

মাঠের পথে যায় চাষী এক মাথায় ঝোলাগুড়—
পড়ল চটি গুড়ের ভাঁড়ে, ভাঁড় পড়ে হুড়মুড়।
গুড়-মাখানো চটিটা যেই পড়ল ভাঁড়ের সাথ
হ্যাংলা কুকুর কোথায় ছিল, আসল অকস্মাৎ—
কামড়ে দাঁতে মিষ্টি চটি দৌড়ে চলে যায়:
গুড়ের শোকে কাঁদছে চাষা, হায় হায় হায়—হায়।
চটি মুখে চলছে কুকুর, ছোঁ মারে তায় চিল,
তাই না দেখে গুলতি দিয়ে ছুঁড়ল জগা ঢিল।
চিল উড়ে যায় শূন্য পানে, ঢিলটি লাগে গায়
ঠোঁটের থেকে খসল চটি ফ্যালার আঙিনায়।
ফ্যালার মাসী দিচ্ছে বড়ি থালের পরে থাল—
চটাস করে পড়ল চটি, হায় এ কী জঞ্জাল!
থেবড়ে গেল ডালের বড়ি, ঘাবড়ে মাসী যায়—
সামনে ফ্যালা দাঁড়িয়ে ছিল, দেখতে সেটা পায়।
ভীষণ চটে ছুঁড়ল চটি গায়ের জোরে তার
কোথায় গিয়ে পড়ল চটি খোঁজ রাখে না আর।
গয়লা নরু দোহায় গোরু পাশের গোয়ালটায়
ঝপাস করে পড়ল চটি শিঙের উপর ঠায়—
দুইটি শিঙের মাঝখানে তা আটকে গেল জোর,
চমকে গোরু ভড়কে গিয়ে ছিঁড়ল গলার ডোর,
চার পা তুলে ছুট লাগাল, একটি চাঁটের ঘায়
দুধের কেঁড়ে উলটে গেল, নরুও উলটায়।

ছুটল গোরু, ছুটল নরু ধরতে তারে আজ—
কী যে হল, করতে নারে একটুও আন্দাজ।
অনেক ছোটাছুটি করে, নিতান্ত হয়রান—
ঘেণ্টুলালের বাড়ির কাছে পেল সে সন্ধান।
এবার নরু ধরল গোরু, শিঙের থেকে তার
অনেক করে গায়ের জোরে করল চটি বার।
তারপরে সে 'হেঁইয়ো' বলে ছুঁড়ল চটিখান,
ঘেণ্টুলালের জানলা পানে করল সে প্রস্থান।

ঘেণ্টু-ভায়া ফেরেন বাড়ি, ঝরছে গায়ে ঘাম
হাত-পা ধুয়ে যান এবারে করিতে বিশ্রাম।
ঘরে ঢুকেই চক্ষু তাঁহার ছানাবড়া প্রায়
গুড়-মাখানো চটি জুতো তাঁহার বিছানায়।
চটি দেখে ঘেণ্টু-ভায়া বেজায় চটিতং —
নাহি বোঝেন কেমনে এ ব্যাপার ঘটিতং !!

ছবি ॥ অরূপ গুহঠাকুরতা

কবির অপ্রকাশিত কবিতা

ছোট বোন টুনু ॥ ও দাদা, বীরুদাদা, ঘুমিয়ে পড়লে যে,—গল্পটা পড়ো না, বলো না তারপর কী হল?

বীরু ॥ (ঘুমজড়িত কণ্ঠে)—হুঁ,—তারপর, রাক্ষসটা—হাঁউ মাউ খাঁউ করে তেড়ে এল রাজকন্যাকে খাবে বলে— (চুপ)।

টুনু ॥ আরে, আবার ঘুমোয়! সন্ধ্যা না হতেই এত কী ঘুম রে বাবা! রাক্ষসটা তেড়ে এল, তারপর?—ন্-নাঃ, একেবারে ঘুমিয়েছে। তবে নিজেই পড়ি। সবে সাতটা বাজে। খাবার এখনও ঢের দেরি।

(ঢং ঢং করে ঘড়িতে সাতটা বাজল)

টুনু ॥ (হেসে)—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী বলছে দাদা?

(দূরে অন্য ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা)

বীরু ॥ (ঘুমিয়ে)—কোথায় ঘণ্টা বাজছে? কই, এখানে তো আগে দরজা ছিল না, কোত্থেকে এল? দরজার ওপাশে ঘণ্টা বাজছে। দরজা খুলে দেখি তো।

এ আবার কোন্ দেশ? কেবল পাখি, কেবল পাখি। মানুষ কোথায়?

পক্ষিরাজ ঘোড়া ॥ (ঘোড়ার ডাকের মতো করে)—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—দেখতেই পাচ্ছ, পাখির রাজ্য। মানুষ নেই এখানে।

বীরু ॥ ও মা, তুমি আবার কে ?

পক্ষিরাজ ॥ দেখছ না ? ঘোড়া আমি। দেখছ না কত বড় ডানা দুটো ? পক্ষিরাজ ঘোড়া। আমি এ দেশের রাজা। আগে ছিলাম মানুষদের রাজা। তোমার নামটা কী ?

বীরু ॥ আমার নাম বীরু। আগে মানুষ ছিলে তুমি ?

পক্ষিরাজ ॥ ছিলাম। এই পাখিরা সকলেই মানুষ ছিল।

বীরু ॥ তবে পক্ষিরাজ হলে কী করে ? ওরা কী করে পাখি হল ?

পক্ষিরাজ ॥ বলি, শোনো :

ওই যে মস্ত কালো পাহাড় দেখছ, যার মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা তালগাছ, ওইখানে এক দানো এসে বাসা গাড়ে। এখনও আছে সে।

বীরু ॥ সর্বনাশ ! তা, দানো আসবার সময়ে তোমরা কোথায় ছিলে ?

পক্ষিরাজ ॥ সে সময়ে আমরা মানুষ ছিলাম। এখানেই থাকতাম। দৈত্যটা এসে আমাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করত,—ধরে ধরে খেত যাকে খুশি তাকে।

বীরু ॥ ওরে বাবা !

পক্ষিরাজ ॥ তারপর একদিন যখন দানো এসেছে হুমহাম করে, ঠিক সেই সময়ে গরুড় পাখি যাচ্ছে আকাশে উড়ে। গোলমাল শুনে নীচের দিকে চাইল সে, আর তার বিশাল ডানায় আকাশ অন্ধকার করে নেমে এল, দানোটাও অমনি ভয় পেয়ে দিল চম্পট।

বরাবর এমনি পাখি থাকবে ?

বীরু ॥ তারপর ?

পক্ষিরাজ ॥ গরুড় তো যে-সে পাখি নয়, দেবতাদের বাহন। সে আমাদের বলল, 'ও দৈত্যের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমি যদি তোমাদের সবাইকে পাখি বানিয়ে দিই, তবে কেমন হয় ? তাহলে দৈত্য যেই তোমাদের ধরতে আসবে, তোমরা ফুরুত করে আকাশে উঠে যেতে পারবে, উড়ে উড়ে প্রাণ বাঁচাতে পারবে।' আমরা তাতে রাজী হয়ে গেলাম। আমাকে বলল, 'তুমি হও পক্ষিরাজ ঘোড়া, পাখিদের রাজা।'

বীরু ॥ তবে কি আর মানুষ হবে না তোমরা ? বরাবর এমনি পাখি থাকবে ?

পক্ষিরাজ ॥ গরুড় বলেছে, যদি ভিন্ দেশের কোনো লোক এসে দৈত্যটাকে মেরে ফেলে, তবে আমরা আবার মানুষ হয়ে যাব। তুমি উদ্ধার করবে আমাদের? মারবে দানোটাকে? মারতে পারলে পুরস্কার— অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

পাখিরাও কথা বলতে পারে দেখছি

বীরু ॥ ঘোড়া-রাজকন্যা?

পক্ষিরাজ ॥ না গো, না। ঘোড়া-রাজকন্যা হবে কেন? তখন তো সবাই মানুষ হয়ে যাব।

বীরু ॥ চেষ্টা করে দেখতে পারি। রাক্ষস দানো এদের প্রাণ তো অনেক সময় অন্য জায়গায় লুকোনো থাকে। এ দানোটার প্রাণ কোথায় আছে তোমরা জান?

পক্ষিরাজ ॥ পাহাড়ের উপরে ওই যে প্রকাণ্ড তালগাছ, ওর ভিতরে আছে দৈত্যের প্রাণ। 'আক্কেল গুড়ুম তালগাছ ছুড়ুম' বলে, তালগাছের গোড়ায় ঘ্যাচাং করে একটা তলোয়ারের কোপ বসাতে পারলেই দৈত্যটা মরে যাবে। সেইজন্য দৈত্য সমস্তক্ষণ তালগাছ পাহারা দেয়। একবার কেবল খাবার জন্য বেরোয়।

বীরু ॥ আমাকে একটা তলোয়ার দিতে পার?

পক্ষিরাজ ॥ পারি বই কি। এই নাও আমার তলোয়ারখানা। এর পর যেদিন দানো আসবে আমাদের খেতে, তুমি চলে যেও তালগাছের কাছে, আর, 'আক্কেল গুড়ুম তালগাছ ছুড়ুম' বলে এক কোপ বসিয়ে দিও গাছের গোড়ায়।

বীরু ॥ তালগাছ তো অনেক দূরে। যেতে যেতে যদি ততক্ষণে দানোটা আবার ফিরে যায়?

পক্ষিরাজ ॥ তবে এক কাজ করলে হয়। দৈত্যের হুমহাম শব্দ শুনলেই, তোমাকে পিঠে নিয়ে আমি পাহাড়ের উপরে উড়ে যাব। তুমিও তখনই পিঠ থেকে নেমে তালগাছ কাটবে।

বীরু ॥ খুব ভালো কথা।

পক্ষিরাজ ॥ চলো তোমাকে একবার আমাদের রাজ্যটা ঘুরিয়ে আনি। এসো, আমার পিঠে বোসো।

(খট খট ঘোড়ার পায়ের শব্দ)

(একটা কোকিল ডেকে উঠল—কূউ-কূউ-কূউ)

কোকিল ॥ মানুষ ছিল যে,
কোকিল হল সে,
কুৎসিত কালো পাখি।
গানের আসর
মাতাত যে স্বর
কী তার রয়েছে বাকী ?
শুধু কুহু কুহু
গাই মুহুঃ মুহুঃ ;
এ দুঃখ কোথায় রাখি।

বীরু। পাখিরাও কথা বলতে পারে দেখছি।

পক্ষিরাজ॥ তা আর পারে না ?

(ঠক্ ঠক্ ঠক্—কাঠঠোকরার কাঠ কাটার শব্দ)

পক্ষিরাজ ॥ ওই শোনো, নারকেলগাছে কাঠঠোকরা কী বলছে।

কাঠঠোকরা ॥ (ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্)
সে দিন হায় নাই রে নাই,
ধপাং ধপ কুড়ুল মারি,
খটাং খট লাগাই বাড়ি,
শিমুল শাল সটাং পড়ে
হুড়মুড়িয়ে মাটির পরে ;
সে কাল আর নাই রে ভাই।

(চিলের ডাক—চীল-ল-ল)

চিল ॥ চিল-ল, চারিদিক
রোদ্দুর ঝিকমিক।
ভয় নাই পাখি ভাই,
শত্রুর দেখা নাই।
এলে পরে চিল্লাব
চটপট উড়ে যাব।

বীরু ॥ ও কী বলছে ?

পক্ষিরাজ। ও আমাদের পাহারাওয়ালা ছিল। দিনের বেলা চারদিকে নজর রাখে দৈত্য এল

কিনা। দানোকে দেখতে পেলে চেঁচাবে। ওইখানে দেখো মাছরাঙা পাখি মাছ ধরছে। সব জেলেরা হয়েছে মাছরাঙা।—ও মাছরাঙা, কত মাছ ধরলে?

মাছরাঙা ॥ নদীর জলে জেলের জাল
ফেলতাম
মস্ত বড় রুই কাতলা
তুলতাম
ছোট্ট মাছ দেখতে পেয়ে
ডুবলাম,
ঠোঁটের মুখে কয়টাই বা
ধরলাম!

(ঢং ঢং ঢং স্কুলের ঘণ্টা পড়ল। ছুটি হল)

(টিয়া-ময়না-শালিখের কলরব)

ময়না ॥ ময়না রে, ছুটি।
ইস্কুল ছুটি
পড়ে পড়ে হল
বই কুটি কুটি।

শালিখ ॥ করি ছুটোছুটি
শালিখেরা জুটি,
বাতাসের মাঠে
খেলি লুটোপুটি।

ফিঙে ॥ উঠি উঠি উঠি,
মেলে ডানা দুটি
কবুতর ফিঙে
আকাশেতে উঠি।

ছোট্ট মাছ দেখতে পেয়ে···

(পাখিদের গোলমাল)

(কা-কা-কা—কাকেরা গোলমাল করছে)

বীরু ॥ কাকরা এত গোলমাল করছে কেন?

পক্ষিরাজ ॥ ওরা হল হাইকোর্টের লোক, উকিল-মক্কেল। কোর্ট বন্ধ হয়েছে, তবু কী নিয়ে তর্কাতর্কি লাগিয়েছে। ওখানে কবাটি খেলা হচ্ছে, চলো যাই দেখি।

(পেঁচার ডাক—ভুত ভুতুম ভুত, ভুত ভুতুম ভুত)

বীরু ॥ ও আবার কে?

পক্ষিরাজ ॥ ও হল পাহারাওয়ালা হুতুম। দিনে চিল পাহারা দেয়। রাত্রে দেয় হুতুম পেঁচা। (মেরী পেঁচার ডাক—উঁ?—উঁ?) শোনো, মেরী পেঁচা কথা বলছে।

মেরী পেঁচা ॥ উঁ? উঁ? এল নাকি? উঁ?

হুতুম ॥ ভুত ভুতুম, মেরী কুটুম!

মেরী ॥ উঁ?

হুতুম ॥ সে আইলে তো ডাক পাড়ুম, হাঁক ছাড়ুম।

মেরী ॥ হুঁ।

হুতুম ॥ সে আইলে তো—চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ!

(হঠাৎ হুমহাম করে দুমদাম পা ফেলে দৌড়ে এল দৈত্য)

(সব পাখিদের চেঁচামেচি ও ডানা ঝাপটানো)

পক্ষিরাজ ॥ ও বীরু, শীগগীর উঠে পড়ো আমার পিঠে।

বীরু ॥ চলো চলো, পাহাড়ে চলো।

(ডানার শব্দ)

পক্ষিরাজ ॥ এই এলাম—এই পাহাড়, এই গাছ। নামো। মারো তলোয়ার দিয়ে তালগাছটাকে।

বীরু ॥ এই যে 'আক্কেল গুড়ুম, তালগাছ দুড়ুম।'

(কাঠের উপর মারার ঘ্যাচাং শব্দ)

টুনু ॥ উ হু হু!! কী কর দাদা? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রুলার চালাচ্ছ কেন? এমন লাগিয়ে দিলে! উঃ!

বীরু ॥ অ্যাঁ?—কে? ওঃ তুই, টুনু? আমি মনে করলাম বুঝি তালগাছ।

[পক্ষিরাজ একজন বড় কেউ হলে ভালো, মোটা গলা হবে, গলার তফাত বোঝা যাবে। পাখিরা অধিকাংশ ছোট মেয়ে হলে ভালো—কাক, পেঁচা আর মাছরাঙা ছাড়া।]

ছবি ॥ সমর দে

———

[সেপ্টেম্বর সংখ্যার পর]
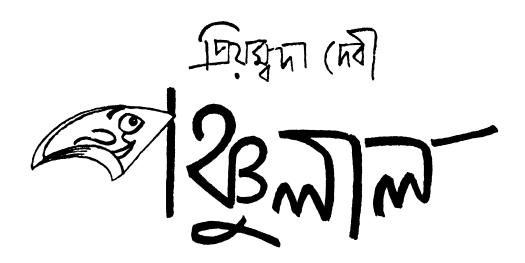
সবে ভোর হতে আরম্ভ হয়েছে এমন সময় দরজায় ঘা পড়ল। পঞ্চু হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে ওখানে? দরজা ঠেলে কে?'

উত্তর শুনলে 'আমি'। গলার আওয়াজে বুঝলে—এ তার বাপ গুপী। পা যে পুড়ে কয়লা হয়েছে, পঞ্চু তখনও সে কথা জানতে পারে নি, উঠে যেমনি দরজা খুলতে যাবে অমনি ধড়াস করে পড়ে গেল।

গুপী চীৎকার করে বলছে, 'দরজা খোল্ শীগগির।'

মাটিতে পড়ে গড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে পঞ্চু বললে, 'বাবা গো! আমি আর উঠতে পারি নে!'

'হয়েছে কী? উঠতে পারছ না কেন?'

'আমার পা দুটো কিসে খেয়ে ফেলেছে।'

'কিসে আবার তোর পা খেলে?'

'নিশ্চয় ঐ বেড়ালটা খেয়েছে—সত্যি বলছি পা দুটো নেই। হায় হায়! এ জন্মে আর দাঁড়াতে পারব না।'

গুপী মনে করছে বুঝি এ তার কেঠো ছেলের আর-একটা তামাশা। তখন আর তার মজা ভালো লাগছিল না, তাই আর দরজা খুলবার অনুরোধ না করে, নিজেই দেয়াল বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। বড্ড রাগই তার হয়েছিল, কিন্তু যখন দেখলে তার অত সাধের পঞ্চু মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, পা দুখানি পুড়ে খাক হয়ে গেছে, তখন ভারি দুঃখ হল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে কত চুমোই খেলে, 'জাদু সোনা মানিক' বলে কত আদরই করলে, আর তার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে

পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গুপী বললে, 'পঞ্চু বাপ, হায় হায়, কী করে পায়ের এমন দশা করলি ?'

পঞ্চু বললে, 'তা জানি নে বাবা, কিন্তু সত্যি বলছি, যে রাত আমার কেটেছে, এ জীবনে আর তা ভুলব না। সারারাত বাজ পড়ার কী ধুম, তার উপর বিদ্যুৎটা মশাল জ্বালিয়ে সারাটা আকাশময় নেচে বেড়াতে লাগল, খিদেয় আমার পেটের মধ্যে হায় হায় করছিল, তারপর বাক্যবাগীশ ঝিঁঝি পণ্ডিত আমায় বললে কী, "বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম তেমনি ফল; যেমন শয়তান তুমি, তেমনি সাজা পেয়েছ।" আমি তাকে বললাম, "চোপরও, মুখ সামাল করে কথা কও।" সে কি থামে, আবার বললে, "একে তো পুতুলনাচের কাঠের মূর্তি; তার উপর আবার মাথাটি একেবারে নিরেট। বুদ্ধি আসবে কোথা থেকে ?" হাতুড়িটা ছুঁড়ে মারলাম, মাথায় লেগে, মরে খড় হয়ে পড়ে রইল। খিদেয় তখন প্রাণ আমার আসি-যাই করছে, খাবার খুঁজে কোথাও একদানাও কুড়িয়ে পেলাম না, বড্ড কাঁপুনি ধরেছিল, তাই খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে চুলোর ধারে পা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর তুমি যখন এলে, দরজা খুলতে উঠতে গিয়ে দেখি, পা পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। খিদে তেমনি রয়েছে, শুধু পা দুখানি নেই।' বলতে বলতে পঞ্চু হু হু করে কেঁদে উঠল। পঞ্চুর সে বিলাপ বহু দূর পর্যন্ত শোনা গেল।

এই বাজে কথার ঘণ্টর মধ্যে থেকে ভাজা বড়ির মতো পরিষ্কার যে তত্ত্বটি পাওয়া গেল, তা হচ্ছে এই—পঞ্চুর পা দুটি অন্তর্ধান, কিন্তু ক্ষুধানল রাবণের চিতার মতো কেবলই জ্বলছে। তিনটে কচি শসা গুপী তার হাতে দিয়ে বললে, 'আমি এই কটা সকালে খাব বলে রেখেছিলাম, ধর্, তুই নে, এখন খা।'

পঞ্চু বললে, 'বাবা, খোসা ছাড়িয়ে দাও, নইলে খাই কী করে।'

গুপী বললে, 'খোসা ছাড়ানো আবার কী ? অত বাবুয়ানা ভালো নয়।'

পঞ্চু বললে, 'তা বলে কচকচিয়ে খোসাসুদ্ধ ওগুলো খেতে পারব না। খোসা আমার সয় না!'

গুপী আর করে কী, ছুরি এনে ধীরেসুস্থে খোসা এক ধার করে রেখে শসা কটি ছাড়িয়ে পঞ্চুকে দিলে। পঞ্চুবাবু আস্তে আস্তে দেখেশুনে তার আশপাশের শাঁস খেয়ে বীচির দিকটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, গুপী তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, 'কর কী ? খোসা ফেলে দিলে, আবার বীচি ফেলবে! তাও কি হয় ? না খাও রেখে দাও, কত কাজে আসতে পারে।' পঞ্চু বললে, 'যাই বল আর যাই কর, বীচি কিন্তু আমি গিলছি নে, ও আমার সইবে না।'

শসা তিনটি খাওয়া শেষ করে পঞ্চু বলে উঠল, 'কই বাবা, খিদে তো গেল না, পেট যে তেমনি হু হু করছে।' গুপী বললে, 'যা ছিল বাছা সব তোমায় দিয়েছি, আর কিছুই নেই।' পঞ্চু গম্ভীরভাবে বললে, 'যদি কিছু না থাকে, তবে খোলাটাই খেতে হবে।' প্রথমে মুখে দিয়ে, ভারি মুখ ভিরকুটি করলে, তেতো ওষুধ গেলবার সময় আমরা যেমনটা করি আর কি। তারপর একে একে তিনখানি খোলাই পার করে, বীচির ভাগটাও খেয়ে সব শেষ করে বললে, 'হ্যাঁ, এবারে একটু একটু পেট ভরেছে মনে হচ্ছে।'

ক্ষুধা নিবৃত্তি হবামাত্র পঞ্চুরাম আরেক জোড়া নতুন পায়ের জন্য বায়না ধরে বসলে, কান্নাকাটি আপসা-আপসি চলতে লাগল। ছেলের দুষ্টুমির শাস্তি দেবার মতলবে, গুপী দুপুর বেলাতক সেদিকে মনই দিলে না। তারপর বললে, 'তোমার নতুন পা যে গড়ে দেব, কেন? আবার ছুটে পালাবার জন্য বুঝি?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে পঞ্চু বললে, 'এখন থেকে একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হব, সব কথা শুনব।'

গুপী বললে, 'ওসব আমার বেশ জানা আছে, আদায় করবার ফন্দিতে সব ছেলেই অমনি বলে থাকে।'

'না গো, না, সত্যি করে ভালো হব, স্কুলে যাব, লেখাপড়া করব, কাজকর্ম শিখব।'

গুপী বললে, 'কাজ হাসিল করবার সময় সব ছেলেই ওরকম বলে।'

পঞ্চু বললে, 'আমি কি অন্য ছেলের মতো? আমি তাদের চেয়ে ঢের ভালো।'

গুপীনাথ যদিও খুব গম্ভীর হয়েই রইল, তবু পঞ্চু বেচারীর কাকুতি মিনতি শুনে শেষটায় ছেলের জন্য একজোড়া পা বানাতে শুরু করে দিলে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুখানি ছোট্ট সুন্দর চটপটে ছটফটে পা তৈরি হয়ে গেল। সে পা দুখানি দেখলেই গুপী যে কেমন ওস্তাদ কারিগর তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। কাজ শেষ করে পঞ্চুকে বললে, 'দেখো বাছা, চোখ বুজে এখন একটু ঘুমোও তো দেখি।'

ঘুমোবার ভান করে পঞ্চুলাল চুপটি করে চোখ বুজে পড়ে রইল। সেই অবসরে শিরিষ দিয়ে গুপী পা দুখানি জুড়ে দিলে। সে জোড় এমনি বেমালুম হল যে নতুন পা যে লাগানো হয়েছে তা কারো বুঝবার সাধ্য রইল না।

পঞ্চু যেমনি বুঝলে যে ভাঙা পা জোড়া লেগেছে, অমনি খাটিয়া থেকে লাফিয়ে নেমে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগল। তখন ভয় হতে লাগল যে আহ্লাদের চোটে দুখানা পা আবার না আটখানা হয়ে যায়।

দৌড়ে গিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দেখো বাবা, আমি লক্ষ্মী ছেলে হই কিনা। তুমি এক্ষুনি আমায় পাঠশালায় দিয়ে এসো, আমি পড়াশুনা করব।'

গুপী খুশী হয়ে বললে, 'এই তো সুবোধ ছেলের মতো কথা—'

পঞ্চু বললে, 'বাবা, ইস্কুল যেতে হলে তো কাপড়-চোপড় চাই, তুমি আমায় কাপড়-চোপড় বানিয়ে দাও।'

গুপীনাথের হাতে কানাকড়িও ছিল না। কী করে, তাই ফুলকাটা কাগজ দিয়ে একজোড়া জামা পাজামা, গাছের ছাল দিয়ে একজোড়া জুতো আর রাঙা শালুর এক টুকরো দিয়ে একটি কানঢাকা টুপি করে দিলে।

সাজগোজ হবার পর পঞ্চু দৌড়ে আপন চেহারা দেখতে চলল। ঘরে আয়না ছিল না, এক কোণে ছোট্ট একটি গামলাতে জল ছিল, তারই মধ্যে আপন ছায়া দেখে পঞ্চুর আনন্দ দেখে কে? সে পেখম-ছড়ানো ময়ূরের মতো ঘরময় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'আমায় যে একেবারে ভদ্দরলোকের মতো দেখাচ্ছে।'

গুপী বললে, 'তা তো দেখাচ্ছেই, কিন্তু বাছা, বাহারে পোশাক পরলেই ভদ্রলোক হয় না, সে পোশাক পরিষ্কার থাকা চাই।'

পঞ্চু বললে, 'পাঠশালায় গেলে আমার পেরথম ভাগ, শেলেট, পেন্সিল সব যে চাই।'

'তা তো চাই, কিন্তু কী করে পাওয়া যায় সেই হচ্ছে কথা।'

'কেন? কিনলেই হয়।'

'কিনতে যে পয়সা চাই, তা আসবে কোত্থেকে?'

'আমার তো পয়সা নেই বাবা।'

মুখখানি বিষণ্ণ করে গুপী বললে, 'আমার হাতেও যে একটি পয়সাও নেই।'

পঞ্চুর মেজাজটা খুব হাসিখুশী হলেও বাপের বিষণ্ণ মুখ আর তাঁর পয়সার অভাব দেখে হাসিখুশি কোথায় উড়ে গেল, মুখখানি কাঁদো-কাঁদো হল, চোখ তুটি ছলছল করতে লাগল। পয়সার অভাবটা এমনি বিশ্রী জিনিস যে তা বুঝতে কারো দেরি হয় না। ছোট ছেলে—যে কোন কিছু বোঝে না, সেও এটা চট করে বুঝে ফেলে।

হঠাৎ 'সবুর করো'—এই কথা বলেই গুপী তার সাত-তালি-দেওয়া পুরনো র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল তার হাতে নতুন প্রথম ভাগ, শেলেট আর পেন্সিল—কিন্তু গায়ে আর তার র‍্যাপারখানি নেই। হাসি মুখে পেন্সিল শেলেট নতুন বই হাতে করে নিয়ে পঞ্চু বাপের দিকে চেয়ে দেখে র‍্যাপারখানি গায়ে নেই।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, 'র‍্যাপার কোথায় গেল বাবা?'

'বেচে ফেলেছি।'

'কেন বেচলে?'

'বড্ড গরম হচ্ছিল, তাই আর গায়ে রাখতে পারলাম না।'

আসল কথাটা বুঝতে পঞ্চুর আর বাকী রইল না। বাপ যে তাকে কত ভালোবাসে সে কথাটা বুঝতে পেরেই, সে লাফিয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে; এ গালে ও গালে কত যে চুমো দিলে তার ঠিক নেই।

নতুন শ্লেট বই নিয়ে পঞ্চু তো পাঠশালায় যাত্রা করল। পথে যেতে যেতে আপন মনে বলতে লাগল, 'ইস্কুলে আজকে আমি পড়তে শিখব, কাল লেখা শিখে নেব, আর পরশু অঙ্ক শিখে ফেলব। যখন সব শেখা হয়ে যাবে, বিদ্যার জোরে আমি অনেক টাকা রোজগার করব। মাইনের টাকা প্রথম যেই পাব, অমনি তখুনি আমার বাবার জন্যে আমি একখানি ঝকঝকে সুন্দর শাল কিনে দেব। এই শীতের দিনে বুড়ো মানুষ র‍্যাপারখানি বেচে ফেলে শীতে কাঁপছে—বাবা আমায় বড্ড ভালোবাসে।' আপন মনে ভাবছে, আর বকতে বকতে চলেছে, এমন সময় পঞ্চুর মনে হল, দূরে কোথায় বাজনা

বাজছে। চলতে চলতে থেমে, সে বাজনা শুনতে লাগল। দূরে রাস্তার মোড়ে, নদীর ধারে, গ্রামের মধ্য থেকে বাজনার আওয়াজ আসছিল।

পঞ্চু ভাবলে বাজনাটা কিসের? জানবারও উপায় নেই, তখন সে স্কুলে চলেছে। মনে মনে একটু দুঃখও হল যে, স্কুলে না যেতে হলে বাজনা যেখানে বাজছে সেখানে যেতে পারত! পঞ্চু দো-মনা হল—স্কুলেই যাবে, না বাজনা শুনতে যাবে? কিন্তু পথের মাঝে বেশীক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না, একটা কিছু ঠিক করে ফেলতে হয়! হতভাগা ছেলেটা বললে কী, আজ বাজনা শুনতেই যাই—স্কুলে কাল গেলেও চলবে। মন স্থির করে সে দৌড় দিলে। যতই এগোয় বাজনা ততই ভালো করে শোনা যায়, বাঁশি বাজছে, সানাই সুর ধরেছে, ঢাকের পিঠে কাঠি পড়ছে। বাঁশির পীঁ পীঁ, সানাই-এর পোঁ, আর ঢাকের গুরু গুরু। এ শুনে কি আর মন স্থির মানে? দৌড়তে দৌড়তে এক মাঠে গিয়ে পৌঁছল, সেখানে তাঁবুর সামনে ভারী ভিড়—একখানা কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'পুতুল নাচ—রামরাবণের যুদ্ধ।' পাশের লোককে পঞ্চু জিজ্ঞাসা করলে, 'ওগো, ভিতরে যেতে কত লাগে?'

'দু আনা'।

'কী! দু আনা!' পঞ্চু তখন এমনি মেতে উঠেছে যে, সে না-জানা-শোনা একটি ছেলের গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, 'আমায় দু আনা ধার দেবে? কাল ফেরত দেব।' ছেলেটি বললে, 'খুশী হয়েই দিতাম, কিন্তু আজ আমার হাত খালি।' পঞ্চু বললে, 'দু আনায় আমার জামাটা বেচতে পারি।' ছেলেটি হেসে বললে, 'কাগজের জামা নিয়ে কী হবে ভাই, বৃষ্টি যদি হয় তা হলে জামা ভিজে, চামড়ার সঙ্গে লেপটে থাকবে, আর কখনো খুলতে পারব না!'

'তবে আমার জুতোজোড়া কিনবে কি?'

'চুলো ধরানো ছাড়া ও জুতোয় আর কোনো কাজ হবে বলে তো মনে হয় না।'

'টুপির জন্য কত দিতে পার বলো তো?'

'মাগো! টুপির কী ছিরি—মরে যাই আর কি! এক টুকরো ছেঁড়া ত্যানা, সুবিধা পেলেই চিলে ছোঁ দিয়ে নিতে আর দেরি লাগবে না।'

পঞ্চুলালের মনে হল যেন কাঁটাবনে পড়েছে। যে দিকে ফেরে সেই দিকেই খোঁচা! তবু ভাবলে—আবার একবার চেষ্টা করে দেখবে। তাই, মুখ কাঁচুমাচু করে, আমতা আমতা করতে করতে, দুবার ঢোক গিলে, একবার মুখ ফিরে, চোখ নীচু করে, বার দুয়েক কেশে, শেষকালে অনেক কষ্টে বললে, 'আমার নতুন বর্ণপরিচয়ের জন্যে দু আনা পয়সা দেবে কি?' তাই শুনে কোত্থেকে একজন ছেঁড়া কাগজের বিক্রিওয়ালা হেঁকে বললে, 'আমি তোমার নতুন পেরথম ভাগ দু আনায় কিনব।' এতক্ষণ সে দুই ছেলের কথাবার্তা সব মন দিয়ে শুনছিল। দেনা লেনা তখনই চুকে গেল। বেচারী গুপে শীতে হি হি করতে করতে ছেলেকে যে বই কিনে দিয়েছিল, পড়াশোনা করে ছেলে বিদ্বান হয়ে বাপের দুঃখ ঘোচাবে,—ও মা! দু দণ্ড না যেতেই তার এই পরিণাম! কিন্তু পঞ্চু এরই মধ্যে সব ভুলে বসে আছে।

পুতুলনাচের ঘরে যখন ঢুকলে তখন দেখলে দুই পুতুলের লড়াই হচ্ছে—লোকেরা সবাই হেসে এ ওর গায়ে পড়ছে। পুতুলের মধ্যে একজনের নাম হরিনাথ, অন্য জনের নাম পঞ্চানন। হঠাৎ হরিনাথ থমকে দাঁড়াল, দূরে একটা কোনার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, 'এ কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি? ওই যে দেখছি পঞ্চু বসে!'

পঞ্চানন পুতুল টিকটিকির মতো করলে, 'ঠিক, ঠিক পঞ্চুই বটে।'

পর্দার পিছন হতে উঁকি দিয়ে মিঞা সাহেব পুতুলের অধিকারী বলে উঠল, 'বটে বটে, গুপীর নতুন পুতুল পঞ্চুলাল!' সবগুলি পুতুলই গুপীর তৈরি। তাই তারা পঞ্চুকে দেখেই আপন বাপের-হাতের ভাই বলে চিনতে পেরেছিল।

হরিনাথ হেঁড়ে গলায় হুকুম করল, 'পঞ্চু, এসো তোমার কেঠো ভাইদের সঙ্গে কোলাকুলি করো।'

পঞ্চু তার পিছনের জায়গা থেকে এক লাফে ঘরের মাঝখানে, তারপর আর-এক লাফে বেহালা বাঁশি যারা বাজাচ্ছিল, তাদের মাথা কোনরকমে বাঁচিয়ে, তক্তাপোশের উপর যেখানে পুতুলেরা সারি সারি নাচছিল সেইখানটিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে যে রকম কোলাকুলি গলাগলি জড়াজড়ি আরম্ভ হল তা আর বলে বোঝানো যায় না। এদিকে নাচ বন্ধ হওয়াতে, যারা দেখতে এসেছিল তারা চটেমটে বেজায় চেঁচামেচি শুরু করে দিলে। শোরগোল শুনে পুতুলনাচের কর্তা এসে উপস্থিত। মা গো, কী তার মূর্তি! কালো পশমের মতো লম্বা দাড়ি পা অবধি ঝুলছে, চলতে ফিরতে থেকে থেকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলছে; হাঁ মুখখানি অজগরের মতো, চোখ দুটো যেন রেলগাড়ির পিছনের গোল লণ্ঠন আর তেমনি রাঙা, হাতে সাপ আর শেয়ালের লেজ দিয়ে বিনুনি গাঁথা একখানা চাবুক, অনবরত সেখানি পটপট করে আওয়াজ করছে।

এই ব্যক্তির অকস্মাৎ আবির্ভাবে চারিদিক একেবারে চুপ হয়ে গেল, নিশ্বাস ফেলবার সাহসও আর কারো রইল না।

কর্তামহাশয় বজ্রগর্জনে পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে বটে তুমি? এখানে এসে এমনি হাঙ্গামা করিয়ে তামাশা মাটি করে দিলে!'

'মশায়, আমার কোনো দোষ নেই।'

'ঢের হয়েছে, চুপ করো। রাতের বেলা তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে এখন।'

পুতুল নাচ শেষ হলে কর্তা শের সাহেব, ডাকনাম কাবাবী মিঞা, বাবুর্চিখানায় ঢুকল। সেখানে প্রকাণ্ড একটা খাসি, মস্ত একটা হাঁড়ির মধ্যে কাবাব হচ্ছিল। হরিনাথ আর পঞ্চাননকে হেঁকে বললে, 'যাও, পঞ্চুলালকে নিয়ে এসো, একটা পেরেকে তাকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি, দেখতে পাবে। তার শুকনো কাঠের দেহখানা উনুনে আঁচ দিতে খুব কাজে লাগবে।' হরিনাথ আর পঞ্চানন, পঞ্চুকে যখন আড়কোলা করে এনে হাজির করলে, আর সে আপসে কেঁদে বলতে লাগল, 'ওগো, আমায় মেরো না, আমি মরতে চাই নে গো, মরতে চাই নে,' তখন অধিকারীর মনটা গলে গেল। তার দয়া চোখের জলে দেখা না দিয়ে নাকের জলে বইল, হেঁচ্চো হেঁচ্চো করে হাঁচতে শুরু করে দিলে।

পঞ্চানন চুপিচুপি বললে, 'পঞ্চু রে, তোর কপাল ভালো, অধিকারী যখন হাঁচতে লেগেছে তখন বিপদ কেটে গেল, তোর আর ভয় নেই।'

হেঁচ্চো, হেঁচ্চো,—পঞ্চু বললে, 'জীব, জীব!' শের সাহেব হাসিমুখে দুবার মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'বহুত আচ্ছা—তোমার মা-বাপ বেঁচে আছে তো?'

'বাবা আছে, জন্মে অবধি মায়ের মুখ কেমন, তা দেখি নি।'

'আহা, আমার বড্ড দুঃখু হচ্ছে, তোমায় যদি আগুনে দিই, তাহলে বুড়োটা কেঁদে মরবে—হেঁচ্চো, হেঁচ্চো।' পঞ্চু আবার বললে, 'জীব।' অধিকারী আবার মাথা নেড়ে হাসল। বললে, 'বহুত আচ্ছা! তোমায় তাহলে পোড়ানো চলবে না, তবে উনুনে আর কিছু কাঠ না জ্বালালেও তো কাবাবটা কাঁচা থাকে—এখন উপায়?' এই হরে, ও পঞ্চা, তবে আমার পুতুলদেরই একটাকে চুলোয় যেতে হল দেখছি। হেই জমাদার, এই হরেটাকে উনুনে ভর্।'

হরে বেচারা কাঁপতে কাঁপতে সটান মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

পঞ্চু হু হু করে কেঁদে কাবাবী মিঞার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'দোহাই তোমার, হরিনাথকে ছেড়ে দাও, দোহাই হুজুর, দয়া করো।'

'তোমায় প্রাণদান করেছি সেই ঢের, আবার ওকে ছাড়ব, তবে আমার কাবাব হবে কী করে?'

পঞ্চু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, জোরের সঙ্গে বললে, 'জমাদার মশায়, এসো, আমায় ধরে চুলোয় পুরে দাও; আমি মরি সেও ভালো, আমার জন্য আর কাউকে মরতে কিছুতেই দেব না।'

পঞ্চুর সে চেহারা আর গলার আওয়াজ শুনে, আর সব পুতুলেরা তো হায় হায় করে কেঁদে উঠল।

কাবাবী মিঞা প্রথম খানিকটা জমাট বরফের মতো অটল হয়ে রইল, একেবারে নড়চড় নেই, যেন একটা পাথরের ঢিবি। কিন্তু ক্রমে মনটা তার গলে গেল, আবার হাঁচির আবির্ভাব হল, তিনবার হেঁচে আদর করে হাত বাড়িয়ে বললে, 'শাবাশ পঞ্চু! সত্যি তুই ভালো ছেলে, আয় আমার কোলে আয়।'

পঞ্চু অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে, দাড়িগুলো সরিয়ে দুই গালে এমনি দুই চুমো খেলে যে বহুদূর পর্যন্ত তার আওয়াজ শোনা গেল।

পরদিন কাবাবী মিঞা পঞ্চুকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বেটা, তোমার বাপের নামটি কী?' পঞ্চু বললে, 'গুপী।'

মিঞাসাহেব বললে 'বেশ, বেশ, তার ঘর-বাড়ি পয়সা-কড়ি আছে তো?'

পঞ্চু বললে, 'কানাকড়িও তার নেই। এই দেখো না, আমার সেলেট বই কিনে দিতে নিজের র‍্যাপারখানি বেচে ফেললে।'

কাবাবী মিঞা বললে, 'আপসোস, বেচারী! আমার যে তার জন্য কলিজায় দরদ লাগছে। এই পাঁচটা মোহর দিচ্ছি, এখুনি নিয়ে যাও, আমার সেলাম জানিয়ে তাকে দিয়ো।' বুঝতেই পারছ, এত-গুলো টাকা পেয়ে পঞ্চুরামের কী আনন্দই না হল—বার বার কাবাবী মিঞাকে ধন্যবাদ দিয়ে, নাচের

পুতুলদের একে একে সবারই সঙ্গে বার বার কোলাকুলি করে, এমনকি চৌকিদারকে পর্যন্ত সেলাম করে লাফাতে লাফাতে বাড়িমুখো চলল।

বেশী দূর যায় নি, দেখলে কী—একটা খোঁড়া শেয়াল আর একটা অন্ধ বেড়াল সেই পথ দিয়ে চলেছে, দুঃখের দিনের বন্ধুর মতো এ ওকে সাহায্য করছে। শেয়াল বেড়ালের কাঁধে ভর দিয়ে চলেছে আর শেয়াল অন্ধ বেড়ালকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। শেয়াল পঞ্চুকে দেখে বললে, 'সেলাম পঞ্চু সাহেব।' পঞ্চু তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার নাম জানলে কী করে?'

শেয়াল বললে, 'তোমার বাবাকে আমি খুব জানি, এই তো কালকেই আমি তাকে দেখলুম খালি গায়ে শীতে হী হী করে কাঁপছিল।'

পঞ্চু বললে, 'বেচারা বাবা! আর কাঁপতে হবে না—এবারে খুব সুখেই থাকবে।'

'কেন বল দেখি?'

'কেন আবার! শোনো কথা, আমি যে ভদ্দরলোক হয়েছি।'

'ভদ্দরলোক? কে, তুমি?'—এই বলে শিয়াল টিটকিরি দিয়ে হেসে উঠল, বেড়ালটাও হাসি লুকোবার জন্য সমুখের পায়ের থাবা দিয়ে মুখটা ঢাকা দিল। পঞ্চু রেগে বললে, 'হাসতে হাসতে ফুটির মতো ফেটে আটখানা হয়ে যেয়ো না যেন,—সোনা যদি চোখে কখনো দেখে থাক তো, এই দেখো পাঁচটা মোহর!' এই বলে মোহর কটা তাদের নাকের সামনে ধরে দিলে। সোনার মোহরের ঝুমু ঝুমু শব্দ শুনেই শিয়ালমশায় তাঁর খোঁড়া পাখানি, ছোঁ মেরে নেবার জন্য বাড়িয়ে দিলে, আর অন্ধ বেড়াল

এমনি করে অন্ধ চোখ ছুটো খুলে আবার বন্ধ করে ফেললে, যে মনে হল যে ছুটো সবুজ লণ্ঠন দপ করে জ্বলে, তেমনি আবার নিবে গেল, বোকা পঞ্চু এসবের কিছু দেখতে পেল না।

শিয়াল দম নিয়ে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'এতগুলো টাকা নিয়ে কী করবে?' পঞ্চু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলে, 'কী করব শুনবে? ১ নম্বর—বাবার জন্য একখানি নতুন শাল কিনব, ২ নম্বর—নিজের জন্য বর্ণপরিচয় কিনব, স্কুলে গিয়ে সত্যিকার লেখাপড়া আরম্ভ করব।' শেয়াল বললে, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো, পড়ার ঝোঁকেই তো পা আমার পড়তে পড়তে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে; বেড়াল বলে, পোড়াপড়া শিখতে গিয়েই তো আমার এমন ছুটো জ্বলজ্বলে চোখ একেবারে অন্ধকার হয়ে আছে, এমনি সময় পাশের ঝোপ হতে ঝুটিওয়ালা বুলবুলি বলে উঠল, 'খবরদার পঞ্চু, ওদের কথা শুনো না।'

ধূর্ত শিয়াল বললে, 'পাঁচটি মোহরকে হাজার ছু হাজার করতে চাও তো আমাদের সঙ্গে পেচাঁর দেশে চলো, সে দেশটাতে পা দিতে না-দিতেই পাঁচ হয়ে যাবে পাঁচ হাজার! পেঁচাদের দেশে একটা মাঠ আছে, তার নাম দেবক্ষেত্র।' এই মাঠে এক জায়গায় ছোট্ট একটি গর্ত করে, একটা মোহর পুঁতে দেবে, মাটি দিয়ে তাকে আচ্ছা করে ঢাকবে, তারপর কাছের একটা ঝরনা থেকে ছু-ঘড়া জল এনে তার উপর আস্তে ঢালবে। জল দেওয়া শেষ হলে, ছু-চুটকি সৈন্ধব নুন তার উপর ছড়িয়ে দেবে, তারপর রাতে চুপচাপ শুয়ে থাকবে, রাতের বেলায় মোহরটায় ফল গজিয়ে ছোট্ট একটি গাছ হবে, তারপর আস্তে আস্তে ডালপালা হবে আর ভোরবেলাকার সোনার রোদ্দুর যেমনি এসে সেই গাছের গায়ে লাগবে, অমনি দেখবে ভেলকিবাজির মতো ফুল ফুটছে, ফুল ফুটতে না-ফুটতে ঝরে পড়ে তার জায়গায় ফল ধরেছে। ফলগুলি যেন এক-একটি রুপোর কৌটো—একটি করে ফল পাকবে আর সেই ফলের মধ্যে থেকে দশটি করে মোহর বেরবে—একটা গাছে অমন কত যে রুপোর ফল ফলবে আর কত সোনার মোহর পাওয়া যাবে, তা কে বলতে পারে?' এ কথা শুনেই পঞ্চুর নৃত্য শুরু হল, সে বললে, 'এ টাকা পেলেই আমি সাড়ে-চার হাজার নিজে রাখব, আর তোমাদের দেব নগদ পাঁচ শ।'

শেয়াল মুখ ভার করে বললে, 'আমি তোমার টাকার বড় তোয়াক্কা রাখি। তোমার উপকার হবে মনে করেই বলেছি আর তুমি কিনা আমায় স্বার্থপর ভাবছ! ছোঃ! আমি আর কিছুতে নেই।' বেড়াল জোর গলা করে বললে, 'শোনো একবার কথা! আমাদের টাকা দেবেন—আমরা যেন ভিখারী!' পঞ্চু মনে মনে ভাবলে, এমন সাধুসজ্জন তো কখনো দেখি নি শুধু পরের ভালই করে, নিজের কোন কথা মনেই আনে না! সেই মুহূর্তে বাপের শাল, নিজের সেলেট, লেখাপড়া, বড় হওয়া, সব ভুলে পঞ্চু বলে উঠল, 'চলো ভাই, দেবক্ষেত্রে যাত্রা করা যাক, আমি তোমাদের সাথী হব।'

[ক্রমশ

বাঘের সেই প্রলয়ংকর মূর্তি
বহুদিন মনে থাকবে।
—পৃষ্ঠা ৩১৫

যমদুয়ারের ছোকরা বাঘ

বুদ্ধদেব গুহ

জায়গার নাম যমদুয়ার। তার নৈসর্গিক দৃশ্যের তুলনা হয় না। একপাশে ভুটান পাহাড়, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালা, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার সবুজ সীমারেখা, আর এদিকে আসাম—সেখানে আমরা আছি। বনবিভাগের দোতলা বাংলোটি একেবারে সংকোশ নদীর দিকে মুখ-চাওয়া। সংকোশ নদীই বাংলা আর আসামের সীমানা দেখিয়ে বয়ে চলেছে এখানে। বড় সুন্দর নদী। নদীময় বড় বড় পাথর। স্বচ্ছ জলে কালো ছায়া ফেলে মাছের দল সাঁতরে চলেছে। সারাক্ষণ কুলকুল কুলকুল করে গান গাইছে সংকোশ।

সঙ্গে আছে স্থানীয় শিকারী সাত্তার, পুরো গোয়ালপাড়া জেলার লোকেরা একে জানে 'ছাত্তার ভাই' বলে। নাম আবু সাত্তার। সত্যিই বড় ভাল শিকারী। এ পর্যন্ত ও কত যে বাঘ, চিতা, কুমির ইত্যাদি মেরেছে তার আর লেখাজোখা নেই।

দুবেলা খাই দাই, রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়াই—বাঘের পায়ের দাগের খোঁজ করি। এ পর্যন্ত বাঘের হদিস পাওয়া গেল না। দু-একদিনের মধ্যে মোষ বেঁধে বসব ভাবছি জঙ্গলে। বাঘের হদিস পাওয়া না গেলেও, বাঘ যে পথে মাঝে মাঝে সংকোশে জল খেতে যায় সে পথটা সাত্তার আর আমি খুঁজে বের করলাম একদিন। তারপর ঠিক করলাম, একদিন বিকেলবেলা গিয়ে সেই পথের ধারের কোনো গাছে বসব, যদি বরাতে বাঘের দেখা মেলে।

বসলাম গিয়ে একদিন। বাংলো থেকে পাহাড়ী সুঁড়িপথে প্রায় মাইল তিনেক। নদীর ধার দিয়ে রাস্তা। রাস্তায় দুটো বড় বড় খাদ থাকাতে জীপ যাওয়া মুশকিল। তাছাড়া জীপ নিয়ে যেখানে বসব সেখান অবধি যাওয়াটা ঠিক হবে না। হেঁটে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাত্তার বলল, 'কপালে থাকলে এখনই আসবে বাঘ।'

উঠে বসলাম একটা খয়েরগাছে। দেখতে দেখতে আমাদের পিছনে, সংকোশের দুধলি-বালি আর স্বচ্ছ জল পেরিয়ে ভুটান পাহাড়ের আড়ালে সূর্যটা ডুবে গেল।

আস্তে আস্তে রাত নামল। রাত বাড়তে লাগল। এখন চারদিকে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। গরমের সময় জঙ্গলে ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। কিছু দূরে ভুটানের পর্বতমালা পূর্ণিমার রাতে আলোর ওড়না মুড়ে ঘুমোচ্ছে। আমাদের পেছন দিয়ে সংকোশের স্রোত বয়ে চলেছে একটানা, কলকল শব্দ করে।

রাত প্রায় নটা বাজে। জ্যোৎস্নামাখা বন-পাহাড়ের যে একটা মিষ্টি ঠাণ্ডা আমেজ আছে সেটা একেবারে বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় আমাদের সামনে প্রায় দুশো গজ দূরে একদল ভারী জানোয়ারের পায়ের আওয়াজ পেলাম। আমরা যে গাছে বসে ছিলাম ঠিক তারই তলা দিয়ে জানোয়ারদের চলার সুঁড়িপথ গেছে। শব্দ শুনে মনে হল, যাদের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল, তারা এই পথেই আসবে। সাত্তার ফিসফিসিয়ে কানে কানে বললে, 'সেই জংলী মোষের দল, যাদের কথা আপনাকে বলেছি। সংকোশে জল খেতে চলেছে।'

রাঁজারের কাছে শুনেছিলাম যে, এই রাঙ্গা ব্লকে, যে ব্লকে আমরা বাঘ মারার জন্যে বনবিভাগের অনুমতি নিয়েছি, তাতে নাকি একদল দেখবার মতো জংলী মোষ আছে। ভেবেছিলাম পূর্ণিমা রাতে যদি বাঘ গাছের নীচে

একবার চেহারা দেখায়, তাহলে গুলি করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু বাঘের আশায় এসে জংলী মোষে দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ততক্ষণে শব্দটা এগিয়ে আসছে। শক্ত ভারী পায়ের ইতস্তত আওয়াজ। কখনো থামছে, কখনো এগোচ্ছে আমাদের গাছের বাঁ দিকে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে, সেই সুঁড়িপথে একটা বাঁক ছিল। দেখতে দেখতে সেই বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল এক অতিকায় প্রাণী। বনের পটভূমিকায় চাঁদের রুপোলী আলোয়, বলিষ্ঠতার প্রতিমূর্তির মতো এসে দাঁড়াল দলপতি। দলপতি হবার যোগ্যই বটে। মাথার শিং দুটো দুখানা অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক হাতের মতো, সামনের সমস্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরার জন্য যেন হাত বাড়িয়ে আছে। গায়ের রঙ লাল-কালোর মাঝামাঝি। একটা প্রকাণ্ড মাথা।

মোষের দলের আমাদের দেখতে পাবার কোনো কথা ছিল না, দেখেওনি। পুরো দলটা নিজেদের মনে নীচের শুকনো পাতা-পড়া পথে, খচমচ আওয়াজ তুলে সংকোশের দিকে চলে গেল। মারতে চাইলে অতি সহজে মারা যেত। অত বড় মাথা, এবং অত ধীরে ধীরে চলন। কিন্তু জংলী মোষ মারতে আমরা যাই নি সেবারে। তাছাড়া মোষ মারার অনুমতিও ছিল না। তবু দেখা তো হল। সেই বা কম কী?

মোষের দল যখন এখনই জলে গেল, তখন বাঘের এখনই এদিকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই মনে করে সে রাতের মতো আমরা গাছ থেকে নেমে, হেঁটে, যমদুয়ারে বাংলোয় এসে পৌঁছলাম।

সকালে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চৌকিদার ঘুম ভাঙাল। দরজা খুলে কী ব্যাপার জিগগেস করাতে সে বাংলোর নীচে, রান্নাঘরের পাশে, মাটিতে গোল হয়ে বসে থাকা চার-পাঁচ জন লোকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। নীচে নামতেই ওরা বললে, 'সাহেব, এক্ষুনি একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!' জঙ্গলের মধ্যে, ভুটানের সীমানার একেবারে পাশেই ওদের মোষের বাথান। সেখানে কুড়ি-বাইশটা মোষ থাকে। ওরা মোষ চরায়, আর দুধ থেকে ঘি করে সংকোশের ওপারে ভুটানের হাটে বিক্রি করে। ওরা বললে, 'কাল শেষ রাতে একটা বাঘ এসে বাথানের চার পাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে—আর ডাকাডাকি করতে থাকে। কিন্তু মোষগুলো সব একসঙ্গে থাকাতে প্রথমে কিছু করতে সাহস পায় না। কিন্তু একটা মোষের অসুখ হওয়াতে, অন্য মোষেদের থেকে আলাদা করে, বাথানের বাইরে, ঘরের পাশে একটা শাল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, বাঘ মুহূর্তের মধ্যে সেই মোষটাকে মেরে দড়ি ছিঁড়ে ওদের ঘর থেকে মোটে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে কতগুলো জার্মান-জঙ্গলের মধ্যে (বিহারে যাকে বলে পুটুস) নিয়ে গিয়ে খেতে আরম্ভ করল। ওরা বললে, ওদের জীবনে ওরা এরকম দুঃসাহসী বাঘ দেখে নি। ঘরের মধ্যে থেকে ওরা কড়মড় করে হাড় চিবনোর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। প্রতিকারে কী যে করবে তা ভেবেই ঠিক করতে পারছিল না। শেষে ওরা সবাই মিলে সাহসে ভর করে ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কেরসিনের টিন বাজানো ও চেঁচামেচি করার পর তিন-চারটে মশাল জেলে, হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে জলন্ত মশালগুলো বাঘের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সে কী কাণ্ড! একে বাঘ খিদের মুখে খাচ্ছিল, তায় জলন্ত মশাল গিয়ে পড়েছে তার ঘাড়ে। পনের মিনিট সে এক প্রচণ্ড অবস্থা। বাঘের বিকট গর্জন, বাথানের মোষেদের গলার ভারী ঘণ্টার সঙ্গে মেশা সমবেত ভয়ার্ত চীৎকার। সব মিলে বেচারাদের প্রাণ উড়ে যাবার অবস্থা!

তাদের জিগগেস করলাম যে, মোষটার অবশিষ্টাংশ ওখানেই আছে না বাঘ যাবার আগে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে গেছে? ওরা বলল, মোষটাকে বাঘ ওখান থেকে আরো একশ গজ দূরে নিয়ে গিয়ে একটা বেতের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। বোধহয় সবটা খেতে পারে নি।

তক্ষুনি আমি আর সাত্তার জীপে উঠে বসলাম। প্রায় সাত-আট মাইল পথ গিয়ে জঙ্গলের প্রধান সড়কে জীপ রেখে আমরা প্রায় মাইলখানেক হেঁটে সেই গোয়ালে এসে পৌঁছলাম। ওখানে আগে একজন ঠিকাদারের ঘর ছিল। ঘন শালের জঙ্গলের মধ্যে, প্রায় ২৫০ বর্গগজ জায়গার গাছ নির্মূল করে পরিষ্কার করা হয়েছে। তারই একপাশে শক্ত শক্ত শালের খুঁটি দিয়ে ঘেরা বাথান, আর অন্য পাশে গোয়ালাদের দুটি থাকার ঘর।

আমরা ভাবলাম যে রাতে বাঘ নিশ্চয়ই আসবে। অতএব মড়ির কাছে কোনো গাছে মাচা বেঁধে বসব। মোষের মড়িটা কোথায় আছে শুধোতে গোয়ালাদের মধ্যে একজন আমাদের সেদিকে নিয়ে চলল। ওদের ঘর থেকে প্রায় পঁচাত্তর গজ উত্তরে একটা সরু শুকনো নালা গেছে। সেই পাহাড়ী নালার এক পাশে একটা ঘন বেতের ঝোপ দেখিয়ে গোয়ালা বলল, বোধহয় এখানে রেখেছে মোষটাকে। আমরা বেত-ঝোপটাকে প্রদক্ষিণ করে ঝোপের ওপাশে গিয়ে সবে পৌঁছেছি, হঠাৎ সাত্তার গোয়ালাটাকে বলল, তুই পালা, শিগগির পালা। আমার হাতে ·৩৬৬ রাইফেল ছিল, সাত্তারের হাতে বন্দুক। কিন্তু এই সকালবেলায়, চারদিকে ঝকঝক-করা রোদের মধ্যে রাতে-মারা মোষের কাছে ভয়ের কী কারণ থাকতে পারে বুঝলাম না। সে যাই হোক গোয়ালাটি কিন্তু ততক্ষণে ঘরের দিকে বড় বড় পা ফেলে চলে গেছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে মোষের মড়ি দেখা যাচ্ছিল না। সাত্তার ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে আমাকে ফিসফিস করে কিছু বলতে যাবে, এমন সময় ঝোপের মধ্যে থেকে একটা সংক্ষিপ্ত চাপা আওয়াজ শোনা গেল। আশ্চর্য কথা। বাঘ এখনো মড়ির উপরে আছে?

আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনে দুদিকে সরে গিয়ে ভাল জায়গা বেছে দাঁড়ালাম—আর প্রায় তক্ষুনি বাঘ মোষ ছেড়ে এক প্রকাণ্ড গর্জন করে এক লাফে আমাদের দিকে প্রায় উড়ে এল। সকালের রোদে থাবাতে-মুখে রক্তমাখা ক্রুদ্ধ বাঘের সেই প্রলয়ংকর মূর্তি বহুদিন মনে থাকবে। সাত্তার আর আমি বোধহয় একসঙ্গেই গুলি করেছিলাম। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে একেবারে সটান লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। আমরা আশ্বস্ত হলাম যে বাঘটা সত্যিই পড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ভীষণভাবে চমকে দিয়ে বাঘটা প্রায় পেটে ভর করে আমি যেদিকে দাঁড়িয়ে ছিলাম (নালার দিকে) সেদিকে তেড়ে এল। এখন, সেটা আমাকে শেষ-আক্রমণ করার জন্যেই, কি আহত অবস্থায় নালায় আশ্রয় নেবার জন্যে, তা বুঝলাম না। তাছাড়া তখন অত বোঝাবুঝির সময়ও ছিল না। আর বেশী ঝুঁকি নেওয়া কোনোমতেই বুদ্ধির কাজ হত না—তাই বাঘের তেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে, একেবারে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। অত কাছ থেকে ছোঁড়া রাইফেলের গুলি বাঘের মগজ থেঁতলে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর কতগুলো শালের চারার উপর কিছুক্ষণ থরথরিয়ে কেঁপে বাঘটা একেবারে নিশ্চল হল।

বাঘটা খুব যে একটা প্রকাণ্ড, তা ছিল না। বয়সেও একেবারে ছেলেমানুষ। সবে বড় হয়ে, মাকে ছেড়ে, শিকার ধরতে আরম্ভ করেছে একা একা। সেই কারণেই হয়তো এমন বোকার মতো দিনের বেলাতেও মড়িতে বসে খাচ্ছিল আর ছেলেমানুষি করেছিল রাত্তিরে। সাত্তার বলল, 'ছোকরা না হলে এত ফকরা হয় না।'

গোয়ালারা খুব খুশী হল, মোষের দুধে ফোটানো চা খাওয়াল, আমাদের খাওয়ার জন্যে জোর করে এক ভাঁড় ভয়সা ঘি দিল। কিন্তু সেই ছেলেমানুষ, সুন্দর বাঘটাকে মেরে, সত্যি বলতে কি, আমাদের একটু কষ্টই হল।

———

মস্ত সে এক কুমির

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

মস্ত সে এক কুমির ছিল,
নড়বড়ে তার দাঁত ;
চক্ষে ছানি—তার ওপরে
পায় ধরেছে বাত !
জলের ওপর ভাসে,
খায় না কিছুই সে,
হাঁসের ছানা ছাগল ধরে
করে না উৎপাত !

দিনের পরে দিন চলে যায়,
মাসের পরে মাস ;
পিঠের 'পরে জমল পলি
গজায় তাতে ঘাস !
ঘাসের লোভে শেষে
ছাগল গোরু এসে
মনের সুখে সেথায় করে
দিব্বি বসবাস ॥

প্রতিযোগিতার লেখা

প্রথম

দাওয়ায় মিটমিটে আলোয় বনমালী এক টুকরো তেলচিটে কাগজ একমনে পড়ছে :

'পুকুরপাড়ে উলুঘাস
কুয়ো আছে তাহার পাশ'

আর পড়া যায় না। শেষ লাইন :

'সোনা পাব বারো মাস।'

তবে কি পুকুরপাড়ে সেই কুয়োটায় ঘড়া-ঘড়া সোনা আছে?—বনমালী ভাবে আর ভাবে।

একটা দুটো করে শেয়াল ডেকে উঠল। থেকে থেকে বাদুড়ের ঝটপটানি। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। বাঁশঝাড়ের মাথায় অস্তগামী চাঁদ। বনমালী ঠাকুরদার বাক্সে কত খুঁজে এই বহুমূল্য চিঠি পেয়েছে! বছর তিন আগে মৃত্যুকালে ঠাকুরদা বলেন বাক্সটা যত্নে রাখতে। এতদিনে অর্থটা বোঝা গেল।

চাঁদ ডুবে গেছে। ভোরের হাওয়া গায়ে লাগছে। বনবাদাড় পেরিয়ে বনমালী চলেছে—সঙ্গে দড়িগাছ আর জগু ময়রার কাছ থেকে আনা টর্চ।

এই তো কুয়ো! বনমালী দড়ি ধরে নামতে শুরু করে। একটা গাছের শেকড়, আবার নিরেট দেওয়াল, অন্ধকার। ওঃ, আর কত দূর!

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনিকেতন, বীরভূম

দ্বিতীয়

হাতের বিবর্ণ কাগজটার ছক অনুযায়ী কুয়োটার ধারে এসে দাঁড়াল বনমালী। চারদিকে ছোটবড় অজস্র গাছ, মাঝে কুয়োটা। এরই জন্যে সে হন্যে হয়ে ঘুরেছে তিন বছর। টর্চের আলো ফেলল বনমালী। কুয়োর মধ্যে তাকাতেই একটা আনন্দের শিহরন বয়ে গেল তার শরীরে। কুয়োর তলায় বহু নীচে কী যেন ঝিকমিক করে উঠল। ওরই মধ্যে আছে সাতরাজার ধন। রাশি-রাশি মোহর, হীরে, জহরত। ওগুলো হাতে পেলেই আজকের ফকির বনমালী, কাল হবে রাজা। সামনের যে গাছটার ডালটা কুয়োটার উপর দিয়ে গেছে তার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি শক্ত করে বেঁধে তার অপর প্রান্ত নিজের কোমরে বাঁধে। একবার নিশ্বাস নেয় প্রাণ ভরে। ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। জগু ময়রার টর্চটা হাতে নিয়ে চিরদুঃখী বনমালী দুঃখমোচনের জন্য নেমে যায় দূরে—বহু দূরে।

অশোক চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা ২৩

হ্যাট, হ্যাট ! ভোরবেলা পোড়ো বাগানটার ভিতর দিয়ে বলদ দুটোকে তাড়িয়ে বনমালী মাঠে চলেছে
নস্যির কৌটোটা ট্যাঁক থেকে বের করতেই হঠাৎ হাত থেকে গড়িয়ে পড়ল পাশের কুয়োটাতে
দেশলাই জ্বালিয়ে কুয়োর ভিতর কৌটোটা দেখতে পেলে না— কিন্তু কী যেন ঝিকমিক করে উঠল
বনমালীর মনেও একটা অসম্ভব চিন্তা ঝিলিক মেরে গেল— গুপ্তধন !

শেষ রাত্তির। বনমালী কুয়োটার কাছে দাঁড়িয়ে কোমরে বাঁধা বিরাট একগাছা দড়ির অন্য প্রা
একটা গাছের সঙ্গে বাঁধছে। হাতে জগু ময়রার টর্চটা। ঘুটঘুট্টে অন্ধকার— পিঠের কাছা
শিরশির করছে। ইচ্ছে করছে পালিয়ে যেতে। কিন্তু গুপ্তধনের লোভ তাকে ওইখানে বেঁ
ফেলেছে।

টর্চটা জ্বালতেই আলোটা যেন বিকট শব্দ করে কুয়োটার ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওই! ক
যেন ঝিক্‌মিক করছে! চোখ-বুজে ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে মাটির পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বনমা
নীচে নামতে লাগল। হঠাৎ কানে এল ভোরের পাখির ক্ষীণ কাকলি···

কুশল নাগ। কলকাতা ২

পাজি পিটার

উপেন্দ্রকিশোর রায়

শহরের কোণে মাঠের ধারে এক পুরনো বাড়িতে 'পিটার' থাকত। তার আর কেউ ছিল না, খালি এক বোন ছিল। পিটারকে সবাই বলত 'পাজি পিটার'—কারণ পিটার কোনো কাজকর্ম করে না—কেবল একে ওকে ঠকিয়ে খায়। পিটার একদিন ভাবল, ঢের লোক ঠকিয়েছি—একবার রাজাকে ঠকানো যাক। এই ভেবে সে রাজবাড়ি গেল।

রাজা বললেন, 'তুমি কে হে, মতলবখানা কী?'

পিটার বলল, 'আজ্ঞে, আমি পাজি পিটার—ঠকাবার জন্য লোক খুঁজছি।'

রাজা বললেন, 'তাই নাকি? লোক খুঁজবার দরকার কী, আমাকেই একবার ঠকিয়ে দেখাও না।' পিটার মাথা চুলকোতে লাগল। বলল, 'তাই তো, আমার সরঞ্জাম সব বাড়িতে ফেলে এসেছি।' রাজা বললেন, 'বেশ তো, তোমার সরঞ্জাম সব নিয়ে এসো।' পিটার তাই শুনে ভয়ানক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল, আর বলল, 'দোহাই মহারাজ অত হাঁটাহাঁটি কল্লে আমি মরেই যাব।' রাজা বললেন, 'তবে এই ঘোড়াটায় চড়ে যা—দেরি করিস নে।' পিটার চীৎকার করতে লাগল, 'ও ঘোড়ায় আমি চড়ব না—ঘোড়া আমায় ফেলে দেবে।' কিন্তু সে কথা কেউ শুনল না, তাকে জোর করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হল। পিটার ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে—যেই একটু আড়াল পেয়েছে, অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে শহরের বাইরে উপস্থিত! সেখানে সাজসরঞ্জাম সুদ্ধ ঘোড়াটাকে বিক্রি করে সে পকেটভরা টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। এদিকে রাজা-উজীর পাত্র-মিত্র সভায় বসে—পিটার আসে না, আসে না—এলই না। রাজামশাই বাইরে খুব হাসলেন—বললেন, 'ছেলেটা বেজায় চালাক।' কিন্তু মনে মনে ভারি চটলেন।

একদিন পিটার দেখতে পেল মাঠের উপর দিয়ে জমকালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল হাতে কে যেন আসছে। পিটার বলল, 'এই মাটি করেছে! রাজা আসছে।' পিটার দৌড়ে তার বোনকে বলল, 'ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দাও—ফুটতে থাকুক।' এই বলে সে একখানা ভাঙা শিলের উপর হিজিবিজি কী সব লিখতে বসল। তারপর যেই রাজামশাই তার বাড়ির সামনে এসেছেন, অমনি সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের উপর বসিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল। রাজামশাই বললেন, 'এ আবার কী?' পিটার বলল, 'আজ্ঞে, ভাত রাঁধছি।' রাজা বললেন, 'সে কী রে? তোর আগুন কই?' পিটার জোড়হাতে বলল, 'মহারাজ, আমরা গরিব মানুষ, আগুন-টাগুন কোথায় পাব? সন্ন্যিসি ঠাকুর এই পাথরখানা দিয়েছেন আর দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের রান্না চলে যায়।'

রাজা বললেন, 'দে, ওটা আমায় দে—তোকে আমি মাপ করে দিচ্ছি।' পিটার কাঁদতে লাগল, দেখাদেখি তার দুষ্টু বোনটাও কাঁদতে লাগল। রাজা বললেন, 'অত কান্নাকাটির দরকার কী? আমি তো কেড়ে নিচ্ছি না—দাম দিয়ে নিচ্ছি। এই নে।' বলে তিনি একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন। তখন পিটার তাঁকে একটা যা-তা মন্ত্র শিখিয়ে দিল।

রাজামশাই সেই শিলখানা নিয়ে বাড়ি গেলেন। গিয়ে সকলকে বলে পাঠালেন, 'কাল সকালে তোমাদের এক আশ্চর্য ভোজ খাওয়াব।' সকাল না হতেই মন্ত্রী উজীর কোটাল সকলে আশ্চর্য ভোজ খাবার জন্য রাজবাড়িতে হাজির। রাজামশাই সেই পাথরটিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে তার উপর প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি চাপালেন, আর পোলাওয়ের চাল, ঘি, মাংস, মসলা, সব তার মধ্যে দিয়ে গম্ভীরভাবে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, পোলাও আর হল না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। রাজামশাই রেগে ঘেমে লাল হয়ে উঠলেন। শেষটায় তিনি লাফিয়ে উঠে কাউকে কিছু না বল্লে এক তরোয়াল হাতে আবার ঘোড়ায় চড়ে পিটারের বাড়ি ছুটলেন। মনে মনে বললেন, 'এবারে আর পাজি পিটারকে আস্ত রাখছি নে।'

দূর থেকে রাজাকে দেখেই পিটার একদৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। তার বোনকে সে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল—সে করল কী—একটা খরগোশ কেটে তার রক্ত দিয়ে একটা থলি ভরে সেই থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

রাজা ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'পিটার কই? তাকে শীগগির ডাক।' পিটারের বোন বলল, 'দোহাই মহারাজ, পিটার এখন ঘুমুচ্ছে, সে ভয়ানক রাগী লোক, এখন জাগাতে গেলে আমায় মারবে।' রাজা বললেন, 'কিছু ভয় নেই—আমি আছি।'

পিটারের বোন পিটারকে ডাকতে গেল। খানিক বাদেই একটা চীৎকারগর্জনের মতো শোনা গেল, রাজা দৌড়ে গিয়েই দেখেন পিটার একটা ছুরি নিয়ে তার বোনকে মারল আর সে বেচারা ঠিক যেন মরার মতো পড়ে গেল—রক্তে তার কাপড় লাল হয়ে গেল। রাজা বললেন, 'তবে রে পাজি পিটার, তোর বোনটাকে শুধু শুধু মেরে ফেললি?' পিটার বলল, 'মহারাজ, এক মিনিট সবুর করুন!' এই বলে সে একটা ভাঙা শিঙের বাঁশি নিয়ে তার বোনের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটা চোখ মেলে বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রাজা তো অবাক! তিনি বললেন, 'এই শিঙেটা আমায় দিতে হবে।' পিটার কাঁদতে লাগল, বলল, 'দোহাই মহারাজ, ওটা না হলে আমাদের চলবে কেমন করে?' দেখাদেখি বোনটাও কাঁদতে লাগল, 'এবার আমি মারা গেলে কী করে বাঁচাবে? দোহাই মহারাজ, পিটারের মেজাজ বড় ভয়ানক।' রাজা বললেন, 'আমার মেজাজ তার চাইতেও ভয়ানক—তোদের যে মেরে ফেলি নি এই ঢের—এই নে—' বলে একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন।

রাজা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলেন, 'এবার থেকে যার উপর রাগ করব—একেবারে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দেব।' বাড়ি ফিরে দেখেন—নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনও আশ্চর্য ভোজ খাবার আশায়

বসে আছে। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আহারের অন্য বন্দোবস্ত করতে বলব কি?' রাজা বললেন, 'কী! এত বড় কথা! আমি করছি একরকম বন্দোবস্ত আর তুমি করবে অন্যরকম?' বলেই মন্ত্রীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলেন। উজীর নাজীর কোটাল সব হাঁ হাঁ করে উঠতেই রাজা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তাদেরও মাথা কেটে দিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। রাজা বললেন, 'ভয় নেই, তোমরা এখন মজা দেখো।' বলে তিনি সেই শিঙেটা মন্ত্রীর মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। কিন্তু ফুঁ দিলে হবে কী—মড়া মানুষ কি আর বাঁচে?

তখন রাজার হুকুমে লোকজন পেয়াদা পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটারকে ধরে আনল। একটা মজবুত বাক্সের মধ্যে তাকে বন্ধ করে সেই বাক্স মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা বললেন, 'পাজি পিটার, তোমার শাস্তি শোনো—এই বাক্সে ভরে তিন দিন তিন রাত্রি তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপর রাখা হবে। সেখানে রোদে পুড়ে হিমে ভিজে তুমি তোমার দুষ্টুমির কথা ভাববে—তারপর তোমাকে ওই পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।' পিটার বললে, 'আহা, মহারাজের দয়ার শরীর।' পাহাড়ের আগায় বাক্সের মধ্যে শুয়ে পিটার মনে মনে ভাবছে 'এখন উপায়?' আর মুখে চীৎকার করে গান করছে—

'ধিনতাধিনা তা ধেই ধেই
স্বর্গে যাবার রাস্তা এই'—

এমনি করে দুদিন গেল। তিন দিনের দিন এক বুড়ো বিদেশী সওদাগর সেখানে এল। সে বেচারা তীর্থ করতে বেরিয়েছে, পিটারের গান শুনে ব্যাপারটা কী দেখতে এল। সওদাগর বলল, 'তুমি কে ভাই? স্বর্গের রাস্তার কথা বলছিলে?' পিটার বলল, 'আরে চুপ—কাউকে বোলো না—তা হলে স্বর্গে যাবার জন্ম কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—মাঝ থেকে আমার স্বর্গে যাওয়া মাটি হবে।' সওদাগর বলল, 'ভাই, তুমি একা যাবে কেন? আমায়ও একটু পথ বাতলে দাও না!' পিটার বলল, 'সকলের কি তা সম্ভব হয়? এই বাক্সকে মন্ত্র পড়ে এখানে রাখা হয়েছে, যেমন-তেমন বাক্স হলে হবে না; আজ রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত এসে আমায় নিয়ে যাবে। আবার যে-সে দিনে হবে না—এমনি তিথি, এমনি বার, এমনি মাস, এমনি নক্ষত্র সব মেলা চাই—এরকম সুযোগ হাজার বছরে একদিন হয়।' সওদাগর বলল, 'ভাই, আমি বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাই তার তো ঠিক নেই—আমার টাকাকড়ি ঘর বাড়ি সব তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি আমায় ও বাক্সটা দাও—আমি স্বর্গে যাই।' পিটার বলল, 'খবরদার, আমি ছেলেমানুষ বলে আমায় টাকার লোভ দেখিও না।' বুড়ো কাঁদতে লাগল; অনেক মিনতি করে বলতে লাগল, 'এই বুড়ো বয়সে তীর্থে ঘুরে কতটুকু আর পুণ্য হবে—এখন না হলে আর আমার স্বর্গে যাবার আশা নেই।' তখন পিটার রাজী।

বাক্স খুলে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকল। পিটার তার কাছ থেকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বাক্সটা আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে গেল, 'রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত আসবে—তখন কিন্তু টুঁ শব্দটি করবেন না। তা হলেই আর স্বর্গে যাওয়া হবে না।'

রাত্রে রাজামশাই শাস্ত্রী নিয়ে বাক্সটা নেড়েচেড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রাজা ভাবলেন, 'আপদ গেল।' দুদিন বাদে রাজা বেড়াতে বেরিয়েছেন এমন সময় পাজি পিটার জমকালো পোশাক পরে ধবধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসে সেলাম করে বলল, 'মহারাজ, আমায় সমুদ্রে ফেলে বড়ই উপকার করেছেন। আহা! সমুদ্রের তলায় যে দেশ আছে—সে বড় চমৎকার জায়গা। আর লোকেরা যে কী ভালো, তা আর কী বলব—আমায় কি ছাড়তে চায়? আসবার সময় থলিভরা কেবল হীরে মণি মুক্তো সঙ্গে দিল।' এই বলেই সে চম্পট দিল।

রাজামশাই হাঁ করে রইলেন। রাজামশাই জানতে চান সমুদ্রের তলাটার কথা পাজি পিটার যা যা বলেছে তা সত্যি কিনা—তা হলে তিনি একবার দেখে আসেন।

---

১২ বছরের ছেলে স্বদেশলাল সেন তার গ্রামের স্কুল ছেড়ে কলকাতার এক স্কুলে এসে ভর্তি হল। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে তার বেশ বুদ্ধি আছে আর স্বভাবও বেশ সরল, তবে চাল-চলন একটু অদ্ভুত ধরনের। সে স্কুলে নতুন নতুন রকমের টিফিন সঙ্গে নিয়ে আসত। পুদিনার আচার দিয়ে শিঙাড়া খেতে ভালোবাসত। একদিন হয়তো চিঁড়েভাজা আর মানকচুর বড়া দিয়েই টিফিন হল, আবার মধ্যে মধ্যে টিফিনে চন্দ্রপুলি দিয়ে পাঁউরুটি খেত। কয়েকদিন পাঁপড়ভাজা দিয়ে ছানার ডালনা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখা গিয়েছিল। যেদিন আমসত্ত্ব দিয়ে ধোঁকা খেত, সেদিন তার বেশ ফুর্তি দেখা যেত।

পড়াশোনায় সে ভালোই ছিল। গায়ে বেশ জোর, রং ফরসা, কপাল চওড়া, চোখে-মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি-হাসি ভাব। খেলাধুলোয় স্বদেশলালের উৎসাহ ছিল।

একদিন স্কুল ছুটি হয়ে গেলে ভয়ানক বৃষ্টি পড়তে লাগল। কেউ বাড়ি যেতে পারছে না। তখন একজন মাস্টারমশাই ছেলেদের বললেন, 'তোমরা কেউ একটা গল্প বলো ; সকলে শুনুক।'

অন্য ছেলেরা যখন গল্প ভাবছে তখন স্বদেশলাল বলে উঠল, 'আমার মামা একবার একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই গল্প শোনাব?'

সকলেই শুনতে চাইল। স্বদেশ তখন বলে যেতে লাগল, 'আমার মামা একবার স্বপ্ন দেখলেন যে কলকাতায় একদল তেজী-তেজী খেলোয়াড় এসেছে, তাদের সঙ্গে মোহনবাগান দলের ফুটবল ম্যাচ হবে। সেদিন ট্রাম বন্ধ ছিল, তাই বাসগুলোতে এত লোক হয়েছিল যে মামা কিছুতেই বাস ধরতে পারলেন না। ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা, সব ভাড়া হয়ে গিয়েছিল। মামা মুশকিলে পড়লেন। মামার এক বন্ধু পালকি ভাড়া করে গড়ের মাঠে ম্যাচ দেখতে চললেন, কিন্তু মামার সেটা পছন্দ হল না।

'মামার বাড়ির একটু দূরেই গঙ্গা। তাঁর শখ হল যে তিনি নৌকোয় উঠে গড়ের মাঠের কাছাকাছি একটা ঘাটে নামবেন, আর সেখান থেকে হেঁটে মাঠে খেলা দেখতে যাবেন।

'তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এক ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলেন। দেখলেন, একটা বাচ্চা তিমি সেখানে সাঁতার কাটছে আর মধ্যে মধ্যে তীরে নাক ঠেকাচ্ছে। কোথা থেকে কেমন করে সেটা এল তা কেউ জানে না। সকলে হাঁ করে দেখছে। ছোট্ট তিমিটার চেহারা বড়ই শান্ত আর আহ্লাদে; দেখলেই আদর করতে ইচ্ছা করে। মামাকে দেখে সেটা এত খুশী হল যে মামা ছুটে গিয়ে সামনের একটা দোকান থেকে পাঁউরুটি কিনে আনলেন আর তিমির বাচ্চাকে রুটির টুকরো খাওয়াতে লাগলেন। তীরে মুখ উঠিয়ে সেটা খেতে লাগল।

'স্বপ্নের মধ্যে মামার একটা দারুণ বুদ্ধি এসে গেল। তিনি ঠিক করলেন যে ঐ তিমির পিঠে উঠে গঙ্গা বেয়ে গড়ের মাঠের কাছাকাছি একটা জায়গায় তীরে নেমে, হেঁটে খেলার মাঠে যাবেন। তিনি একটা বাঁশের ডগায় একটা পাঁউরুটি বাঁধলেন আর জলের ধারে কিছু খাবার ছড়িয়ে দিলেন। তিমির বাচ্চাটা যখন তীরে মাথা উঠিয়ে সেই খাবার খাচ্ছে, মামা তখন বাঁশটা হাতে নিয়ে সাবধানে তিমির পিঠে উঠে বসলেন আর বাঁশের ডগার রুটিটা তিমির নাকের সামনে এগিয়ে রেখে বাঁশটাকে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়ে ধরে রাখলেন, যেদিকে গেলে গড়ের মাঠের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। তিমিটা সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিকে ফিরে রুটি ধরবার জন্য এগিয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রুটিও সঙ্গে সঙ্গে তিমিটার সামনে সামনে ছুটে চলেছে। গড়ের মাঠের কাছে এসে মামা বাঁশের ডগার রুটিটা আস্তে আস্তে তীরের দিকে ফেরালেন, আর তিমিও রুটির পিছনে ছুটে ছুটে তীরে পৌঁছে গেল। ডাঙায় তখন কী ভিড়, কী ভিড়, কী ভিড়! মামার সেদিকে খেয়াল নেই! তিনি তীরে নেমেই গড়ের মাঠের দিকে ছুটলেন।

'মাঠে গিয়েই তিনি একটা গাছের তলায় একটা উঁচু ঢিপির উপরে দাঁড়ালেন। খেলা আরম্ভ হল। একদল লম্বা-লম্বা তেজী-তেজী মানুষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে আর খেলতে খেলতে ঝটপটাপট বগল বাজিয়ে শূন্যে এয়া উঁচু-উঁচু লাফ দিচ্ছে। তা দেখে সকলের তো চক্ষুস্থির! পনেরো মিনিটের মধ্যেই সেই তালঢ্যাঙা লোকেরা মোহনবাগানকে তিনটা গোল খাওয়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনবারই ফুটবলটা গোলপোস্টের অনেক উপর দিয়ে উড়ে গেল আর অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। সেই আখাম্বা লম্বা খেলোয়াড়দের লম্ফঝম্ফ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, তাদের সাতরঙা পোশাক রোদে ঝলমল করছে।

'এর মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড হল। নতুন দলের লোকগুলো যখন মহাতেজে হাই জাম্প দিতে দিতে এগিয়ে আসছে তখন মোহনবাগানের একটি বেঁটে লোক তাদের তলা দিয়ে পাঁই পাঁই করে এগিয়ে গিয়ে একটা গোল দিয়ে দিল। তখন চারদিকে যা হাততালি! "গোল" "গোল" বলে যা চিৎকার!

'মামা হতভম্ব হয়ে সব দেখছেন। হঠাৎ তাঁর পাশের গাছ থেকে এক বুড়ো-গোছের মানুষ তাঁর কাঁধের উপরে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে মামা "আরে, আরে, আরে, আরে ধ্যাত্তারি" বলে ঢিপির উপরে বসে পড়লেন। বুড়োমানুষটি খুব বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগল, "বাবুমশাই, আমি কলকাতার

একজন খুব নামজাদা বাঁদরওয়ালা, বাঁদর নাচিয়ে বেড়াই। খেলা দেখতে এসেছিলাম। ওধারের গাছটায় বাংলাদেশের একজন মন্ত্রীমশাই উঠেছেন, তাই ওটাতে উঠি নি, আপনার পাশের গাছেই উঠেছিলাম। বুড়োমানুষ, বেশীক্ষণ গাছে বসে থাকতে পারি না, তাই আমার বাঁদরটাকে সঙ্গে এনেছিলাম। ওটা পিছন থেকে আমার জামা টেনে ধরে রেখেছিল, যাতে হঠাৎ আছাড় না খাই। সকলকে হাততালি দিতে দেখে বাঁদরটা আমার জামা ছেড়ে দিয়ে তালি দিতে লেগেছে, তাই শরীরটাকে সামলাতে না পেরে গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে আপনার কাঁধে নেমে পড়েছিলাম।" মামা উঠে দাঁড়ালেন।

'বাঁদরওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, "বাবুমশাই, ঐ ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা লোকেরা কারা?" মামা বললেন, "ওদের বলা হয় বিক্রমাদিত্য ক্লাবের দল; জঙ্গীপাড়ার কাছে ধোলাইগঞ্জে থাকে। ওদের জংলী জংলী চেহারা বটে, কিন্তু ওরা বড় সোজা আর আমুদে মানুষ। দেখতেই পাচ্ছ, মোহনবাগানের কাছে গোল খেয়েও ওরা কেমন ঝটপটাপট ঝটপটাপট ঝটপটাপট বগল বাজাচ্ছে!" তিনবার চেঁচিয়ে "ঝটপটাপট" বলার ধাক্কায় মামার এমন স্বপ্নটা একেবারে ভেঙে গেল।'

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। স্বদেশলালের মামার স্বপ্নটার কথা ভাবতে ভাবতে ছাত্রেরা মহানন্দে ঝটপটাপট বগল বাজাতে বাজাতে বাড়ির দিকে রওনা হল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, স্বদেশের বুদ্ধি বাড়তে থাকে আর শরীর লম্বা হতে থাকে, কিন্তু তার জলযোগ আগে যেমন অদ্ভুত ধরনের ছিল তেমনি রয়ে গেল। সে একটু গম্ভীর হয়ে এল, গল্পটল্প কমিয়ে দিল। শোনা যেত, সে কয়েক রকম জিনিস নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা চালিয়ে দেখছে।

একদিন তার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আজকাল ক্রমেই চুপচাপ হয়ে আসছিস কেন?' স্বদেশ উত্তর দিল, 'স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়ে স্কুল ছেড়ে যাবার আগে আমি তোদের এমন একটা অদ্ভুত ম্যাজিক বা এমন একটা সুন্দর আবিষ্কার দেখিয়ে যাব যে তোরা আমাকে চিরদিন মনে রাখবি।'

স্বদেশ তার আত্মীয়স্বজনদের বাড়ির আর পাড়ার বেড়ালগুলোর সঙ্গে খুব ভাব পাতিয়ে নিল। অনেক পরীক্ষা চালিয়ে চালিয়ে জেনে নিল যে তার চেনা বেড়ালগুলোর মধ্যে কার গলার স্বর কতখানি মোটা আর কার কতখানি মিহি। হারমোনিয়মে সা রে গা মা পা ধা নি সা বাজিয়ে, বেড়ালগুলোর গলার স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিল যে কোন্ কোন্ বেড়ালের গলার স্বর হারমোনিয়মের কোন্ কোন্ পর্দার সুরের সঙ্গে মিলে যায়। পরে গান শেখাবার জন্য মোটা স্বরের আর মাঝারি স্বরের আর মিহি স্বরের বেড়ালগুলোকে পাশে পাশে এমনভাবে সাজিয়ে বসিয়ে দিত যাতে এক এক করে তাদের ল্যাজে চাপ দিলে বেড়ালগুলো চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সার মতন 'ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও-ম্যাও' সুর শুনতে পাওয়া যায়। স্কুলের বন্ধুদের সে কিছু জানতে দিত না। নিজেই বেড়ালদের গান শেখাত।

স্বদেশলাল বেড়ালের হারমোনিয়ম বানাবার মতলব করেছে, তাই বেড়াল নিয়ে তার এত পরিশ্রম

আর পরীক্ষা। এর জন্য সে কত কষ্টই না সহ্য করেছে! তাকে অনেকবার বেড়ালের আঁচড় আর কামড় খেতে হয়েছে। শেষে বেড়ালগুলো আর আঁচড় বা কামড় দিত না। সে মধ্যে মধ্যে তামাশা করে বলত, 'আমি শেষটায় বেড়ালতপস্বী হয়ে দাঁড়ালাম, আর বেড়ালগুলোও তপস্বী হয়ে উঠেছে।'

সে কারিগরদের দিয়ে কতকটা হারমোনিয়মের মতন দেখতে একটা যন্ত্র বানিয়ে নিল। যন্ত্রের উপরে হারমোনিয়মের পর্দার মতন চৌ-কোনা চৌ-কোনা কাঠের টুকরো লাগিয়ে দিয়ে প্রত্যেকটা টুকরোর সঙ্গে একটা-একটা ছোট্ট ডাণ্ডা এঁটে দেওয়া হল। প্রত্যেকটা ডাণ্ডার নীচ দিয়ে একটা-একটা খাঁজ বা সুড়ঙ্গ গিয়েছে। যন্ত্রের সামনে বেড়ালগুলোকে পিছন ফিরিয়ে বসিয়ে দিয়ে, তাদের ল্যাজগুলোকে যন্ত্রের খাঁজগুলোর মধ্যে ঠেসে গুঁজে দিয়ে, সেই সুন্দর হারমোনিয়মের কলগুলো টিপে টিপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট ডাণ্ডাগুলো নেমে নেমে বেড়ালগুলোর ল্যাজে ঘা দিতে থাকবে, আর বেড়ালগুলো মোটা মিহি নানা সুরে ডাকতে থাকবে। স্বদেশ বেড়ালগুলোকে সা-রে-গা-মা ভাঁজিয়ে ভাঁজিয়ে ওস্তাদ বানিয়ে দিল।

কাজের মানুষের দিনগুলো তাড়াতাড়ি কেটে যায়, তাই স্বদেশের সময়ও বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেল। দেখতে দেখতে স্কুলের শেষ পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষার পরে ছেলেরা স্বদেশকে পাকড়িয়ে বলল, 'তোমার সেই নতুন ম্যাজিক বা আবিষ্কারটা আমাদের দেখাবে না?' স্বদেশ উত্তর দিল, 'আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি, তোমরা একটা সভার আয়োজন করো।'

সামনের শনিবারেই সভার আয়োজন করা হল। ছাত্রেরা এসেছে, মাস্টারমশাইরা এসেছেন, হেডমাস্টারমশাইও উপস্থিত। স্বদেশলাল বেড়ালগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আর হারমোনিয়মের মতন যন্ত্রটা হাতে নিয়ে সভায় ঢুকতেই সভাময় একটা সাড়া পড়ে গেল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'স্বদেশের কাণ্ডটা দেখেছ? ও আজ সকলের পিলে চমকিয়ে দিতে চায়।' মাস্টারমশাইরা বললেন, 'ছেলেদের খুব বিশ্বাস যে স্বদেশ আজ একটা কিছু দারুণ রকমের ভেলকি-টেলকি দেখাবে।' ছাত্রেরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

স্বদেশ সকলকে নমস্কার করে বলল, 'পূজনীয় শিক্ষকমহাশয়গণ আর আমার প্রিয় ছাত্রভাইয়েরা! আজ আমি সকলকে বেড়ালের হারমোনিয়ম বাজিয়ে শোনাতে এসেছি। এই নতুন রকমের হারমোনিয়ম সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি অনেকদিন বেড়ালগুলোকে অনেক জ্বালাতন করেছি, বেড়ালগুলোও আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে। প্রথম প্রথম ওরা রেগে যেত, ছটফট করত, আঁচড়-কামড় দিত। ক্রমে অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পরে বেশ ভদ্র হয়ে গিয়েছে। আমি হারমোনিয়মের কল টিপে টিপে বাজিয়ে যাই, আর বেড়ালগুলো ল্যাজে চাপ খেতে খেতে নানারকম ম্যাও ম্যাও স্বরে সা-রে-গা-মা ভাঁজতে থাকে, রাগ-টাগ করে না।'

বেড়ালগুলোকে ঠিকভাবে বসিয়ে দিয়ে, তাদের ল্যাজগুলো হারমোনিয়মের খাঁজে খাঁজে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে স্বদেশ বাজাতে শুরু করল। তখন ঘরটা যেন স্বর্গ হয়ে গেল। সা-রে-গা-মার সুরে ম্যাও ম্যাও শব্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, সকলে আনন্দে বুঁদ হয়ে বেড়ালের হারমোনিয়ম শুনছে আর

দেখছে। ছাত্রেরা হাততালি দিতেও ভুলে গিয়েছে।·· হেডমাস্টারমশাই মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্বদেশ! তোমার নাম সারা জগতে ছড়িয়ে পড়বে!' মাস্টারমশাইরা বললেন, 'বাস্তবিক, আজ একটা দিন বটে!'

স্বদেশলালের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালদের গলার তেজ বেড়ে যাচ্ছে। ম্যাও ম্যাও শব্দের স্রোতে সকলে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে। বেড়াল-কণ্ঠের ঝংকার ক্রমেই উঁচুতে উঠছে; গানের খোঁচা কানে এসে বিঁধছে, দেয়ালে গিয়ে ফুটছে, কড়ি-বর্গায় গিয়ে লাগছে। একজন ছাত্র আর স্থির থাকতে না পেরে বলে উঠল, 'স্বদেশদাদা, ব্যাপার যে শেষে গুরুচরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলেই বেড়ালের হারমোনিয়মের গুঁতো হাড়ে হাড়ে টের পেতে লাগল। এতক্ষণে বেড়ালদের চেহারাতেও একটা উৎকট রাগের ভাব আর দারুণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সা-রে-গা-মা ভাঁজতে ভাঁজতে ওরা হঠাৎ হঠাৎ ভীষণ ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ করছে আর অস্বাভাবিক গর্জন ছাড়ছে। ওদের গা ফুলছে, চোখ জ্বলজ্বল করছে, নখ আর দাঁত চকচক করছে। তারপর? তারপর যা হল তা শুনলে আক্কেলবুদ্ধি গুড়ুম হয়ে যায়! বিষম রাগের চোটে বেড়ালদের গা দিয়ে বুনো-বুনো বাঘের গন্ধ বেরোতে লাগল!

হেডমাস্টারমশাই চিৎকার করে বললেন, 'স্বদেশ, আজ বুঝি একটা কিছু প্রলয়কাণ্ড ঘটে! একজন বড় শিকারীর কাছে শুনেছি যে বেড়ালরা যখন রাগের ঠেলায় বাঘের গন্ধ ছাড়তে থাকে তখন ওরা সব-রকমের পাপ করতে পারে—মানুষের মাথায় টাক পড়িয়ে দিতে পারে, জুতো ফেড়ে

দিতে আর গোঁফ কেড়ে নিতে পারে, টনসিল চিরে দিতে পারে, নাক আর কান খেয়ে ফেলতে পারে, ভুঁড়ি ফাঁসিয়েও দিতে পারে। এইবেলা সাবধান।'

স্বদেশকে সাবধান করে দেবার দরকার ছিল না। হেডমাস্টারমশাইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই বেড়ালগুলোর নাক-মুখ দিয়ে একটা দুর্গন্ধ কটকটে বাষ্পের মতন জিনিস বেরিয়ে এসে স্বদেশের নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। সে এক নিমেষেই দশ হাত দূরে পালিয়ে গেল আর মাটিতেই শুয়ে পড়ল। বেড়াল-গুলো ভীমপরাক্রমে হেডমাস্টারমশাইকে টপকিয়ে, মাস্টারমশাইদের ডিঙিয়ে, ছাত্রদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে ইস্কুলের সেই নরককুণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

স্বদেশকে সকলে ধরাধরি করে ওঠাল। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সে সুস্থ হল। হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'স্বদেশ, তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে ভবিষ্যতে এমন কাণ্ড আর করবে না। তোমার হারমোনিয়মটা স্বর্গের খেলনা, কিন্তু শেষে নরকে নিয়ে যায়।' স্বদেশ বলল, 'আমি নাকে খত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার সাধের আবিষ্কারের কাছে আমি চিরবিদায় গ্রহণ করলাম। আমার বেড়াল-শিষ্যেরা আমাকে ক্ষমা করুক আর শান্তিতে থাকুক।' সকলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরে গেল।

স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাস করে স্বদেশলাল কলেজে ভর্তি হল। বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি অমূল্য সম্পত্তি লাভ হল ; সে দুটি হচ্ছে তার সুদীর্ঘ সুশ্রী গোঁফ আর সুন্দর সুবিশাল দাড়ি। গোঁফ-জোড়ার ডগা দুই কানে পেঁচিয়ে রেখে সে বলত, 'এ হচ্ছে আমার কানপাট্টা গোঁফ।' লম্বা দাড়ির ডগাটা সে পকেটে রুমালের মতন গুঁজে রেখে দিত। খাওয়া-দাওয়ার পরে মুখ ধুয়ে রুমালের বদলে দাড়ি দিয়েই মুখ মুছে আবার পকেটের মধ্যে দাড়ির ডগা গুঁজে রেখে দিত।

ওইরকম গোঁফদাড়ি নিয়ে ক্লাসে বসবার অনুমতি পেতে তাকে বেশ চেষ্টা করতে হয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষমহাশয় জানতেন যে সংসারের লোকদের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা করা চলে না, তাই তিনি অনেক ভেবে শেষটায় অনুমতি দিলেন।

একদিন বিকালে স্বদেশলাল কলকাতার দক্ষিণে টালিগঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে এক গাছতলায় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দেখা পেল। দেখা হওয়ামাত্রই দুইজনেই একেবারে অবাক্! স্বদেশ মুগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীর সাদা দাড়ি আর সাদা জটা দেখছে, আর সন্ন্যাসী গভীর স্নেহের সঙ্গে স্বদেশের অপরূপ গোঁফদাড়ি দেখছেন। কারো মুখে কথা নেই! দশ মিনিট এইভাবেই কেটে গেল। সেদিন স্বদেশ কাছে যেতে সাহস পেল না ; সন্ন্যাসীর কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল।

পরদিন কলেজে গিয়ে বন্ধুদের বলল, 'এক যা সন্ন্যাসী দেখে এলাম, একেবারে সেরা সাধু! শিবের মতন জ্ঞানী, সমুদ্রের মতন গম্ভীর, নারদঋষির মতন সাদা দাড়ি আর সাদা জটা, চাঁদের মতন স্নিগ্ধ চোখ! আজ আবার দেখতে যাব। শুনেছি, রোজ গাছতলায় এসে বসেন। কাল তাঁকে প্রণাম করা হয় নি। দশ মিনিট শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, আর তিনিও ততক্ষণ সমানে আমার উপরে কৃপাদৃষ্টি রেখেছিলেন।'

পরদিন বিকালে স্বদেশের বন্ধুরা খেলার মাঠে গেল, আর সে একা সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে

প্রণাম করতেই তিনি স্বদেশের দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন আর বললেন, 'একা এসেছ ভালোই করেছ। আজ তোমাকে বিনা মূল্যে এমন একটি আশ্চর্য জিনিস দেব যা পৃথিবীতে আর কারো কাছে নেই। তোমাকে দেখেই বুঝেছি যে একমাত্র তুমিই এই জিনিসটাকে কাজে লাগাতে পারবে। আজকাল পৃথিবীতে এই ধরনের জিনিস একমাত্র এটিই আছে।'

সন্ন্যাসীঠাকুর খুব জোরে জোরে তাঁর সাদা সাদা দাড়ি ঝাড়তে লাগলেন। একটু পরেই দাড়ি থেকে একটা কৌটো বেরিয়ে এল, আর কৌটোটা খুলতেই রজনের মতন দেখতে এক টুকরো জিনিস বেরিয়ে এল। সাধু বললেন, 'এই জিনিসটা তোমার দাড়িতে রোজ একঘণ্টা ঘষবে। দুইমাস এইরকম করলেই তোমার দাড়িতে এক চমৎকার শক্তির খেলা দেখতে পাবে। তখন বাঁ হাতে দাড়িটাকে টান করে ধরবে আর ডান হাতে দাড়ির উপর দিয়ে বেহালার ছড়ি চালাতে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গেই নানারকম নতুন নতুন অচেনা সুর শুনতে পাবে।'

স্বদেশের হাতে কৌটোসমেত জিনিসটা দিয়ে সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন, 'যাকে তাকে আর যেখানে সেখানে দাড়ির বাজনা শোনাবে না ; এই বাজনার একটা গৌরব আছে, পবিত্রতা আছে। নারদমুনি চোখ বুজে অনেকদিন তপস্যা করেছিলেন, আর সেই সুযোগে তাঁর দাড়িতে কুমুরে পোকা বাসা বানিয়েছিল। তপস্যা শেষ হলে তাঁর দাড়ির দিকে খেয়াল গেল আর পোকা পালিয়ে গেল। তখন নারদমুনি কুমুরে পোকার বাসার সঙ্গে একটা বনৌষধির রস মিশিয়ে এই গুটিকা প্রস্তুত করলেন। গত চার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র পাঁচ জন অতি পুণ্যবান্ আর সৌভাগ্যবান্ লোক এই জিনিসটি ব্যবহার করবার অধিকার পেয়েছে। এটির নাম নারদকৃপা গুটিকা। এর সামান্য একটু বাকী রয়েছে ; সেটুকু তোমাকে দিলাম।'

স্বদেশ গড় হয়ে সাধুকে প্রণাম করল। সাধু আবার বললেন, 'একবার দাড়িতে শক্তি এসে গেলে প্রতিদিন গুটিকা ঘষবার দরকার থাকবে না ; শুধু দাড়িতে বেহালার ছড়ি চালিয়ে দিলেই সুর বেরোবে। কয়েক মাস পরে যখন দাড়ির তেজ মিইয়ে আসবে আর সুর ঢিমিয়ে আসবে, তখন শুধু এক সপ্তাহ গুটিকা ঘষলেই দাড়ি আবার জ্যান্ত হয়ে উঠবে। একটা কথা মনে রাখবে—দাড়িতে যেন কিছুতেই চামচিকা না বসে। একবার চামচিকার খপ্পরে পড়লে কিন্তু দাড়ি একেবারে ভেস্তিয়ে যাবে, তুমিও পস্তাতে থাকবে।'

সাধু আর এদিকে আসবেন না, তাই স্বদেশ তাঁকে খুব ভালো করে প্রণাম করল। বাড়ি ফিরেই স্বদেশ দাড়িতে সেই গুটিকা ঘষতে লাগল। একঘণ্টা পরে ঘুমোতে গেল, কিন্তু আনন্দের ঠেলায় সেদিন ঘুম আর এলই না। রোজ একঘণ্টা খুব উৎসাহের সঙ্গে দাড়িতে ঘষে। তার চেহারায় কিছু দিনের মধ্যেই একটা তেজের ভাব আর এক আনন্দের চিহ্ন দেখা দিল। ক্লাসে বন্ধুরা আর অধ্যাপক মহাশয়েরা মধ্যে মধ্যে বলতেন, 'স্বদেশ, তোমাকে এক নতুন মানুষ মনে হচ্ছে! উন্নতি করছ? বেশ বেশ, উন্নতিই করো।'

দুইমাস পরে স্বদেশের মনে হল যেন তার দাড়িতে কেউ আশীর্বাদ ঢেলে দিল, একটা প্রাণের

লক্ষণ এসে গেল—কেমন একটা জ্যান্ত জ্যান্ত ভাব। সে ছুটে গিয়ে বেহালার ছড়িটা হাতে নিল আর দাড়ির উপরে সেটা চালাতে লাগল। প্রথমে কতকটা ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতন একটা শব্দ শোনা গেল, কিন্তু অনেক বেশী মিষ্টি। পরে অস্পষ্ট হাসির মতন সুন্দর শব্দ—হা হা হা হা, হো হো হো হো, হি হি হি হি, হে হে হে হে। শেষে নানা অচেনা বাজনার নতুন নতুন সুর! স্বদেশ বাঁ হাতে দাড়িটাকে বেশ জোরে টেনে ধরে ডান হাতে সমানে ছড়ি বুলিয়ে যেতে লাগল। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'এই বাজনা শুনে শুনে তোমার অশেষ উন্নতি হবে। হিংস্র জানোয়ারেরা এই বাজনা শুনে ঘুমিয়েই পড়বে, সিংহ বাঘেরা পর্যন্ত গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে।' বাজাতে বাজাতে সাধুর কথায় স্বদেশের বিশ্বাস বেড়ে যেতে লাগল। রোজ অভ্যাস চলতে লাগল।

একদিন স্বদেশ খবরের কাগজে সিদ্ধিগড়ের রাজার একটা বিজ্ঞাপন দেখতে পেল। রাজা জানাচ্ছেন যে তিনি একটা ভয়ানক হিংস্র বাঘিনীকে ধরে খাঁচায় রেখেছেন; যে কেউ ওই খাঁচায় ঢুকে বাঘিনীর পায়ে আলতা পরিয়ে আসতে পারবে তাকে তিনি সোনার মেডেল উপহার দেবেন।

স্বদেশলাল বন্ধুদের কিছু না জানিয়ে, শুধু নিজের বাড়ির লোকদের একটু জানিয়ে রেখে সিদ্ধি-গড়ের দিকে রওনা হল। রেলগাড়িতে সাতাশি মাইল, বাস ধরে কয়েক মাইল, আর হেঁটে তিন মাইল যেতেই সে সিদ্ধিগড়ে এসে গেল। মনে তার যেমনি উৎসাহ তেমনি সাহস; একেবারে রাজসভায় গিয়ে হাজির। তার চেহারা দেখে রাজা অবাক্। সভার লোকেরা সকলেই অবাক্!

স্বদেশলাল বাঘিনীর খাঁচায় ঢুকবার মতলবের কথা জানাতেই রাজা বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এ কাজ পারবে কেন? শেষে একটা বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়বে। তোমাকে দেখে আমাদের বড্ড মায়া হচ্ছে।'

স্বদেশ উত্তর দিল, 'আপনারা আমার বিদ্যাটা দেখবেন। আমি যদি বাঘিনীকে ভোলাতে পারি তবেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে খাঁচায় ঢুকব।' রাজা আর আপত্তি করলেন না। স্বদেশকে নিয়ে সকলে বাঘিনীর খাঁচার ধারে গেল। ওঃ! সেটা একটা বাঘিনী বটে! একেবারে বাঘের রাজ্যের রানী! সারা শরীরে তেজ খেলে যাচ্ছে, চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক, পান খেয়ে ঠোঁট লাল।

স্বদেশ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঘিনী পান খায়?' রাজা বললেন, 'আগে খেত না। একবার এক শিকারী পানের খিলি সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিল। বাঘিনী শিকারীকে মেরে তার মাংস খেয়ে পানটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। সেদিন বাঘিনীর খুব ভালো হজম হয়েছিল। পানের গুণ জানতে পেরে বাঘিনী কয়েকদিন মানুষ মেরে পানের খোঁজ করেছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে পান ছিল না। এক দিন মহিষের মাংস খেয়ে পেট ভার হওয়াতে বাঘিনীটা একটা পানের দোকান লুট করে ভালো ভালো সাজা পান খেয়ে সুস্থ হয়। এইসব কথা শুনেছিলাম, তাই রোজ ওর খাওয়া হলে ওকে পান সেজে দেওয়া হয়।'

স্বদেশ বলল, 'এবার আমি আমার কাজ আরম্ভ করি।' দাড়িটাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে জোরসে টেনে

বাগিয়ে রেখে, দাড়িতে ছড়ি চালাতে চালাতে সে এমন সব সুর শোনাতে লাগল যা অন্যের কানে আগে কোনদিন ঢোকে নি। দাড়ির এমন দিব্যশক্তি দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, সকলেই একটা আনন্দের নেশায় বিভোর হয়ে গেল। বাঘিনীর চেহারা অনেকটা মোলায়েম হয়ে এল, মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব দেখা দিল, চোখ একটু একটু ছলছল করতে লাগল। ক্রমে তার চোখ আরামে বুজে আসতে লাগল, সে একটু একটু ঢুলতে লাগল, ঘর্‌ঘর্‌ করে একটা আরামের ডাক ডাকতে লাগল। শেষে ঘুমের ঘোরে শুয়ে পড়ে গাঁক গাঁক করে নাক ডাকাতে লাগল। তাই দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটোয়াল, এদের ধিঙ্গি-ধিঙ্গি ধিঙ্গি-ধিঙ্গি করে কী নাচ! কী নাচ! কী নাচ! আবার নাচ দেখে রানীর খিল-খিল খিল-খিল করে কী হাসি! কী হাসি! কী হাসি!

স্বদেশ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'আপনারা থামুন, থামুন! বাঘিনীর ঘুম ভেঙে যাবে।' শুনেই সকলে শান্ত হয়ে গেল। খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে স্বদেশ একটা কাঠি দিয়ে বাঘিনীর মাথায় জোরে জোরে টোকা মেরে দেখতে পেল যে বাঘিনী আর নড়ে-চড়ে না; একেবারে কুম্ভকর্ণের দিদিমার মতন ঘুমোচ্ছে। তখন সে খাঁচায় ঢুকে খুব যত্নের সঙ্গে বাঘিনীর পায়ে আলতা মাখিয়ে দিয়ে, ঘুমন্ত বাঘিনীকে প্রণাম করে বিজয়ী বীরের মতন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। সকলে মিলে তখন কী আনন্দ!

স্বদেশকে নিয়ে সিদ্ধিগড়ে একসপ্তাহ খুব উৎসব করা হল। পরে রাজা তাকে সোনার মেডেল দিলেন। ফিরে আসবার আগের দিন রাজার বাগানে স্বদেশ একটা নতুন রকমের গাছ দেখতে পেল। সে গাছের কাছে এগিয়ে যেতেই একটা চামচিকা নেমে এসে তার দাড়িতে ঢুকে গিয়ে লটকিয়ে রইল। স্বদেশ যতই দাড়ি ঝাড়ে, চামচিকা ততই জোরে দাড়ি আঁকড়িয়ে ধরে আর ফড়র্‌ ফড়র্‌ করে! সে এক বিদ্‌ঘুটে অবস্থা!

গাছটার কাছেই রাজার দারোয়ানের রান্নাঘরে রান্না চড়েছে। স্বদেশলাল ছুটে সেখানে গিয়ে দারোয়ানের কাছে সাহায্য চাইল। দারোয়ানজী স্বদেশের দাড়ি কেটে দেবার জন্য একটা কাঁচি আনতে গেল। এদিকে উনুনের মধ্যে একটা লঙ্কা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিকে কারো খেয়াল যায় নি। দারোয়ান ফিরতে না ফিরতেই লঙ্কার কড়া ধোঁয়া বেরিয়ে চামচিকাটাকে এমন অস্থির করে দিল যে সেটা ডাকাতের মতন খানিকটা দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েই পালিয়ে গেল!

স্বদেশ সেই মুহূর্তেই টের পেল যে তার দাড়িতে আর জ্যান্ত-জ্যান্ত ভাব নেই! ছড়ি চালিয়ে দেখতে পেল যে দাড়িতে আর সাড়া পাওয়া যায় না, সুর আর বেরোয় না। সে বিমর্ষ হয়ে আয়নার সামনে গিয়েই দেখতে পেল যে তার দাড়ির খানিকটা খুবলে যাওয়াতে অতি বিটকেল চেহারা হয়েছে!

সকলের পরামর্শে স্বদেশ তখন দাড়ি কামিয়ে নিল আর গোঁফ ছাঁটিয়ে নিল। তার চেহারা তখন অনেক বেশী ভালো দেখাতে লাগল। তাই দেখে রাজা, মন্ত্রী, কোটায়াল, এদের ধিঙ্গি-ধিঙ্গি-ধিঙ্গি-ধিঙ্গি করে কী নাচ! কী নাচ! কী নাচ! আর তাই দেখে রানীর খিলখিল খিলখিল করে কী হাসি! এবারে স্বদেশ তাদের মানা করতে পারছে না; এখন তো বাঘিনী জেগে যাবার ভয় নেই!

সিদ্ধিগড়ের রাজার আর রাজ্যের সব লোকের কাছে অনেক স্নেহযত্ন পেয়ে, সোনার মেডেল আর বাঘিনীর স্মৃতি নিয়ে স্বদেশ কলকাতায় ফিরে এল। তার আত্মীয়স্বজন, তার কলেজের বন্ধুরা আর অধ্যাপকমহাশয়রা তার সুশ্রী চেহারা দেখে খুব খুশী! সে আর দাড়ি রাখলই না দেখে আরো খুশী! দাড়ি হারাবার কারণটা সে একটু একটু করে সকলকে জানিয়ে দিয়েছিল। সহজ সরল মানুষ!

আফ্রিকার একপ্রান্তে বিস্তীর্ণ তৃণ-আচ্ছাদিত প্রান্তরে ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়ায় একদল জেব্রা — ঘন ও অগভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছের ছায়ায় ছায়ায় তাদের ডোরাকাটা দেহগুলি চমকে ওঠে আর সেদিকে তাকিয়ে গাছের উপর অপেক্ষারত লেপার্ডের চোখ জ্বলতে থাকে ক্ষুধিত হিংসায়, পশুরাজ সিংহের জিভ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে — কিন্তু জেব্রাদের দলপতি পেক্‌কা বড় সাবধানী জানোয়ার ; ঘাসঝোপে একটা খস খস শব্দ, বনের বাতাসে ভেসে আসে একটা কটু গন্ধ — ব্যস! চেঁচিয়ে ওঠে পেক্‌কা আর গোটা দলটা ঝড়ের বেগে ছুটে পালায় শত্রুর নাগালের বাইরে।

পিছনের ঝোপ থেকে ক্রুদ্ধ গর্জনে বন কেঁপে ওঠে, কিন্তু জেব্রাদের আর পায় কে!

তবু মাঝে মাঝে বিপদ ঘনিয়ে আসে

অনেকক্ষণ ধরে দুটো সিংহী জেব্রাদের পিছু নিয়েছে ওরা বড় বেশী কাছে এসে পড়ছে ···

নাঃ, এবার সাবধান না হলে বিপদ হতে পারে, পেক্‌কা হাঁক দেয় ···

সংকেত-ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুট দেয় জেব্রার দল, সিংহী দুটো একবার থমকে দাঁড়ায়, তারপরই বিদ্যুদ্বেগে তাড়া করে শিকারের পিছনে...

পিছন থেকে হিংস্র গর্জন ভেসে আসে। পেক্‌কা জানে সামনের ঘাস-ঝোপটা পার হলেই তারা নিরাপদ

কিন্তু ঝোপের মধ্যে...

লুকিয়ে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু
শিকারের অপেক্ষায়...

ররর হ-ল-ন-ন-ন

হিঁহঁহঁ!
অন্‌ন্‌ন্‌!
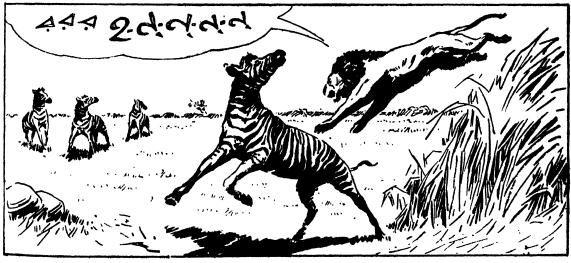
পিছন দিকে তাকায় না জেব্রার দল,
চাচা আপন প্রাণ বাঁচা এই হল
অরণ্যের আইন!
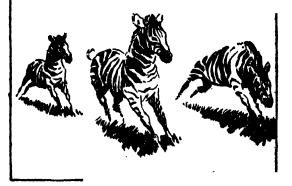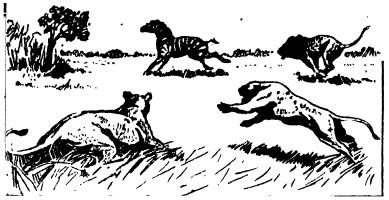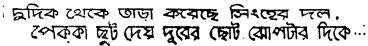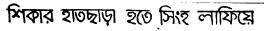
কিন্তু এত সহজে মরতে রাজী নয় পেকৃকা…

এক প্রচন্ড ঝটকায় ছিটকে পড়ে পশুরাজ!

দুদিক থেকে তাড়া করেছে সিংহের দল, পেকৃকা ছুট দেয় দূরের ছোট ঝোপটার দিকে…

ঝোপের সামনে গাছটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে…
কটাং!

ভাঙা গাছটার পিছন থেকে আত্মপ্রকাশ করে একটা মারমুখো ক্ষ্যাপা গন্ডার!

শিকার হাতছাড়া হতে সিংহ লাফিয়ে
পড়ে গন্ডারের উপর...

পশুরাজের দুর্দশা দেখে সিংহী
দুটো ভয় পেয়ে যায়...

পিছন থেকে
লড়াইয়ের
শব্দ ভেসে
আসে —
চোখে না
দেখলেও
ব্যাপারটা
বুঝতে
পেক্কার
অসুবিধা
হয় না।

দলের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে পেক্কা,
দূর থেকে উত্তর আসে...

খোকার এন্‌জিন

নির্ম্মলেন্দু গৌতম

ঝিক ঝিক যেতে যেতে
খেলাঘর কাঁপিয়ে,
মাঝে মাঝে এন্‌জিন
থেমে যায় হাঁপিয়ে !

খোকা সেই এন্‌জিনে
দম দেয় পয়লা,
তারপর ন্যাকড়ায়
দেয় মুছে ময়লা !

একঝাঁকা কয়লাও
দেয় খোকা চাপিয়ে :
ফের চলে এন্‌জিন
খেলাঘর কাঁপিয়ে !!

বিপিন চৌধুরীর স্মৃতিভ্রম

সত্যজিৎ রায়

নিউ মার্কেটের কালীচরণের দোকান থেকে প্রতি সোমবার আপিস-ফেরতা বই কিনে বাড়ি ফেরেন বিপিন চৌধুরী। যতরাজ্যের ডিটেকটিভ বই রহস্যের বই আর ভূতের গল্প। একসঙ্গে অন্তত খান পাঁচেক বই না কিনলে তাঁর এক সপ্তাহের খোরাক হয় না। বাড়িতে তিনি একা মানুষ। লোকের সঙ্গে মেলামেশা তাঁর ধাতে আসে না, আড্ডার বাতিক নেই, বন্ধুপরিজনের সংখ্যাও কম। সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেসব কাজের লোক আসেন, তাঁরা কাজের কথা সেরে উঠে চলে যান। যাঁরা ওঠেন না বা উঠতে চান না, বিপিনবাবু তাঁদের সোয়া আটটা বাজলেই বলেন—'আমার ডাক্তারের আদেশ আছে—সাড়ে আটটায় খাওয়া সারতে হবে। কিছু মনে করবেন না…'। খাওয়ার পর আধঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর গল্পের বই হাতে নিয়ে সোজা বিছানায়। এই নিয়ম যে কতদিন ধরে চলেছে বিপিনবাবুর নিজেরই তার হিসেব নেই।

আজ কালীচরণের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিপিনবাবুর খেয়াল হল আরেকটি লোক যেন তাঁর পাশে কিছুক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। বিপিনবাবু মুখ তুলে দেখেন একটি গোলগাল অমায়িক চেহারার ভদ্রলোক তাঁরই দিকে চেয়ে হাসছেন।

'আমায় চিনতে পারছেন না বোধহয়?'

বিপিনবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেন। কই, এঁর সঙ্গে তো কোনদিন আলাপ হয়েছে বলে তাঁর মনে পড়ে না। এমন মুখও তো কোন মনে পড়ছে না তাঁর।

'অবিশ্যি আপনি কাজের মানুষ। অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয় তো রোজ—তাই বোধহয়…'

'আমার কি আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে এর আগে?'

ভদ্রলোক যেন এবার একটু অবাক হয়েই বললেন, 'আজ্ঞে সাতদিন দুবেলা সমানে দেখা হয়েছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলুম—সেই গাড়িতে আপনি হুড্রু ফল্‌স দেখতে গেলেন। সেই নাইনটিন ফিফ্‌টি এইটে—রাঁচিতে! আমার নাম পরিমল ঘোষ।'

'রাচি ?' বিপিনবাবু এবার বুঝলেন যে ভুল তাঁর হয় নি, হয়েছে এই লোকটিরই। কারণ বিপি বাবু কোনদিন রাঁচি যান নি। যাবার কথা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি এবার বিপিনবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমি কে তা আপনি জানেন কি ?'

ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে জিভ কেটে বললেন, 'আপনি কে তা জানব না ? বলেন কী বিপিন চৌধুরীকে কে না জানে ?'

বিপিনবাবু এবার বইয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'কিন্তু তাও আপনার ভুল হয়েছে ওরকম হয় মাঝে মাঝে। আমি রাঁচি যাই নি কখনো।'

ভদ্রলোক এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'কী বলছেন মিস্টার চৌধুরী ? ঝরনা দেখতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে আপনার হাঁটু ছ গেল। আমিই শেষটায় আয়োডিন এনে দিলুম। পরদিন নেতারহাট যাবার জন্যে আমি গাি ঠিক করেছিলুম—আপনি পায়ের ব্যথার জন্যে যেতে পারলেন না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না ? আপনা চেনা আরেকজন লোকও তো গেস্‌লেন সেবার—দীনেশ মুখুজ্যে। আপনি ছিলেন একটা বাংলে ভাড়া করে—বললেন হোটেলের খাবার আপনার ভালো লাগে না—তার চেয়ে বাবুর্চি দিয়ে রান্না করি নেওয়া ভালো। দীনেশ মুখুজ্যে ছিলেন তাঁর বোনের বাড়িতে। আপনাদের দুজনের সেই ত লেগেছিল একদিন চাঁদে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে—মনে নেই ? সব ভুলে গেলেন ? আরো বলছি— আপনার একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ছিল—তাতে গল্পের বই থাকত। বাইরে গেলে নিয়ে যেতেন কেমন—ঠিক কিনা ?'

বিপিনবাবু এবার গম্ভীর সংযত গলায় বললেন, 'আপনি নাইনটিন ফিফ্‌টি-এইটের কোন্ মাসে কথা বলছেন বলুন তো ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মহালয়ার ঠিক পরেই। হয় আশ্বিন, নয় কার্তিক।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। পুজোয় সে বছর আমি ছিলাম কানপুরে আমার এক বন্ধু বাড়িতে। আপনি ভুল করছেন। নমস্কার।'

কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন না। অবাক অপলক দৃষ্টিতে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে যেতে লাগলেন, 'কী আশ্চর্য ! একদিন সন্ধ্যাবেলা আপনার বাংলোর দাওয়ায় বসে চা খেলুম। আপনি আপনার ফ্যামিলির কথা বললেন—বললেন, আপনার ছেলেপিলে নেই, আপনার স্ত্রী বারো তেরো বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ভাই পাগল ছিলেন, তাই আপনি পাগলা গারদ দেখতে যেতে চাইলেন না। বললেন, ভাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়…'

বিপিনবাবু যখন বইয়ের দামটা দিয়ে দোকান থেকে বেরোচ্ছেন তখনও ভদ্রলোক তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন।

বারট্রাম স্ট্রীটে লাইটহাউস সিনেমার গায়ে বিপিন চৌধুরীর বুইক গাড়িটা লাগানো ছিল। তিনি গাড়িতে পৌঁছে ড্রাইভারকে বললেন, 'একটু গঙ্গার ধারটায় ঘুরে চলো তো সীতারাম।'

চলন্ত গাড়িতে বসে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বিপিনবাবুর আপসোস হল। বাজে ভণ্ড লোকটাকে এতটা সময় কেন মিছামিছি দিলেন তিনি! রাঁচি তো তিনি যান নি, কখনই যেতে পারেন না। মাত্র ছ সাত বছর আগেকার স্মৃতি মানুষে অত সহজে ভুলতেই পারে না, এক যদি না—

বিপিনবাবুর মাথা হঠাৎ বন্ করে ঘুরে গেল।

এক যদি না তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু তাই বা হয় কী করে?

তিনি তো দিব্যি আপিসে কাজ করে যাচ্ছেন। এত বিরাট আপিস—এত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কোথাও তো কোন ত্রুটি হচ্ছে বলে তিনি জানেন না। আজও তো একটা জরুরী মিটিংএ আধঘণ্টার বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। আশ্চর্য! অথচ—

অথচ লোকটা তাঁর এত খবর রাখল কী করে? এ যে একেবারে নাড়ীনক্ষত্র জেনে বসে আছে। বইয়ের ব্যাগ, স্ত্রীর মৃত্যু, ভাইয়ের মাথা খারাপ! ভুল করেছে কেবল ওই রাঁচির ব্যাপারে। ভুল কেন—জেনেশুনে মিথ্যে বলছে। আটান্ন সালের পুজোয় তিনি রাঁচি যাননি; গিয়েছিলেন কানপুরে, তাঁর বন্ধু হরিদাস বাগচির বাড়িতে। হরিদাসকে লিখলেই—নাঃ, হরিদাসকে লেখার উপায় নেই।

বিপিনবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল হরিদাস বাগচি আজ মাসখানেক হল সস্ত্রীক জাপানে গেছেন তাঁর ব্যাবসার ব্যাপারে। জাপানের ঠিকানা বিপিনবাবু জানেন না। কাজেই চিঠি লিখে প্রমাণ আনানোর রাস্তা বন্ধ।

কিন্তু প্রমাণের প্রয়োজনটাই বা কোথায়। এমন যদি হত যে উনিশ শ আটান্ন সালের আশ্বিন মাসে রাঁচিতে কোন খুনের জন্য পুলিশ তাঁকে দায়ী করার চেষ্টা করত, তখনই তাঁর চিঠির প্রয়োজন হত হরিদাস বাগচির কাছ থেকে। এখন তো প্রমাণের কোন দরকার নেই। তিনি নিজে জানেন তিনি রাঁচি যান নি। ব্যস্, ল্যাঠা চুকে গেল।

গঙ্গার হাওয়াতে বিপিন চৌধুরীর মাথা অনেক ঠাণ্ডা হলেও, মনের মধ্যে একটা খটকা, একটা অশোয়াস্তিবোধ যেন থেকেই গেল!

হেস্‌টিংস-এর কাছাকাছি এসে বিপিনবাবু তাঁর প্যান্টের কাপড়টা গুটিয়ে উপরে তুলে দেখলেন যে ডান হাঁটুতে একটা এক-ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ রয়েছে। সেটা কবেকার দাগ তা বোঝবার কোন উপায় নেই। ছেলেবেলা কি কখনও হোঁচট খেয়ে হাঁটু ছড়ে নি বিপিনবাবুর? অনেক চেষ্টা করেও সেটা তিনি মনে করতে পারলেন না।

চড়কডাঙার মোড়ের কাছাকাছি এসে তাঁর দীনেশ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। লোকটা বলছিল দীনেশ মুখুজ্যে ছিল রাঁচিতে ওই একই সময়ে। তাহলে দীনেশকে জিগ্যেস করলেই তো হয়। সে থাকে কাছেই—বেণীনন্দন স্ট্রীট। এখনই যাবেন কি তার কাছে? কিন্তু যদি রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা মিথ্যেই হয়—তাহলে দীনেশকে সে সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করতে গেলে তো সে বিপিনবাবুকে পাগল ঠাওরাবে। না না—এ ছেলেমানুষি তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সেধে সেধে

এইভাবে বোকা বানানো কোনমতেই চলতে পারে না। আর দীনেশের বিদ্রূপ যে কত নির্মম হতে পারে তার অভিজ্ঞতা বিপিনবাবুর আছে।···

বাড়ি এসে ঠাণ্ডা ঘরে বসে ঠাণ্ডা ফলের শরবত খেয়ে বিপিনবাবুর উদ্বেগটা অনেক কম বলে মনে হল। যত সব বাউণ্ডুলের দল! নিজেদের কাজকর্ম নেই, তাই কাজের লোকদের ধরে ধরে বিব্রত করা।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে নতুন বইটা পড়তে পড়তে বিপিনবাবু নিউমার্কেটের ভদ্রলোকটির কথা ভুলেই গেলেন।

পরদিন আপিসে কাজ করতে করতে বিপিনবাবু লক্ষ্য করলেন যে যতই সময় যাচ্ছে ততই যেন গতকালের ঘটনাটা তাঁর স্মৃতিতে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে আসছে। সেই গোলগাল মুখ, সেই ঢুলুঢুলু অমায়িক চাহনি, আর সেই হাসি। তাঁর এত ভেতরের খবরই যদি লোকটা নির্ভুল জেনে থাকে, তবে রাঁচির ব্যাপারটায় সে এত ভুল করল কী করে?

লাঞ্চের ঠিক আগে—অর্থাৎ একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময়—বিপিনবাবু আর থাকতে না পেরে টেলিফোনের ডিরেক্টরিটা খুলে বসলেন। দীনেশ মুখুজ্যেকে ফোন করতে হবে একটা। ফোনই ভালো। অপ্রস্তুত হবার সম্ভাবনাটা কম।

টু-থ্রি-ফাইভ-সিক্স-ওয়ান-সিক্স।

বিপিনবাবু ডায়াল করলেন।

'হ্যালো।'

'কে, দীনেশ? আমি বিপিন কথা বলছি।'

'কী খবর?'

'ইয়ে—ফিফ্‌টি এইটের একটা ঘটনা তোমার মনে আছে কিনা জানবার জন্য ফোন করছি।'

'ফিফ্‌টি এইট? ঘটনা? কী ঘটনা?'

'সে বছরটা কি তুমি কলকাতাতেই ছিলে? আগে সেইটে আমার জানা দরকার।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। ফিফ্‌টি এইট—আটান্নো···দাঁড়াও, আমার ডায়রি দেখি। একটু ধরো।'

একটুক্ষণ চুপচাপ। বিপিনবাবু তাঁর বুকের ভেতর একটা দুরুদুরু কাঁপুনি অনুভব করলেন। প্রায় এক মিনিট পরে আবার দীনেশ মুখুজ্যের গলা পাওয়া গেল।

'হ্যাঁ, পেয়েছি। আমি বাইরে গেস্‌লাম—দুবার।'

'কোথায়?'

'একবার গেস্‌লাম ফেব্রুয়ারিতে—কাছেই—কেষ্টনগর—আমার এক ভাগনের বিয়েতে। আরেকবার—ও, এটা তো তুমি জানই। সেই রাঁচি। সেই যে যেবার তুমিও গেলে। ব্যস্‌। কিন্তু কেন বলো তো?'

'না। একটা দরকার ছিল। ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ...'

বিপিনবাবু টেলিফোনটা রেখে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তার কান ভোঁ ভোঁ করছে, হাত পা যেন সব কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সঙ্গে টিফিনের বাক্সে স্যাণ্ডউইচ ছিল, সেটা আর তিনি খেলেন না। খাবার কোন ইচ্ছেই হল না। তাঁর খিদে চলে গেছে।

লাঞ্চ টাইম শেষ হয়ে যাবার পর বিপিনবাবু বুঝতে পারলেন, এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে আপিসে বসে কাজ করা অসম্ভব। তাঁর পঁচিশ বছরের কর্মজীবনে এর আগে এরকম কখনো হয় নি। নিরলস কর্মী বলে বিপিনবাবুর একটা খ্যাতি ছিল। কর্মচারীরা তাঁকে বাঘের মতো ভয় করত। যত বিপদই আসুক, যত বড় সমস্যারই সামনে পড়তে হোক, বিপিনবাবুর কোনদিন মতিভ্রম হয় নি। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে সব সময়ে সব বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন তিনি।

আজ কিন্তু তাঁর সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে!

আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরে, শোবার ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে মনটাকে প্রকৃতিস্থ করে, কী করা উচিত সেটা ভাববার চেষ্টা করলেন বিপিনবাবু। মানুষ মাথায় চোট খেয়ে বা অন্য কোনরকম অ্যাকসিডেণ্টের ফলে মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আর সব মনে আছে, শুধুএকটা বিশেষ ঘটনা মনে নেই—এর কোন উদাহরণ তিনি আর কখনও পান নি। রাঁচি যাবার ইচ্ছে তাঁর অনেক দিন থেকেই ছিল। সেই রাঁচিই গেছেন, অথচ গিয়ে ভুলে গেছেন, এ একেবারে অসম্ভব।

বাইরে কোথাও গেলে বিপিনবাবু তাঁর বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু এখন যে বেয়ারাটি আছে সে নতুন লোক। সাত বছর আগে তাঁর বেয়ারা ছিল রামপ্রসাদ। তিনি রাঁচি গিয়ে থাকলে সেও নিশ্চয়ই যেত, কিন্তু এখন সে

আর নেই , তিন বছর হল নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপিনবাবু একাই কাটালেন তাঁর ঘরে। মনে মনে স্থির করলেন আজ কেউ এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না।

সাতটা নাগাদ চাকর এসে খবর দিল তাঁর সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী শেঠ গিরিধারিপ্রসাদ দেখা করতে এসেছেন। জাঁদরেল লোক গিরিধারিপ্রসাদ। কিন্তু বিপিনবাবুর মানসিক অবস্থা তখন এমনই যে তিনি বাধ্য হয়ে চাকরকে বলে দিলেন যে তাঁর পক্ষে নীচে নামা সম্ভব নয়। চুলোয় যাক গিরিধারিপ্রসাদ!

সাড়ে সাতটায় আবার চাকরের আগমন। বিপিনবাবুর তখন সবে একটু তন্দ্রার ভাব এসেছে, একটা দুঃস্বপ্নের গোড়াটা শুরু হয়েছে, এমন সময় চাকরের ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। আবার কে এল? চাকর বলল, চুনিবাবু। বলছে ভীষণ জরুরী দরকার।

দরকার যে কী তা বিপিনবাবু জানেন। চুনি তাঁর স্কুলের সহপাঠী। সম্প্রতি দুরবস্থায় পড়েছে, কদিন থেকেই তাঁর কাছে আসছে একটা কোন চাকরির আশায়। বিপিনবাবুর তার জন্যে কিছু করা সম্ভব নয়, তাই প্রতিবারই তিনি তাকে না বলে দিয়েছেন। আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক তো চুনি!

বিপিনবাবু অত্যন্ত বিরক্তভাবে চাকরটাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে শুধু আজ নয়—বেশ কিছু দিন তাঁর পক্ষে চুনির সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না।

চাকর ঘর থেকে চলে যেতেই বিপিনবাবুর খেয়াল হল যে চুনির হয়তো আটান্নর ঘটনা কিছুটা মনে থাকতে পারে। তাকে একবার জিগ্যেস করাতে দোষ কী?

বিপিনবাবু তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈঠকখানায় হাজির হলেন। চুনি যাবার জন্য উঠে পড়েছিল, বিপিনবাবুকে নেমে আসতে দেখে সে যেন একটু আশান্বিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল।

বিপিনবাবু ভণিতা না করেই বললেন, 'শোনো চুনি, তোমার কাছে একটা—ইয়ে, একটু বেখাপ্পা প্রশ্ন আছে। তোমার তো বেশ স্মরণশক্তি বেশ ভালো ছিল বলে জানি—আর আমার বাড়িতে তো তুমি অনেক বছর ধরেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করছ। ভেবে দেখো তো মনে পড়ে কিনা—আমি কি আটান্ন সালে রাঁচি গিয়েছিলাম?'

চুনি বলল, 'আটান্ন? আটান্নই তো হবে। নাকি উনপঞ্চাশ?'

'রাঁচি যাওয়াটা নিয়ে তোমার কোন সন্দেহ নেই?'

চুনি এবার রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

'তোমার কি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই সন্দেহ হচ্ছে?'

'আমি গিয়েছিলাম? তোমার ঠিক মনে আছে?'

চুনি যে সোফা থেকে উঠেছিল, সেটাতেই আবার ধপ করে বসে পড়ল। তারপর সে বিপিন চৌধুরীর দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, 'বিপিন, তুমি কি নেশাটেশা ধরেছ নাকি আজকাল? এদিকে তো তোমার কোন বদনাম ছিল না! তুমি কড়া মেজাজের লোক, পুরোনো

বন্ধুদের প্রতি তোমার সহানুভূতি নেই—এসবই তো জানতুম! কিন্তু তোমার তো মাথাটা পরিষ্কার ছিল; অন্তত কিছুদিন আগে অবধি ছিল!'

বিপিনবাবু কম্পিতস্বরে বললেন, 'তোমার মনে আছে আমার যাবার কথা?'

চুনি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল। সে বলল—

'আমার শেষ চাকরি কী ছিল মনে আছে তোমার?'

'বিলক্ষণ। তুমি হাওড়া স্টেশনে বুকিং ক্লার্ক ছিলে।'

'তোমার সেটা মনে আছে, আর আমিই যে তোমার রাঁচির বুকিং করে দিলুম সেটা মনে নেই? তোমার যাবার দিন তোমার কামরায় গিয়ে দেখা করলাম, ডাইনিং কারে বলে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম, তোমার কামরায় পাখা চলছিল না—সেটা লোক ডেকে চালু করে দিলাম—এসব তুমি ভুলে গেছ? তোমার হয়েছে কী?'

বিপিনবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন।

চুনি বলল, 'তোমার কি অসুখ করেছে? তোমার চেহারাটা তো ভালো দেখছি না।'

বিপিনবাবু বললেন, 'তাই মনে হচ্ছে। কদিন কাজের চাপটা একটু বেশি পড়েছিল। দেখি একটা স্পেশালিস্ট-টেশালিস্ট...'

বিপিনবাবুর অবস্থা দেখেই বোধহয় চুনি আর চাকরির উল্লেখ না করে আস্তে আস্তে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

পরেশ চন্দকে ইয়াং ডাক্তারই বলা চলে, চল্লিশের নীচে বয়স, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। বিপিনবাবুর ব্যাপার শুনে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিপিনবাবু তাঁকে মরিয়া হয়ে বললেন, 'দেখুন ডক্টর চন্দ, আমার এ ব্যারাম আপনাকে সারিয়ে দিতেই হবে। আপিস কামাই করার ফলে যে কী ক্ষতি হচ্ছে আমার ব্যবসার তা আমি বোঝাতে পারব না। আজকাল তো অনেক ওষুধ বেরিয়েছে। আমার এ ব্যারামের জন্য কি কিছুই নেই? আমি যত টাকা লাগে দেব। যদি বিদেশ থেকে আনাবার দরকার হয় তারও ব্যবস্থা করব। কিন্তু এ রোগ আপনাকে সারাতেই হবে।'

ডাক্তার একটু ভেবে চিন্তে মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন মিস্টার চৌধুরী? আমার কাছে এ রোগ একেবারে নতুন জিনিস; আমার অভিজ্ঞতার একেবারে বাইরে। তবে একটা মাত্র উপায় আমি বলতে পারি। ফল হবে কিনা জানি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই।'

বিপিনবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন।

ডাক্তার বললেন, 'আমার যতদূর মনে হচ্ছে—এবং আমার বিশ্বাস আপনারও এখন তাই ধারণা—যে আপনি সত্যিই রাঁচি গিয়েছিলে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এই যাওয়ার ব্যাপারটা আপনি বেমালুম ভুলে গেছেন। আমি সাজেস্ট করছি যে আপনি আরেকবার রাঁচি যান। তাহলে হয়তো

জায়গাটা দেখে আপনার আগের ট্রিপএর কথাটা সব মনে পড়ে যাবে। এটা অসম্ভব নয়। আজ এই মুহূর্তে তো বেশি কিছু করা সম্ভব নয়! আমি আপনাকে একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি—সেটা খেলে হয়তো ঘুমটা হবে। ঘুমটা দরকার, তা নাহলে আপনার অশান্তি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অসুখও বেড়ে যাবে। আপনি একটা কাগজ দিন, আমি ওষুধটা লিখে দিচ্ছি।'

বড়ির জন্যেই হোক্, বা ডাক্তারের পরামর্শের জন্যেই হোক, বিপিনবাবু পরদিন সকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করলেন।

প্রাতঃকালীন জলযোগ সেরে আপিসে টেলিফোন করে কিছু ইন্‌স্ট্রাকশন দিয়ে সেইদিনই রাত্রের জন্য রাঁচির টিকিট কিনলেন।

পরদিন রাঁচি স্টেশনে নেমেই তিনি বুঝলেন এ জায়গায় তিনি কস্মিনকালেও আসেন নি।

স্টেশন থেকে ঢুকে একটা গাড়ি করে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে বুঝলেন যে এখানের রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, প্রকৃতিক দৃশ্য, মোরাবাদি পাহাড়, হোটেল, বাংলো, কোনটার সঙ্গেই তাঁর বিন্দু-মাত্র পরিচয় নেই। হুড্রু ফল্‌স কি তিনি চিনতে পারবেন? জলপ্রপাতের
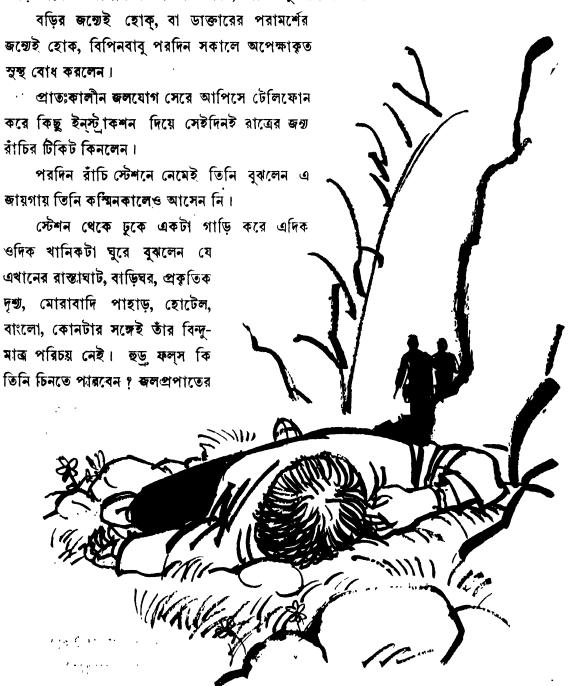
দৃশ্য দেখলেই কি তাঁর পুরোনো কথা সব মনে পড়ে যাবে ?

নিজে সে কথা বিশ্বাস না করলেও, পাছে কলকাতায় ফিরে অনুতাপ হয় তাই একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দুপুরের দিকে হুড্রুর দিকে রওনা দিলেন।

সেইদিনই বিকেল পাঁচটার সময় হুড্রুতে একটি পিকনিকের দলের দুটি গুজরাটি ভদ্রলোক বিপিনবাবুকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি পাথরের ঢিপির পাশে আবিষ্কার করল। এই দুই ভদ্রলোকের শুশ্রূষার ফলে জ্ঞান ফিরে পেতেই বিপিনবাবু প্রথম কথা বললেন—'আমি রাঁচি আসি নি। আমার সব গেল! আর কোন আশা নেই…'

পরদিন সকালে বিপিন চৌধুরী কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে যদি না তিনি এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারেন, তবে তাঁর আর সত্যিই কোন আশা নেই। তাঁর কর্মক্ষমতা, তাঁর আত্মবিশ্বাস, তার উৎসাহ বুদ্ধি বিবেচনা সবই তিনি ক্রমে ক্রমে হারাবেন। শেষে কি তাহলে তাঁকে সেই রাঁচির…?

এর পরে আর বিপিনবাবু ভাবতে পারেন না, ভাবতে চান না।…

বাড়ি ফিরে কোনরকমে স্নান করে মাথায় বরফের থলি চাপা দিয়ে বিপিন চৌধুরী শয্যা নিলেন। চাকরকে বললেন ডাক্তার চন্দকে ডেকে নিয়ে আসতে।

চাকর যাবার আগে তাঁর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল কে জানি ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে গেছে। সবুজ খাম, তার উপর লাল কালিতে লেখা—শ্রীবিপিনবিহারী চৌধুরী। জরুরী, একান্ত ব্যক্তিগত।'

অসুস্থতা সত্ত্বেও বিপিনবাবুর কেন জানি মনে হল যে চিঠিটা তাঁর পড়া দরকার। খাম খুলে দেখেন এই চিঠি—

'প্রিয় বিপিন,

হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কুফল যে তোমার মধ্যে এভাবে দেখতে পাব তা আশা করি নি। একজন দুঃস্থ বাল্যবন্ধুর জন্য একটা উপায় করে দেওয়া কি সত্যিই তোমার পক্ষে এত অসম্ভব ছিল? আমার টাকা নেই, তাই ক্ষমতা সামান্যই। যে জিনিসটা আছে আমার সেটা হল কল্পনাশক্তি। তারই সামান্য কিছুটা খরচ করে তোমার উপর সামান্য প্রতিশোধ নিলাম।

নিউমার্কেটের সেই ভদ্রলোকটি আমার প্রতিবেশী; বেশ ভালো অভিনেতা। দীনেশ মুখুজ্যে তোমার প্রতি সদয় নন, তাই তাকে হাত করতে কোন অসুবিধা হয় নি। হাঁটুর দাগটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—সেই চাঁদপাল ঘাটে আছাড় খাওয়া—উনিশ শ ছত্রিশ সনে?…

আর কী? এবার সেরে উঠবে। আমার একটি উপন্যাস এক প্রকাশকের পছন্দ হয়েছে। কয়েকটা মাস তাতেই কোনরকমে চালিয়ে নেব। ইতি।

তোমারই বন্ধু 'চুনিলাল'

ডাক্তার চন্দ আসতেই বিপিনবাবু বললেন, 'ভালো আছি। রাঁচি স্টেশনে নেমেই সব মনে পড়ে গেল।'

ডাক্তার বললেন, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আপনার কেসটা একটা ডাক্তারি জার্নালে ছাপিয়ে দেব ভাবছি।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আপনাকে যেই জন্য ডাকা—দেখুন তো, আমার কোমরের হাড়টাড় ভাঙল কিনা। রাঁচিতে হোঁচট খেয়েছিলাম। টনটন করছে।'

———

মিঠু! টু···কি···

ছবি। অমল চক্রবর্ত্তী

প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তর

জীবন সর্দার
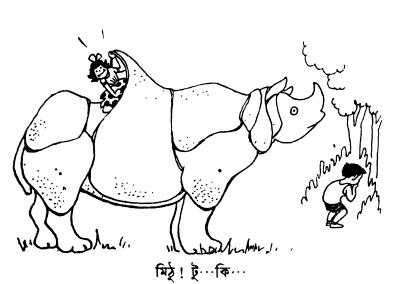
প্রকৃতি-পড়ুয়া বন্ধুরা,

আমার এই চিঠিটা যখন তোমরা খুলে পড়বে, তখন নতুন এক উপকূলে, পাহাড়-বনে, আমার নতুন করে প্রকৃতি-পড়া শুরু হবে। পড়ুয়ার চোখ দিয়ে পড়ুয়াদের জন্যে প্রকৃতিকে পড়তে গিয়ে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পড়বে।

এমনি এক ঝলমলে সকালে এক বছর আগে নীলাঞ্জনের সঙ্গে আমার পরিচয়। সে আমাকে ভিড়িয়ে নিল তার দলে। তারপর শুরু হল যা জানা তাতে, আজও যা জানি না, তার খোঁজ। আমি একা কত আর পারি, ডাক দিলাম তোমাদের। একে একে তোমরা এলে। প্রশ্ন নিয়ে, উত্তর নিয়ে আর খবর নিয়ে। তারায় তারায় আকাশটা ভরে গেল।

'জীবন সর্দার, আমাকে তোমার প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরে নিয়ে নিও।' এইভাবে শুরু হয় সব পড়ুয়াদের চিঠি। তাতে আরও থাকে কত প্রশ্ন। যেমন শোনো :

বিপ্লব আর সৌমা চট্টোপাধ্যায় (নতুন পড়ুয়া) প্রশ্ন করেছে : 'টিয়া চন্দনা ও ময়না প্রভৃতি পাখির মতো চড়াই চাতক আর কাক এরা কথা বলতে পারে না কেন? সাপের জিভ চেরা কেন? কেনই বা সাপ ঘন ঘন জিভ বার করে? কোন্ গাছ ছোট ছোট প্রাণী খায়, কী করে খায়?'

অশোকচন্দ্র চন্দ, ৩৮নং পড়ুয়া (রামপুরহাট) লক্ষ্য করেছে—'মুরগী যখন ডিম পাড়ে তার আগে ক্ ক্ ক্ ক্ করে ডাকে এবং ডিম পাড়ার পর ক্ক্ক্ ককড় করে ডাকে।' সে জানতে চায়, এর কারণ কী? সে আরও জানতে চেয়েছে, 'কোন্ দেশে একটিও মশা নেই আর একটা মশা কতবার কামড়ালে শরীর থেকে ½ সি সি রক্ত চলে যায়?'

পড়ুয়াদের নজর শুধু পশু-পাখি বা পোকামাকড়ের দিকেই রয়েছে তা নয়, গাছপালার দিকেও তাদের দৃষ্টি পড়েছে :

অশোক চট্টোপাধ্যায় (৩৭ নং পড়ুয়া) জানতে চেয়েছে : 'ব্যাঙের ছাতা কী করে খাদ্য সংগ্রহ করে?' তার আর-একটা প্রশ্ন—'অর্কিডের শেকড় ও সবুজ প্রাণ দুইই আছে কিন্তু তবু তারা পরগাছা

কেন ? এরা কি মাটিতে বাঁচতে পারে না ?' তার শেষ প্রশ্ন, 'বাঘ অধিকাংশ সময় পায়চারি করে বেড়ায় কেন ?'

পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর পড়ুয়ারাই দিক এই আমার ইচ্ছা। প্রশ্নগুলো তুলে দিয়ে আমি চুপচাপ থাকতাম। পড়ুয়াদের কাছ থেকে উত্তর আসতে দেরি হত না।

বেবী দাশ (১২নং পড়ুয়া) চাতক পাখি বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় কি জল খেয়ে থাকে, এই প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছে :

চাতক যে শুধু বৃষ্টির জলই খেয়ে থাকে এ কথা ঠিক নয়। ওরা অন্য সব পাখিরই মতো খাবার যেমন খায়, জলও তেমনি খায়। চাতকের ডাকের সঙ্গে 'ফটিক জল' কথাটা মানুষেরই মিলিয়ে দেওয়া।

বহুরূপী রঙ বদলায় কী করে ? তার উত্তরে সে বলছে : বহুরূপীর রঙ বদলায় তার শরীরের 'ভিতরকার গ্রন্থির রস' বেরোবার ফলে। এই রসকে বলে 'হর্মোন'। এরা বেরিয়ে সরাসরি রক্তে মিশে যায়। বহুরূপী এই গ্রন্থিগুলোকে ইচ্ছেমতো খুলে বা বন্ধ করে শরীরের রঙ বদল করে।

টিকটিকির লেজে কিছু লাগলেই খসে যায় কেন ? বা, কুকুর ঘাস খায় কেন ? প্রশ্ন দুটি পুরনো হয়েও পড়ুয়াদের কাছে নতুন। বহু জনে বহুবার এই প্রশ্ন করেছে। তার উত্তরে বেবী জানাচ্ছে :

টিকটিকি যে লেজটা নিয়ে জন্মায় তাতে হাড়গুলো পরস্পর, এমনকি শিরদাঁড়ার সঙ্গেও, জোড়া থাকে না। হাড় যেমন আলাদা, তাতে মাংসও গজায় আলাদা। হাড়গুলো একের সঙ্গে অন্যে জোড়া না থাকায় একটু আঘাতেই মাংসসুদ্ধ খসে যায়। কিন্তু ওদের আবার লেজ গজায়।

কুকুর-বেড়াল ঘাস খায় বমি করবার জন্যে। আমরা বমি করবার জন্যে যেমন গরম নুন-জল খাই। যে সমস্ত ঘাসের পাতা খসখসে সেগুলিই ওরা খায়। পাতাগুলো গলা পর্যন্ত নামিয়ে সেগুলো বারবার উগরোতে গিয়েই বমি আসে। এ ছাড়া অন্য কারণ নেই।

গৌতম রায় (পড়ুয়া নং ৪৫) অগস্টের দপ্তরে যে কয়টা প্রশ্ন ছিল তার কয়েকটার উত্তর দিয়েছে। যেমন, 'কেঁচোর চোখ—কেঁচোর কোনো চোখ নেই। এদের শরীরের উপরের দিকে 'স্পর্শ ইন্দ্রিয়' থাকে। ওই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ওরা শব্দ, বস্তু বা আলোর অস্তিত্ব টের পায়।'

'লজ্জাবতী লতা—লজ্জাবতী লতার গায়ে হাত দিলে এদের পাতা আর ডালপালা কুঁকড়ে যায়, কারণ, ওদের পাতার গোড়ার দিকে ফোলা-মতো একটা জায়গায় কোষে জল ভরা থাকে। এই জলের শক্তি ডালটাকে খাড়া করে রাখে। যখন পাতায় কেউ হাত দেয় সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুভূতির জন্য জল নীচে নেমে যায় এবং ওই পাতা ধরে রাখার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, পাতাটা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।'

পড়ুয়াদের প্রশ্ন আর উত্তর দেখে আমি যেমন তাদের জ্ঞানের পরিচয় পাই তেমনি তাদের চোখে দেখা বিবরণ পড়ে বুঝতে পারি তারা কী নিখুঁত দৃষ্টি নিয়ে চারপাশের সবকিছু লক্ষ্য করে।

সুচিত্রা সেন, নতুন পড়ুয়া, (কৃষ্ণনগর) লিখেছে, 'জুন মাসে আমাদের বাগানে দুটি পাখির বাসা

দেখেছিলাম। ডুমুর গাছের দুটি পাতা এক করে, ঠোঙার মতো করে, তুলো দিয়ে পাতা দুটি বুনেছিল। ভিতরেও তুলো দিয়েছিল। তার ভিতর ছিল দুটি ডিম। গায়ে সাদার উপর লাল ছিট-ছিট। এটি টুনটুনি পাখির বাসা। শিউলি গাছে আর-একটি বাসা দেখেছিলাম। এই বাসাটি ছোট ছোট কাঠি দিয়ে তৈরী। বাসার উপরে একটা ঢাকনা ছিল। ওখানে পায়রার ডিমের মতো বড় ডিম ছিল, তাতে সাদার উপর লাল ছিট। এই বাসাটি ছিল বুলবুলির।'

ঠিক এই ধরনের বিবরণ অনেক অনেক পড়ুয়াদের কাছ থেকে পাই। এমনি ঘটনা যখন যেখানে দেখবে রোজনামচায় টুকে রাখবে। সময় বুঝে পাঠিয়ে দেবে দপ্তরে।

পাটরা বলে এক জায়গায় গিয়েছিল **বর্ণালী দে (নতুন পড়ুয়া, হুগলী)**। সে লিখেছে, 'সকালে উঠে এক তেঁতুলগাছে দেখলাম প্রচুর বক। তিনরকম বক দেখলাম, বামুন-বক—ওদের সব সাদা। ঠোঁট কালো, লম্বা গলা, পা লম্বা আর হলদে, মাথায় চার-আঙুল টিকি—একে আমরা টিকি-বক বলি। আর একরকম হল গোবক। ওরা টিকি-বকের চেয়ে ছোট, গলা সাদা, লম্বা, বুক সাদা, পিঠ আর ডানা হালকা লাল। মেঘের মতো কালো, গোবকের চেয়েও ছোট আর-এক জাতের বক দেখলাম। ওদের গায়ের রঙের মতোই ঠোঁটের রঙ। ঠোঁট ছোট, পাও ছোট আর হলদে। একদিন ঝড়ের শেষে দেখি তেঁতুলতলায় বকের ডিম আর বাসার ছড়াছড়ি। বাসাগুলি কাঠি আর পাতার। ডিমগুলো তেলা, নীলচে আভার। হাঁসের ডিমের চেয়ে ছোট।'

চন্দ্রচূড় সরকার (পড়ুয়া নং ৩৩, শান্তিনিকেতন) দিনের পর দিন এক মথের জন্ম লক্ষ্য করেছে। রোজনামচা থেকে কিছু কিছু তুলে দিলাম :

'২৭।২।৬৩—আজ শুঁয়ো বা গুটিটাকে টগরগাছে পেলাম। ওটা তিন ঘণ্টায় পনেরোটা পাতা খেল। ২৮।২।৬৩—আজ ঘণ্টায় তিনটি পাতা খেল। ৩।৩।৬৩—কদিন ধরে খাওয়া কমেছে, বেশ চুপচাপ। লম্বায় বড় হয়েছে। ৪।৩।৬৩—ওর গায়ের রঙ পালটাচ্ছে। কিছু খাচ্ছে না। একটু ছোট হয়ে গেছে। ৫।৩।৬৩— আমার দেওয়া পাতা না খেয়ে তাই দিয়ে আর লালা দিয়ে ঘর তৈরি করেছে। ওকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু পাতার ঘরটা নড়ছে। ৬।৩।৬৩—আজ একদম নড়ছে না। ঘরটার ওপর একটা পাতা দিয়ে আস্তে মারতেই ঘর ছিঁড়ে বেরিয়ে এল মূককীট। ওর চেহারা দেখে আমি অবাক—খয়েরী খোলসের ভেতর ওটা রয়েছে। একদিক সরু ছুঁচলো, অন্যদিক মোটা। গুটির খোলসের গায়ে ছুঁলেই সরু দিকটা নড়ছে। ৭।৩।৬৩—একই রকম। ৮।৩।৬৩—গুটিটার গায়ে কয়েকটা নতুন দাগ দেখা দিয়েছে। এই অবস্থা ১৯।৩।৬৩ পর্যন্ত ছিল। ২০।৩।৬৩—এবার প্রজাপতি বা মথ বেরোবে মনে হচ্ছে। খোলসটা একটু নরম হয়েছে। ২১।৩।৬৩—আজ সকালে সাড়ে-ছটায় স্কুলে যাবার সময় দেখি একটা মথ বেরিয়ে পড়েছে।'

দিনের পর দিন পড়ুয়াদের কাছ থেকে তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার চিঠি পেতে লাগলাম। এরা অনেকেই এতটুকু জীবনে এতটুকু দেখা বা জানায় খুশী নয়। ওরা অনেকেই চাইলে নীলাঞ্জনের মতো ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে শুনতে। আমিও তাইই চেয়েছিলাম।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরে নতুন একটি বিভাগ হল। 'প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা' তার নাম। পড়ুয়ারা এক শনিবার 'সন্দেশ' দপ্তরে এসে আমার কাছ থেকে জেনে যাবে পড়ুয়াদের নিয়মকানুন। পরের দিন রবিবার সকাল থেকে তারা 'কলকাতা জীব-উদ্যানের' অধ্যক্ষমশায়ের কাছে পাঠ নেবে তাদের মনোমত বিষয়ের—এইভাবে পাঠশালার কাজ চলছে। এমনি ধরনের পাঠশালা এই দেশে এই প্রথম। পাঠশালায় উৎসাহী পড়ুয়ার অভাব নেই। এরা নিজের নিজের পাঠ নিয়ে 'ছয় ঋতু বারো মাস' শখের পড়া করতে লেগেছে।

জলের পোকা নিয়ে কাজ করছে ১২নং পড়ুয়া বেবী দাশ। চুঁচুড়ায় কপিডাঙার মতিঝিলকে সে তার কাজের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আমি তার মেঠো খসড়া থেকে একটা পোকার বর্ণনা তুলে দিচ্ছি।

'কুমরি পোকা, চলতি কথায় কুমরি। লম্বা কাঠির মতো শরীর। কালো রঙ। লম্বা-লম্বা হাত পা। চারটে পা আর দুটো শুঁড় নিয়ে যে পরিমাণ নড়ছে চলাটা সে পরিমাণ তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। থমকে থমকে চলছে। পাগুলো জোড়া-দেওয়া। সামনের পা পিছনের পা থেকে ছোট। শুঁড় আছে দুটো, সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে সরু, লম্বায়ও একটু ছোট। এগুলো মাথা থেকে না বেরুলে পা বলেই মনে হত। চোখ দুটো ড্যাবড্যাবে, চিংড়ির চোখের মতো দুটো কাঠির উপর বসানো। মুখের কাছে ছোট আরও দুটো শুঁড়, আতশ কাঁচ দিয়ে দেখলাম ঐ শুঁড় দুটোতে আছে দাঁতওয়ালা চোয়াল। ওরা শুঁড় দিয়ে খাবার ধরে দাঁতওয়ালা চোয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। পেট লম্বা আর মোটা। পেছনের অংশ সরু, আরও লম্বা। সেটা লেজ। ভালো করে দেখলাম—দুটো লেজ পাশাপাশি থাকার জন্য একটা মনে হয়। এদের সমস্ত শরীরটা, পাগুলো, শুঁড় দুটো এবং লেজের প্রথম অংশটা পর্যন্ত ছোট ছোট লোমের মতন শুঁয়ো দিয়ে ঢাকা।'

পাঠশালার পাঠ নিয়ে অনেকেই এখন ব্যস্ত। কেউ বা দেখছে হুপো বা মোহনচূড়া পাখি, কেউ বা দেখছে কাঠবিড়ালীর স্বভাব আর কেউ বা লক্ষ্য করছে একটা গাছের জীবন।

আমার চিঠিটা পড়ে এই এক বছরে প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরে কী কাজ কীভাবে হয়েছে বুঝতে পারবে। বুঝতে পেরে অনেকেই হয়তো দপ্তরে যোগ দিতে চাইবে। যে 'সন্দেশ' পড়ে সেই অবশ্য দপ্তরে যোগ দিতে পারে। কিন্তু পড়ুয়া হতে গেলে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেটা, নিজে দেখার ইচ্ছেটা চাই। আর চাই একটু সাহস, একটু বেশি বুদ্ধি (সবার চেয়ে)। পথ চলার কষ্ট যে সইতে পারবে না প্রকৃতি-পড়ুয়া সে হতে পারে না।

আমি চাই 'সন্দেশ' যারা পড়ে সবাই হোক প্রকৃতি-পড়ুয়া। বুদ্ধি কারো কম নেই, সাহসও সবার আছে। ভয় কী তবে, এগিয়ে এসো।

তোমাদেরই জীবন সর্দার

ব্রিটেনের রাজধানী শহর যে লণ্ডন
প্রহরে প্রহরে বাজে 'বিগবেন' ঢনঢন।
মাটির তলায় হেথা রেলগাড়ি চলে ভাই—
কোনো খানে যেতে হলে পাতালের তলে যাই
টেমসনদী মাঝে বহে ভাগীরথী-তুল্য—
ছেলে বুড়ো সকলেরই মেজাজ প্রফুল্ল!
পিকাডেলি, পলমল, নেলসন-স্তম্ভ—
দেখে ভাই, অনেকেই হয় হতভম্ব!
টেলিভিশনের হেথা ছড়াছড়ি খুব যে—
আওয়াজের সাথে এতে দেখা যায় রূপ যে!
পথে চলে 'ট্রলিবাস'—জান এ কী দ্রব্য?
বিজলী-চালিত বাস—ট্রাম অতি নব্য!
শীত খুব—রোদ নেই, প্যাচপ্যাচে বর্ষা।
কদাচিৎ দেখা যায় আকাশটা ফরসা।
ঝোল-ভাত পাওয়া যায় ভারতীয় দোকানে,
লণ্ডনে ভারতীয় এখানে ও ওখানে।
রাস্তার ধারে ধারে বিপণিও অগণন—
বহুবিধ পণ্যের সুবিপুল আয়োজন।

* *
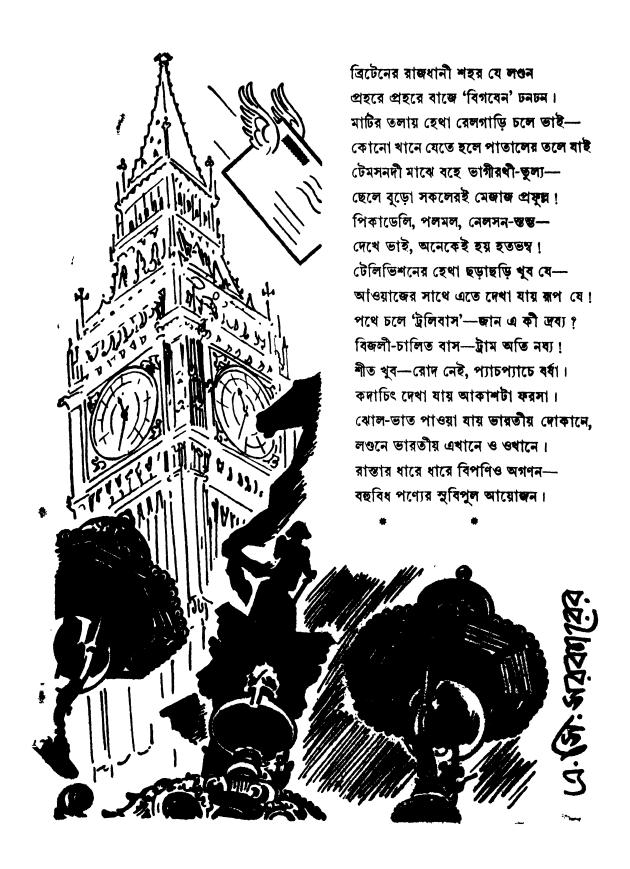
একদিন বৈকালে কৌতুকছলেতে,
ফলের দোকানে এক ঢুকি পলমলেতে।
কিনে নিয়ে আপেল এক কাটতেই ছুরিতে—
বেরুল একটা গিনি। সামনের ঝুড়িতে
যে ছটা আপেল ছিল কাটলাম পর পর
বেরুল ছয়টা গিনি, তুলে নিয়ে তারপর,
দাম দিয়ে বললাম, 'ফলওয়ালী বুড়ী হে,
দাও মোরে সব আপেল যত আছে ঝুড়িতে।'
লোভে ভরা চোখে বুড়ী বলে, 'বাপু যাও হে,
এতেই হও গে খুশি যা মেরেছ দাঁও হে।'
কৌতুক বোধ করি, চলে আসি বাইরে
দোরে খিল দেয় মেম, বলে গুড্ বাই রে
ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে যাই আর বার,
ছানাবড়া হয় চোখ দেখে তার কারবার—
সব আপেল কচুকাটা শূন্য যে ঝুড়ি হে
গালে হাত দিয়ে পাশে বসে আছে বুড়ী যে।
একটিও কানাকড়ি আপেলেতে পায় নাই,
কপাল চাপড়ে বুড়ী করে হায় হায় তাই।
পরিচয় জানালাম হল যে ভ্রমান্ত—
আপেলের দাম পেয়ে বুড়ী হল শান্ত।

তোমরাও চাও বুঝি এ খেলাটা করতে—
ফলের ভেতরে চাও টাকা সিকি ভরতে ?
তবে শোনো বলছি : ছুরিতেই কৌশল,
শোনো ভাই, কায়দাটা আরও করি প্রাঞ্জল :
চওড়া ধারালো ফলা, কৌশলী ছুরিটার
দর্শকগণ দেখে শুধু এক ধারই তার।
মোম দিয়ে আঁটা থাকে গিনি, সিকি, আধুলি
ফলাটার ও পাশেতে। জাদুকর তা খুলি
ফেলে দেয় ভেতরেতে, তুলে দেখে সকলে,
মুদ্রা অতীব খাঁটি—নয় মোটে নকল এ!
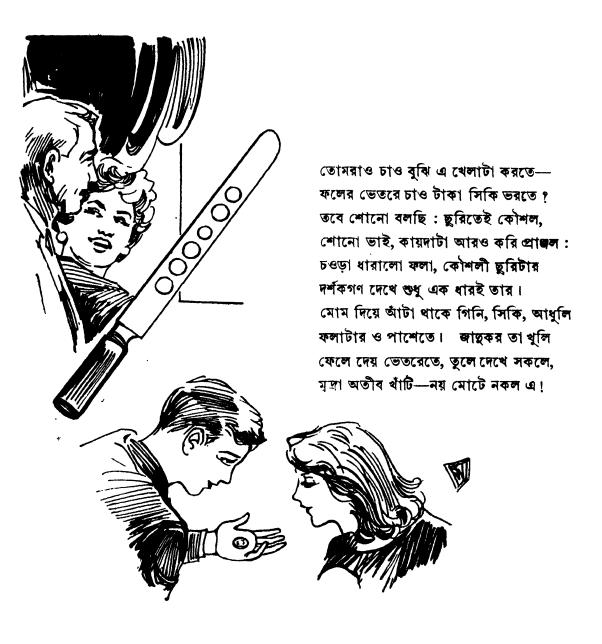
খাব কী

অসীম রায়চৌধুরী

খিদে পেলে খাব কী? ঘরে কিছু রয় না—
ভাত খায় বাদুড়ে, দুধ খায় ময়না!
মাছ খায় বেড়ালে, ঝোলটুকু খায় না—
ঝাল কেন ঝোলেতে? গেলা কেন যায় না?

বেলগুলো পাকে নি, বেলতলা যাব না—
আমে থাকে পোকারা, আম পেড়ে খাব না।
মিঠে তাল গাছেতে, নাগালে তা পাই না—
পড়বে কি পিঠেতে? থাক তবে—চাই না।

———

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

॥ আট ॥

রাখাল বললে—পাঠশালের পড়ুয়া কই, গুরুমশাই কই ?

লোকটা বলল—পাঠশালা নয়, বাক্‌শালা। এখানে আমরা মাসে দুবার করে, অমাবস্যায় আর সবাই মিলে কথাবার্তা বলি। তাই বলি বাক্‌শাল। রাখাল ভুতো তো অবাক! এ আবার কী রকম আজব দেশ, যেখানে থানা নেই, জেলখানা নেই, অথচ কথা বলবার জন্যে খাসা এক বাগানওয়ালা বাড়ি করে রেখেছে। কেমন যেন খটকা লাগল ওদের ; রাখাল জিগগেস করল—কী কথাবার্তা বল তোমরা ?

সে বললে—যার যা ইচ্ছা, তবে একসঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি কারও কথা বলবার নিয়ম নেই।

রাখাল বললে—নিয়ে যেতে পার আমাদেরও তোমাদের বাক্‌শালের সভায় একবার ?

সে হেসে বললে—নিয়ে যাবার কী আছে ? যার খুশি যেতে পারে। বেশ, আজ রাত্রে এসো আমার সঙ্গে। এখন চলো, গাছের নীচের ডাল কেটে পাতলা করে দেওয়া যাক, নইলে গোড়ায় রোদ পৌঁছবে না, বেশি ফুল ফুটবে না। ওই যে ছিদাম এসে গেছে।

দুজনের হাতে দুটি কাঁচি কাটারি দিয়ে সত্যি সত্যি তাদের কাজে লাগিয়ে দিল ছিদাম। পাঠশালা পালিয়ে সেই যে দুজনায় এক ছুতোর মিস্ত্রির দোকানে কাজ নিয়েছিল, তার পরে এতকাল বাদে এই প্রথম। রাখাল ভুতোর কানে কানে বললে—বেশি তক্ক করিস নে, যেমন যেমন বলে করে যাবি, আর চারদিকে চোখ রাখবি। আর দেখ, এই দা-কাঁচির ওজন দেখেছিস ? চার টাকা দরে বিকোয় এসব, এ যেন খবরদার হাতছাড়া করিস নে।

গন্ধরাজ ফুলের গাছের ডাল কুপোতে কুপোতে কেমন যেন বোকার মতো চেয়ে থাকে ভুতো, রাখালের ভাবনা হয়, আহাম্মুকটার গায়ে এদেশের হাওয়া লেগে গেল নাকি ? তবেই তো মুশকিল, একা এত জিনিস আগলানো তো সম্ভব নয়। রাখালও কাজে লেগে যায়।

রোদ পড়ে এলে উস্কোখুস্কো চুল, সারাগায়ে ঘাম, মহা রেগেমেগে দিকদার এসে হাজির, ছিদামের যেন কোথায় গিয়ে তার বাঁধার কথা, সে বেমালুম ভুলে গেছে। যা নয় তাই বলে বকাবকি করে তাকে দিল পাঠিয়ে সেখানে, এখন রাত জেগে তার বাঁধুক হতভাগা। সারা জীবন রাখাল ভুতো গালাগালি শুনে, গালাগালি দিয়ে, আর গালাগালি খেয়ে এসেছে, তবু এই বাগানের মধ্যে অতগুলো কড়া কথা কেমন যেন ভুতোর বড় বিশ্রী লাগল।

দিকদার কিন্তু ছিদামকে ভাগিয়েই চলে যায় নি, একমনে এদের দুজনার কাজ দেখছিল। রাখাল একবা কাজ করতে করতে চোখ তুলতেই ইশারা করে তাকে কাছে ডাকল।

কী নাম তোমাদের?

আজ্ঞে আমি রাখাল, ও ভুতো।

হটুমালা থেকে আসছ বুঝি?

আজ্ঞে না তো, আমরা ভুঁইতরাসির মানুষ।

ওই একই হল। তা কী কর তোমরা?

কী বলবে ভেবে পায় না রাখাল, আমতা আমতা করতে থাকে। সত্যি কথাটা বলে ফেলে, এত বোকা সে নয়। দিকদার একটু বিরক্ত হয়েই বলল—একটা সোজা কথার জবাব দিতেই জিভ তালু জড়িয়ে যাচ্ছে? এ পৃথিবীতে দুর্বল আর অকেজোদের কোনো জায়গা নেই, বুঝলে হে! যারা নিজেরা ভাবতে পারে না, তাদের চলতে হবে বুদ্ধিমানদের কথামতো আর যারা নিজেদের হাত চালাতে পারে না, তাদের হাত জোর করে চালিয়ে দিতে হবে।

রাখাল-ভুতোর কেমন ভয়-ভয় করতে থাকে। দিকদার কিন্তু আর রাগ দেখায় না, নরম গলায় বলে, কী, ফ্যালফ্যাল করে দেখছ কী? জান, আমার কথামতো চললে তোমাদের কোনো ভাবনা থাকবে না। নাও, নাও, এখন আবার কাজে লেগে যাও দিকিনি। সব সমান সমান ভাগে আমি বিশ্বাস করি না, বুঝলে? যে যত খাটবে তার তত ক্ষমতা হবে আর যার যত ক্ষমতা বাড়বে সুবিধেও তার ততই বেশি। কী বল হে, তোমরা? আচ্ছা, এখন চলি, সুজ্যি ডুববার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও কাজের ছুটি। তারপর স্নান করে, খেয়ে দেয়ে আমার ফুলের ঘরে একবার এসো দিকি নি, তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

দিকদার চলে যাবার পর ভুতো যেন কী রকম মুষড়ে পড়ল, কোনো কথা না বলে একমনে কাজ করতে লাগল। নাঃ, বোকাটাকে নিয়ে তো আর পারা গেল না। এই তো কেমন ভাগ্যঠাকরুন হাতেনাতে সুবিধে করে দিচ্ছেন আর ভুতোটার কিনা হাঁড়িমুখ!

কী রে, তোর হল কী? তোকে দেখলে যে গয়লার কলসিতেই দুধ সব দই হয়ে যাবে।

ভুতো কাঁচি নামিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সূর্যদেব পাটে নেমেছেন, চারদিকে আলো কমে এসেছে। সে বললে—লোকটার কথাবার্তা আমার ভালো লাগে না। এমন খাসা জায়গা, এত ভালো খাওয়াদাওয়া আর ও কিনা ঘোঁট পাকাতে চায়।

রাখাল রেগে বললে—ঘোঁট? ঘোঁট আবার কিসের? কী অন্যায়টা বলল শুনি? সবাই মিলে চারবেলা সমান খাবে সমান পরবে কেনই বা শুনি? দিকদারের মতো একটা লোকও যা খাবে, ছিদামকে একটা কুলিমজুর বললেও চলে, ঘটে একদানা বিদ্যে নেই—ও-ও তাই খাবে? বুদ্ধি করে যদি কেউ নিজের সুবিধে করে নেয় সেটা কি দোষ হল?

ভুতো মাটিতে বসে পড়ে বলল—তাই বলে জোরজার করে—

রাখাল বললে—হ্যাঁরে, তোর কি মাথা খারাপ হল? জোরজার না করে কে কবে বড়লোকটা হল শুনি? তুই আমি না জানি লেখাপড়া, না আছে পয়সাকড়ি, এখন ওই দিকদারের কাছা ধরে ঝুলে পড়ে যদি কিছু করে নিতে পারি, তা হলে তোর আপত্তিটা কোথায় শুনি? নে রাখ, এখন চল, এ আলোতে আর নিজের হাত দেখা যাচ্ছে না।

কোনো কথা না বলে ভুতোও খুন্তি কাঁচি গুটিয়ে উঠে পড়ে। তারপর পুকুরে নেমে ডুবজলে স্নান, আর মোটা মোটা লাল আটার রুটি দিয়ে ঝাল-ঝাল তরকারি আর বড় একঘটি মিষ্টি ঘন দুধ। রাখাল পর্যন্ত খুশী না হয়ে পারে না। বেড়ে ব্যবস্থা, যাই বলিস। জন্মে কখনও এত ভালো খাইদাই নি। এই ঝিরঝিরে বাতাসে গাছতলায় ঘুম দিতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু ঘুম দেওয়া আর হয় না, দিকদার লোক দিয়ে ডেকে পাঠায়। ভুতো যেতে নারাজ।—তোর ইচ্ছে হয় তুই যা, আমি এইখানে চাঁদের আলোয় বসে গা জিরোই। রাত নটায় ছিদামরা বাকৃশালে নিয়ে যাবে বলেছে।

শুনে রাখালের হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। নাঃ, এ জায়গাটা খুব সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, এর আগে সে যখন যা বলেছে ভুতো অম্লানবদনে সেইমতো কাজ করে গেছে, কোনো দিনও এতটুকু আপত্তির কথা তোলে নি, আর এখানে এসে দুদিন না যেতে ব্যাটা লক্ষীছাড়ার হাত পা খুর শিং নখ দাঁত সব দেখা দিচ্ছে। এমনি ওকে ছেড়ে দিলে কে জানে হয়তো পুলিশের খাতাতে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসবে। তবে হ্যাঁ, এদেশে পুলিশ নেই এই রক্ষে। কর্কশ গলায় রাখাল বলল—ভালো চাস তো ওঠ, চল, কী বলে সে শুনে আসি। তারপর যেতে হয় বাকৃশালে যাওয়া যাবে।

অনেকটা অভ্যাসবশতই ভুতো উঠে পড়ে শেষ অবধি রাখালের সঙ্গে হাঁটা দেয়। দিকদার ওদের দেরি দেখে মনে মনে হয়তো চটেছিল খুব, কিন্তু বোকা তো আর নয়, তাই বাইরে সেটা প্রকাশ না করে, খানিকটা বাঁকা হেসে বলল—কী, এখানকার হাবভাব কেমন তোমাদের হট্টমালার হট্টগোলের পর?

রাখাল বললে—আমরা মুখ্যু মানুষ কত্তা, সেখেনেও খেটে খাই, এখেনেও খাব। হট্টগোলের ধার ধারি নে।

বরং নিরিবিলিতে কাজ সারতে পারলেই ভালো, কী বল হে?—এই বলে দিকদার আরেকটু বাঁকা হাসল। ভুতো অবাক হয়ে গিয়ে বলল,—নিরিবিলিতে না তো কি হাটের মাঝে কেউ চুরি করে নাকি?

দিকদার বলল,—ওইখানেই তোমাদের ভুল। চুরির কথা ভুলে যাও, চুরি বড় ছোট জিনিস, শুধু এইটুকু মনে রেখো যে জোর থাকলে হাটের মাঝেও যেমন ইচ্ছে কাজ করা যায়। তবে জোর থাকা চাই, তার মানে একা একা কিছু হয় না। আমিও কিছু করতে পারব না আর তোমাদের মতো আকাট মুখ্যুরা তো পারবেই না। তাই একটা দল বানাতে হবে, বুঝলে হে?

রাখাল বললে—সে আর এমন কী, ভুঁইতরাসিতেও তো সিঁদেলদের একটা বড় দল ছিল। তা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, এর নামে ও লাগাচ্ছে, ওর নামে এ লাগাচ্ছে, তাই এ ধরা পড়ল, ও ধরা পড়ল, শেষ পর্যন্ত গেল দল ভেঙে। এখন ভুতো আর আমি একসঙ্গে কাজ করি।

দিকদার একবার রাখালের দিকে, একবার ভুতোর দিকে তাকাল। তারপর ভুতোকে শুধোল—কী হে, তুমি যে চুপ মেরে গেলে? তোমারও কি সেই মত?

ভুতো যেন আকাশ থেকে পড়ে। কোন্ মতের কথা হচ্ছে? এখানে তো কারও খাবার কষ্ট নেই। দিকদার বিরক্ত হয়ে বলে—তোমার দেখছি শুধু খাই আর খাই! কেন, খাবার ছাড়া কি জিনিস নেই?

ভুতো একগাল হেসে বলে—তা হলে বোধহয় থেটারের কথা হচ্ছে? সেও খুব ভালো, কেমন প্যাঁ পোঁ বাজনার সঙ্গে পরীরা নাচে!

রাখাল এক ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে বললে—ওর জন্য ভাবনা করবেন না কত্তা, ওকে আমি ঠিক করে নেব। কিন্তু আপনার দলে ভিড়লে আমাদের ন্যায্য পাওনাটি পাব তো শেষ পর্যন্ত?

দূরে থেকে ছিদাম-হারুদের চিৎকার শোনা যায়, তারা রাখাল-ভুতোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাকৃশালে সভা

বসবে। দিকদার ফিসফিস করে বলল, 'যাও এখন, কিন্তু দেখো এসব কথা কাকপক্ষীও যেন টের না পায়, তাহলে কিন্তু তোমাদের সমূহ বিপদ। যাও এখন ভালোমানুষ সেজে, তবে চোখ কান খোলা রেখো।

চমৎকার সভা হল, চাঁদের আলোয়, খোলা ঘাসজমিতে, কী যেন একটা ফুলের গন্ধে চারদিকটা ভুরভুর করছে। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখাল ভুতো চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। একজন দুজন করে দেখতে দেখতে মেলা লোকজন জড়ো হল, তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই মেয়ে। মাঝখানে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সবাই গোল হয়ে বসেছে।

ফুটফুট করছে চাঁদের আলো, রাখাল ভুতো দেখলে সেই বিনি-পয়সায় ডাব বিক্রি করে বুড়ি, সেও এসেছে। তার গা-ভরা সোনার গয়না চাঁদের আলোতে ঝিকমিক করছে। দেখে দেখে ওদের চোখ ঝলসে যায়, হাত নিশপিশ করতে থাকে। ইস্, যদি খানকতক আলগোছে খুলে নেওয়া যেত! কিন্তু বুড়ি এত দামী জিনিস পেল কোত্থেকে, গিলটি নয় তো?

যেমনি মনে ভাবা, রাখাল ছিদামকে শুধোল—বুড়ির গায়ে ও কি সত্যি সোনা?

ছিদাম আশ্চর্য হয়ে বললে—সত্যি সোনার হবে না তো কিসের হবে?

না, অত দামী জিনিস ও পেল কোত্থেকে?

ছিদাম বললে—যেখান থেকে সবাই পায়, লাইব্রেরি থেকে।

লাইব্রেরি? সে আবার কী? ভুঁইতরাসির জমিদারবাবু মার নামে লাইব্রেরি করে দিয়েছেন শতদলবাসিনী স্মৃতি লাইব্রেরি, তা সেখানে তো শুধু বই থাকে। পাশেই একজন মোটামতো গিন্নি বসেছিলেন, বললেন—বইতে গয়নাতে তফাত কী শুনি? কোথা থেকে এসেছ বাছা যে কিছুই জান না?

ছিদাম কানে কানে কী বলাতে তিনি ভারি লজ্জা পেয়ে গেলেন—ও, হ্যাঁ, সে তো আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমাদের লাইব্রেরিতে বাছা, দেশের যত ভালো জিনিস রাখা থাকে। যার যা দরকার নাম লিখিয়ে নিতে পারে।

রাখাল বললে, টাকা দিতে হয় না তার জন্যে? ভুঁইতরাসিতে মাসে দশ পয়সা দিতে হয়, তবে বই পড়তে দেয়।

লাইব্রেরিতে বই পড়বে, তার জন্যে আবার টাকা? গিন্নি তো হাঁ, টাকা আবার কী?

সঙ্গে একজন কমবয়সী মেয়ে ছিল, সে বললে—আহা দেখ নি মাসি, লাইব্রেরির কলা বিভাগে, সেই যে বিদেশ থেকে আনা সাদা সাদা গোল চাকতির গয়না, বোধহয় তার কথা বলছে ওরা। এতক্ষণে গিন্নি যেন কথাটা বুঝলেন—ও, তাই বল। না বাবা, কিচ্ছু দিতে হয় না। কেউ কিছু ভালো জিনিস পেলে কিংবা তৈরি করলে তো এমনিই লাইব্রেরিতে দিয়ে দেয়, সবাই দেখবে শুনবে, পড়বে; ইচ্ছে হয় গায়ে দেবে।

এই বলে যেন ভারি একটা শক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেল এমনি ভাব করে গিন্নি হাত-পা গুটিয়ে বসলেন। এবার বোধহয় সভার কাজ শুরু হবে। রাখালের মাথায় কিন্তু লাইব্রেরির আজব কথাটাই শুধু ঘুরছে। না জিজ্ঞাসা করেও পারে না,—ধরো, বুড়ি গয়না ফেরত না দিয়ে পালাল? শুনে সবাই অবাক! পালাবে? কেন পালাবে কেন?

বাঃ, গয়না বেশী পছন্দ হয়ে গেলে যদি নিজের কাছে রাখতে ইচ্ছে করে, কিংবা বেচে দিয়ে টাকা—

হঠাৎ মনে হয়ে গেল—টাকা কাকে বলে এরা জানে না, কাজেই কথাটা শেষ করা হল না।

ছিদাম বললে—স্-স্-স্, আর কথা নয়, গয়না পছন্দ হয় তো এক বছর দু বছরের জন্য লিখিয়ে নেওয়া যায়। না হারালেই হল লাইব্রেরির জিনিস।

রাখাল ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—তা অতই যদি দয়া তো লেখাবারই বা দরকারটা কী? এমনি তুলে নিয়ে গেলেই তো হল।

ছিদাম রাখালের কানে কানে বলল—তাহলে লাইব্রেরির জিনিসপত্রের হিসেবের গোলমাল হয়ে যাবে যে। —এখন থামো দিকি নি, সভা আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু রাখাল সভার কথা শুনবে কী, তার মাথায় খালি ঘুরছে এদের লাইব্রেরিতে বোঝাই বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকবোঝাই সোনারুপোর চাই কি হীরেমণিমুক্তোর জিনিস সাজানো আছে, একবারটি কোনমতে বের করে আনতে পারলেই হল। তা ভুতোটার কাছ থেকে যে খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে তা তো মনে হয় না। এসব কথা হয়তো ওর কানেও যায় নি, ব্যাটা হাঁ করে সভার কথা শুনছে। দিকদার ঠিকই বলেছে—একটা ভালো দল না পাকালেই নয়।

ভুতো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করে দেয়। শুনে রাখালের চুল দাড়ি খাড়া। যে ভুতো চারটে কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলতে পারে না, সে দিব্যি উঠে গিয়ে মাঝখানের গোল জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে বলছে কিনা, 'হ্যাঁ, নীচু জায়গা থেকে বাঁধ দিয়ে কেমন করে উঁচু জায়গায় জল তুলতে হয় সে আমি জানি। সেবার যখন দশ মাস কয়েদ খাটলাম, তখন আমরা তো এ-ই করতাম গো।'

ভুতোটাকে কি ভুতে পেয়েছে যে হাটের মাঝখানে কয়েদ কয়েদ করে চ্যাচাচ্ছে! তারপর সবাই সাবধান হয়ে যাক আর কি, তখন লাইব্রেরিতে ঢোকাই এক ব্যাপার হবে, হয়তো চারগুনো পাহারা বসিয়ে দেবে, তখন ভুঁইতরাসির দাগী সিঁদেলেরও সাধ্য হবে না ভেতরে সেঁধোয়।

রেগেমেগে সভা ছেড়ে রাখাল বেরিয়ে পড়ে, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু আচ্ছা পাগল তো এদেশের লোকরা, বইয়ের মতো করে সোনাদানা নাম লিখিয়ে বের করে দেয়। এ তো চোরের সগ্‌গ ছাড়া আর কিছু নয়, এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া মহা-পাপ!

হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে রাখাল দেখে চাঁদের আলো মেখে গাছপালা টলটল করছে, দূরে দূরে একটা-দুটো ঘরবাড়ি, তাদের দরজা জানালা সব হাট করে খোলা। রাখাল বুঝল সে পথ হারিয়েছে।

[ক্রমশ

অগস্ট মাসের ধাঁধার উত্তর

১। পালক, গুলি, ছোঁড়া, মাচানে, মুড়ি।

২। ৮০ টাকা

ছবি । অমল চক্রবর্তী

গোপালনের গোড়ার কথা

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ আজও চলেছে। সেকালে প্রকৃতির কাছে মানুষকে অনেকবার হার স্বীকার করতে হয়েছিল। তবুও মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বুদ্ধির জোরে। পৃথিবীর উত্তর অংশ যখন বরফে ঢাকা, মানুষ তখন চাষবাস শেখে নি। তখন সে শিকার করে খাবার সংগ্রহ করত আর অনেক সময় পাহাড়ের গুহাতে বাস করত। তারপর মানুষ শিখল চাষ করতে, ফসল জন্মাতে। এই চাষ হত কাঠের শাবলের মতো হাতিয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে। কেউ বা গাছের ডাল থেকে যেখানে ফেকড়া বেরিয়েছে সেই খোঁচ সরু মুখ করে ব্যবহার করত। পারস্য দেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে একদল এই রকম লোক ছিল। অনেককাল চাষ করে বেশ চলছিল। তারপর এল উত্তর অঞ্চলে বরফ গলে গিয়ে এইসব দেশে শুকনো হাওয়ার যুগ। ছোট নদী বিল শুকিয়ে গেল। বনভূমি কমে গেল পরিধিতে। সে যুগ আরও যত এগিয়ে চলল, বন শুকিয়ে প্রথমে হল মাঠ; তারপর এল মরুভূমি। খাবারের অভাবে অনেক জীবজন্তু, পাখি মরে গেল। অনেক জানোয়ার উত্তরের, পশ্চিমের আর দক্ষিণের সরস জমিতে চলে গেল। মানুষের বসতিও অনেক ঐ তিন দিকে সরে গেল এশিয়ার এই অঞ্চলের শুকনো জায়গা থেকে।

অক্সাস নদীর অঞ্চলে বেশী দূর পর্যন্ত আর আগেকার মতো ঘন বসতি নেই। চাষ করার মতো জমি খুব কমে গেছে। মানুষ এবার বাধ্য হয়ে একই জমি বছর বছর চাষ করতে লাগল। বনজঙ্গল পুড়িয়ে ছাই সার করে চাষ করলে বছর দুই পরে সেই খেত ছেড়ে আবার নতুন এলাকার জঙ্গল পোড়াতে হত। পুরনো প্রথম পোড়ানো জমিতে ফিরে আসা যেত বছর আষ্টেক পরে। তখন সেখানে নতুন জঙ্গল হয়ে বেড়ে উঠেছে; সেটা কেটে আবার পোড়ানো চলে। একই জমিতে বছর বছর চাষ করলে জমির ফসল দেবার ক্ষমতা কমে যায়; অথচ উপায় নেই। মানুষ প্রথম প্রথম দূরের জঙ্গল থেকে ডালপালা কেটে এনে খেতে ফেলে তাই পোড়াত, সেই ছাই জমিতে বিছিয়ে দিয়ে সারের ব্যবস্থা করত। কিন্তু জঙ্গল ক্রমশ দূরে চলে গেল। এবার মানুষের নজরে এল যে জমিতে চাষের পর শুকনো ডাঁটাগুলি ভেড়ার পাল চরে খায়, সেই জমিতে জায়গায় জায়গায় বেশ ফসল জন্মায়। তারপর খেয়াল হল যে ভেড়ার নাদি যেখানে বেশী পড়ে সেখানে ফসল বেশী হয়। মানুষ জমিতে সার দেবার একটা নতুন উপায় আবিষ্কার করল। স্থায়ী গ্রামের পত্তন এবার সম্ভব হল।

কিন্তু শুকনো হাওয়ার প্রকোপে জঙ্গল আর চাষের জমি অনেক কমে গেছে। অনেক লোকই ভেড়ার পালের কতক কতককে সঙ্গে নিয়ে নতুন জমি খুঁজতে যেতে বাধ্য হল। এরা এদের পুরনো বাসভূমির কথা গান রচনা করে গ্রামের উৎসবের সময় গেয়ে যেত, যাতে সকলের মনে থাকে এইসব

কাহিনী। যারা পুরনো বাসভূমিতে থেকে গেল, তারাও এইসব গানের কিছুকিছু গাইত ওইরকম উৎসবে—পুরনো দিনের কথা, যখন অন্য ধরনের চাষ হত সেই সময়ের কথা। ভেড়ার পাল যখনও পোষ মানে নি, কী করে তাদের গৃহপালিত পশুতে.পরিণত করা হল সে কথাও গানের ভিতর এসেগেল।

এই পুরনো এলাকায় এবার এক নতুন উৎপাত এল। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বনভূমিতে বড় বড় বুনো গোরুর পাল চরে বেড়াত। জঙ্গল শুকনোর ফলে তারা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নেমে এল, আর মানুষের স্থায়ী চাষের জমির ফসল বেশ খুশী মনে খেতে শুরু করল।

আজকাল যারা বন্দুক নিয়ে বুনো বাইসন শিকার করে তারা জানে যে বাইসন কী প্রচণ্ড বেগবান জন্তু, আর আহত হলে কীরকম হিংস্রভাবে আক্রমণ করে। সে যুগে মানুষের পক্ষে কাঠের বল্লম আর পাথরের কুড়াল নিয়ে বুনো গোরুর সঙ্গে লড়াই করা একটা বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। মানুষ একা একা বুনো গোরুর দল রুখে শস্য বাঁচানো অসম্ভব দেখে, দলবেঁধে পাহারার ব্যবস্থা করল।

গর্ত খুঁড়ে, খোঁচ পুঁতে, ফাঁস লাগিয়ে বুনো গোরু মেরে ফেলার ব্যবস্থা হল। কিছু কিছু মাংস গ্রামের সকলের খাদ্য হিসাবে কাজে লাগলেও অনেক মাংস নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এই বিরাট বলশালী জানোয়ারকে ধরে পোষ মানাবার সামর্থ্য এদের ছিল না। এইভাবে মেরে ফেলার ফলে কয়েক পাল গোরু অন্য জঙ্গলের সন্ধানে চলে গেল। কিন্তু কতক গোরু ঐ অঞ্চলেই রয়ে গেল, তারা মাঝে মাঝে সুবিধা পেলে ফসল খেয়ে যেত। ক্রমে তাদের স্বভাব একটু কম বুনো হয়ে এল। এই সময় এই বসতিতে অঙ্গিরা-বংশের এক মহাবলশালী পুরুষ জন্মেছিলেন। তিনি 'ভব' নামে পরিচিত ছিলেন। ভব তাঁদের গ্রামের উৎসবে পূর্বপুরুষেরা কী করে ভেড়ার পাল পোষ মানিয়েছিলেন সেই গান শুনেছিলেন। তাঁর মনে হল কেন তাঁরাই বা চেষ্টা করে দেখবেন না– যদি এই বড় জানোয়ারকে বশ করে পোষ মানানো যায়। তিনি গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধ উৎসকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে গেলেন। ভবকে দেখে খুশী হয়ে উৎস প্রশ্ন করলেন, তাঁর কাছে মহাবলশালী ভব কী সমাচারের জন্য এসেছেন। ভব উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে বললেন, 'এই যে বুনো গোরু আমাদের শস্য নষ্ট করে, শুনেছি পূর্বকালে মেষপাল এমনি করে শস্য নষ্ট করত। কিন্তু আপনার পূর্বগত যাঁরা, সেই বন্য মেষকে তাঁরা পোষ মানিয়েছিলেন।' উৎস বললেন, 'তুমি বন্য গোরু বশ করতে চাও?' ভব মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, তাই তাঁর ইচ্ছে। উৎস তখন তাঁকে প্রাচীন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি জানালেন। উৎসের কাছে উৎসাহিত হয়ে ভব ফিরে এসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর তিনি একটা চামড়ার শক্ত ফাঁস তৈরি করলেন আর একটা কাঁটা-গাছের শক্ত লাঠি নিলেন। জঙ্গল শুকিয়ে চটান মাঠ হওয়ার পর থেকে ভেড়ার পাল চরাবার সময় দুরন্ত পলাতক ভেড়া ধরবার জন্য মানুষ দূর থেকে চামড়ার ফাঁস ছুঁড়ে, সেটা ভেড়ার গলায় লাগাবার কায়দা আয়ত্ত করেছিল—একে ইংরিজীতে 'ল্যাসো' বলা হয়।

মানুষ নিজের সবচেয়ে পুরনো পোষা জানোয়ার, শিকারের সঙ্গী কুকুরকেও শিখিয়েছিল, ভেড়া তাড়িয়ে আনতে কামড়াবার ভান করে। ভব এবার তাঁর সবচেয়ে বলিষ্ঠ দুটি কুকুর নিয়ে ফাঁস আর লাঠি হাতে বুনো গোরু ধরতে বেরোলেন।

প্রথমেই গোটা দুই গাভী বেছে নিলেন। যে গোরুটাকে একটু শান্ত মনে হল সেটাকে ফাঁসে বেঁধে কুকুর দুটো দিয়ে ভয় দেখিয়ে, দু-চারটে কাঁটা-লাঠির ঘা খাইয়ে বেঁধে রেখে দিলেন। তারপর অন্যটাকেও কুকুর আর ফাঁসের সাহায্যে বেঁধে আনলেন। এই গোরুটি বেশী তেজী ছিল। খুব লাফাতে লাগল, তেড়ে এল ধরা পড়ে। ভব তখন ফাঁসটা জোরে টান দিলেন। গোরুটা দম বন্ধ হয়ে পড়ে গেল ; ভব ফাঁসটা একটু ঢিলে করে দিয়ে দাঁড়ালেন। গোরুটা জ্ঞান হয়ে উঠতে চেষ্টা করতেই ভব সেটাকে শিং ধরে এক আছাড় দিলেন। গোরুটা এবার ভয় পেয়ে গেল। উঠে কাঁপতে লাগল। ভব তখন সেটাকেও বেঁধে রাখলেন। এইভাবে ফাঁসে প্রায় দমবন্ধ করে আর তারপর শিং ধরে আছাড় দিয়ে অনেকগুলি গোরু ভব নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনলেন। গোটা দুই ষাঁড়ও ধরে রাখলেন।

এগুলিকে বশ করতে ভবকে তাঁর সমস্ত শক্তি দিনের পর দিন প্রয়োগ করতে হত। ষাঁড় ফোঁস ফোঁস করে এলে, ভব তাকে শিং ধরে চেপে হটিয়ে শেষ পর্যন্ত আছড়ে ফেলে দিতেন। ষাঁড় দুটো অনেকবার এইভাবে আছাড় খাওয়ার পর বুঝলে যে আর মারামারির চেষ্টা করে লাভ নেই। তারাও পোষ মেনে গেল।

ভব যখন গোরু ও ষাঁড় এইভাবে বুদ্ধি ও বল প্রয়োগ করে বশ করতেন গ্রামের অন্য লোক অবাক হয়ে দেখত। তারা বলত, ভব দেবতাদের শক্তি পেয়েছেন। তারা ভবকে প্রায় দেবতার মতো শ্রদ্ধা করত। ভব যে গোরুগুলি পুষেছিলেন তাদের বাচ্চারা মানুষের কাছে জন্মে খুব পোষ মেনে গিয়েছিল। পোষা গোরুর পাল এইভাবে যখন বেশ বড় হল, ভব তাঁর আত্মীয়দের এক-এক জোড়া উপহার দিলেন।

সেকালে সাধারণত এক বংশের লোকই এক বসতিতে বাস করত। ফলে অঙ্গিরা বংশের লোকেদের নতুন খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে অঙ্গিরাগণ প্রথমে তপস্যা করে অর্থাৎ অনেক কষ্ট স্বীকার করে ধৈর্যের সাহায্যে গোপালন করেন। অন্যেরা পরে তাঁদের কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করে। সে যুগের মানুষ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিয়মিত খাদ্য ভোগ হিসাবে দিয়ে তাঁদের তৃপ্ত করবার চেষ্টা করত। যে লোকদের এরা আবার দেবতার শক্তি পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করত, তারা এঁদের নাম করে দেবস্থানে পূজা করত।

ভবর বংশধরেরাও যারাই গোপালন করত শেষ পর্যন্ত তারাও ভবকে গোপালকদের দেবতা বলে পশুপতি হিসাবে পূজা করতে শুরু করে।

ভব অন্য নামেও খ্যাত ছিলেন, আবার বিভিন্ন বসতিতে তাঁর নাম কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে পৌঁছেছিল। তাই বিভিন্ন দেশে গোপালকদের দেবতা ভিন্ন নামে খ্যাত হয়েছিলেন। অবশ্য এর পরের যুগে, ঐ দিকের অন্যান্য দেশেও গোরুর পাল পোষ মানানো হয়েছিল, এবং সেই সব অঞ্চলের পশুপালক দেবতা সৃষ্টি হয়েছিল। হাজার বৎসর পরে এইসব নামই এক দেবতার ভিন্নরূপ বলে গণ্য হয়েছিল।

———

লেদার ক্র্যাফ্ট্স্

সমর দে

মিনি আবার শুরু করেছে চামড়ার কাজ।

যদিও সে কাজগুলো সব পরিচিত জিনিসেরই, তবুও তার কাজে আছে বেশ নতুনত্বের ছাপ!

সত্যি! এত সুন্দর যে দেখলে অমনি হাতে নিতে ইচ্ছে করে। এমন কি, কাজটা শিখিয়ে দিলে তৈরি করতেও মন চায়!

কিন্তু না চাইতেই—মিনি তার তৈরি কাজের একটি জিনিস আমাকে উপহার দিলে। হয়তো, শিল্পীকে কাজ দেখিয়ে আশ্চর্য করে দিয়েছে সেই আনন্দে।

আজ তার সেই দু-পকেটওয়ালা মনিব্যাগটি দেখালে। তোমাদের ভেতর যারা চামড়ার কাজে উৎসাহী, তারা কি ব্যাগটি না বানিয়ে পারবে?

নিজে হাতে করে দেখো
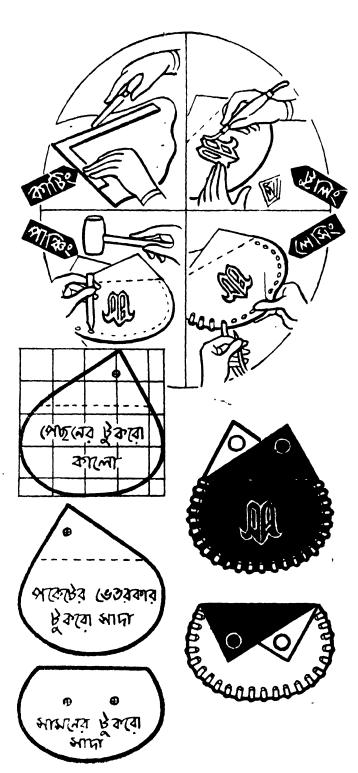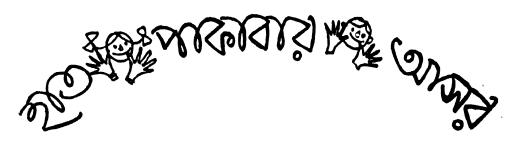
ভূত দর্শন

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১০৩। এলাহাবাদ। বয়স ১৬

আমরা একবার ভূত দেখেছিলাম। সেটা মনে পড়লে এখনও আমাদের খুব হাসি পায়। অনেক দিন আগে আমার এক বন্ধু সন্তু আমাকে ও আরো কয়েকজন বন্ধুকে নিজের জন্মদিনে নেমন্তন্ন করে। সন্তুরা বড়লোক। তাই তারা আমাদের খুব ভালো ভালো খাবার খাওয়াল। যখন নেমন্তন্ন শেষ হয়ে গেল তখন আমরা বাড়ি ফেরবার জন্যে তৈরি হলাম। কিন্তু হঠাৎ ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি থামল না দেখে সন্তু আমাদের রাতটা ওখানেই কাটাবার জন্যে পরামর্শ দিলে। আমরাও আর আপত্তি না করে সেখানেই থেকে গেলাম।

আমরা সব একই ঘরে শুয়েছিলাম। খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর হঠাৎ সন্তু আমাকে টোকা মেরে বললে, 'আরে তপু, এই ঘরে ভূত আছে—ওই দেখ' বলে সে নিজের আঙুলটা সামনের দিকে বাড়াল। আমিও দেখলাম সত্যি সত্যিই একটা কোট-প্যান্ট-পরা লোক বার বার নড়ে উঠছে আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে। ভয়ে আমরা অসাড় হয়ে গেলাম। পাশেই হারু আর মুকুল ঘুমোচ্ছিল, তাদেরও জাগালাম। তারা ভূতটা দেখেই হাঁউ মাঁউ করে চিৎকার করে উঠল। ঘরে বড় অন্ধকার ছিল আর লাইট আলাবার আমাদের সাহস ছিল না। হঠাৎ ভূতটা ক্যাঁচ-ক্যাচ্চো করে আওয়াজ করে উঠল। আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

আমাদের চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে চাকরটা দৌড়ে এল। সে তক্ষুনি লাইট জ্বালিয়ে বললে, 'কী হুয়া হ্যায়, বাবুজি ?'

আর আমরা হতবুদ্ধির মতো দেখলাম যে যেটাকে আমরা ভূত ভেবেছিলাম সেটা আর কিছুই নয়, সন্তুর হ্যাঙারে টাঙানো কোট প্যান্ট। পাশের জানলাটা খোলা ছিল বলে হাওয়ায় নড়ে হ্যাঙারটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠছিল। নিজেদের মূর্খতা দেখে আমরা নিজেরাই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। এই হল আমাদের ভূতদর্শন।

ঝগড়ার ফল

শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ১৭৫। চন্দননগর। বয়স ৭

স্কুলে তখন টিফিন হয়েছে। আমি জানালার ধারে বসে টিফিন বাক্স খুলে টিফিন খাচ্ছি। হঠাৎ শুনি বাদামগাছে দুটো কাক খুব জোরে ঝগড়া করছে। আমি তাপসকে বললাম, তাপস, দেখবি আয়, কাক দুটো কেমন ঝগড়া করছে। তাপস বলল, ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। আমি বললাম, ঝগড়াই করছে ওরা। ও মা! দেখি

ঝগড়া করতে একটা কাক অন্যটাকে ঠুকরে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। নীচে ইলেকট্রিকের তার ছিল। কাকটা তার উপর পড়েই মরে ঝুলে রইল। সেই সময় তালগাছে একটা চিল বসে কাকটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার মতলব করছিল। চিলটা কী বোকা! কাকটাকে নিতে গেলে ওর নিজের অবস্থাও যে কাকের মতো হবে সেটা বুঝতে পারছিল না। আমি যখন চিলটাকে লোভ করতে বারণ করব ভাবছিলাম ঠিক তখনই ঢং ঢং করে টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ে গেল। আমিও ক্লাসে চলে গেলাম।

পুতুল-খেলা

সুস্মিতা সরকার। ১৪৮৩। কলকাতা। বয়স ৭

অনেক দিন ধরে বাপিয়াকে একটা পুতুল কিনে দেবার কথা বলছিলুম। রোজই বলেন কাল দেব। কিন্তু সময় আর হয় না। হঠাৎ একদিন মামার বাড়ি গিয়ে দেখি অনেক পুতুল সেখানে। দিদা বললেন, 'দেখো সুস্মিতা, তোমার জন্যে কত পুতুল এনে রেখেছি।' আমি তো অবাক! কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা নেব! তারপর বেছে বেছে একটা বড় ডল পুতুল আর একটা মেয়ে পুতুল নিলুম। আরও দেখি কত সাহেব পুতুল, মেম পুতুল, ডল-পুতুল পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পুতুলগুলো নিয়ে খেলে বাড়ি এলুম। বাড়িতেও দেখি কত পুতুল। আমার পুরনো ভাল্লুকটা নতুন পুতুলদের সঙ্গে বাজনা বাজাচ্ছে। পুরনো ছোট্ট পুতুলটা নাচছে। দেখে আমার খুব আনন্দ হল। আমিও ওদের সবাইকার সঙ্গে খেললুম। হঠাৎ একটা ডল পুতুল নাচতে লাগল। ভাল্লুকটা ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বাজনা বাজাতে লাগল। দেখে আমার খুব হাসি পেল। আমি হেসে ফেললুম। শুনলাম, মা বলছেন—সুস্মিতা, হাসছ না কাঁদছ? ঘুম ভেঙে গেল। দেখলুম, আমি অন্ধকার ঘরে মার পাশে শুয়ে আছি। ভাবলুম,—এত পুতুল, বাজনা বাজানো সবই ফাঁকি! আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম! বাপিয়াকে বলাতে বাপিয়া পরদিন আমায় একটা পুতুল কিনে এনে দিলেন। আমি এখন সেই পুতুলটা নিয়ে খেলা করি।

পল্লীগ্রাম

কৃষ্ণা রায়। ৯৩১। কলিকাতা। বয়স ১৩

নদীর সাথে সুজ্জিমামার খেলা,
জলের মাঝে আলোর ঝিকিমিকি—
দুকূলে তার বসে বকের মেলা,
মাছের দল ধরতে মারে উঁকি॥
মাঠের 'পরে বটের ছায়াতলে,
বজায় রাখাল মধুর স্বরে বাঁশি—
সেথায় গাছে দোয়েল ফিঙে নাচে,
চারিদিকে কেবল হাসিখুশি॥

এই মাসে দুটি প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়েছে। একই বাড়ি থেকে যদি একজনের বেশি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চাও, তাহলে কুপন পাঠাতে মুশকিল হবে। সেই অবস্থায় আমাদের একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলে আমরা কুপন পাঠিয়ে দেব।

প্রতিযোগিতা : ৪।৬৩

'আবোল তাবোল'-এর "কুমড়োপটাশ" কবিতাটি তোমাদের সকলেরই নিশ্চয়ই মুখস্থ আছে—

(যদি) কুমড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে ;
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে ;
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমুলার গাছে।

কিন্তু, কুমড়োপটাশ যদি কাঁদে, তাহলে কী করবে ? সে তো সুকুমার রায় বলেই দিয়েছেন আর যদি সে হাসে, ছোটে, কিংবা ডাকে ? তারও জবাব 'আবোল তাবোলে'ই দেওয়া আছে।

কিন্তু, (যদি) কুমড়োপটাশ রাগে—তখন কী করবে ? সুকুমার রায় কিছু বলে যান নি তোমরা কে ভেবে বলতে পার ?

সুকুমার রায়ের ছন্দে তিন লাইনের একটি ছড়ায় উত্তরটা লিখে ফেলো তো।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

১। ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের যে-কোনো ছেলে-মেয়ে এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক না হলেও চলবে।

২। এই পৃষ্ঠার নীচে দাগকাটা লম্বা ফালিটি হল কুপন। নির্দিষ্ট জায়গায় নাম, ঠিকানা আর জন্মদিন লিখে গোটা কুপনটি দাগ-বরাবর কেটে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে। মূল রচনার নীচে নাম-ঠিকানা দেওয়া নিষিদ্ধ—এই বিষয়ে ভুল হলে লেখা বাতিল হবে। খামের উপর লিখে দিতে হবে : 'প্রতিযোগিতা ৪।৬৩'।

৩। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই নভেম্বর ১৯৬৩।

৪। ১ম পুরস্কার ১০ টাকা, ২য় ৮ টাকা, ৩য় ৫ টাকা।

'সন্দেশ'
প্রতিযোগিতা ৪।৬৩
অক্টোবর ১৯৬৩

প্রতিযোগীর নাম..

বয়স..........................

জন্মদিন : সন.................. তারিখ.................. মাস..........

ঠিকানা..

....

প্রতিযোগিতা : ৫।৬৩

কাল খেতে গিয়েছিলাম ঘনশ্যাম চৌধুরীর ছেলের জন্মদিনে।

বাক্যটিতে একটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সাতটি শব্দ আছে বাক্যটিতে। প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষরটি লক্ষ্য করো : ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ—বাঙলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুলো পর-পর যেভাবে আছে এখানেও ঠিক সেইভাবেই সাজানো হয়েছে (মাঝখানে শুধু 'ঙ'-টা বাদ)।

এই প্রতিযোগিতায় তোমাদের **কুড়িটি শব্দে একটানা একটি ধারাবাহিক** ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। **প্রত্যেক শব্দের প্রথম** অক্ষরটি বাঙলা বর্ণমালার বিন্যাস অনুযায়ী হতে হবে : ক-খ-গ-ঘ, চ-ছ-জ-ঝ, ট-ঠ-ড-ঢ, ত-থ-দ-ধ, প-ফ-ব-ভ।

তিনটি **শর্ত** আছে : (১) আমরা উদাহরণ হিসাবে যে বাক্যটি দিয়েছি সেটি ব্যবহার করতে পারবে না, (২) পাঁচটির বেশি বাক্য ব্যবহার করতে পারবে না, (৩) একটানা একই বিষয়ের বর্ণনা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

১। ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের যে-কোনো ছেলে-মেয়ে এই রচনা-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। 'সন্দেশ'-এর গ্রাহক না হলেও চলবে।

২। এই পৃষ্ঠার নীচে দাগকাটা লম্বা ফালিটি হল কুপন। নির্দিষ্ট জায়গায় নাম, ঠিকানা আর জন্মদিন লিখে গোটা কুপনটি দাগ-বরাবর কেটে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে। মূল রচনার নীচে নাম-ঠিকানা দেওয়া নিষিদ্ধ—এই বিষয়ে ভুল হলে লেখা বাতিল হবে। খামের উপর লিখে দিতে হবে : 'প্রতিযোগিতা ৫।৬৩'।

৩। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ নভেম্বর, ১৯৬৩।

৪। ১ম পুরস্কার ১০ টাকা, ২য় ৮ টাকা, ৩য় ৫ টাকা।

'সন্দেশ'
প্রতিযোগিতা ৫।৬৩
অক্টোবর ১৯৬৩

প্রতিযোগীর নাম...

বয়স.............................

জন্মদিন : সন.................তারিখ.................মাস.................

ঠিকানা:...

....

১

অলোক আর অলকানন্দা দুজনে পিঠোপিঠি ভাইবোন। পুজোর ছুটিতে ওদের বাড়িতে এসেছে ওদেরই মামাতো মাসতুতো পিসতুতো ভাইবোনেরা—আশিস-আরাধনা, ইলাবন্ত-ইরাবতী আর উষ্ণীষ-উত্তরা। একদিন ঠিক হল সবাই মিলে দল বেঁধে সমুদ্র দেখতে যাবে—কী মজাই না হবে! ধড়াচুড়ো বেঁধে তৈরি হয়ে তিন ঘণ্টা বেলা থাকতেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। যেতে আসতে চার মাইল পথ—বেলাবেলি আবার ফিরে আসতে হবে তো। মাইলখানেক যেতেই পড়ল সেই নদীটা যার মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ আর তীরে একখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা। সেটা এত ছোট যে একসঙ্গে দুজনের বেশি লোকের জায়গা হয় না। চারদিকে কোথাও মাঝির পাত্তা পাওয়া গেল না।

আরাধনা বলল, 'হয়ে গেল সমুদ্র-দেখা।' ইলাবন্ত বলল, 'ঘাবড়াও মত, সমুদ্রও দেখা হবে আর সেই সঙ্গে একটা বুদ্ধির খেলাও হয়ে যাবে। আমরা এমন শর্তে ওপারে পৌঁছব যে বোনেরা আপন ভাইদের সঙ্গছাড়া হয়ে অপর ভাইদের সঙ্গে থাকবে না; আর ভাইয়েরাও এপারে, ওপারে বা দ্বীপে যদি অপর কোনো বোন একলা থাকে তবে একা একা নৌকো চালিয়ে যেতে পারবে না—অবিশ্যি আপন বোন থাকলে এ ব্যাপারে বাধা নেই।'

'আচ্ছা, তবে শুরু হোক এবার আমাদের বুদ্ধির খেলা।' আশিস সায় দিল। তারপর তারা খেলার শর্ত অনুসারে যথাসম্ভব কম সময়ে নদী পেরোল।

বলতে পার তারা মোটমাট কটা খেপ দিয়ে আটজনেই ওপারে গিয়ে পৌঁছেছিল?

২

বাঁকুড়া থেকে 'সন্দেশ'-এর একজন গ্রাহকের মা চিঠি লিখেছেন:

...ছেলেটা এতও হেঁয়ালি জানে! আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে কী পুরস্কার পেয়েছিস

খুলে বললেই হয়। তা নয়, কবিতা থেকে খুঁজে বার করে বুঝতে হবে সেটা কী বস্তু! আরে বাবা, অত বুদ্ধি কি আমার ঘটে আছে? 'সন্দেশ'-পড়ুয়াদের সাফ মাথা—ওরা নিশ্চয়ই বার করতে পারবে—

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে, গা-শিরশির রাত।
রত্নমালার গল্প বলে ঠানদি হল কাত;
নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় দিদি, ঠোঁট বাঁকিয়ে মা,
কটমটিয়ে তাকিয়ে ঘুমোয় হুতোম প্যাঁচার ছা।
লকলকিয়ে লাউয়ের ডগা উঠছে মাচার 'পর,
মকমকিয়ে ডাকছে দাদুর চড়িয়ে গলার স্বর।

[উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ : ৫ নভেম্বর ১৯৬৩]

যারা দুটি ধাঁধারই নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে শুধু তাদেরই নাম ছাপা হবে

———

এই সংখ্যায় ছাপা বাঘের ছবি এঁকেছেন—প্রসাদ রায়
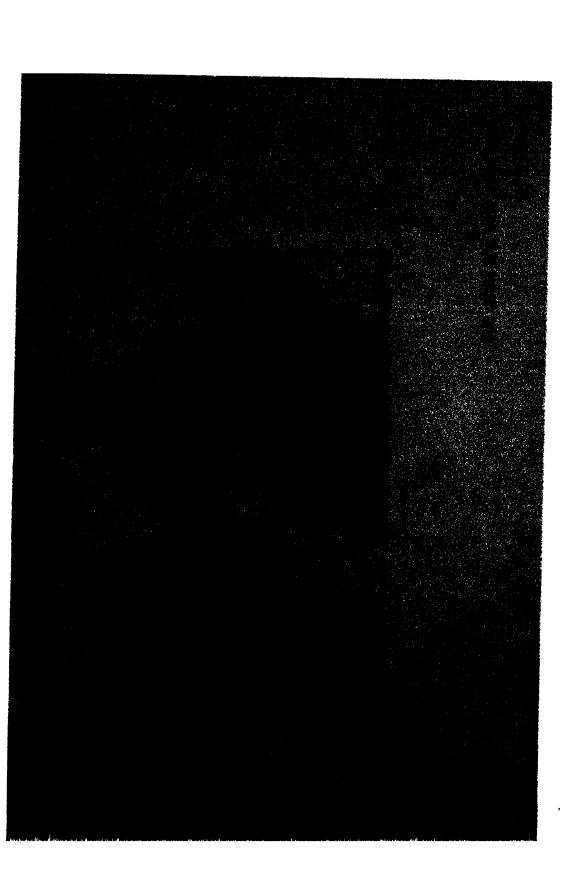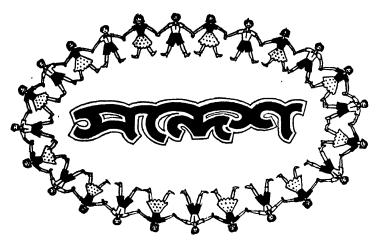
৩য় বর্ষ । ৭ম সংখ্যা

নভেম্বর ১৯৬৩ । কার্তিক ১৩৭০

স্বপ্ন চোখে জুড়ছিল

শৈলশেখর মিত্র

নীল আকাশে সুর ছিল—
সবুজে ফড়িং উড়ছিল—
ছেঁড়া মেঘের ভেলায় ভেসে
স্বপ্নরা সব ঘুরছিল।

গাছের শাখায় ফুল ছিল—
মৌমাছিটা ঢুলছিল—
ফুলের থেকে ফুলের মধু
খোশমেজাজে তুলছিল।

বাতাস বনে চলছিল—
রূপকাহিনী বলছিল—
রাতজাগানো সন্ধেপিদিম
জোনাক-পোকায় জ্বলছিল।

নীল আকাশে সুর ছিল—
স্বপ্ন চোখে জুড়ছিল—
তাই কি অমন খুশির নেশায়
সবুজে ফড়িং উড়ছিল?

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

বৃষপর্বা দানবদিগের রাজা, শুক্রাচার্য তাহাদের গুরু। শুক্রাচার্যের কন্যার নাম দেবযানী, বৃষপর্বার কন্যার নাম শর্মিষ্ঠা। একদিন দানবের মেয়েরা বনে বেড়াইতে গেল, দেবযানী আর শর্মিষ্ঠাও তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

স্নানের পর পরিবার জন্য মেয়েরা যে কাপড় আনিয়াছিল, তাহা একজায়গায় সাজাইয়া রাখিয়া, তাহারা আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিল, ইহার মধ্যে কখন বাতাস আসিয়া সেইসকল কাপড় উলটা-পালটা করিয়া দিয়াছে, কেহ তাহা টের পায় নাই। সুতরাং তাহারা নিজের নিজের কাপড় খুঁজিতে গিয়া ভুল করিতে লাগিল। শর্মিষ্ঠা যে কাপড়খানি হাতে লইলেন, সেখানি ছিল দেবযানীর; দেবযানী তাহাতে রাগিয়া গিয়া শর্মিষ্ঠাকে বলিলেন, 'হ্যাঁ লো, অসুরের মেয়ে, তুই কোন্ সাহসে আমার কাপড় নিতে গেলি?'

এ কথায় শর্মিষ্ঠা বলিলেন, 'দেখ দেবযানী, আমি মহারাজ বৃষপর্বার কন্যা। তোর পিতা আমার পিতার চেয়ে নীচু আসনে বসিয়া সর্বদা তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। তুই কি ভাবিয়াছিস যে খালি তোর মুখের জোরে তুই আমার সমান হইয়া যাইবি?'

তখন দেবযানী আর কোনো কথা না কহিয়া, কাপড় ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে, শর্মিষ্ঠা তাঁহাকে একটা কুয়ার ভিতর ঠেলিয়া ফেলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, দেবযানী নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ঠিক সেই সময়ে নহুষের পুত্র মহারাজ যযাতি ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথে যাইতেছিলেন; আর সারাদিন হরিণ তাড়াইয়া তাঁহার অত্যন্ত পিপাসা হওয়াতে, তিনি জল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কুয়ার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কুয়ার নিকট আসিয়া তিনি যখন তাহার ভিতরে কান্না শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার আর আশ্চর্যের সীমা রহিল না। তিনি ব্যস্তভাবে কুয়ার ভিতর তাকাইয়া দেখিলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা তাহাতে পড়িয়া কাঁদিতেছে।

রাজা অবিলম্বে সেই কন্যাটিকে কুয়ার ভিতর হইতে উঠাইলেন, আর তাঁহার পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, তিনি শুক্রাচর্যের কন্যা দেবযানী।

দেবযানীকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া যযাতি সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় ঘূর্ণিকা নামে দেবযানীদের এক দাসী তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবযানী

কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে বলিলেন, 'ঘূর্ণিকা, তুমি বাবাকে গিয়া বলো যে, শর্মিষ্ঠা আমাকে কুয়ায় ফেলিয়া দিয়াছিল, আমি আর বৃষপর্বার দেশে যাইব না।'

শুক্রাচার্য ঘূর্ণিকার মুখে এ কথা শুনিতে পাইয়াই, তাড়াতাড়ি দেবযানীর নিকট চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবযানী বলিলেন, 'বাবা, শর্মিষ্ঠা আমাকে কুয়ার ভিতরে ফেলিয়া দিয়াছিল। আর সে বলিয়াছে যে, আপনি না-কি বৃষপর্বার নীচে বসিয়া তাঁহার স্তব করেন। বাবা, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহার নিকট আমি ঘাট মানিব। আর যদি তাহা না হয়, তবে এমন কথা বলার সাজা তাহাকে দিতে হইবে।'

শুক্রাচার্য দেবযানীকে শান্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার রাগ থামিল না।

তখন শুক্র বৃষপর্বার নিকট গিয়া বলিলেন যে, 'হে দানবরাজ, পাপ করিলে সকলকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। আমার শিষ্য কচকে তুমি তোমার লোক দিয়া কত রকম যন্ত্রণাই দিয়াছিলে। তারপর তোমার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমার কন্যা দেবযানীকে কুয়ায় ফেলিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমরা আর তোমার দেশে বাস করিব না, আজই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম।'

শুক্রের কথার বৃষপর্বার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'যদি আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় সমুদ্রে ডুবিয়া মরিব।'

শুক্র বলিলেন, 'তুমি তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার; কিন্তু তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যে অপমান করিয়াছে, তাহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।'

বৃষপর্বা বলিলেন, 'ভগবন্, আমাদের যাহা কিছু আছে, সকলই আপনার। আপনিই আমাদের সকলের প্রভু। আপনি আমাদিগকে দয়া করুন।'

এ কথা শুক্র দেবযানীকে বলিলে, তিনি বলিলেন, 'বৃষপর্বা যদি নিজে আমার নিকট আসিয়া এ কথা বলেন, তবে আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি।'

তাহা শুনিয়া বৃষপর্বা বলিলেন, 'তোমার কী ইচ্ছা হয়, বলো—উহা যত বড় জিনিসই হউক, আমি নিশ্চয়ই তাহা তোমাকে দিব।'

তখন দেবযানী বলিলেন, 'আমি এই চাই যে, শর্মিষ্ঠা এক হাজার অসুরকন্যা লইয়া আমার দাসী হইবে। আমার বিবাহের পর যখন আমি স্বামীর গৃহে যাইব, তখনও সে এই এক হাজার অসুরকন্যা সমেত আমার দাসী হইয়া আমার সঙ্গে যাইবে।'

এ কথা শুনিয়া বৃষপর্বা তখনই একটি দাসীকে বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র শর্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া আনো।'

দাসী রাজার আজ্ঞায় শর্মিষ্ঠার নিকট গিয়া বলিল, 'রাজকন্যা, মহারাজ ডাকিতেছেন, তুমি শীঘ্র চলো। দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমাকে তাঁহার দাসী হইতে হইবে; নহিলে অসুরদিগের বড়ই বিপদ। দেবযানীর কথায় শুক্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছিলেন।'

এ কথায় শর্মিষ্ঠা বলিলেন, 'আমার জন্য শুক্র আর দেবযানী এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। তাহার চেয়ে আমার দাসী হইয়া থাকাই ভালো।'

এই বলিয়া শর্মিষ্ঠা এক হাজার সখী সমেত দেবযানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'গুরুকন্যা, আমি আমার এই এক হাজার সখী লইয়া তোমার দাসী হইতেছি। তুমি স্বামীর ঘরে যাইবার সময় আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইও।'

শর্মিষ্ঠার কথায় দেবযানী বলিলেন, 'সে কী! তুমি রাজার মেয়ে হইয়া কী করিয়া দাসী হইতে যাইবে?'

শর্মিষ্ঠা বলিলেন, 'আমি দাসী হইলে যদি আমার আত্মীয়গণের বিপদ নিবারণ হয়, তবে আমার তাহাই করা উচিত।'

এইরূপে দানবদিগের উপকারের জন্য শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। দেবযানী কোথাও বেড়াইতে গেলে, শর্মিষ্ঠা এক হাজার সখী লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতেন। দেবযানী শুইয়া বা বসিয়া থাকিলে শর্মিষ্ঠা তাঁহার পা টিপিয়া দিতেন।

একদিন দেবযানী সেই বনে আবার বেড়াইতে গেলেন। শর্মিষ্ঠা ও তাঁহার সখীগণ দেবযানীর সঙ্গে গিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

সেদিনও মহারাজ যযাতি সেই বনে শিকার করিতে আসিয়াছেন, আর জল খুঁজিতে খুঁজিতে সেই কন্যাগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রথমে যখন যযাতির সহিত দেবযানীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন দেবযানীর যার-পর-নাই দুঃখের অবস্থা। আর এখন তিনি পরম সুখে বসিয়া, এক হাজার সখী সমেত রাজকন্যার সেবা গ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া যযাতির চিনিতে না পারারই কথা।

কিন্তু যযাতিকে দেবযানীর না চিনিতে পারার কোনো কারণ ছিল না। যযাতির দয়ায় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া অবধি দেবযানী তাঁহাকে বড়ই ভালোবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যযাতিকে আবার দেখিয়া তাঁহার সেই ভালোবাসা আরও বাড়িয়া গেল।

এই সময়ে শুক্রাচার্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা যযাতিকে ভালোবাসেন, আর যযাতিও কন্যাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যযাতিকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আনন্দের সহিত অনুমতি দিতেছি, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করো।'

এইরূপে যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হইল। যযাতি তাঁহাকে লইয়া পরম আনন্দে নিজের দেশে চলিয়া আসিলেন।

অবশ্য, শর্মিষ্ঠা আর তাঁহার এক হাজার সখীও যযাতির সহিত তাঁহার রাজধানীতে আসিলেন। শুক্র যযাতিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, 'সাবধান! শর্মিষ্ঠাকে তুমি বিবাহ করিতে পারিবে না।'

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে]

ওরা এল

জীবন সর্দার

নীলাঞ্জনের ছোট্ট চিঠি পেলাম। তাতে লেখা—'ওদের আসা শুরু হয়েছে।' সে জানত না তার চিঠি পাবার আগেই আমি ওদের আসা দেখতে পেয়েছিলাম।

বছরের এই সময়ে যখন মেঘেরা সাদা, আকাশ ঘন নীল, ধানের খেত সবুজ, বিলভরা জল আর সূর্যাস্ত রঙীন হয় তখনই ওদের আসা শুরু হয়।

শীত আসছে—গাছেরা যেন বুঝতে পারে। বর্ষায় শরতে যতটা পারে জল জমায়, তারপর যে পাতা ঝরাবার পালা। মাঝে মাঝে উত্তরের হাওয়া বয়। ওরাও আসতে শুরু করে উত্তর থেকে।

এই বিরাট শহরটার নদীর ধার, পুলের ওপর, মাঠ, পথ কিংবা কোনো সন্ধ্যায় জানালার ধারে বসে আমি ওদের আসা দেখি। ওরা ওদের গলায় নূপুরের ঝংকার তুলে উড়ে চলে যায়।

আমি যাযাবর হাঁসের কথা বলছি।

বাদামী রঙের ছোট্ট হাঁসগুলোকেই বেশী দেখা যায়, না? সমস্ত দিন ওরা চুপচাপ জলে ভাসে, কিংবা ঝিমোয় ডাঙায় বসে এক পা তুলে, ডানায় ঠোঁট গুঁজে। কেউ কাছাকাছি এলে একডুবে অদৃশ্য হবে নয়তো ঝাঁক বেঁধে উড়বে আকাশে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ওদের যত কাজ—খাবার খোঁজা। ওদের ডাকে, ডানা-ঝাপটানোর শব্দে, ডুবে-যাওয়া আর ভেসে-ওঠার ব্যস্ততায় ঝিলগুলোতে জীবনের সাড়া পড়ে যায় তখন।
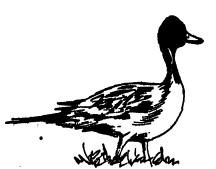
আমি ভেবে পাই না, ওরা এমন করে, এমনি সময় বছর বছর একই জায়গায় কী করে আসে? কেন আসে? যদি আসেই, তবে আবার ফিরে কেন যায়? বলতে পার?

নীলাঞ্জনের মতে এই আসা-যাওয়ার মানে বোঝা কিছুই কঠিন নয়—উত্তরের ঠাণ্ডা জায়গায় যে সব পাখিরা থাকে, শীতে তাদের খাবার বলতে কিছুই থাকে না। বরফে ঢাকা পড়ে যায়। দক্ষিণে, যেখানে তখন শীত পড়ে অথচ বরফ
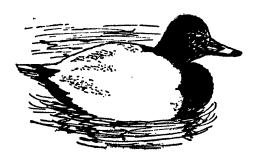
পড়ে না, সেখানে তাদের খাবার-দাবারের অভাব হয় না। তাই শীত পড়লেই উত্তর থেকে পাখিদের দক্ষিণ-যাত্রা শুরু হয়। শীতের শেষে গরমের শুরুতে আবার শুরু হয় তাদের উত্তরে ফিরে যাওয়া।

তার কথায় ভুল নেই। কিন্তু শীত আর গরম এই দুটো শব্দের মধ্যে তোমরা নতুন যুক্তির ইঙ্গিত পাবে। মানে, ঐ দুটো ঋতুতে তাপের যে বাড়া-কমা, তার সঙ্গে হাঁসদের আসা-যাওয়ার যোগ থাকা অসম্ভব নয়। ঠিক। এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছেন অনেকে। জানাও গিয়েছে অনেক কিছু। তোমাদের কাছ থেকে আরও জানার আশা রাখি।

এত সব কথা ভাবতে ভাবতে, একদিন সন্ধ্যায় পাখি দেখা শেষ করে আলের পথে ফিরছিলাম। পথের পাশে ছোট ডোবা। ডোবাতে দুটো হাঁস জলে মাথা ডুবিয়ে, উবু হয়ে খাবার খাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, ওরা বুঝি কারও পোষা হাঁস। কিন্তু এই পথ, এই ডোবা থেকে কাছেপিঠের গাঁ কম করেও মাইল খানেক দূর। সন্ধ্যা হল। ওদের নিতে কেউ এল না! আমার ভাবনা শেষ হল না। ওরা একে একে মাথা তুলল, আমাকে দেখতে পেল, তার পরই নিমেষে ডানা ঝাপটে আকাশে ভাসল। ঠিক চিনলাম—নীলশিরা। সবুজ মাথা, গলায় সরু সাদা রেখা, বাদামী বুক আর ডানার ভিতর দিকটা দু-রঙের।

চারদিক অন্ধকার। চেনা পথ চিনতেও কষ্ট হচ্ছিল। দূর-দূরান্তের পাখিরা কী করে যে ঠিক পথ চিনে আসে আর যায় ভেবে পাই না!

পথ চিনে কী করে ওরা আসে—ব্যাপারটা নিয়ে, একটু ভেবে, তোমরা কী বলবে আমি জানি। বলবে, যেভাবে আমরা পথ চিনে ঘরে ফিরি, নাবিক সমুদ্রে দিক ঠিক করে, সেইভাবে। অর্থাৎ কোনো নিশানা দেখে পথ ঠিক করা। কথাটা ভুল নয়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ওদের পথের নিশানা আমাদেরই চেনা পাহাড়, নদী, বন, আকাশের ছায়াপথ, সূর্য, চন্দ্র, তারা—সবকিছুই হতে পারে। এমনও হতে পারে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে তারা পথ চেনে—কিংবা, তাদের শরীরে কোথাও এমন কোনো 'ইন্দ্রিয়' আছে যা ঠিক পথ চিনতে সাহায্য করে।

তবে, তাদের আসার যেমন অনেক কারণ, তাদের পথ চিনে নেওয়ারও পেছনে অনেক কারণ অনেক পণ্ডিত দেখিয়েছেন। পণ্ডিতদের বড়ো ভাবনাগুলো ভাবতে দাও; ছোট ভাবনাগুলো তোমাদেরই—মানে প্রকৃতি-পড়ুয়াদেরই ভাবতে হবে।

তোমাদের জানতে হবে, শুধু হাঁসেরাই এমনি আসা-যাওয়া করে, না অন্য অন্য পাখিরও এই স্বভাব আছে। পাখি ছাড়া আর কারও কি নেই? নেই কি?

যদি এমনি ধরনের যাযাবর কারও সন্ধান পেয়ে থাক, তবে খোঁজ নিয়ে আরো জানবে—সে কোথা

থেকে এল। উঁচু জায়গা থেকে—মানে পাহাড় থেকে—নেমে এল, না পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনো জায়গা থেকে এল? জেনে আমাকে খবর দিও।

আমার মেঠো খসড়া থেকে ছুটো খবর দিচ্ছি :

২৮শে জুলাই '৬৩ : নৌকোয় বজবজ যাচ্ছি। উদ্ভিদ্-উদ্যানের (বোটানিক্যাল গার্ডেন্স্) কাছাকাছি অনেক প্রজাপতিকে পশ্চিম থেকে পুবে নদী পার হতে দেখলাম। ফিরতে দেখলাম না কাউকে।

২০শে সেপ্টেম্বর '৬৩ : গড়ের মাঠের অনেক জায়গায় নীলকণ্ঠ পাখি দেখলাম। প্রতি বছর এমন সময় রোজ দেখা যায়। নভেম্বরে আর দেখি না।

পড়ুয়াদের প্রশ্ন
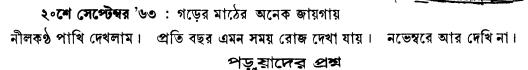
সন্দীপ মাইতি, কলাগাছিয়া, মেদিনীপুর থেকে জানাচ্ছে : ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পাশের গ্রাম রানীচক স্কুলের 'ক্লাশ সিক্সে' বাজ পড়েছিল। খড়ের চালটা থালার মতো পুড়ে যায়। ঘরের একটা নারকেল গাছের খুঁটি একেবারে ফেটে যায়। ক্লাশের ২৭টি ছেলে অজ্ঞান হয়ে যায়। ৬ জন মারা গিয়েছে। ছেলেরা সব এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছিল। ক্লাশের শিক্ষকমশাই দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান কিন্তু আহত হন নি। সন্দীপের প্রশ্ন : (১) ছেলেরা কেন ছিটকে পড়ল? (২) বেঞ্চিতে-বসা ছাত্ররা আহত হল, মাটিতে-দাঁড়ানো শিক্ষকমশাই কী করে অক্ষত রইলেন? (৩) আহত ছেলেদের বমিতে বারুদের গন্ধ কেন? (৪) শুকনো নারকেল গাছের খুঁটি বেয়ে বিদ্যুৎ নামল কী করে?

ফাল্গুনী রায়, কলকাতা থেকে লিখছে : আমাদের বাড়িতে অনেক শেওলা আছে। সেগুলো গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়। কিন্তু বর্ষাকালে সতেজ হয় কী করে?

সৌম্যেন্দু সরকার, কলকাতা, জানতে চাইছে—(১) কেঁচো, উই, ফড়িং, পিঁপড়ে এরা শ্বাস নেয় কী করে? (২) হাঁসকে চিত করে শুইয়ে তার পেটের উপর একটা ছোট পাথর চাপিয়ে দিলে হাঁস মরার মতো পড়ে থাকে কেন?

সর্বাণী রায়, এলাহাবাদ থেকে জানতে চাইছে, 'কুকুরের গায়ে এক রকম খয়েরী মাছি দেখতে পাই। ওদের সঙ্গে সাধারণ মাছির কী তফাত? ওরা কি অন্য জানোয়ারের গায়েও থাকে?' সে আরো জানতে চাইছে, 'সবুজ রঙের আলোর পোকাগুলো (শ্যামা) সর্বদা পাশের দিকে চলে দেখেছি। কেন ওরা সোজা দিকে চলে না?'

পড়ুয়ারা ব্যাপারগুলো পড়ে, ভেবে, পরীক্ষা করে চটপট উত্তর লিখে জানাও।

স্মৃতিলেখা গুহ
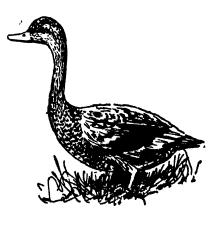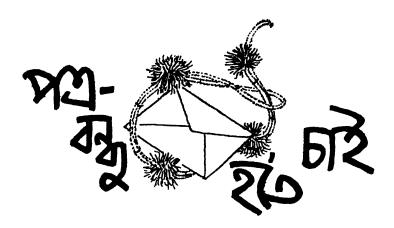
বয়স ১০। ২৬৩এ মহারাজা ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩১, নবম শ্রেণী। ডাকটিকিট, নাচ-গান, নতুন খেলা, ভুতের গল্প, কবিতা বা গল্প লেখা, গাছের পাতা সংগ্রহ করা।

কানাই দত্ত

বয়স ১৬। ৪২।১ পঞ্চানন চ্যাটার্জি লেন, হাওড়া। নবম শ্রেণী। ডাকটিকিট, গল্প ও কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, খেলাধুলা।

উদয় দত্ত

বয়স ১৩। অবধায়ক শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, অ্যাডভোকেট, বনগাঁ, ২৪ পরগনা। একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ডাকটিকিট, বিজ্ঞান বিষয়ে জিজ্ঞাসু।

অরুণ মজুমদার

বয়স ১৬। অবধায়ক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মজুমদার, গ্রাম—হরিনাভি, পোঃ অঃ কোদালিয়া, ২৪ পরগনা। ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান। গান-বাজনা, অভিনয়, গল্প-উপন্যাস পড়া, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্‌স্‌।

ভুঁইয়া মোহাম্মদ ইকবাল

বয়স ১৬। 'খেলাঘর', ৯ নয়া পল্টন, ঢাকা-২, পূর্ব পাকিস্তান। দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা, গল্প, প্রবন্ধ লেখা, ডাকটিকিট, বই-পত্র-পত্রিকা পড়া ও সংগ্রহ, সংগঠনমূলক কাজ।

দোলা দাশগুপ্ত

বয়স ১৫। অবধায়ক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশশর্মা, ৩ডি স্টার্চি রোড, লিলুয়া, হাওড়া। দশম শ্রেণী কলা। ব্যাডমিন্টন, ক্যারম, টেবল টেনিস, গল্পের বই পড়া, অভিনয়, কোটেশন জমানো, ভ্রমণ।

গৌতম চৌধুরী

বয়স ১১। অবধায়ক শ্রীপ্রদ্যোৎ চৌধুরী, ২৬/৩১/২ কই পুকুর লেন, পোঃ শিবপুর, হাওড়া। অষ্টম শ্রেণী। ডাকটিকিট, ফটোগ্রাফি, অভিনয়, আবৃত্তি, জাদুবিদ্যা, ক্রিকেট, গল্পের বই, বিজ্ঞানকল্প কাহিনী, ডিটেক্‌টিভ গল্প, বিজ্ঞান, রুশভাষা, মহাকাশ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু।

শুক্লা চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১৪। পি ১১৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-১৪। দশম শ্রেণী কলা। ডাকটিকিট, অটোগ্রাফ, কোটেশন সংগ্রহ, সবরকমের খেলাধুলা।

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স ১৩। ৩৮ ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলকাতা-৪১। দশম শ্রেণী বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান, গল্পের বই, মহাপুরুষের বাণী সংগ্রহ, খেলার ছবি (ক্রিকেট), ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট।

শ্যামল ভৌমিক

বয়স ১৪। 'মন্মথ নিবাস', খিরনি পোকার, মজফফরপুর, বিহার। ডাকটিকিট, ছবি আঁকা, কবিতা ও গল্প লেখা।

হারকিউলিসের গল্প

কমলা চট্টোপাধ্যায়

আগেকার দিনের লোকেরা শুধু যে দেবতাদের পুজো দিয়ে খুশী থাকত, তা মোটেই নয়। যেসব বীর সাহস আর মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়ে শ্রদ্ধা আর সুনাম কিনতেন, লোকে তাঁদেরও পুজো করত আর দেবতাদের অংশ বলে মনে করত। গ্রীস আর রোমে এইসব বীরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন হারকিউলিস।

হারকিউলিসের অদ্ভুত সাহসের আর শক্তির পরিচয় খুব ছোটবেলা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর জন্মের পরেই শত্রুরা তাঁকে মেরে ফেলবার জন্য দুটো বিষাক্ত সাপকে তাঁর খাটের চারিদিকে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিল। বাড়ির সকলেই তাই দেখে ছেলেটাকে বাঁচাবার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, এমনি সময় সকলের চোখের সামনে সে নিজের ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে সাপদুটোর গলা টিপে মেরে ফেলে দিল।

হারকিউলিসের শিক্ষার ভার পড়ল চিরোন নামে একজন পণ্ডিতের উপর। তিনি হারকিউলিসকে নানান রকম অস্ত্রচালনা আর দৌড়ঝাঁপের খেলা শেখাতে আরম্ভ করলেন। মহানন্দে দিনগুলো হু হু করে কেটে যেতে লাগল। তারপর একদিন হারকিউলিস দেখলেন যে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে আর সামনে পড়ে রয়েছে বিশাল পৃথিবী—নানান রকম সুযোগ আর সম্ভাবনা দিয়ে ভরা।

তিনি তখন গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর যাবার পর ভারি সুন্দর দুটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। একজনের নাম সুমতি, আর আরেকজনের নাম কুমতি। তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে হারকিউলিসকে বলল তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে তার কথামত চলতে হবে। কুমতি তাঁকে ধনদৌলত, সুখের জীবন, অলসতা এইসবের লোভ দেখাল; আর সুমতি বলল তাকে নিলে কিন্তু পৃথিবীর সবরকম অন্যায়ের সঙ্গে তাঁকে দিনরাত যুদ্ধ করে জয়ী হতে হবে, তার জন্য নানারকম দুঃখকষ্টও সহ্য করতে হবে, আর সারাজীবন দারুণ খাটতে হবে।

হারকিউলিস এই কথা শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে সুমতিকেই বেছে নিলেন। পুরস্কারস্বরূপ থিবিসের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল।

হারকিউলিসের এত সুখ তাঁর সৎমা জুনোর সহ্য হল না। জুনো স্বর্গের রানী। সুযোগ বুঝে হারকিউলিসকে তিনি পাগল বানিয়ে দিলেন। পাগল হয়ে হারকিউলিস নিজের স্ত্রীকে আর ছেলেকে মেরে ফেলেছিলেন। সেই দুঃখেই তার জ্ঞানও ফিরে এসেছিল আর তিনি পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এইরকম করেই হয়তো জীবনটা কাটিয়ে দিতেন যদি না মার্কিউরি, যিনি দেবতাদের কাছে দুনিয়ার সব খবর পৌঁছে দেন, তাঁকে দেখতে পেতেন। তখন দেবতারা ঠিক করলেন যে,

হারকিউলিসকে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এক বছর ধরে আর্গসের রাজা ইউরিসথিউসের দাসত্ব করতে হবে।

হারকিউলিস যখন বুঝতে পারলেন যে এক বছর ধরে একজন কাপুরুষ রাজার গোলাম হয়ে থাকতে হবে, তখন তিনি রেগে আবার পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তারপর খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বুঝলেন যে দেবতাদের কথার উপর আর জারিজুরি খাটবে না। তিনি নিজেই ইউরিসথিউসের কাছে গেলেন। ইউরিসথিউস বললেন যে বারোটা অত্যন্ত কঠিন কাজ করে দিলে তবে তাঁকে গোলামি থেকে ছুটি দেওয়া হবে।

নিমিয়ার জঙ্গলে একটি সিংহ বাস করত। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করবার জন্য হারকিউলিস তাকে খুঁজতে চলে গেলেন। সিংহটা অত্যন্ত হিংস্র। লোকের বহু ক্ষতি করত,—মানুষ, গোরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি খেয়ে ফেলত। সবাই হারকিউলিসকে এই অসাধ্য কাজ করতে বারণ করল, কিন্তু নির্ভয়ে সিংহের পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে তিনি একেবারে তার গুহার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর দুহাতে তার টুঁটি চেপে ধরে তাকে মেরে ফেলতে কতক্ষণই বা লেগেছিল! সিংহটার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে পোশাক তৈরি করে হারকিউলিস সব সময় পরে থাকতেন।

প্রথম কাজ শেষ করে আর্গসে ফিরে এসে তিনি শুনলেন যে, তাঁকে এবার লের্না বলে এক জায়গায় যেতে হবে। সেখানকার জলা জায়গায় হাইড্রা নামে একটা সাপ থাকে, তার সাতটা মাথা। এই সাপটাকে মারবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু কেউই পারে নি ; বরং সেই সাপ মানুষ জন্তু সমানে সব খেয়ে চলেছে। হারকিউলিস তাঁর বিরাট তলোয়ার দিয়ে যেই না সাপের সাতটা মাথা কেটে ফেলেছেন, অমনি সেই কাটা জায়গাগুলো দিয়ে আরো সাতটা মাথা গজিয়ে উঠেছে। এমনি যতবার কাটেন ততবার গজায়। তখন হারকিউলিস এক মতলব ঠাওরালেন। বন্ধু আইওলসকে বললেন মাথা কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওই জায়গাটা জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই-ভাবে দুইবন্ধুতে মিলে শেষ পর্যন্ত সাতমাথা সাপটাকে শেষ করলেন। ফেরবার আগে হারকিউলিস তাঁর তীরগুলোকে সাপের বিষাক্ত রক্তে ডুবিয়ে নিলেন যাতে ভবিষ্যতে ওই তীরগুলোর ক্ষত সামান্য হলেও সাংঘাতিক হয়।

তৃতীয় কাজ সেরিনিয়ার সোনার-শিংওয়ালা হরিণ ধরে আনা। এই হরিণটি এত জোরে দৌড়তে পারত যে দেখে মনে হত তার পা মাটিতে পড়ছেই না। হারকিউলিস হরিণের পিছন পিছন অনেক দৌড়ে তাকে উত্তর দেশের বরফের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তবে ধরতে পারলেন। তারপর বরফের মধ্যে থেকে তাকে টেনে বের করে রাজার কাছে পৌঁছে দিলেন।

চতুর্থ কাজ আর্কেডিয়ার বুনো শুয়োর ধরে দেওয়া।

এরপর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এলিসের রাজা ঈজিয়াসের কাছে। এই রাজার একটা বিরাট গোয়ালঘর ছিল, তার ভিতর মেলা গোরু থাকত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই : গোয়ালঘর বহু বছর পরিষ্কার না করার ফলে একেবারে ময়লার গাদা হয়েছিল। সেই ময়লা তাঁকে সাফ করতে হবে। গোয়ালঘরের কাছেই আলফিউস নদী প্রবাহিত, তার স্রোতের বড় জোর। হারকিউলিস এবারে নদী

নদীর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন কী কর্তব্য। তিনি নদীকে বেঁধে ফেলে তার স্রোতের মোড় ঘুরিয়ে গোয়ালঘরের মধ্যে দিয়ে বইয়ে দিলেন। নদীর জলে গোয়ালঘরের সব ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। কাজ হয়ে গেলে নদীর বাঁধ সরিয়ে দিয়ে হারকিউলিস তার গতি আবার পুরনো পথে চালিয়ে দিলেন। এইভাবে পাঁচ নম্বর কাজও শেষ হল।

এবার হারকিউলিস ক্রীটের দিকে এগুলেন। জলের দেবতা নেপচুন ক্রীটের রাজা মিনোস্‌কে একটি ষাঁড় দিয়েছিলেন পুজোর বলির জন্য। কিন্তু মিনোসের ওই ষাঁড়টিকে এতই পছন্দ হয়েছিল যে তিনি তাকে নিজের কাছে রেখে, অন্য আরেকটি ষাঁড়কে বলির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নেপচুন জানতে পেরে রেগেমেগে ষাঁড়টিকে পাগল বানিয়ে দিলেন। ষাঁড়টা তখন উন্মত্তভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর লোকের ঘরবাড়ি ভাঙতে আরম্ভ করল। হারকিউলিস গায়ের জোরে ষাঁড়টাকে ধরে বেঁধে ফেললেন।

থ্রেসের রাজা ডাইওমিডিসের কয়েকটি অত্যন্ত সুন্দর ঘোড়া ছিল। রাজা তাঁর প্রিয় ঘোড়াদের মানুষের মাংস খাওয়াতেন। তিনি হুকুম করেছিলেন যে তাঁর রাজ্যে যত বিদেশী আসবে তাদের ধরে প্রথমে খাইয়েদাইয়ে মোটা করিয়ে নেওয়া হবে, তারপর তাদের মেরে তাদের মাংস ঘোড়াদের দেওয়া হবে। হারকিউলিস এই নিষ্ঠুরতার জন্য রাজাকেই ধরে তাঁর নিজের ঘোড়ার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর ঘোড়াগুলোকে দেশে নিয়ে এসে ইউরিসথিউসকে উপহার দিলেন।

এইভাবে সাত-সাতটা পরীক্ষায় বীরত্বের পরিচয় দিয়ে হারকিউলিস অষ্টম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইউরিসথিউসের একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল, তার নাম ছিল এডমিটি। রাজকন্যা কিন্তু ভীষণ অহংকারী ছিল আর সাজসজ্জা গহনা এইসবই ভালোবাসত। তার মনে আর কিছুরই জায়গা ছিল না। সে একদিন একজন বিদেশীর কাছে শুনল যে আমাজনদের রানী হিপ্পোলিটের কোমরে একটি গয়না আছে যার জুড়ি দুনিয়াতে নেই। শুনেই তো সেইটি পাবার জন্য রাজকন্যার মন একেবারে আকুল হয়ে উঠল। তার বাবাকে এ কথা বলতে হারকিউলিসের উপর ভার পড়ল সেইটে এনে রাজকন্যার হাতে দেবার।

আমাজনরা ছিল অত্যন্ত সাহসী আর যুদ্ধে নিপুণা। তাদের সবাই ভয় করত। হারকিউলিস যখন তাদের রানী হিপ্পোলিটের কাছে সব কথা খুলে বললেন, তিনি বললেন রাজকন্যার ইচ্ছাটাকে ভালো করে ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু হারকিউলিসের সেই যে হিংসুটে সৎমা জুনো, তিনি আমাজন সেজে দলের মধ্যে ঢুকে রটিয়ে দিলেন যে, ওসব গয়না-টয়না বাজে কথা, আসলে হারকিউলিস চায় হিপ্পোলিটকে চুরি করে নিয়ে যেতে। এই কথা রটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমাজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একজোট হয়ে হারকিউলিসকে আক্রমণ করল। হারকিউলিস একা যুদ্ধ করে তাদের হারিয়ে দিয়ে রাজকন্যার জন্য গহনা নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

ইউরিসথিউস অত্যন্ত খুশী হয়ে হারকিউলিসকে অভিবাদন জানালেন আর বললেন যে স্টিমফালাস হ্রদের উপর একঝাঁক সাংঘাতিক পাখিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। তাদের নখে। যাথ গরীভ

একমাত্র হারকিউলিসই সেগুলোকে মেরে ফেলতে পারবেন। এইবার সেই বিষাক্ত তীরগুলো হারকিউলিসের কাজে এল। ওইগুলো দিয়ে হারকিউলিস কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পাখি মেরে ফেললেন।

হারকিউলিসের কাজ কিন্তু তখনও শেষ হয় নি। তাঁকে যেতে হল ইরিথিয়া থেকে একপাল গোরু নিয়ে আসতে। ফিরতি পথে ক্লান্ত হয়ে, আভেন্টাইন পাহাড়ের উপর গোরুগুলিকে ছেড়ে দিয়ে হারকিউলিস যখন বিশ্রাম করছিলেন তখন ক্যাকাস নামে এক দানব কয়েকটাকে চুরি করে নিয়ে যায়। চোরকে শাস্তি দেবার জন্য হারকিউলিস তার গুহার মধ্যে ঢুকে তাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে গোরুগুলিকে নিরাপদে ইউরিসথিউসের কাছে নিয়ে এলেন।

ফিরে এসেই তাঁকে আবার যেতে হল হেসপেরিডিসদের কাছ থেকে সোনার আপেল আনতে। এই হেসপেরিডিসরা ছিল পশ্চিমদিকের দেবতা হেসপেরেসের মেয়ে। হারকিউলিস এক সমস্যায় পড়লেন, কারণ তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না যে কোথায় আপেলগুলো লুকনো আছে। এই আপেলগুলো আকাশের রানী জুনো তাঁর বিয়েতে উপহার পেয়েছিলেন, সেগুলোকে দেখাশোনার ভার পড়েছিল এই হেসপেরিডিসদের উপর।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর হারকিউলিস জানতে পারলেন যে হেসপেরিডিসরা এই আপেলগুলো নিয়ে একেবারে সোজা আফ্রিকা চলে গেছে। সেখানে নিজেদের বাগানের গাছে ঝুলিয়ে রেখে লেডন বলে একটা ড্রাগনকে দিনরাত পাহারা দেবার জন্য গাছের তলায় বসিয়ে রেখেছে। দুঃখের বিষয় কেউই আর হারকিউলিসকে বলতে পারল না যে আফ্রিকার কোন্‌দিকে ওই বাগান। তিনি তখন ঠিক করলেন যে নিজেই খুঁজে নেবেন। এই ভেবে বেরিয়ে পড়লেন। পথে যেতে যেতে এরিডেনাস নদীর জলপরীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। আপেলের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তারা বলল, একমাত্র সমুদ্রের দেবতা নিরিয়াস ঠিক খবর দিতে পারবেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি প্রমিথিউসের খবর দিলেন। তখন হারকিউলিস প্রমিথিউসকে খুঁজে বের করে দেখলেন যে ককেসিয়ান পাহাড়ের ধারে শিকল দিয়ে তিনি বাঁধা রয়েছেন, আর তাঁর চারিদিকে শকুনিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। নিমেষের মধ্যে হারকিউলিস শকুনিগুলোকে মেরে, শিকল কেটে প্রমিথিউসকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। প্রমিথিউস খুশী হয়ে তাঁর ভাই অ্যাটলাসের কাছে হারকিউলিসকে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক জায়গায় ঘুরে অ্যাটলাসের কাছে গিয়ে হারকিউলিস দেখলেন যে সে তার চওড়া কাঁধের উপর আকাশ ধারণ করে রয়েছে। সব কথা শুনে অ্যাটলাস বলল, যদি হারকিউলিস কিছুক্ষণ আকাশের ভার নিজের কাঁধের উপর নিয়ে তাকে ছুটি দেন তাহলে সে নিজে গিয়ে আপেলগুলো আনবে।

হারকিউলিস রাজী হওয়াতে অ্যাটলাস চুপিচুপি হেসপেরিডিসদের বাগানে ঢুকে ড্রাগনটাকে মেরে আপেল নিয়ে হারকিউলিসের কাছে ফিরে চলল। যেতে যেতে তার হঠাৎ মনে পড়ল এ আবার তো তাকে আকাশের ভার নিতে হবে; তার থেকে এই ছুটিটা কত ভালো। এই ভেবে হারকিউলিসের কাছে এসে সে বলল যে সে নিজেই আপেলগুলো নিয়ে ইউরিসথিউসের কাছে যাবে।

হারকিউলিস বরঞ্চ আকাশের ভারটা নিক। হারকিউলিস তখন রাজী হবার ভান করে বললেন, তাহলে কাঁধের জন্য কয়েকটা বালিশ নিয়ে নিতে হয়—যদি অ্যাটলাস আকাশটাকে কিছুক্ষণ ধরে। বোকা অ্যাটলাস রাজী হতেই হারকিউলিস তার বোঝা তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপেল নিয়ে রওনা দিলেন।

তার পরের কাজটাই হল হারকিউলিসের শেষ কাজ। এইবার তাঁর ভার পড়ল হেডিস বা পাতালে থেকে সেরবেরাসকে নিয়ে আসা। এই সেরবেরাস হল একটি তিনমাথা কুকুর যার মুখের ফেনা থেকে রাতের সৃষ্টি হয়। ইউরিসথিউস কিন্তু কুকুরটাকে দেখে এত ভয় পেলেন যে শেষ পর্যন্ত হারকিউলিস কুকুরটাকে আবার পাতালে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন।

এইভাবে হারকিউলিসের বারোটি কাজ শেষ হল। ইউরিসথিউসের দাসত্ব থেকে তিনি মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু ততদিনে এই ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাই ঘুরতে ঘুরতে অলিম্পিয়ায় ফিরে গিয়ে তিনি দেবতাদের রাজা জুপিটারের জন্যে পাঁচ বছর অন্তর একটি বিশাল খেলা-ধুলোর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। এইরকম করে অলিম্পিক খেলার সূচনা হয়েছিল, যার কথা তোমরা সকলেই জান।
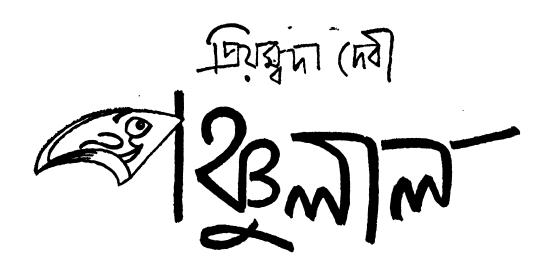
[অক্টোবর সংখ্যার পর]

চলতে চলতে পা যখন আর চলে না, সন্ধ্যেবেলায় তারা একটা অতিথশালায় এসে পৌঁছল। শেয়াল বললে, 'এসো, এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক।' অতিথশালায় গিয়ে সেখানকার কর্তাকে শেয়াল বললে, 'দেখো, আমাদের দুটো ঘর চাই। একটা পঞ্চু বাবুসাহেব মশায়ের, আর একটাতে গরিব আমরা দুজনে থাকব। দুপুর রাতে আমাদের ডেকে দেবে, তখুনি আমাদের আবার যাত্রা করতে হবে।'

'ভালো কথা, ভালো কথা' বলে কর্তা মাথা নেড়ে শেয়ালকে চোখ টিপলে,—ভাবখানা এই যে, সব ঠিক হবে, তোমার আমার মতলব তো একই।

বিছানায় পড়তে না পড়তে পঞ্চু গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে সুখস্বপ্নে হাবুডুবু খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে চমকে জেগে উঠল, কর্তা তার ঘুম ভাঙাতে এসেছেন। তখন রাত দুপুর।

ধড়মড় করে উঠে পঞ্চু জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার সঙ্গীরা তৈরী আছেন তো?'

'তৈরী? তারা তো ঘণ্টা দুই হল চলে গিয়েছে! বেড়াল বেচারীর বড় ছেলের অসুখের খবর পেয়ে তারা আর থাকতে পারল না।'

'তাঁদের খাবার খরচটা দিয়ে গেছেন তো?'

'তারা কি বোকা না অসভ্য—তোমার অতিথি হয়ে এসে খাবার দাম দিয়ে যদি যায়, তা হলে তোমারই তো অপমান। এমন বেয়াদবি তারা করবে কেমন করে?'

মাথা চুলকোতে চুলকোতে পঞ্চু তখন জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে কি তারা আমার জন্য অপেক্ষা করবে বলে গেছে?'

'হ্যাঁ, কাল সকালে দেবক্ষেত্রে তাদের দেখা পাবে।'

অতিথশালার কর্তা হিসাব চুকোবার জন্য একটা মোহর আদায় করে পঞ্চুকে বিদায় করলেন। পথ তখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, কোনোরকমে হাতড়ে হাতড়ে পঞ্চু এগোতে লাগল।

পথে যেতে যেতে পঞ্চু দেখলে গাছের ডালে একটা আলো ঝিকমিক করছে, ঠিক যেন কে একটি সোনার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছে। আলোটা জ্বলছে নিভছে, আবার জ্বলছে। পঞ্চু জিজ্ঞাসা করলে, 'কে তুমি?' আলো বললে, 'দেখো পঞ্চু, আমি সেই বাক্যবাগীশ ঝিঁ ঝিঁ, তুমি আমায় মেরে ফেলেছিলে, আমি তোমায় একটু উপদেশ দিতে চাই।' ঝিঁঝিঁ বেচারীর গলায় আর জোর ছিল না, সরু কাঁপা গলায় বললে, 'দেখো বাছা, ফিরে যাও, ও পথে আর এগিয়ো না—তোমার বুড়ো বাপ তোমার জন্য কেবলি কাঁদছে। যারা বলে মোহরের গাছ জন্মায় তাদের লোকে কী বলে? এসব কথা হয় পাগলে নয় চোর-জুয়োচোরে বলে থাকে। ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে যাও।' কিন্তু পঞ্চু কি সে কথা শোনে? সে বকে ধমকে ঝগড়া করে ঝিঁঝিঁকে তাড়িয়ে দিল। তখন চারদিকে আরও বেশী অন্ধকার হয়ে এল।

এমন সময় গাছের পাতাগুলো সিরসির করে কেঁপে উঠল, মনে হল কে যেন বিড়বিড় করে বকছে। ফিরবামাত্র দেখতে পেলে শয়তানের মতো যেন দুটো কী কয়লার কালো ছালা পরে এগিয়ে আসছে। তারা গুঁড়ি মেরে পঞ্চুর পিছন পিছন আসছে আর এক-একবার লাফিয়ে উঠছে।

মোহরগুলো কোথায় লুকোবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে পঞ্চু সেগুলো মুখের মধ্যে পুরে রাখল। তারপর পালাবার জন্য দৌড় দিলে। তিন পা যেতে না যেতে দুটো হাত তাকে আঁকড়ে ধরলে আর ভাঙা ঢোলের মতো গলায় একজন বললে, 'হয় তোমার টাকা দাও, নয় তোমার প্রাণ দাও।'

মুখে টাকা ছিল বলে পঞ্চুর কথা কইবার জো ছিল না—তাই সে আকারে ইঙ্গিতে মাথা লুটিয়ে বার বার নমস্কার করে বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে একটা কাঠের পুতুল মাত্র; তার একটি কানা কড়ি নেই।

লোক দুটির পরনে কয়লার ছালা, মুখ সবটা ঢাকা, শুধু দুটি চোখ দেখা যাচ্ছিল। তারা বললে, 'ওসব ন্যাকামিতে চলছে না—চটপট টাকা বার করো, নইলে প্রাণ যাবে।' প্রতিধ্বনির মতো তার সঙ্গী বলে উঠল, 'প্রাণ যাবে।'

'তাতেও যদি না হয়, তোকে মেরে তোর বাপকেও খুন করব।'—'বাপকেও খুন করব।'

হায় হায় করে কেঁদে উঠে পঞ্চু বললে, 'ওগো, আমার বাবাকে তোমরা মেরো না, সে বুড়ো মানুষ তাকে মেরো না, মেরো না।' কথা কয়ে ওঠবামাত্র পঞ্চুর মুখের মধ্যে মোহরগুলো টুনটুন করে বেজে উঠল। আর যাবে কোথা! তখন ডাকাতরা পঞ্চুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'বটে রে ব্যাটা! বোবা সাজা হয়েছিল! জোচ্চোর কোথাকার! শীগগির টাকা ফেল বলছি।'

পঞ্চু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখন তারা বললে, 'বোবা ছেড়ে এখন কালা হয়েছিস বুঝি! দাঁড়া তবে!' এই না বলে একজন ধরলে তার নাক আর একজন ধরলে থুতনি, একজন টান দিতে লাগল

উপরের দিকে, অন্যজন নীচে। কিন্তু অনেক টানাহেঁচড়াতেও কোনো ফল হল না—পঞ্চুর মুখ যেন পেরেক-আঁটা কৌটোর মতো বন্ধ হয়েই থাকল।

তখন ডাকাতের মধ্যে যে বেঁটে সে একখানা ছুরি বার করে পঞ্চুর মুখের মধ্যে ছুতোরের বাটালির মতো ঢুকিয়ে দিয়ে চাড়া দিতে লাগল। পঞ্চু তখন বিদ্যুতের মতো তাড়াতাড়ি তার হাত দুখানি ধরে ফেললে। হাত ধরেই সে শিউরে উঠল—ওমা, এ তো মানুষের হাত নয়, এ যে বেড়ালের থাবা। পঞ্চুর লম্বা লম্বা কাঠের নখগুলো এবারে কাজে এল ; বেড়ালটাকে সে এমনি আঁচড়াতে লাগল যে সে আর তাকে ধরে রাখতে পারল না। ছাড়া পেয়েই পঞ্চু প্রাণপণে দৌড় দিল, বেড়া পার হয়ে, খাল বিল ডিঙিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলল, পিছন পিছন ডাকাত দুটিও ছুটল।

সামনে মস্ত চওড়া ঘোলা জলে ভরা নালা—এক-দুই-তিন বলে পঞ্চু ঝাঁপ দিয়ে ওপারে পৌঁছল। ডাকাত দুজন লাফ দিতে গিয়ে ঝপাত করে সেই ঘোলা জলের মধ্যে পড়ে গেল। পঞ্চু সেই ঝপাত শব্দ শুনে আর তাদের হাবুডুবু খাওয়া দেখে দৌড়তে দৌড়তে হেসে চীৎকার করে বললে, 'ভালো ডাকাত বাবুরা, বেশ ডুব দিয়েছ।' তার তখন বিশ্বাস হল আপদ দুটো ডুবে মরেছে। কিন্তু একটু পরে ফিরে দেখে কী, মরা দূরে থাকুক, দুটোই আবার তার পিছু পিছু দৌড়ে আসছে—ছালার পোশাক বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। দূরে একটা বাড়ি দেখে পঞ্চু ভাবলে যদি কোনোরকমে ওইখানটাতে পৌঁছতে পারি তবেই রক্ষা। ছুটতে ছুটতে দুয়ারের কাছে পৌঁছেই খুব জোরে ঘা দিলে, কিন্তু কারো সাড়া পেলে না। বাঁচি কি মরি বলে সে দুয়ারের গায়ে ধমাধম ধাক্কা লাগাতে লাগল। তখন জানালার কাছে একটি সুন্দর মেয়েকে দেখতে পেলে। মুখখানি তার মোমের মতো সাদা, চুলগুলি মেঘের মতো ঘন নীল, চোখ দুটি বুজে আছে, হাত দুখানি বুকের উপর জড়ো করা। ঠোঁট দুখানি তার আদপেই নড়ল না, কিন্তু কথা শোনা গেল, 'এ বাড়ির সবাই মরে গেছে।'

পঞ্চু তখন চেঁচিয়ে বললে, 'তবে তুমিই না হয় দরজাটা খুলে দাও।'

উত্তর এল : 'আমিও মরে গেছি'। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে জানালাটিও বন্ধ হয়ে গেল। 'খোলো—' পঞ্চুর কথা আর শেষ হল না, দুই দস্যি এসে তার টুঁটি চেপে ধরে বললে, 'আর পালাতে হচ্ছে না।' পঞ্চু বেচারীর কাঠের শরীর তখন এমনি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল যে তার মুখের মধ্যে মোহরগুলোও বেজে উঠল। তখন ডাকাত দুটো বললে, 'এবারে মুখ খুলবি কিনা।' এই না বলে ক্ষুরের মতো ধারালো একটা ছোরা বার করে তার বুকে বিঁধিয়ে দিতে গেল, কিন্তু পঞ্চুর ভাগ্যি যে তার শরীরটা ছিল খুব শক্ত কাঠের—ছুরিটা মট্ করে ভেঙে গেল।

তখন ডাকাত দুটো বললে, 'ছুরির কর্ম না, এটাকে ফাঁসিতে লটকাতে হবে।' আর দেরি না করে পঞ্চুর হাত দুটো লম্বা করে একটা বটের গাছে বেঁধে, গলায় ফাঁস দিলে। 'আচ্ছা, এখন তবে বিদায় হওয়া যাক। বিশ্রাম হলে পর যখন ফিরে আসব তখন তুমি একদম মরে থাকবে, মুখটা হাঁ হয়ে থাকবে, আমরা এসে অনায়াসে মোহর কটা বার করে নিতে পারব।' এই বলে তারা পঞ্চুকে গাছের ডালে লটকিয়ে ঝোপের মধ্যে পালিয়ে গেল। বাতাসের ধাক্কায় দুলতে দুলতে [illegible]

লাগল—পঞ্চু আর নিশ্বাস ফেলতে পারে না। ক্রমে তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল,—প্রাণ বুঝি আর থাকে না। তখন তার আপন বাপকে মনে পড়ল। মরছে মনে করে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—'বাবা গো, তুমি যদি এখানে থাকতে!' বলতে বলতে পঞ্চুলাল অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

সুন্দরী মেয়েটি আবার একবার জানালার কাছে এসে, যখন দেখলে বেচারী পঞ্চুর ফাঁসি হয়েছে, তখন তার বড় দয়া হল। হাত দুটি একত্র করে সে তিনবার হাততালি দিতেই একটি মস্ত চিল এসে নমস্কার করে বললে, 'মা লক্ষ্মী, কী চাও তুমি?'

সুশ্রী মেয়েটি যে সে নয়—তিনি এই বনেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর নাম শ্যামা বনশ্রী।

বনশ্রী বললেন—'দেখো শ্যেন, তুমি এক্ষুনি যাও, তোমার ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঐ ফাঁসির গাঁট কেটে পঞ্চুলালকে নামিয়ে, ঘাসের উপর শুইয়ে দাও।'

চিল তখনিই উড়ে গেল আর একটুখানি পরে ফিরে এসে বললে, 'মা লক্ষ্মী, তোমার আদেশমত কাজ করেছি।' বনশ্রী আবার দুবার হাততালি দেবামাত্র, গায়ে বড় বড় লোম, মস্ত একটি কুকুর এসে হাজির হল। সে কিন্তু মানুষের মতো দুই পায়ে চলে, কোচম্যানের মতো জামা-

জোড়া পরা, আর পাগড়িধারী। বনশ্রী বললেন, 'যাও তো মহেন্দ্র, পঞ্চুলালকে নিয়ে এসো।' অবিল
ছোট্ট একখানি সুন্দর গাড়ি আস্তাবল হতে বেরিয়ে এল, মহেন্দ্র হুঁশিয়ার কোচম্যানের ম
কোচবাক্সে চড়ে বসল। একটু পরেই পঞ্চুলালকে সুদ্ধ গাড়ি ফিরে এল। বনশ্রী পঞ্চুলালকে বিছান
শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডেকে পাঠালেন। ডাক্তার মশায়রা কাছেই থাকতেন, আসতে দেরি হল ন
একজন হচ্ছেন কাক, অন্যটি পেচক, তৃতীয় জনের নাম ঝিল্লী চক্রবর্তী। বনশ্রী বললেন, 'মহাশয়
দেখুন তো, ও পঞ্চুলাল জীবিত, কি মৃত।'

কাক এগিয়ে এসে প্রথমে পঞ্চুর নাড়ী, তারপর নাক, তারপর ডান পায়ের কড়ে আ
মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে বললে, 'আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে এ রোগী সম
মৃত, তবে যদি দুর্ভাগ্যবশত না মরে থাকে, তবে সম্ভবত জীবিত আছে।' তারপর পেচক মহা
বললে, 'ডাক্তার কাকের মতের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কেন না তিনি জ্ঞানী এ
যশস্বী, তাঁর পসার খুব বেশী। আমার মতে পঞ্চু এখনও জীবিত, কিন্তু দৈবাৎ যদি মরে থাকে ত
সেটা তার মৃত্যুর চিহ্ন বলেই ধরে নিতে হবে।'

ঝিল্লী ঝাঁঝালো স্বরে বললে, 'এ বিষয় নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না, তবে রোগীকে আমি প
দেখেছি, আমি একে ভালো করেই জানি! ওটি একটি পাকা বদমায়েশ, অকর্মা, ভবঘুরে।' পঞ্চু এ
বার চোখ খুলে আবার বন্ধ করলে, 'এই অবাধ্য ছেলেটার ব্যবহারে তার বাপের মনে এমনি ব
লেগেছে যে মন-মরা হয়ে সে মরেই যাবে।' পঞ্চু এসব কথা শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ক
গম্ভীর স্বরে বললে, 'মরা রোগী যখন কেঁদে ওঠে তখন বুঝতে হবে সে বাঁচবার পথে আসছে।' ডাক্
পেচক ঘাড় নুইয়ে বললে, 'আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু আমার মতে
রোগী যখন কাঁদে তখন বুঝতে হবে তার বাঁচবার আশা কম।' তিন ডাক্তার বিদায় হয়ে গেলে ব
একগ্লাস জলে একটা সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে পঞ্চুর মুখের কাছে ধরে স্নেহের সুরে বললেন, 'পঞ্চু,
ওষুধটা খাও তো দেখি, তাহলেই সেরে উঠবে।' পঞ্চু গেলাসটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকা করল, তা
ভুরু কুঁচকে কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, 'ওষুধ তেতো না মিষ্টি?'

'তেতো—কিন্তু খেলে তোমার উপকার হবে।'

'তেতো ওষুধ আমি খেতে পারব না—না না, ও আমি খাব না।'

'আমার কথা শোনো, লক্ষ্মীটি খাও। তাহলে মিছরি পাবে।'

'মিছরি কোথায় দেখি?'

একটা সোনার বাটি থেকে এক টুকরো মিছরি তুলে বনশ্রী পঞ্চুকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে মিছ

পঞ্চু বললে, 'আমায় আগে মিছরি দাও—তাহলে আমি তোমার তেতো পাঁচন খাব।'

'ঠিক বলছ খাবে?'

'হাঁ আমি খাব।' বনশ্রী তার হাতে মিছরি দেবামাত্র পঞ্চু সেটা কড়মড়িয়ে খেয়ে জিভ
ঠোঁট চাটতে লাগল।

বনশ্রী বললেন, 'নাও, এবারে ওষুধটা খেয়ে ফেলো।' পঞ্চু ওষুধের গেলাস নিয়ে একবার সেটা শুঁকলে তারপর বললে, 'তেতো তেতো গন্ধ করছে—আমায় আর একটু মিছরি দাও, তবে আমি খাব।'

বনশ্রী আর একটুকরো মিছরি তার মুখে দিয়ে ওষুধটা আবার মুখের কাছে ধরলেন। পঞ্চু বললে, এমন করে আমি খেতে পারছি নে।'

'কেন?'

'পায়ের কাছের বালিশটা আমায় বড্ড জ্বালাতন করছে।'

বনশ্রী বালিশটা সরিয়ে দিলেন। তাতেও হল না। পঞ্চু বললে,—'ঐ দুয়োরটা যে আধখানা খোলা আছে, ওটা আমায় ভারী বিরক্ত করছে।' বনশ্রী গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এলেন।

তখন আর কোনো ছুতো না পেয়ে পঞ্চু কেঁদে উঠে বললে, 'আমি তেতো জল খেতে পারব না, পারব না—কিছুতেই পারব না।'

'বাছা, এখন খাচ্ছ না, পরে কিন্তু অনুতাপ করতে হবে।'

'তা হয় হবে।'

'তোমার যে শক্ত ব্যামো—ওষুধ না খেলে সারবে না তো।'

'তা না হয় নাই সারবে।'

'তুমি কি মরতে ভয় কর না?'

'মরি মরব—ওষুধ খাব না।' যেমনি এই কথা বলা, অমনি দরজাটা ধড়াম করে খুলে গেল, চারটে কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড বেড়াল একখানা ছোট্ট খাটিয়া ঘাড়ে করে সেখানে এসে বললে, 'তৈরী হও—তোমায় নিতে এসেছি।'

'আমায় নিতে কেন? আমি তো এখনো মরি নি।'

'একটু বাদেই মরবে—ওষুধ যখন খেলে না, তখন মরবে নিশ্চয়।'

পঞ্চু চেঁচিয়ে উঠল, 'ওগো মা গো, কোথায় গেলে গো, শীগগির ওষুধ দাও।'

এবারে পঞ্চু এক চুমুকে চোঁ চোঁ করে ওষুধ শেষ করে ফেললে। বেড়ালরা খাটিয়াটা আবার কাঁধে তুলে গজগজ করে বকতে বকতে চলে গেল।

একটু পরেই পঞ্চু লাফিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল, তার অসুখ তখন একেবারে সেরে গিয়েছে। পঞ্চু ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে দেখে বনশ্রী হেসে বললেন, 'তবে দেখো, ওষুধে তোমার উপকার হয়েছে।'

পঞ্চু বললে, 'এরপর বলতে না বলতেই ওষুধ খেয়ে ফেলব—কালো বেড়ালগুলোর কথা মনে রইল তো।'

'মোহর চারটে কোথায় রাখলে?'

পঞ্চু একটা মিছে কথা বলে ফেললে। মোহর চারটেই তার পকেটে ছিল, সে কিন্তু চট করে বললে, 'হারিয়ে গিয়েছে।' এই মিছে কথা বলামাত্র পঞ্চুর নাকটা দু আঙুল বেড়ে গেল।

'কোথায় হারালে?'

'এই বাড়ির কাছে বনে।'

'তাহলে ভাবনা নেই, কেননা এ বনে যা হারায় সব ফিরে পাওয়া যায়।'

পঞ্চু কী ভেবে আবার বললে, 'না না, বনে হারায় নি, মুখের মধ্যে রেখেছিলাম, ওষুধ খাবার সময় গিলে ফেলেছি।'

বার বার তিনবার মিথ্যে কথা বলবার পর পঞ্চুর নাক লম্বা হতে হতে এতই লম্বা হয়ে গেল যে, সে আর নড়তে পারে না। যে দিকে ফেরে সেই দিকেই নাকটা গিয়ে দেয়ালে আটকে যায়—একবার খাটে, একবার জানালায়, একবার দরজায় গিয়ে ঠোক্কর লেগে লেগে নাকটা তুবড়ে যাবার গতিক হয়ে উঠল। বনশ্রী কিছু না বলে খুব হাসতে লাগলেন। পঞ্চু ফাঁপরে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'অত হাসছ কেন?'

বনশ্রী হেসে বললেন, 'তুমি যে মিছে কথা বলেছ তাই হাসছি।'

'তুমি কী করে জানলে আমি মিছে কথা বলেছি?'

'আমার কাছে কিছু লুকোনো থাকে না। দু রকমের মিছে কথা আছে—কতকগুলোর পা খাটো, যে মিছে কথা সে বলে সে ক্রমেই বেঁটে হতে থাকে। অন্য রকমের মিথ্যে কথায় নাক কেবলই বেড়ে বেড়ে চলে। তোমার মিথ্যে লম্বা জাতের, তাই নাক শুধু শুধুই বাড়ছে।' লজ্জায় পঞ্চু ঘর হতে দৌড় দিয়ে পালাতে গেল, পারল না—যে দিকে যায় সেই দিকেই আটকে পড়ে। আধঘণ্টা ধরে পঞ্চু খুব চেঁচামেচি করে কাঁদতে লাগল, কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলে ঢিপি হল, চেহারাটা একেবারে বিশ্রী হয়ে গেল। তখন বনশ্রীর মায়া হল। তিনি আবার হাততালি দিলেন, অমনি হাজার হাজার কাঠ-ঠোকরা এসে, পঞ্চুর নাকের উপর গিয়ে পড়ে, এমনি উৎসাহে ঠোকর দিতে লাগল যে দু-চার মিনিটের মধ্যেই পঞ্চুর নাক আবার যেমন ছিল তেমন।

চোখ মুছে পঞ্চু বনশ্রীকে বললে, 'তুমি বড় ভালো, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি।'

বনশ্রী বললেন, 'আমিও তোমার খুব ভালো বাসব, যদি তুমি আমার কাছে লক্ষ্মী হয়ে থাক।'

'আমার যে বাবা আছেন তাঁর কী হবে?'

'আমি তোমার বাবাকে বলে পাঠিয়েছি, তিনি একটু পরেই আসবেন।'

'সত্যি? তুমি তো খুব লক্ষ্মী দিদি। তবে আমি যাই, আমার বাবাকে এগিয়ে নিয়ে আসি।'

'যাও, কিন্তু সাবধান! পথ হারিয়ো না যেন। বনের ঠিক মাঝখান দিয়ে যে পথ গেছে, তাই ধরে যদি যাও, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

[ক্রমশ

ছবি আঁকা

ছবি আঁকার আসল মজাই হল তার কোনো নিয়মকানুন থাকে না। সত্যিকার শিল্পী তাঁর নিজের চোখে যাকে যেমন দেখেন তেমনি আঁকেন, তাতে লোকে প্রশংসা করল কি নিন্দা করল—তাতে তাঁর এসে যায় না। সব দেশে সব কালে এমন শিল্পী জন্মান, যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের গুণে অমর হয়ে থাকেন; তাঁদের আঁকা ছবিগুলিকেও তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলেই গ্রহণ করতে হয়।

তার চেয়েও বড় কথা আছে।

লেখার চেয়ে আঁকার জোর অনেক বেশি এইজন্যে যে, আঁকা বুঝতে হলে কোনো ভাষা শেখবার দরকার হয় না। ইতিহাস রচনা হবার বহু আগে নানান দেশের আদিম লোকেরা পাহাড়ের গুহার গায়ে যে ছবি এঁকে গেছে তাই দেখে আজকের দিনেও সেকালের জীবনযাত্রার কথা জানতে কারও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। একজোড়া চোখ থাকলেই যথেষ্ট। ছবির রাজ্য দেশ-কালের ধার ধারে না। তাই তার এত শক্তি। এক-এক দেশের এক-একজন চিত্রকর যে ছবি এঁকে যান, পৃথিবীর সব মানুষ চিরকাল তার শিক্ষার ও আনন্দের আস্বাদ পেতে পারে। তার আর শেষ থাকে না। সেইরকম একজন চিত্রকরের কথা শোনো। ১৮০৪ সালে হকুসাই নামে বছর পঁয়তাল্লিশের একজন জাপানী চিত্রকর বললেন যে তিনি জাপান দেশের সবচেয়ে বিরাট ছবি আঁকবেন। এই বলে পুরু কাগজ জোড়া দিয়ে-দিয়ে তিনি ২২৫০ বর্গ-ফুট মাপের একটা আঁকবার জায়গা তৈরি করলেন। তারপর কাগজটার এক মাথা একটা কাঠের কড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলেন, যাতে আঁকা শেষ হলে, দড়ি দিয়ে কড়িটাকে টেনে তুলে সম্পূর্ণ ছবিটাকে ঝুলিয়ে রাখা যায়। আর নীচের দিকটা পাথর চাপা দিয়ে টান করে রাখা হল। তারপর প্রকাণ্ড হাঁড়া আর চাড়িতে রং গোলা হল, কয়েকটা ঝাঁটা কেনা হল, ডাণ্ডার আগায় ন্যাকড়া জড়িয়ে আরো কিছু আঁকবার তুলি বানানো হল। সব জোগাড়যন্ত্র হলে পর, কিমোনোটি কোমরে জড়িয়ে নিয়ে, চটি খুলে, হকুসাই দৌড়োদৌড়ি করে ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন।

ছবি হল—জাপানীদের বড় শ্রদ্ধা-ভালোবাসার ঋষি দীরুমার।

সন্ধ্যের আগেই ছবি শেষ হলে, দড়ি দিয়ে কাঠের কড়িটাকে তোলা হল। ষাট ফুট উঁচু ঋষির ছবির মুখটাই এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে একটা আস্ত ঘোড়া অনায়াসে চলে যেতে পারত।

চারদিকে লোকে লোকারণ্য, সবার মুখে হকুসাইয়ের প্রশংসা ছাড়া কথা নেই। তারপর হকুসাই একজোড়া চড়াই পাখির ছবিও এঁকেছিলেন, সে আবার এত ছোট যে চোখে দেখতে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস লাগে।

আরেকবার সম্রাট তাঁর শিল্পের নমুনা দেখতে চাওয়াতে, হকুসাই একটা দরজার পাল্লা খুলে নীল কালিতে ডুবিয়ে নিলেন। তারপর একটা মোরগ ধরে, তার পা দুটি লাল কালিতে ডুবিয়ে, তাকে নীল

দরজার উপর ছেড়ে দিলেন। নীল দরজা মোরগের লাল পায়ের ছাপে ভরে গেল, যেন জলের উপর মেপ্‌ল্‌ গাছের পাতা ভাসছে। তখন 'তাতসুতা নদীর নীল জলে হেমন্তকালের পত্রগুচ্ছ' এই নাম দিয়ে রাজসভায় ছবিখানি পাঠানো হল।

বাস্তবিক হকুসাই ছিলেন অসাধারণ গুণী। কাঠের ব্লক দিয়ে জাপানের প্রাচীন নিয়মে দৈনন্দিন জীবনের ছবি ছাপতেন, আঁকতেন। এই শিল্পকে বলে 'উকিয়ো-এ'; খুব পুরোনো সূক্ষ্ম শিল্প, লোকে তাকে ভুলে যেতে বসেছিল। হকুসাইয়ের হাতে এই ছবি যেন নতুন প্রাণ পেল।

সব চাইতে মজার কথা হচ্ছে যে সাধারণ লোকে যে বয়সে কাজকর্ম ছেড়ে একটা জড়ভরত হয়ে যায়, হকুসাই সেই বয়সে তাঁর সবচেয়ে ভালো ছবিগুলি এঁকেছিলেন, অর্থাৎ আশী পেরিয়ে।

হকুসাই ত্রিশ হাজার ছবি এঁকেছিলেন বলে শোনা যায়, কিন্তু সারা জীবন দারিদ্র্যে কাটিয়েছিলেন, কারণ পয়সাকড়িকে তিনি ঘৃণা করতেন। দু বার বিয়ে করেছিলেন, ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি হয়েছিল, তবে তাঁর মেয়ে ওয়ে-ই ছাড়া কারও তেমন প্রতিভা ছিল না। এই মেয়েটিও চমৎকার 'উকিয়ো-এ' শিল্পী ছিলেন। ওয়ে-ই শেষ বয়স পর্যন্ত বাপের যত্ন করতেন। আশী বছর বয়সে হকুসাই একদিন কেঁদে আকুল, এত কাল এত সাধনা করেও, সত্যিকার জিনিসের মতো ছবি আঁকতে শিখলাম না। প্রায় নব্বই পৌঁছে মৃত্যুশয্যায় শুয়েও হকুসাই এই বলেই দুঃখ করেছিলেন—আরও যদি দশ, কিংবা অন্তত পাঁচ বছর বাঁচতাম তা হলে সত্যিকার শিল্পী হতে পারতাম!

'মাঙ্গা' বলে হকুসাইয়ের পনেরাটি ছবির বই আছে; তাতে কী যে নেই বলা শক্ত। হাজার হাজার মানুষ, ফুল, ভূত, সমুদ্রের কাঁকড়া, ডুবুরি, ঘোড়া সাঁতরাচ্ছে, বাড়িঘর, বুনো জানোয়ার, ছিগির, পৌরাণিক কাহিনীর ছবি—সব পাওয়া যায় এই বইগুলিতে। যা দেখেছেন, যা শুনেছেন বা ভেবেছেন, ঠিক যেমনটি হয় তেমন করে এঁকে রেখেছেন। তা ছাড়া আরো বহু ছবি আছে: এক পরম্পরকে ফুজিয়ামার দৃশ্য, সমুদ্রের ঢেউ, যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখেছেন। একটা অপূর্ব ছবিতে একদল অন্ধ ধরাধরি করে একটা ছোট নদী পার হচ্ছে; এ ছবি একবার দেখলে আর ভোলা যায় না।

পঁচাত্তর বছর বয়সে হকুসাই লিখেছিলেন:

'ছয় বছর বয়স থেকে জিনিসের ছবি আঁকি। পঞ্চাশ বছর কত যে নকশা এঁকেছি তার ঠিক নেই, কিন্তু সত্তরের আগে পর্যন্ত যা এঁকেছি তার কোনো মূল্যই নেই। তিয়াত্তর বছর বয়সে জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা, মাছ-পোকা, কোন্‌টার কেমন গড়ন একটু একটু বুঝতে পারলাম। আশী হলে আরেকটু উন্নতি করব। নব্ব্‌ই বছরে সৃষ্ট জিনিসের রহস্যটি জানতে পারব। আর একশো দশ বছর বয়সে যাকিছু আঁকব, ছোট একটি বিন্দু কিংবা একটি রেখা হলেও, তার মধ্যে প্রাণ থাকবে।'

দুঃখের বিষয়, অতদিন আর বাঁচেন নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল উননব্বই, তখনও তিনি চমৎকার ছবি আঁকতেন।

এক যে ছিল ডাইনি

বিনোদ বেরা

এক যে ছিল ডাইনি,
রাত্রি হলে বলত—আমি বছর পাঁচেক খাই নি।
জুড়ত বিষম কান্না—
হুতোম পেঁচা বলত তারে : আর না বুড়ি, আর না
চেঁচামেচির শব্দে তোমার রাত্রি গেছে থমকে,
ঘুমের ভিতর খোকা খুকু উঠছে বিষম চমকে,
থাম রে, বুড়ি আর না—
থামাও তোমার চেঁচামেচি, থামাও তোমার কান্না।
ডাইনি তবু থামত নাকো। তখন হুতোম পেঁচা
ধরত বিকট মূর্তি—বলত এবার বুড়ি চেঁচা!
ভীষণ ভয়ে হারিয়ে দিক্‌দিশে
ডাইনি বুড়ি পালিয়ে যেত অন্ধকারে মিশে॥

ভেলকির গল্প

ছবি ও লেখা ।। **শিবানী রায়চৌধুরী**

আমি যত লোকদের চিনি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান আর লেখাপড়াজানা লোক হচ্ছে করমলাল কচকচি। তার মতো লোক আমি দুটো দেখি নি। পয়লা নম্বর কয়লাপট্টি লেনে থাকে। নাকে চশমা, কানে পেন্সিল, বুকপকেটে নোটবই, পাশ-পকেটে পেরেক আর এক হাতে হাতুড়ি, ডান কাঁধে ডিকসোনারি আর বাঁ কাঁধে শব্দকোষ, মেজাজখানা কড়কড়ে। সুযোগ পেলেই লোকের মাথায় পেরেক ঠুকে ঠুকে কঠিন কঠিন শব্দ এঁটে দেয়। একবার করমলাল মুখ খুললে তার কচকচি থামায় কার সাধ্য। এক নিশ্বাসে বলতে থাকবে—'কাংস-কাকলী-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ক্যাসান্নাক্কা-কামচকাটকা-কাকস্য পরিবেদনা। এসব শুনলে কেউ এর মানে বুঝবে না। অথচ সব কথাই বড্ড চেনা ঠেকবে।

ওর একটা আদরের কুকুর আছে। তার নাম ভেলকি। ও কেবল কুকুরই নয়, আবার মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান। ওর বিখ্যাত ম্যাজিক হচ্ছে হাওয়াইবাজি। এই ম্যাজিক দিয়ে ভেলকি সব জিনিস হাওয়া করতে পারে। এ ছাড়া ওর এমন জ্ঞানপিপাসা যে অচেনা জিনিস দেখলে মচমচিয়ে খেয়ে ফেলে। আর সেগুলো না খেতে দিলে মন্তর-তন্তর পড়ে তাদের হাওয়া করে দেয়। এমনি জিনিসপত্তর হাওয়া করে চারদিকে ও বেজায় অসুবিধে তৈরি করে। এই তো কদিন আগে সকালবেলা ভেলকি এসে হাজির। মুখটা কাঁচুমাচু, ঘাড় হেঁট করে বলল : বড্ড খিদে।

আমি বললাম, কী খাবি? বিস্কুট, না কাটলেট?

ঠিক এমনি সময় টেবিলের টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং…করে বেজে উঠল। তাই ভেলকি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, ওটা খাব। কখনো খাই নি। কেমন খেতে ?

আমি তাড়াতাড়ি ওকে সামলে নিয়ে বলি, ভাই ভেলকি, ওটা খাস না। খেলে তোর মাথা ঘুরবে, কানের কাছে কারা যেন বিড়বিড় করবে। অন্য কিছু খা। কী খাবি, কোন্ দোকানে খাবি বল ? সাহেবী দোকানের কেক খাওয়াব। একটু দাঁড়া।

তা কে কার কথা শোনে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ভেলকি বিষম রেগে বলে ফেলল, গ…হুশ…হু…হু…হাওয়া…। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল থেকে টেলিফোনটা হাওয়া। আমি আর টেলিফোনটা দেখতে পেলাম না। কিন্তু সারাদিন ক্রিং…ক্রিং…বাজনা শুনলাম।

এইসব বদখট ম্যাজিক দেখাতে ভেলকিটা ওস্তাদ। তাই আমি ওর ধারেকাছে যেতে চাই না।

ভেলকির সঙ্গে করমলালের কবে কোথায় দেখা সে কথা ওরা কেউ বলতে চাইত না। আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করত কী করে এই মানিক-জোড়ের আলাপ হল (অবশ্য কথায় বলে রতনে রতন চেনে)। কিন্তু খুব কষ্টের কথা—এই দুই জনেরও একদিন বিচ্ছেদ ঘটল।

কচকচি আর ভেলকি একবার বেড়াতে গিয়েছিল। কচকচি সেই বেড়ানোটাকে গল্পের মতো করে লিখেছিল আর ভেলকি তার জাদুমন্তর দিয়ে সেটাকে যতটা পেরেছিল আজগুবি করে দিয়েছিল। গল্পটা ছিল—অ্যাডভেঞ্চার ইন আইল্যাণ্ড।

কচকচি লিখেছে :

একবার পুজোর ছুটিতে আমি আর ভেলকি বেড়াতে যাব ঠিক হল। বন্ধুরা বলল, একা যাও সেও ভালো। ভেলকিকে নিয়ে যেও না। ওকে নিয়ে গেলেই নির্ঘাত রাস্তা হারাবে। আর দেশে ফিরতে হবে না।

আমি ভালো কথায় কোনদিনই কান দিই না। তাই ওসব না শুনে বললাম, ভেলকির মতো জাদুকর থাকতে ভাবনা কী ? আমরা তো উড়ো-জাহাজে করে যাব। রাস্তায় কোনো বিপদ হলেই ভেলকি সেগুলো হাওয়া করে দেবে ! তার পর আমাদের প্লেন সোজা রাস্তা পেয়ে যাবে।

ভেল্কি কান দুলিয়ে বলল : কুছ পরোয়া নেই। কিছু খাবার-জিনিস আর মারামারি করবার মতো কয়েক ডজন ব্লেড আর ছুরিকাঁচি নিলেই চলবে।

ভেলকি বলল, আচ্ছা, প্লেনটা চালাবে কে ?

আমি বললাম কেন, সোজা রাস্তায় আমি আর বাঁকা রাস্তায় জাদুকর ভেলকি। ভেলকি তো খুশী হয়ে মাটিতে খানিক গড়াগড়ি খেল।

আশ্বিন মাসের পয়লা তারিখে আমরা রওনা হলাম। বেরোবার মুখেই টিকটিকি আর চামচিকে হ্যাচ্চো…হ্যাচ্চো করে উঠল। কারণ, ওদের সঙ্গে নিলাম না। বুঝলাম অযাত্রা। ভেলকি বলল, অযাত্রা না হলে অ্যাডভেঞ্চার হয় না। বেড়ানো যত গণ্ডগোল-ছাড়া, মজা তত কম। ওর কথা শুনে প্লেনটা ছাড়লাম। বললাম, ভেলকি, হাওয়াই দ্বীপে যাওয়া যাক। বেশ কাব্য করা যাবে। ভেলকি বলল, না কাব্য-টাব্য নিজের ঘরের জানলার ধারে বসেই করো। চলো, সাইবেরিয়া যাই। খুব শিকার করা যাবে। এই বলে সে জিভ চাটতে লাগল। আমি চুপচাপ প্লেন চালিয়ে যাচ্ছি। ভেলকি

জানলা দিয়ে মুখে বাড়িয়ে আপন মনে গান গাইছে। সারাটা দিন এইভাবে চলল। আকাশে মেঘের ঠোকাঠুকি দেখলাম। নীল সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ দেখলাম। ভেলকি বারদুয়েক আপন মনে বলল, আহা···আহা···। লেখাপড়াজানা কুকুর তো! এসব জিনিস ভালো না লেগে যায়!

সন্ধের পর ভেলকি বলল, কচকচি, তুমি ঘুমোও। এবার আমি চালাই। রাত্তিরে অনেক ঝক্কি। তোমার মতো পণ্ডিতে এসব পারবে না।

সারারাত আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে ভেলকি বলল, নীচের দিকে তাকাও। তাকিয়ে দেখি হলুদ বন। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, চোখে সর্ষেফুল দেখছি নাকি?

ভেলকি বলল, ভয় কী, এটা সর্ষেখেত। এরপর শেয়ালকাঁটার জঙ্গল। তার উত্তরে ফণি-মনসার বন। তারপর একটু গেলেই জংলীল্যাণ্ড

আমি বললাম, এ দেশটার নাম তো বইে পড়ি নি।

ভেলকি বলল, সব কথা কি বইতে থাকে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হয়।

যাইহোক জংলীল্যাণ্ডে তো পৌঁছনো গেল সেই কাঁটাঅরণ্যে প্লেন যদিবা থামল তো না কার সাধ্য। ভেলকিটা প্লেনের ভেতরে ছটফ করতে লাগল আর বলল, কেন যে এবার পুজো লোহার বর্ম নিলাম না। তা হলে আর প্লেনে মধ্যে বসে থাকতে হত না। আমি বাইরে যতটা পারা যায় দেখতে লাগলাম।

এমন সময় একদল কুকুর-বেড়াল-পাখি একটা রেলগাড়ি করে এল। তাদের রেলটা সাপে মতো ফোঁসফোঁস আওয়াজ করছিল। আমার ভ গা ছমছম করছিল। তা ভেলকিকে ফিসফিস ক কী সব বলল। ভেলকি ঘাড় দুলিয়ে তার জব দিল। দুটো জন্তুদের মা সজারু কাঁটার জামা দিল একটা ভেল্কির গায়ে ঠি মত হল। কিন্তু আমার গা হল না। ভেলকি এ লাকে প্লেন থেকে নে বলল: যাই, কচক তুমি বাড়ি ফিরে যা এখানে তোমার পোষা না। আমি রইলাম।

আমার লেখা 'মন্তু কুলের কাহিনী'টা এখানে
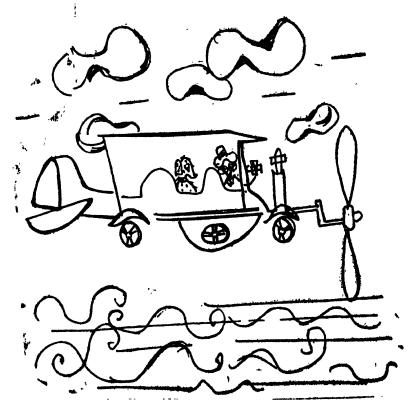
পে ফেলব। তোমাকেও এক কপি পাঠাব। সছে ডাকে সব খবর পাবে। তখন তুমি ্যাড্‌ভেঞ্চার ইন্‌ জংলীল্যাণ্ড'টা লিখে ফেলো। র কী? চলি। সোজা উত্তরমুখো গেলে ঠিকমত ড়ি পৌঁছে যাবে।

আমি মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে এলাম। এতকালের বন্ধুকে রেখে এলাম।

ভাবছি ভেলকি এখন কেমন আছে। হাজার হোক নিজের দেশ তো, ভালোই আছে।
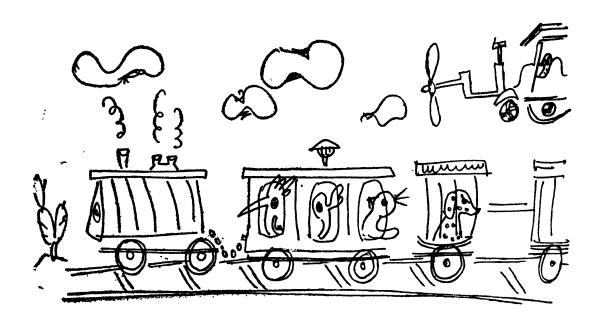
পাখির গান

উপেন্দ্রকিশোর রায়

কত পাখি আছে, তাহা কহো মোর কাছে।
আহা, কতমতো সাজে তারা ফেরে ধরামাঝে॥
তারা বলে কত বুলি, তারা করে কত খেলা,
দুখ নাহি কারো মনে, কারো কাজে নাহি হেলা॥
নাচে খঞ্জন বাটে মাঠে, আর কোকিল গাহে ডালে,
আর কিবা মনে করে কাক বসে আছে চালে!
মুনিঠাকুরেরই মতো বক থাকে ঝিম ধরে,
মাছ এলে মুখ মেলে তারে গেলে কপ করে॥
কহে হুতোমেরে প্যাঁচা, 'মুই বলি শোনো চাচা,
এই যে হাঁড়িমুখে দাড়ি, এর বাহার বড় ভারি।'
শামা বুলবুল গাহে বনে, মিলি দয়েলের সনে
এসে চড়াই ঘরে বড়াই করে শঙ্কা নাহি মনে॥
বলো শঙ্খচিল কেন যত ঘটি বাটি পাবে
আর গোদা বেটা কেন খালি ঘাড়ে লাথি খাবে?
কহো সে বা কোন্ পাখি যার বউ না কহে কথা?
কিবা নামটি তার চোখে যার বড্ড হায় ব্যথা?
বটে চালাক বড় শালিক, রাখে দুনিয়ার খবর,
আর ময়না কাকাতুয়া তারা কথায় বড় জবর।
তার গলে দোলে ঝোল্লা, গায়ে কালো আলখাল্লা,
রূপের কিবা হয় জিল্লা হাই তুললে হাড়গিল্লা!
আছে গগনবেড়ে, গৃধিনী, শাঁচানি, শকুনি,
পায়রা, ঘুঘু, ফিঙা, পানকৌড়ি, মাছরাঙা
কাঠঠোকরা, কাদাখোঁচা, হরবোলা, হাঁড়িচাচা,
টিয়া, টুনটুনি, টিঠি পাখি,—কহো কত আর বাকী!

'পাখির গানে'র স্বরলিপি

রাগিণী : বিভাস, তাল : দাদ্‌রা।

```
      +                  ০                  +                  ০
II { সা   —া   রা  |  —া   গা   পা  |  পা   —ধা   ধা  |  —া   ধা   —পা
   { ক    ০    ত       ০   পা   খী     আ    ০    ছে      ০   তা    হা

      +                  ০                  +                  ০
   | পা   —ধা  না  |  —া   ধা   পা  |  পা   —পগা  গা  |  —া   গা   গা
     ক    ০    হ       ০   মো   র্‌     কা   ০০   ছে      ০   আ    হা

      +                  ০                  +                  ০
   | গা   —ধা  ধা  |  —া   ধনা  ধা  |  পা   —ধা   পা  |  —া   ধা   পা
     ক    ০    ত           ম    ত      সা   ০    জে      ০   তা    বা

      +                  ০                  +                  ০
   | গা   —পা  গা  |  —া   রা   গা  |  রা   —া    সা  |  —া —া —া —া)} II
     ফে   ০    রে      ০   ধ    রা     মা   ০    ঝে      ০  ০  (০  ০)}

      +                  ০                  +                  ০
II { পা  পা | গপ  —া   গা  |  া   পা   ধা  |  ধা  —র্সা  র্সা | —া"  না   ধা  |
   { তা  রা   ব    ০    লে     ০   ক    ত      বু   ০    লি      ০   তা   রা

      +                  ০                  +                  ০
     পা   —ধা  না  |  —া   ধা   পা  |  পা   পগ   গা  |  —া } গা   গ
     ক    ০    রে      ০   ক    ত      খে   ০০   লা      ০ } দু   খ

      +                  ০                  +                  ০
   | গা   —ধা  ধা  |  —া   ধ্না  ধা  |  পা   —ধা   পা  |  —া   পধা  পা |
     না   ০    হি      ০   কা   রো     ম    ০    নে      ০   কা   রো

      +                  ০                  +                  ০
   | গা   —পা  গা  |  —া   রা   গা  |  রা   —া    সা  |  —া —া —া II
     কা   ০    জে      ০   না   হি     হে   ০    লা      ০—০—০

             +                 ০                 +                 ০
II   সা   সা | সা  —া   সা | —া   সা   রা  |  গা  —া   গা  |  —া   র্গা   রা
১।   না   চে   খ    ০   গু    ন্‌   ঘা   টে     মা   ০   ঠে      ০   আ    র্‌
২।   খ    ল    শ    ভ্‌   খ    ০   চি   ল্‌     কে   ০   ন       ০   য    ত
৩।   ক    হে   হ    ০   তো   ০   মে   রে     প্যাঁ  ০   চা      ০   মু    ই
৪।   ব    টৈ   চা   ০   লা   ক্‌   ব    ড়      শা   ০   লি      ক্‌  রা    খে
```

\+ ০ + ০
|গা —পা পা | —া পা পা | গা —রা সা | —া সা রা |
১। কো ০ কি ল গা হে ডা ০ লে ০ আ য়্
২। ঘ ০ টী ০ বা টী পা ০ বে ০ আ য়্
৩। ব ০ লি ০ শো না চা ০ চা ০ এই যে
৪। দুঁ ০ নি ০ য়া র খ ০ ব র্ আ য়্

\+ ০ + ০
|গা —পা পা | —া না না | ধা —না ধা |—পা পা গা |
১। কি ০ বা ০ ম নে ক ০ রে ০ কা ক্
২। গো ০ দা ০ বে টা কে ০ ন ০ খা লি
৩। হাঁ ০ ড়ি ০ মু খে দা ০ ড়ি ০ এ র্
৪। য় য়্ না ০ কা কা তু ০ য়া ০ তা রা

|সা —া সা | —া সা রা | গপা —া গা | —া II
১। ব ০ সে ০ আ সি চা ০ লে ০
২। ঘা ০ ড়ে ০ লা থি খা ০ বে ০
৩। বা ০ হা র্ ব ড় ভা ০ রি ০
৪। ক ০ থা য়্ ব ড় জ ০ ব র

II পা পা | পা —া গা | —া পা ধা | ধা —র্সা র্সা | —া র্সা র্সা
১। মু নি ঠা ০ কু ০ রে রি ম ০ স্ত ০ ব ক
২। ক হ সে ০ বা ০ কো ন্ পা ০ খী ০ যা র্
৩। শ্যা মা বু ল ব ল্ গা হে ব ০ নে ০ মি লি
৪। তা র্ গ ০ লে ০ দো লে ঝো ০ লা ০ গা য়ে

\+ ০ + ০
|র্সা র্রা র্রা | —া র্রা র্গা | র্গা —র্রা র্সা —া না ধা
১। থা ০ কে ০ ঝি ম্ ধ ০ রে | ০ মা ছ |
২। বৌ ০ না ০ কে য় ক ০ থা ০ কি বা
৩। দ ০ য়ে ০ লে র ন ০ নে ০ এ সে
৪। কা ০ লো ০ আ ল্ খা ০ লা ০ রা পের্

\+ ০ + ০
|পা —ধা র্সা | —া র্রা র্সা | না র্সনা ধা |—পা পা গা |
১। এ ০ লে ০ মু খ্ মে ০০ লে ০ তা রে
২। না ম্ টি ০ তা রে্ চো ০০ খে ০ যা ব্
৩। চ ০ ড়া ই ঘ রে ব ০০ ডা ই ক রে
৪। কি ০ বা ০ হু ম জি ০০ লা ০ হা ই

	+			০			+			০		
	| গা	—পা	পাধা |	না	ধা	পা |	গা	রা	সা |	া	—া	া
১।	গে	০	লে০	০	ক	প্	ক	০	রে	০	০	০
২।	ব	০	ড্ড০	০	হা	য়	ব্য	০	থা	০	০	০
৩।	শ	০	ঙ্কা০	০	না	হি	ম	০	নে	০	০	০
৪।	তু	০	ল্লে০	০	হা	ড়	গি	০	লা	০	আ	ছে
											সা	বা

+			০			+			০		
| গা	—া	গা |	—া	গা	-া |	গপা	·	গা |	—া	গা	—া |
গ	০	গ	ন্	বে	ড়	গৃ	০	খি	০	নী	০

+			০			+			০		
| গপা	—া	গা |	—া	রা	—া |	রগ	—া	রা |	—া	সা	-া |
সাঁ	০	চা	০	নী	০	শ	০	কু	০	নি	০

+			০			+			০		
| সা	—রা	গা |	—পা	পা	পা |	ধা	-া	ধা |	—া	পা	-ধা
পা	য়	রা	০	ঘু	ঘু	ফি	০	ঙ্গা	০	পা	ন্

+			০			+			০		
| না	—া	না |	—া	না	র্সা |	না	—া	ধা |	া	ধা	—না
কৌ	০	ড়ি	০	মা	ছ	রা	০	ঙ্গা	০	কা	ঠু

+			০			+			০		
| ধা	—া	পা |	—া	পা	ধা |	পা	—া	গা |	—া	গা	পা |
ঠো	ক্	রা	০	কা	দা	র্খো	০	চা	০	হ	র

+			০			+			০		
| গা	—া	রা |	—া	রা	গা |	রা	—া	সা |	—া	সা	রা |
বো	০	লা	০	হাঁ	ড়ি	চাঁ	০	চা	০	টি	রা

+			০			+			০		
| গা	—া	পা |	পা	পা	ধা |	না	—া	ধা |	-া	ধা	পা
টু	ন্	টু	নি	টি	ঠী	পা	০	খী	০	ক	হ

| গা	—া	পা |	—া	গা	গা |	রা	-া	সা |	—া	—া	—া :
ক	০	ন্ত	০	আ	ছে	বা	০	কি	০	০	০

———

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

॥ নয় ॥

পথ হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু দিকদার তো বলেই দিয়েছে চোখকান খোলা রাখতে, তবে আবার ভয়টা কিসের? রাখাল-সিঁদেল কাকে ভয় করে? হ্যাঃ! হ্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়! তবে একবারটি লাইব্রেরির তাকগুলো চেঁছেপুঁছে নিলে পর তখন না হয় অন্য কথা। এখন সেসব জিনিস নিরাপদে দেশে নিয়ে যাওয়া নিয়েই যত ভাবনা। ছোটবেলা থেকে রাখাল দেখে এসেছে চারদিকে শুধু দুষ্টু লোকের ভিড়। একটা কানাকড়ি হাতিয়েছে কি অমনি চিল-ছোঁ মারবার জন্য সবাই মিলে চারদিকে ডানা ঝাপটাতে লেগে যাচ্ছে। ছিঃ! এখানেও এখন কপালে কী ভোগান্তি আছে কে জানে। তবে যদ্দূর দেখা যাচ্ছে, এখানকার কাণ্ডকারখানাই অন্যরকম। কোথায় ঘরে সিন্দুক ভরে সোনাদানা রেখে সজাগ হয়ে ঘুমুবে আর চোর এসে আপিমের ধুঁয়ো দিয়ে সবাইকে আরও অঘোরে ঘুম পাড়িয়ে সিন্দুক ভেঙে সর্বস্ব পাচার করবে, তা না, দরজা জানলা হাট করে খোলা রেখে সব বাক্‌শালে বক্তিমে করতে গেছেন!

হাসি পেতে লাগল রাখালের। এদের ঘরে যে এককণাও সোনা নেই এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহই নেই। ভুতো বলছিল এখানকার মেয়েরা নাকি ফুলের গয়না সবচেয়ে ভালবাসে, সোনার গয়না গায়ে পরা দেখলে বেশির ভাগ লোক নাকি মজা পায়। মিটিং-এ তো ডাব-ওয়ালী ছাড়া কেউ বড় একটা গয়না পরেছে বলে মনে হয় নি।

তাহলে এদের ঘর থেকে নেবে কী? খায় তো সব ক্যান্টিনে, ঘরে বোধ হয় কারও রাঁধাবাড়ার পাট নেই, বাসনকোসনই বা চুরি করবে কোথায়? নাঃ, লাইব্রেরিটাই সব। অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ রাখালের খেয়াল হল সবাই তো বাক্‌শালে যায় নি, দুটো একটা ঘরে মিটমিট বাতি জলছে, দুটো একটা লোক এখানে ওখানে বসে চাঁদের আলো পোয়াচ্ছে।

বাস্তবিক এ দেশের চাঁদের আলোটা কিন্তু বেড়ে। পথের ধার থেকে একটা লোক ডেকে বলল—কী ভাই, কাকে খুঁজছ? তুমিই না সেই হট্টমালীদের একজন? রাখাল এগিয়ে গিয়ে তার পাশে মাটির ঢিপির উপর বসে পড়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তোমাদের দেশটি একটু ঘুরেফিরে দেখছি। বেড়ে আছ তোমরা, দরজা জানলা খুলে দিব্যি নিশ্চিন্দিমনে সব ঘুরছ! তা তুমি বাক্‌শালে গেলে না যে বড়?

লোকটা হেসে বলল, না হে, বোকাদের বকবকানির মতো বিরক্তিকর কিছু আছে নাকি? ওসব আমার ভালো লাগে না। সারাদিন লাইব্রেরিতে খাটি আর সন্ধ্যে হলেই স্নান করে খেয়ে দেয়ে বাইরে বসে গায়ে হাওয়া লাগাই। আমার নাম মোতিলাল।

মোতিলাল লাইব্রেরিতে কাজ করে শুনে রাখালের কানদুটো খাড়া হয়ে উঠল। ভালো লোকের সঙ্গেই মোলাকাত হয়ে গেল দেখা যাচ্ছে। তাকে জিগগেস করলে—কী আছে তোমাদের লাইবেরিতে? কী কাজ কর তোমরা?

লোকটা তো অবাক। বাঃ! লাইব্রেরিতে কী থাকে জান না? দেশে যা কিছু ভালো জিনিস তৈরী হয় সব থাকে। বই, ছবি, ঘর সাজাবার জিনিস! কী চমৎকার সব ঘড়ি আছে, দেখে তাক লেগে যাবে তোমার। সব এখানে তৈরী; আবার বিদেশী জিনিসও আছে। তোমাদের হট্টমালার নকশা কাঁথা আছে।

রাখালের ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়তে লাগল। বললে—আর কী আছে? লোকটা বললে—আরে, কত জিনিস আছে সে কি সব বলা যায়। কাল সকালে চলো, আমি তোমাকে সব দেখিয়ে দেব। আমাকে ছবি বিভাগে পাবে।

আমাকে ঢুকতে দেবে তো সেখানে?

ও-মা! কেন দেবে না? সবাই ঢুকে দেখবে বলেই তো রাখা। তাকে সব সারি সারি সাজানো।

রাখাল সাবধানে বলল—দামী জিনিস আছে না সব? সেও কি তাকের উপর খোলা পড়ে থাকে নাকি?

লোকটা হেসে ফেলল—পাগল নাকি। খোলা ফেলে রাখলে কে কোথায় টানাহ্যাঁচড়া করে কোনা ছিঁড়ে দিক আর কি!

কোনা ছিঁড়ে দেবে? রাখাল তো অবাক! কিসের আবার কোনা ছিঁড়বে?

লোকটা বললে, কেন, ওই সব দামী দামী এক হাজার দু হাজার বছরের পুরোনো ছবি, নকশা, পুঁথিপত্র, এই সবের।

বললে না দামী জিনিস? এখানকার যা কাণ্ড! পুঁথিপত্রের কথা কে জানতে চাইছে! আরও সাবধানে রাখাল বললে,—ডাবওয়ালী দেখলাম মিটিং-এ গা-ভরা সোনার গয়না পরেছে। নাকি লাইবেরি থেকে নাম লিখিয়ে নিয়েছে। সে সব তালাচাবি বন্ধ থাকে নিশ্চয়?

লোকটা বললে—না গো, না, ওসব চাবিবন্ধ করতে হলে তো দেশের সব চাবিতেও কুলোত না। সাধারণ জিনিস যা যে-কেউ তৈরি করতে পারে, সে সব খোলাই থাকে। শুধু যে জিনিস ভাঙলে আর পাওয়া যাবে না, সেগুলো বন্ধ থাকে। তবে কি জান, লাইব্রেরির কোনো জিনিস নষ্ট করলে বেদম সাজা দেওয়া হয়।

কী আবার বেদম সাজা? গারদ নেই, বেত নেই, দারোগা নেই।

লোকটা বললে—নিজের কাজ সেরে রোজ সন্ধ্যেবেলায় লাইব্রেরির কাজ করতে হয় রাত দশটা অবধি।

পাগলের দেশ নয় তো কী। ও আবার একটা শাস্তি হল নাকি। মুখে বললে রাখাল—রাত দশটা অবধি লাইবেরি খোলা থাকে?

তা থাকবে না? পড়ুয়ারা সব রাত জেগে না পড়লে যে তাদের ঘুম হয় না। তবে রাত দশটায় তাদের বের করে দিয়ে, ঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সারারাত পাহারাওয়ালারা থাকে নিশ্চয়?

তা থাকে বৈ কি। নইলে পাগলগুলো আবার ঢুকে বই নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসবে না ভেবেছ!

কজন পাহারাওয়ালা থাকে?

লোকটা অবাক হয়ে রাখালের মুখের দিকে চেয়ে বলল—কেন বল তো? এ বিষয়ে বই-টই লিখছ নাকি?

রাখাল মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে নিয়ে বলল—সত্যিই লিখব হয়তো। সব বিষয়ে জেনে রাখা ভালো।

লোকটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল —তা সত্যি। দিকদারের সঙ্গে তোমাদের কোনো কথা হয়েছে নাকি?

অত বোকা নয় রাখাল। লোকটা হয়তো দিকদারের শত্রু। তাই বলল—কী নিয়ে কথা? খাওয়ার পর সে একবার ডেকে আমাদের দেশের কথা শুধোল বটে। তা দেখো, আমার একটা উব্‌গার করবে?

কী উপকার?

দিকদার আমাকে গাছ ছাঁটার কাজে লাগিয়েছে, ও আমার হাতে তেমন আসে না। তোমাদের লাইবেরিতে আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দাও না।

লোকটা খুব হাসল। আরে লাইব্রেরির কাজ যে শিখতে হয়, যে সে পারে না। তুমি বরং কাল সকালে একবার এসে দেখে যেও, তারপর ভালো লাগে তো কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেব। কেমন?

এদের কথাবার্তা শুনে ততক্ষণে আরেকটা লোকও এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার কথা বলল।—তুমিই কি সেই পালানো হট্টমালী যাকে শহরময় আঁতিপাঁতি খোঁজা হচ্ছে?

কে খুঁজছে? —না তোমার সাগ্‌রেদের যে এতক্ষণ তোমাকে না দেখে নাড়ি ছেড়ে যাবার জোগাড়!

তাও ভালো। রাখালের তো ভয় হচ্ছিল যে ভুতোর গায়ে এদেশের হাওয়া লেগে সে এবার রাখালকে ছেড়ে ওদের দলে গিয়ে ভিড়বে। আঃ, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একা একা কি কোনো কাজ করা যায়। তবে একাই বা কেন? দিকদারের যে একটা দল আছে, যারা এখানকার সাধারণ লোকদের মতো নয়, সেটা রাখাল টের পেয়ে গেছে। অবিশ্যি, সাধারণদের মতো না হলেই যে রাখালের সঙ্গে মতে মিলবে, তাও খুব মনে হচ্ছে না। তবু দেখা যাক, এদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যদি নিজের কাজ হাসিল করা যায়, তাই বা মন্দ কী? মন্দ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ঢের ভালো, কারণ পয়সা-কড়ি সোনাদানার উপর এদের এতটুকু নজর নেই, কাজেই ভাগ বসাতে আসবে না। শেষ নাগাড়ে মন্দ হবে না ভাগাভাগিটা।

ভুতো রাখালকে দেখে ছুটে এল—কোথায় গিছলি? আমি বলি বুঝি আবার কোথায় কী ফেঁদে ধরা পড়েছিস? ভুতোর হাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাখাল বললে, ধরবে কেটা শুনি? লাইবেরিতে একটা কাজের চেষ্টায় গিয়েছিলাম।

ভুতো এমনি অবাক হয়ে গেল যে তলার ঠোঁটটা আধ বিঘৎ ঝুলে পড়ল। —কেন, অত অবাক হবার কী আছে? আমি কি কোথাও কাজ গুছুতে জানি না ভেবেছিস?

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা বুঝল ভুতো। ব্যস্ত হয়ে কাছে এসে কানে কানে বলল—ওরে, গোলমালের মধ্যে যাস নি বলছি।

সাকরেদের যে ভারি সাহস হয়েছে, আবার পরামর্শ দিতে আসে! রাখাল বললে, কেন, ভয়টা কিসের শুনি? এরা আমাকে জেলে দেবে, না ফাঁসি দেবে?

ভুতো বলল,—না, ওসব এরা জানে না—কিন্তু ভারি নিন্দে করবে এটা ঠিক।

রাখাল হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। তেড়িয়া হয়ে উঠে বলল—আমি একটু কাজে লাগি সেটা যদি তোর ইচ্ছে না হয় তুই যেখানে খুশি চলে যেতে পারিস। মোট কথা, কাল সকালে আমি লাইবেরি দেখতে যাব।

রাখালের রাগ দেখে থতমত খেয়ে ভুতোর বিষম লেগেটেগে একাকার। তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে বলল—আমিও যাব তোর সঙ্গে, কিন্তু পড়তে পারব না বলে রাখলাম।

কী জ্বালা! পড়াশুনো কত্তে আবার লাইবেরিতে যায় নাকি, তারচেয়ে গোঁফ চেঁচে আবার পাঠশালে গিয়ে ভর্তি হলেই হয়। কেমন হাঁটু বেঁকিয়ে দুই হাতে দুই থান ইঁট নিয়ে দাঁড়াবি আবার!

পরদিন সকালে ভুতো রাখালকে এক মুহূর্তও কাছছাড়া করে না। ভক্তির জন্যে না, পাছে রাখাল কিছু করে বসে স্রেফ এই ভয়ে, এটা রাখাল বেশ জানে। সকালে জলখাবার খেয়েই দিকদারের কাছে গিয়ে রাখাল দুজনার ছুটি করে নিল। দিকদার একটু মুচকি হেসে বলল,—বেশ তো, তা যাওগে লাইব্রেরিতে, দেখো গিয়ে কী সুবিধে করতে পার। কিন্তু দুপুরে খাওয়ার পর একবারটি দেখা কোরো আমার সঙ্গে। ভুতো পড়ে গেল মহা ফাঁপরে, গাছের কাজটিই তার ছিল পছন্দ, অথচ রাখালকে তো আর ছেড়ে যাওয়া যায় না।

মোতিলাল নিজে বেরিয়ে এসে ওদের লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল, যেন কতই খাতিরের অতিথি। রাখাল ঢুকল বুক ফুলিয়ে, কিন্তু ভুতো কেবলি রাখালের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করে। আধময়লা জামাকাপড় কেচেকুচে পরিষ্কার হয়ে এসেছে দুজনে, তবু এ জায়গাটা এত বেশি পরিষ্কার যে রাখালের দেখে দেখে বিরক্ত লাগে।

সামনের ঘরেই তাকের উপরে ভাল ভাল সোনারুপোর জিনিস।

[ক্রমশ

দার্জিলিঙের পথে

মাল্যশ্রী চক্রবর্তী। ২৩৭০। দার্জিলিং। বয়স ১৪

টিং টিং টিং টিং
চলল গাড়ি দার্জিলিং।
ছাড়ল এবার শিলিগুড়ি
উড়ল রুমাল সাদার সারি।
ঘটাং ঘটাং ঘটাং ঘটাং
চলল গাড়ি আজকে সটাং
পেরিয়ে ডোবা পেরিয়ে খানা
চলছে গাড়ি যায় না থামা।
ফেরিওলা বেচছে বাসন
ওই এসেছে শুকনা স্টেশন
লোক চলেছে পথের 'পরে
ঝাউয়ের বনে চড়াই ওড়ে।
ঘটর ঘটর ঘটর ঘটর
কার্ট রোডেতে চলছে মোটর,
পাহাড়-ছেলে ক্ষুদে-চোখো
দেখছে গাড়ি মাথায় 'ডোকো'।
উল বুনছে নেপাল-মেয়ে
পিঠের 'পরে ছেলে নিয়ে।
ওই যে দেখো 'পাগলাঝোরা'
ছুটছে যেন মাতাল ঘোড়া,
ছিটিয়ে দিয়ে জলের রাশি
খিলখিলিয়ে খুশির হাসি
হেসে হেসে পড়ছে ঝরে
পাহাড় ভেঙে নুড়ির 'পরে।
টং টং টং টং
ওই যে এল কার্সিয়াং
জোর চলেছে গাড়ি এবার
ছাড়িয়ে যাবে দূরের পাহাড়।
রডডেনড্রন গাছের 'পরে
ফুল ফুটেছে থরে থরে।
ক্যামেলিয়ার লালচে মুখে
লজ্জারাঙা হাসি দেখে
রবির আলো বাঁধন ফেলে
উঠল হেসে ঝলমলিয়ে।
মুক্তধারা ঝরনাগুলি
আজকে সকল বাঁধন খুলি
চলছে সবে নীচের দিকে
তাদের মাতন আজ কে রোখে ?
চুপ করো না—একটু চুপ
'বাতাসিয়া'র ওই যে লুপ
ঘটাং ঘটাং টিং টিং
এসেই গেলাম দার্জিলিং।
ইস্টিশনে লোকের সারি
থামল এবার রেলের গাড়ি॥

আমার ছোট বোনটি

শিপ্রা গোস্বামী। ৮৬১। শ্রীরামপুর। বয়স ১৪

আমার মিষ্টি ছোট বোনটি নামটি তাহার মিতুল।
ভালোবাসে সে যে সদাই খেতে কাঁচা তেঁতুল।
সবার সাথে ভাব যে তাহার, সবার সাথে আড়ি—
পড়াশুনোর নামেই তাহার মুখটি যে হয় হাঁড়ি।
হাসিখুশী সর্বদা সে, আনন্দে উজ্জ্বল
একটুখানি বকুনিতে চোখে আসে জল।
খেলতে যত ভালোবাসে পড়তে তত নয়।
আচার চুরি করতে দড়ো, নেইকো মনে ভয়।
বাবার কাছে যায় না মোটে মার সাথেতে কথা
কেবল সে যে আপন মনে বেড়ায় যথাতথা।
যখন সে ভাই পড়তে বসে শ্লেট-পেন্সিল হাতে
কত রকম খেলার কথা ঘুরতে থাকে মাথে।
এমনিধারা মিষ্টি সে যে মিষ্টি আমার বোনটি
দুষ্টুমিতে ভরা সদাই তাহার ছোট মনটি।

মধ্যাহ্নে

অভিসার সেনগুপ্ত। ২৬১৪। কলকাতা। বয়স ১১

দুপুরবেলা ঘরের কোণে
পড়ছে খোকা আপন মনে;
লোহার খাঁচায় ঘুমোয় পাখি,
মায়ের কোলে খেলছে রাখী।
ছোট্ট পুশি চাটছে থাবা,
দাদুরা সব খেলছে দাবা,
উঠোনমাঝে ঘুমোয় ভুলো,
ঠিক যেন এক পেঁজা তুলো।
পায়রাগুলো খাচ্ছে খুঁটে,
বোঝা বয়ে ফিরছে মুটে,
গাছে গাছে ডাকছে টিয়ে,
বইছে হাওয়া দোলা দিয়ে॥

লিমেরিক

সমর রায়। ২৪৫৪। কলকাতা। বয়স ১৫

গড়ের মাঠে লাইন দিল গুপ্তিপাড়ার চ্যাংড়া
রাত্রি থেকে লাইন পড়ে ময়দান-সে ট্যাংরা।
টিকিট-আশে দাঁড়িয়ে থেকে
চ্যাংড়া শেষে বলল হেঁকে—
'আমায় ছেড়ে বিদায় এবার নেবে আমার ঠ্যাং-রা।

শরৎ-রানী

নন্দিতা মৌলিক। ২৩৮১। বহরমপুর। বয়স ১৩

সাঙ্গ হল মেঘের খেলা
বিদায় নিল শ্রাবণবেলা
নীলের সনে এবার সবুজ
ধরার কানাকানি।
সোনার আলোর আঁচল মেলে এল শরৎ-রানী।

ঘরের মাঝে থাকতে নারি
আজ সুদূরে জমাই পাড়ি
কাশের বনে সোনার রোদে
হচ্ছে জানাজানি।
সোনার আলোর আঁচল মেলে এল শরৎ রানী।

প্রবাসী মন হল আকুল
গৃহের তরে পরান ব্যাকুল
বাঁশির সুর জানায় তারে
মায়ের আগমনী।
সোনার আলোর আঁচল মেলে এল শরৎ-রানী।

প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে

তোমাদের প্রতিযোগিতার কবিতা প্রায় পৌনে দু শো পড়লাম। তার মধ্যে থেকে আমাদের মতে সব চাইতে ভালো পাঁচটি ছাপা হল। এবার কবিতা লেখা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। অনেকগুলি জিনিস মিলে কবিতা হয়, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল 'কাব্যগুণ'; এ গুণটি না থাকলে কবিতা হয় না। তোমাদের ছড়া লিখতে বলা হয়েছিল, কাজেই তাতে ছন্দ মিল দুই-ই থাকা চাই, কিন্তু তোমরা নিশ্চয় এমন অনেক কবিতা পড় যার না আছে ছন্দ, না আছে মিল, এমনকি অনেক সময় পরিষ্কার একটা মানেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু সেগুলো যে কবিতা, সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকে না। একমাত্র কাব্যগুণের জোরেই এসব লেখাকে কবিতা বলতে আমরা বাধ্য হই। এই কাব্যগুণ জিনিসটি কবির নিজের দান, তাঁর মন থেকে তৈরী। অন্যের নকল করে হয় না। কয়েকটা চালাক-চালাক কথা জুড়েও হয় না। এর মধ্যে থাকা চাই খানিকটা খাঁটি রস, তা সে যে বিষয়েই হোক না কেন। সুন্দরের কথা, ভালোবাসার কথা, রাগের কথা, ভয়ের কথা, হাসির কথা, কান্নার কথা, খেয়ালের কথা কিংবা অন্য যে কোনো কথাই হোক না কেন, কিন্তু ভাবনাটি হওয়া চাই খাঁটি, কবির সত্যিকার মনের কথা। অদ্ভুত, অসম্ভব কথা হলেও চলে। উদ্ভট খেয়ালের কথা দিয়ে পৃথিবীতে অনেক সেরা কবিতা লেখা হয়েছে, কিন্তু কৃত্রিম ও নকল দিয়ে কবিতা হয় না। তোমরা যারা কবিতা লিখবে এ কথা তারা মনে রেখো।

—সম্পাদক

॥ প্রতিযোগিতা ৩।৬৩-র ফলাফল ॥

তালগাছেতে চিলের বাসা
নিমগাছেতে কাগ।
সরষেগাছে চড়াই নাচে
ও বেড়ালি, ভাগ।

১

এয়ারগানটা বাগিয়ে হাতে
করছি এখন তাগ।
তিনটে পাখিই এক গুলিতে—
লাগ্ ভেলকি লাগ্।

—রাজা দাশগুপ্ত। কলকাতা-২৬

২

তাল পাকলে পড়বে পিঠে
তেতো নিমের ফল।
চড়াই পাখি দেখেই বুঝি
ঝরছে জিভে জল।

—মালবিকা চক্রবর্তী। কলকাতা-৩৬

৩

হাঁড়িচাচায় গান ধরেছে।
বাজনা বাজায় ফিঙে,
কাঠবেড়ালি তাই না শুনে
ফুঁকল হঠাৎ শিঙে।

—সুব্রত ঘোষ। বাটানগর, ২৪ পরগনা

৪

আমগাছেতে পিঁপড়েরানী
গুড়গুড়িয়ে ওঠে।
এসব কথা ক্যাবলামামা
লিখে রাখেন নোটে।

—জয়ন্তী রায়। কলকাতা-২৯

৫

মাঝপুকুরে ঘাঁই মেরেছে
রাম-কাতলার ছা।
ধরবি যদি মুরোদ থাকে,
সেইখানেতে যা।

—দীপালি পাল। কলকাতা-৯

এই পাঁচজনের প্রত্যেকেই ৫ টাকা করে পুরস্কার পাবে।

গ্রাহক ও পাঠকদের কাছে

নভেম্বর সংখ্যা ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশ করতে পারলাম। আমাদের কৈফিয়ত দেবারও কোনো মুখ নেই। ডিসেম্বর সংখ্যা জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি প্রকাশ করার জন্যে খুব চেষ্টা করছি।

সেই কারণে এই সংখ্যায় নতুন ধাঁধা দেওয়া হল না। কেননা কাগজ পেয়ে ধাঁধার উত্তর পাঠানোর সময় তো তোমরা পাবে না।

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র তোমরা ডিসেম্বর সংখ্যার সঙ্গে পাবে!

শয়তানের দল সেই পথ বেয়ে তীরবেগে উঠে আসতে লাগল।

গল্পের চেয়ে ভয়ংকর । পৃষ্ঠা ৬৮

ছবি । প্রসাদ রায়
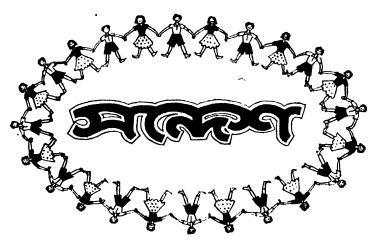
৩য় বর্ষ । ৮ম সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৬৩ । অগ্রহায়ণ ১৩৭০

ছবির বাবা

কানাই সামন্ত

ছবির বাবা ফ্রেমের মধ্যে থাকে,
আমি বলি 'পেড়ে দাও-না তাকে'—
কেউ কি কথা শোনে!
বাবা যে যায় রাজশাহী গৌহাটি,
সঙ্গে নেয় না যত-ই কাঁদিকাটি—
গৌরীপুরে রয়েছে কন্যাটি
থাকে না আর মনে।
ছবির বাবা থাকবে পরিপাটী
খেলাঘরের কোণে।

কাঁচের মধ্যে কষ্ট হয় না বুঝি!
পর্‌জাপতি রাস্তা পায় না খুঁজি,
বসে সোনার ফ্রেমে।
টিকটিকিটা ধরতে তারে আসে—
ছাখে না তাই, বাবা তেমনি হাসে—
নইলে কেন বারণ করে না সে?
ভয়ে যে যাই ঘেমে!
টিকটিকিটা দুষ্টু বড়ো—বাবা,
এইখানে আয় নেমে!

আমি পড়ি ধারাপাতের পাঠ,
তিন তিরিশং বলি যখন ষাট
বাবা ওঠেন চটে।
ষাট সত্তর যা খুশি হোক তাই
ছবির বাবার ওসব হিসাব নাই—
ছবির বাবার খেলার সাথি চাই,
পড়া চায় না মোটে।
হাসির সঙ্গে খেলছে খুশিখানি
দুই চোখে আর ঠোঁটে।

ছবির বাবার সঙ্গে করব খেলা,
ওরে নিয়েই শোব রাতের বেলা
ছোটো ঘরের খাটে।
আমায় ভালোবাসবে মায়ের চেয়ে—
বলবে, 'ওরে আমার সোনার মেয়ে,
তুমি কেবল নাচবে ধেয়ে ধেয়ে
বাগ-বাগিচায় মাঠে।'
আমরা শুধু বসব পুরাণ-কথা
আর রামায়ণ-পাঠে।

আমার বড়ো মনটা কেমন করে—
বাবা আমার ছোট্টো কাঁচের ঘরে
বন্দী আছে ব'লে।
তোমরা বলো 'ও কথা কয় না যে।
সঙ্গে নিয়ে যাবে সকাল সাঁঝে
নদীর ঘাটে? ফুল-বাগিচার মাঝে?
করবে তোমায় কোলে?'
আমি না-হয় কোলে করব ওকে,
দোষ কী বা তাই হলে?
সত্যি বাবার নাই তো দয়ামায়া—
ছবির বাবা দেয়ালে ঐ ঝোলে।

শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

[নভেম্বর সংখ্যার পর]

রাজধানীতে পৌঁছিয়া দেবযানী রাজার বাড়িতে রহিলেন, কিন্তু শর্মিষ্ঠাকে তিনি সেখানে থাকিতে দিলেন না। তাঁহার কথায় রাজা একটা অশোকবনের ভিতরে শর্মিষ্ঠার জন্য একটা বাড়ি প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এইরূপে দিন যায়। ইহার মধ্যে, একদিন কী হইয়াছে, শুনো। শর্মিষ্ঠাকে যযাতি বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু দেবযানীকে তাহা জানিতে দেন নাই। দেবযানীর দুই পুত্র, তাহাদের নাম যদু আর তুর্বসু। শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র, তাহাদের নাম দ্রুহ্য, অনু আর পুরু। দেবযানীর পুত্রেরা রাজপুত্রের মতন পরম সুখে রাজ্যের ভিতরে চলাফেরা করে, তাহাদের সম্মান আর আদরের সীমা নাই। শর্মিষ্ঠার ছেলে তিনটিকে, দেবযানীর ভয়ে, রাজা সেই অশোকবনের ভিতরেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে দেন না। ছেলে কয়টি আশপাশের বনে খেলা করিয়া বেড়ায়। বাহিরের লোকে তাহাদিগকে দেখিতেও পায় না, কাজেই তাহাদের কথা জানেও না।

একদিন দেবযানী রাজার সঙ্গে বনের ভিতরে গিয়া সেই ছেলে তিনটিকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর ছেলে তিনটি কোথা হইতে আসিল? দেখিতে রাজপুত্রের মতন অথচ তাহাদের সঙ্গে লোকজন নাই! এসকল কথা ভাবিলে সকলেরই আশ্চর্য বোধ হয়, আর তাহাদের পরিচয় লইতে ইচ্ছা করে। দেবযানী তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাছা, তোমরা কে? তোমাদের পিতার নাম কী?'

এ কথায় ছেলে তিনটি আহ্লাদের সহিত যযাতিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, 'এই আমাদের বাবা। আমাদের মার নাম শর্মিষ্ঠা।'

এই বলিয়া তাহারা হাসিতে হাসিতে যযাতির নিকট ছুটিয়া আসিল; কিন্তু যযাতি, দেবযানীর ভয়ে, যেন তাহাদিগকে চিনিতেই পারিলেন না। ইহাতে ছেলে তিনটি অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের মায়ের নিকট চলিয়া গেল।

ইহার পর আর দেবযানীর জানিতে বাকি রহিল না যে, রাজা লুকাইয়া শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনে কী যে কষ্ট হইল, তাহা কী বলিব। তাঁহার বিশাল সুন্দর চক্ষু দুটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি আর এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, 'মহারাজ, এই আমি চলিলাম' বলিয়া তখনই তাঁহার পিতার নিকট যাত্রা করিলেন।

রাজা নিতান্ত দুঃখের সহিত, তাঁহাকে নানারূপ মিনতি করিতে করিতে, তাঁহার পিছু পিছু

চলিলেন ; কিন্তু দেবযানী কিছুতেই ফিরিলেন না। তিনি রাজাকে ভালো মন্দ কিছু না বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে শুক্রাচার্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়া জোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তারপর দেবযানীর নিকট সকল কথা শুনিয়া, শুক্র যযাতিকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'মহারাজ! তুমি ধার্মিক হইয়া অধর্ম করিয়াছ। এই দোষে এখনই দারুণ জরা (ভয়ানক বুড়া মানুষের অবস্থা) আসিয়া তোমাকে ধরিবে।'

শুক্র এ কথা বলিবামাত্র, রাজার চুল পাকিয়া গেল, দাঁত পড়িয়া গেল, চোখ ঝাপসা হইয়া গেল, চামড়া ঝুলিয়া পড়িল। তাঁহার হাত পা আর মাথা কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার মুখের ভিতরে কথা জড়াইয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর কানে শুনিতে পান না ; সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না।

তখন যযাতি বিনয় করিয়া শুক্রকে বলিলেন, 'এই অবস্থায় আমার আর বাঁচিয়া লাভ কী ? আমি যে এখনও এই পৃথিবীর সুখ ভালো করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। দয়া করিয়া আমার শরীর হইতে এই জরা দূর করিয়া দিন।'

শুক্র বলিলেন, 'আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা হইবেই। তবে তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে স্মরণ করিয়া, এই জরা অন্য কাহাকেও দিয়া দিতে পার। ইহাতে তোমার পাপ হইবে না।'

রাজা বলিলেন, 'তবে আমাকে এই এই অনুমতি দিন যে, আমার পাঁচ পুত্রের মধ্যে যে আমার জরা নিয়া আমাকে তাহার যৌবন দিতে সম্মত হইবে, সে-ই আমার রাজ্য পাইবে।'

শুক্র বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিতেছি।'

তারপর জরায় কাতর যযাতি দেশে ফিরিয়া, নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে বলিলেন, 'বৎস, দেখো শুক্রের শাপে আমার কী দশা হইয়াছে। পৃথিবীর সুখে এখনও আমার তৃপ্তি হয় নাই। তুমি যদি এক হাজার বৎসরের জন্য আমার এই জরা নিয়া তোমার যৌবন আমাকে দাও, তবে আমি কিছু কাজকর্ম এবং সুখ ভোগ করিয়া লইতে পারি। এক হাজার বৎসর পরে আবার তোমার যৌবন তোমায় ফিরাইয়া দিব।'

যদু বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার জরা লইয়া কষ্ট পাইতে ইচ্ছা করি না। আপনার আরও অনেক পুত্র আছে, তাহাদিগকে আপনার জরা দিন।'

এ কথায় যযাতি বলিলেন যে, 'তুমি যখন আমার কথা অমান্য করিলে, তখন, তুমি বা তোমার বংশের কেহ, রাজ্য পাইবে না।'

তারপর যযাতি তুর্বসুকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি আমার জরা গ্রহণ করো।'

তুর্বসু বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তাহা করিতে পারিব না।'

এ কথায় রাজা তুর্বসুকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'তোমার ছেলেপিলে হইবে না, আর তুমি পাপীদিগের রাজা হইবে।'

তারপর দ্রুহ্যু আর অনুকে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহার কথায়

সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি দ্রুহ্যুকে বলিলেন যে, 'তোমার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে না। তোমার বংশে কেহই রাজা হইবে না। আর, যেখানে হাতি ঘোড়া, গাড়ি পালকি কিছুই নাই, কেবল ভেলায় চড়িয়া আর সাঁতরাইয়া চলাফেরা করিতে হয়, সে দেশে গিয়া তোমাকে বাস করিতে হইবে।'

আর অনুকে তিনি এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'তুমি যে জরা লইতে এত আপত্তি করিতেছ, সেই জরা এখনই তোমাকে ধরিবে। আর, তোমার ছেলেপিলে একটিও বাঁচিবে না!'

এইরূপে পাঁচ ছেলের মধ্যে চারিজনে যযাতির জরা লইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু সকলের ছোট পুরু যযাতি বলিবামাত্রই তাঁহার কথায় রাজী হইলেন। ইহাতে যযাতি পুরুর উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে, 'তোমার রাজ্যে প্রজারা চিরকাল পরম সুখে বাস করিবে।'

তারপর পুরুর যৌবন লইয়া যযাতি একহাজার বৎসর নানারূপ সৎকার্যে সুখে সময় কাটাইলেন। এক হাজার বৎসর শেষ হইলে পুরুর যৌবন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া এবং তাঁহাকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া, তিনি তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অনেক যাগ-যজ্ঞ এবং বহুকালের কঠোর তপস্যার ফলে যযাতির বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় হওয়ায়, মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া কয়েক হাজার বৎসর তাঁহার বড়ই সুখে কাটিল। তারপর একদিন ইন্দ্রের সহিত তাঁহার দেখা হওয়ায় ইন্দ্র কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'মহারাজ, বলো দেখি, তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?'

যযাতি বলিলেন, 'সে আর কী বলিব? আমার সমান তপস্যা এই ত্রিভুবনে কেহ কখনও করিতে পারে নাই!'

যযাতির এই অহংকারে ইন্দ্র নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, অন্যে কিরূপ তপস্যা করিয়াছে, বা না করিয়াছে, তাহা না জানিয়াই তুমি সকলের অপমান করিলে? এই দোষে তুমি আজই স্বর্গ হইতে পড়িয়া যাইবে।'

তাহাতে যযাতি বলিলেন যে, 'যদি পড়িতে হয়, তবে যেন ভালো লোকের নিকট পড়ি।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'তুমি ভালো লোকদের মধ্যেই পড়িবে।'

এইরূপ কথাবার্তার পর যযাতি স্বর্গ হইতে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তিনি স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি আসিয়াছেন, এমন সময়, সেই শূন্যের উপরে বসুমান, অষ্টক, প্রতর্দন ও শিবি রাজার সহিত তাঁহার দেখা হইল।

এই চারিজন রাজা পৃথিবীতে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে যাইতেছিলেন। ইহারা যযাতিকে আগুনের মতন তেজের সহিত পৃথিবীর দিকে পড়িতে দেখিয়া, আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হে যুবক, তুমি কে? আর কি জন্যই বা স্বর্গ ছাড়িয়া পৃথিবীতে চলিয়াছ?'

ইহার উত্তরে যযাতির নিকট সকল কথা শুনিয়া, ইহারা সকলেই বলিলেন যে, 'মহারাজ, আমাদের পুণ্যের যে ফল তাহা আপনাকে দিতেছি, আপনি আমাদের সঙ্গে স্বর্গে চলুন।'

এ কথায় যযাতি প্রথমে সম্মত হন নাই। তিনি কহিলেন, 'দান ব্রাহ্মণেই লইয়া থাকে। আমি রাজা ; আমি দান করিতেই পারি,—দান লইতে যাইব কেন ?'

কিন্তু সেই চারিজন রাজা যযাতিকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। সুতরাং তাঁহাদের পুণ্যের জোরে তাঁহাদের সঙ্গে যযাতিকে আবার স্বর্গে যাইতে হইল।

[সমাপ্ত]

ছেলেবেলায়

কত যে জন্তুজানোয়ারের মধ্যে থাকতাম ছোটবেলায় তার ঠিক নেই : কাউকে শুধু দেখতে পেতাম, ছোঁবার জো ছিল না ; কাউকে দেখতেও পেতাম না, ছুঁতেও পেতাম না, কিন্তু শুনতে পেতাম। আবার কাউকে দেখতাম, শুনতাম, ছুঁতাম।

যেই না সন্ধ্যা হত, পাহাড়-দেশে ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসত আর অমনি ঝিঁঝিপোকার কনসার্ট বসে যেত। ঝোপে ঝোপে অমন কিঁঝির ডাক এখন মনে করতেও আশ্চর্য লাগে, কান ঝালাপালা হয়ে যেত। কিন্তু আবছা অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে গিয়ে পোকাটাকে দেখবার সাহস ছিল না। শেষটা একদিন কে যেন বললে, কত বড় আর হবে পোকাটা, অথচ ক্যায়সা বাজখাঁই গলা শুনেছ !

অমনি আমাদের পাহাড়ী চাকর তেজু বললে, গলা আবার কোথায় পেলে ? ওরা তো ডানাতে পায়েতে ঘষে ওইরকম শব্দ বের করে।

শুনে আমরা হাঁ! কেউ বিশ্বাস করে না দেখে গেল তেজু অন্ধকারে বেরিয়ে। খানিক বাদেই প্রায় আমাদের ছোটবেলাকার হাতের তেলোর মতো বড় কালো কুচ্ছিত একটা পোকা কাঠিতে করে নিয়ে এল। তা সে নড়ে না চড়ে না, শব্দ করে না।

আমরা বললাম, যাঃ! এই বুঝি তোমার ঝিঁঝি ? ও তো একটা গুবরে জাতের পোকা ! রেগে গিয়ে তেজু পোকাটার পেটে চাপ দিতেই সে পেছনের পা আর ডানার সাহায্যে সে যা শব্দ শুরু করে দিল তা আজ পর্যন্ত ভুলতে পারলাম না।

কত রকমের যে পোকা ছিল আমাদের বাগানে তার লেখাজোখা নেই! মাঝে মাঝে দেখতাম পাতার নীচে একদলা ফেনা আটকে আছে। তেজু বলত, ছুঁয়ো না, ওটার মধ্যে পোকা আছে। সে পোকা আর চোখে দেখা হল না।

শুঁয়োপোকাই বা কত রকম দেখেছিলাম সে আর কী বলব। লম্বা লম্বা লালচে লোমওয়ালা একরকম শুঁয়োপোকা গাছ থেকে নেমেই পাঁই পাঁই ছুট লাগাত, তাকে ভালো করে দেখতে হলে আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হত। অবিশ্যি ছোঁবার জো ছিল না, অমনি গায়ের লোম হাতে বিঁধে যাবে—তার যা জ্বলুনি! তেজু একটু চুন লাগিয়ে দিত সে জায়গাটায় ; চুন শুকোলে খুলে ফেলতে হত, দেখতাম শুঁয়োগুলোও সেই সঙ্গে খুলে এসেছে।

আর একরকম শুঁয়োপোকা ছিল, দেখলেই ভয় করত। তারা সরলগাছের এবড়ো-খেবড়ো গুঁড়ির সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়ে বেমালুম অ-দেখা হয়ে থাকত। তাদের গায়ে হাত দেবার সাহস ছিল না, কিন্তু দূর থেকে একটা কাঠি বাড়িয়ে এতটুকু ছোঁয়ালেই ফোঁস করে শব্দ হত, আর শুঁয়োপোকার পিঠে দু সারি ছোট ছোট ঢাকনির মতো খুলে যেত। প্রত্যেকটি ঢাকনির নীচে এক গোছা করে শুঁয়ো আর প্রত্যেকটি শুঁয়োর আগায় একবিন্দু আঠা—ছুঁয়েছ কি বিষিয়ে উঠবে।

আরও একরকম কালো মখমলের মতো শুঁয়োপোকা ছিল, গায়ের দু পাশ দিয়ে দুটি সাদা দাগ কাটা, রাতে সেগুলি জোনাকির মতো জ্বলত। মনে হত পরীরা বুঝি ঘাসের মধ্যে পিদিমের সারি দিয়েছে।

বড় বড় গুগলি ছিল বাগানে, তারা পিঠে একটা করে পলকা শামুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর যেখান দিয়ে-ই যেত চকচকে একটা রুপোলি দাগ কেটে যেত। সেগুলোও ছোঁয়া বারণ ছিল।

পাথরের ঢিবির নীচে চকচকে রামধনু রঙের গিরগিটি দেখতাম; গাছের ডালে দেখতাম গলায় ঝালর-দেওয়া বহুরূপী।

সবচেয়ে সুন্দর ছিল প্রজাপতিরা। অত বড় প্রজাপতি এই সমতল দেশে দেখাই যায় না; ডানা মেলে দিলে আটাশ ইঞ্চির কম হবে না। আর কিবা তাদের রঙের বাহার, যেন কোনো নিপুণ শিল্পী কত যত্ন করে তুলি দিয়ে নকশা এঁকে দিয়েছে। তার রঙ মেলাবার বাহাদুরি দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। পিছন দিক থেকে নিঃশব্দে এসে প্রজাপতি ধরা খুব শক্ত মনে হত না। ধরলেই তার কী ছটফটানি, ডানা থেকে একরকম রঙিন গুঁড়ো আমাদের হাতে লেগে যেত আর তেজু বলত, আহা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, গুঁড়ো উঠে গেলে ও আর উড়তে পারবে কেন!

পাখিরা দেখতাম প্রজাপতি ধরে খেত, সুন্দর ডানাদুটি ছিঁড়ে নীচে ফেলে দিত, তারা ছোট্ট ছোট্ট ঘুড়ির মতো ভেসে ভেসে মাটিতে নামত, দেখে আমাদের কী যে দুঃখ হত।

আর একবার আমাদের ঝাউগাছের মগডালে বোলতায় প্রকাণ্ড বাসা করেছিল, নীচে থেকে বিশাল একটা নারকোলের মতো দেখতে লাগছিল। একদিন রাত্রে গাঁয়ের লোকেরা এসে বাঁশের আগায় মশাল জ্বেলে বোলতার চাকে আগুন ধরিয়ে দিল। জ্বলতে জ্বলতে সেটা নীচে এসে পড়লে পর ওরা ডিমসুদ্ধ চাক টুকরো টুকরো করে ভেঙে যে যার বাড়ি নিয়ে গেল আর অন্ধকারে অন্ধের মতো বোলতাগুলো উড়ে বেড়াতে লাগল। সে কী কষ্ট!

চারদিকে খালি দেখতাম নিরীহ প্রাণীরা কত কষ্ট পাচ্ছে। ভাম গাছে চড়ে পাখিরা ডিম খেয়ে ফেলছে। পেঁচার ছানা বাসা থেকে নীচে পড়ে মরে যাচ্ছে। চিল ছোঁ মেরে পায়রার বাচ্ছা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, মা-পায়রা ডানা সাপটে তেড়ে গেলে তার চোখ ঠুকরে দিচ্ছে। আর মানুষদের অত্যাচারের তো কথাই নেই।
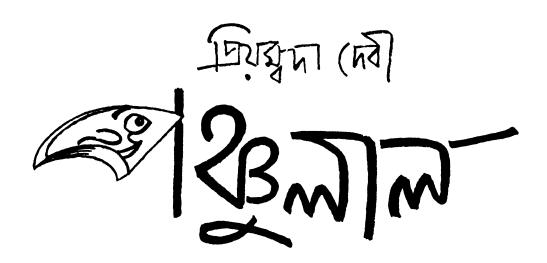
[নভেম্বর সংখ্যার পর]

পঞ্চু যাত্রা করল। বনের মধ্যে কিছু দূর যাওয়ার পর তার মনে হল দুজন মানুষ যেন কোথায় কথা বলছে। তারা আর কেউ নয়, সেই কানা বেড়াল আর খোঁড়া শেয়াল। পঞ্চুকে দেখেই তারা বলে উঠল, 'ওমা, এই যে দেখছি আমাদের পঞ্চুলাল। এখানে এলে কেমন করে?'

'সে সব ঢের কথা। কিন্তু জান, কাল দুজন খুনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

'খুনী! কী সর্বনাশ! কী মতলবে তারা তোমার কাছে এসেছিল?'

'মতলব— আমার মোহর কটি হাত করা।'

'কী হতভাগা মানুষ সব, ছিঃ ছিঃ। মোহরগুলো ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, একটা শুধু সেই সরাইখানায় খরচ করেছি।'

'এখন তো মোটে চারটে, মনে করলে হাজার হাজার হতে পারে—তুমি দেবক্ষেত্রে সেগুলো পুঁতে রাখ নি কেন?'

'দেবক্ষেত্রটা কতদূর বলতে পার?'

'এই তো কাছেই—আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে পার। তখনই যদি মোহর পুঁতে দাও খানিক বাদেই হাজার হাজার হয়ে যাবে, আর আজই সন্ধ্যায় থলে-ভরা-ভরা মোহর নিয়ে বাপের কাছে যেতে পারবে।'

পঞ্চু কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলে। বনশ্রীর কথা, তার বাপের অবস্থা, ঝিল্লী চক্রবর্তীর পরামর্শ, সব মনে পড়ে গেল, দুবার আপন মনে মাথা নাড়লে, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'চলো, যাওয়া যাক।'

দুপুর বেলা তারা একটা নির্জন মাঠে গিয়ে পৌঁছল। মাঠটা নিতান্তই সাধারণ রকমের, তাতে দেবত্বের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। পঞ্চু আপন হাতে মাটি খুঁড়ে মোহরগুলো পুঁতে মাটি দিয়ে ঢাকা দিল। তখন শেয়াল বললে, 'যাও, ঐ খালটা থেকে জল এনে এখানকার মাটি ভালো করে ভিজিয়ে দাও।' পঞ্চু কথামত কাজ করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আর কিছু করতে হবে কি?'

'না, আর মিনিট বিশেক পরেই দেখবে গাছ গজিয়েছে—তারপরেই ডালপালা সব মোহরের ভারে নুয়ে পড়বে—তুলে নিতে কোনো কষ্টই হবে না।'

পঞ্চু তাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বকশিশ দিতে চাইলে।

তারা দুজন বেজায় সাধুর মতো বললে, 'ছিঃ! ও কথা বোলো না, বকশিশ আবার কী? নিঃস্বার্থ পরোপকারই আমাদের ব্রত—তার আনন্দই আমাদের পুরস্কার।'

পঞ্চুলালের মোহরের গাছ যে কী রকম হয়েছিল, তা তোমরা বুঝতেই পারছ! বেচারা দেবক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে চারিদিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল মোহরের গাছটা কোথায়। দেখে কী—কোথাও কিচ্ছু না, চারিদিক একেবারে শূন্য। যে মোহরকটি এত আশা করে পুঁতেছিল, সেগুলিও কোথায় কখন মিশিয়ে গিয়েছে। পঞ্চুলাল হাত দিয়ে খুঁড়ে, নখ দিয়ে আঁচড়ে চারিদিক চিরে কাঁকুড় চেরা করেও কোনো ফল হল না। তখন পঞ্চু দৌড়ে পুলিশ আপিসে গেল। দারোগার কাছে দুই চোরের নামে ডায়রি লিখে দিয়ে জজসাহেবের কাছে ঘটনার সব কথা খুলে বলল। জজসাহেব বড় গম্ভীর হয়ে শুনলেন, ভারী আগ্রহ দেখালেন, মন তাঁর গলে এল, চোখে জল দেখা দিল। তারপর পঞ্চুর কথা যখন শেষ হল, তখন ধর্মাবতার জজসাহেব হুকুম দিলেন, 'এই ছেলেকে জেলে ভরে রাখো, এর চারটে মোহর চুরি গিয়েছে।' এই অদ্ভুত বিচার দেখে পঞ্চু তো আর নেই। হুড়মুড় করে উঠে সে কী বলতে যাচ্ছিল, তা আর বলা হল না,—দুটো ডালকুত্তা পুলিশের সিপাই তার মুখ চেপে ধরে একেবারে সোজা নিয়ে গারদে ভরে ফেলল।

সেইখানেই তার চার-চারটে মাস কেটে গেল। আরও কতকাল থাকতে হত কে জানে, কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজামহাশয়ের কী একটা যুদ্ধজয়ের জন্য চারিদিকে উৎসবের ধুমধাম পড়ে গেল। সেই অবসরে গোটাকত ভারী ভারী কয়েদী ছাড়া পেলে, তার মধ্যে পঞ্চু ছিল একজন। দারোগা প্রথমে পঞ্চুকে ছাড়তে চায় নি; বলেছিল, 'তুমি তো ভাগ্যবন্তদের দলে নও, তোমায় ছাড়া হতে পারে না। পঞ্চু তো মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, 'হুজুর, ভুল করছেন, আমিও ঐ দলেরই। চুরি, জাল, জুয়োচুরি—এ সবেতেই আমার হাত পেকেছে।' জেলের দারোগা তখুনি লম্বা সেলাম করে দরজা খুলে তাকে খালাস করে দিলে।

ছাড়া পেয়েই পঞ্চু আর দেরি না করে সেই বনের রাস্তা ধরে বনশ্রীর বাড়ির দিকে ছুটল। কিছু দূর যেতে না যেতে সে ক্ষিদের জ্বালায় এমনি অস্থির হয়ে উঠল যে আর থাকতে না পেরে পাশের মাঠ থেকে গোটাকতক আঙুর ছিড়ে নেবার জন্য সেইখানে লাফিয়ে পড়ল। অমনি পঞ্চুলালের পা দুখানি জাঁতিকলে আটকে গেল। শেয়াল এসে ক্ষেতে উৎপাত করে, গৃহস্থের মুরগি হাঁস ধরে নিয়ে

যায়, রসালো আঙুরগুলো খেয়ে পালায়; তাই চাষী এই ফাঁদ পেতেছিল। চুরি করতে গিয়ে, পঞ্চুবাবু সেই ফাঁদে আটকে পড়লেন।

ক্রমে রাত হয়ে এল। একে পায়ের ব্যথা, তার উপর অন্ধকার বন, জনমনিষ্যি কোথাও কেউ নেই—ভয়ে পঞ্চু প্রায় মূর্ছা হয়ে পড়েছিল, এমন সময় দেখলে একটি জোনাকি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তার মিটমিটে আলোটুকু দেখে পঞ্চু বললে, 'ও ভাই জোনাকি, দয়া করে আমার ফাঁদটা খুলে দেবে ভাই?'

জোনাকি বললে, 'আহা, বাছা আমার, কে তোমার এ দশা করলে?'

'আমি ঐ মাঠে গোটাকতক আঙুর পাড়তে এসেছিলাম।'

'বটে? পরের জিনিস নিয়ে যেতে কে তোমাকে শিখিয়েছে বলো তো?'

'বড্ড ক্ষিদে যে পেয়েছিল—'

'ক্ষিদে পেলেই পরের জিনিস নিতে হবে?'

'না না, আর আমি এমন কাজ কখনো করব না—'

এমন সময় ক্ষেতের মালিক এসে উপস্থিত। তার শেয়াল-ধরা ফাঁদে একটা মানুষ ধরা পড়েছে দেখে সে তো অবাক। বললে, 'ওহো, এবার চোর-চক্রবর্তী কে বোঝা গেছে। রোজ রোজ তুমিই বুঝি আমার মুরগিছানা নিয়ে পালাও?'

পঞ্চু কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমি কখনো তোমার মুরগিছানা চুরি করি নি। আমি শুধু গোটাকতক আঙুর নিতে এসেছিলাম।'

'আঙুর চুরিও যা, মুরগি চুরিও তাই! আঙুর-চোর বুঝি সাধুপুরুষ?'

তারপর সে ফাঁদটা খুলে, পঞ্চুর টুটি ধরে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। বাড়ির উঠোনে পৌঁছে পিতলের কড়া বসানো শক্ত একটা বকলস এনে তার গলায় বেশ করে এঁটে একটা লম্বা শিকল দিয়ে তাকে দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে রাখলে। বললে, 'ভালোই হয়েছে, আমার কুকুরটা আজ মারা গেছে—আজ থেকে তুই তার হয়ে পাহারা দিবি। দেখ, বৃষ্টি যদি হয় তো কুকুরের ঘরটার মধ্যে গিয়ে শুয়ে থাকবি। দেখিস, কান খাড়া করে থাকবি, চোর ডাকাত এলে যত পারিস চেঁচাবি।'

হুকুম দিয়েই কর্তা বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঘুমের আয়োজন করলেন।

ভয়ে ক্ষিদেয় শীতে আধমরার মতো হয়ে পঞ্চু মাটির উপর পড়ে রইল। গলার বকলসে হাত দিয়ে বলতে লাগল, 'আহা, যদি ভালো ছেলে হতাম, বাবার কথা শুনতাম, তাহলে কি আজ চাষার দুয়োরে শিকল-বাঁধা কুকুর হয়ে থাকতাম?' আপন মনে বকে বকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘণ্টাকয়েক ঘুমের পরে শুনলে উঠোনে কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। ঘরের মধ্যে হতে মুখ বাড়িয়ে দেখে কি—চারটে বড় বড় কালো কালো বনবেড়াল চুপিচুপি কী পরামর্শ আঁটছে। তাদের একজন এগিয়ে কুকুরের ঘরের কাছে এসে চাপা গলায় বললে, 'ওরে মানিয়া, কী করছিস রে?'

পঞ্চু এগিয়ে এসে বলল, 'আমার নাম তো মানিয়া নয়,—পঞ্চুলাল।'

'কেন, মানিয়া কোথায় গেল ?—সেই যে বড় কুকুরটা ?'

'সে তো আজ সকালে মারা গেছে—আমি তার জায়গায় পাহারা দিচ্ছি।'

'তাহলে মানিয়ার সঙ্গে যে বন্দোবস্ত ছিল, তোমার সঙ্গেও তাই করব—হপ্তায় আমরা আটটা করে মুরগির ছানা চুরি করে নিয়ে যাবে—তার মধ্যে তোমায় একটা দেব। কিন্তু বাপু সাবধান! যদি শোরগোল কিছু কর আর গৃহস্থ খবর পায়, তাহলে তোমায় আর আস্ত রাখব না—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব।'

এই বলে বেড়ালগুলো চুপিচুপি আঙিনায় যেখানে মুরগি আর তার ছানাগুলি ছিল সেখানে একে একে গিয়ে ঢুকে পড়ল। সব্বাই যখন গেছে তখন পঞ্চু দরজাটা খুব জোরে বন্ধ করে তার গায়ে মস্ত একটা পাথর ঠেসিয়ে দিয়ে কুকুরের মতো ভৌ ভৌ করে ডাকতে লাগল। ডাক শুনেই গৃহস্থ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপারখানা কী ?'

পঞ্চু বললে, 'মুরগির ঘরে ডাকাত পড়েছে।'

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে গৃহস্থ মুরগির ঘরে গিয়ে পড়ল। তারপর বেড়ালকটাকে ছালায় ভরে বললে, 'বাছাধনরা সব এতদিনে ধরা পড়েছে। ইচ্ছে করছে তোমাদের গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে ডুগডুগি বাজাই। যাক, তা আর করব না, পাঁঠার দোকানে দেব। তারা যা ভালো বোঝে করবে এখন।'

তারপর পঞ্চুকে আদর করে শিকল আর বকলস খুলে তাকে স্বাধীন করে দিলে। ছাড়া পেয়েই পঞ্চু বনশ্রীর বাড়ির পথে দৌড় দিলে। পথের ধারে বন, বনের মধ্যে সেই মস্ত বটগাছ, যে গাছে পঞ্চুর ফাঁসি হয়েছিল,—সবই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, কেবল বনশ্রীর বাড়ির চিহ্নমাত্রও কোথাও চোখে পড়ল না। তার বুকের মধ্যেটা ধড়াস করে উঠল, ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল। যেখানে বাড়িখানা ছিল, সেখানে গিয়ে দেখে একটি নতুন ছোট্ট মন্দির রয়েছে—মন্দিরের দরজায় লেখা রয়েছে :

শ্যামা বনশ্রী

তার ছোট ভাই পঞ্চু তাকে ত্যাগ করে গেল—সেই

দুঃখে বনশ্রীর মৃত্যু হয়। এই তার স্মৃতিমন্দির।

পঞ্চু অতি কষ্টে বানান করে করে যখন সেই কথাগুলি পড়লে তখন সে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে মাথা কুটতে কুটতে বললে, 'ও দিদি, কেন তুমি মরে গেলে ? আর আমার বাবা, তাকে আমি কোথায় খুঁজে পাব ? কী করব গো, কী আমি করব ?' তার এই কান্নাকাটি শুনে একটা পায়রা সেইখানে উড়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, পঞ্চু বলে কাউকে তুমি জান ?'

'কী বললে ? ও মা, আমিই যে পঞ্চু—'

কবুতরটা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি গুপী ছুতোরকে জান ?'

'জানি নে ? বল কি ? সে যে আমার বাবা। আমায় তুমি তার কাছে নিয়ে যাবে ?'

'তাই তো ! আজ তিন দিন হল তাকে যে জগন্নাথক্ষেত্রে দেখে এসেছি।'

'এখান থেকে কত দূরে এই জগন্নাথক্ষেত্র?'

'এই তিন শো ক্রোশ হবে।'

'ওগো নীল পায়রা, ওগো সুন্দর পাখি, আমায় তুমি নিয়ে যাবে?'

'তা তুমি যেতে চাও তো নিয়ে যেতে পারি।'

বলতে না বলতে পঞ্চু তার পিঠের উপর চড়ে বসে, ঘোড়ার মতো হেট হেট করে তাকে চালাতে লাগল।

সারাদিনটা উড়ে উড়ে সন্ধ্যার সময় কবুতর বললে, 'আমার ভারী ক্ষিদে লেগেছে। এসো আমরা ঐ যে কবুতরের খোপ দেখা যাচ্ছে—ওইখানে দুদণ্ডের জন্য নামি। একটু খেয়ে জিরিয়ে তাজা হয়ে, তারপর আবার উড়ে যাওয়া যাবে এখন। কাল সকালেই সমুদ্রতীরে পৌঁছে যাব।'

তারা একটা খালি কবুতরের খোপে গিয়ে নামল। সেখানে ছোট্ট গামলায় জল আর একটা ডালায় কতকগুলো পায়রা-মটর ছিল। কবুতরটা জল খেয়ে কতকগুলো মটর খুঁটে খেয়েই খুশী হয়ে বসে রইল। পঞ্চু বেচারী জীবনে কখনো পায়রা-মটর মুখেও দেয় নি, কিন্তু আজ ক্ষিদের জ্বালায় সেও তাই খেয়েই খুশী হল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে, জিরিয়ে আবার তারা যাত্রা করলে। ভোরের আলো ভালো করে দেখা দেবার আগেই তারা জগন্নাথক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে হাজির হল। সেখানে অনেক মানুষজন, সমুদ্রের দিকে ভারী চেঁচামেচি করছে, একে ওকে তাকে ঠেলা দিয়ে পঞ্চু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ গা, এত গোলযোগ কিসের?'

একজন বললে, 'ছেলে-হারা একটি বাপ, তার ছেলে খুঁজতে ওপারে যাবে বলে যাত্রা করেছে—তারপর ঝড় উঠে, ওই দেখো না, ছোট্ট নৌকোখানা টলমল করছে, এখুনি ডুবে যাবে বুঝি।'

ভালো করে দেখে পঞ্চু গুপীকে চিনতে পেরেই 'ওই যে আমার বাবা' বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। এদিকে ঝড়ের দাপটে ছোট্ট নৌকো আর বাঁচে না, এই ডোবে বুঝি! পঞ্চু হাত পা ছুঁড়ে কত রকম ইসারা করে ডাকতে লাগল—গলা ফাটিয়ে 'বাবা গো' বলে ডাক ছাড়লে। একবার যেন মনে হল গুপী তাকে চিনতে পেরেছে, কিন্তু সেই ঝড়ে আর বৃষ্টিতে তীরে ফিরে আসা অসম্ভব। হঠাৎ মস্ত একটা ঢেউ লাফাতে লাফাতে হাত বাড়িয়ে এসে এক হেঁচকা টানে নৌকোখানিকে নিয়ে জলের মধ্যে ডুব মারলে, আর তাকে দেখা গেল না। তীরের লোক হায় হায় করে উঠল, পঞ্চু ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে একেবারে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঠের পুতুল হালকা জিনিস, কিছু দূর পর্যন্ত ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে, স্পষ্ট দেখা গেল,—তারপর সেও যে ঢেউএর মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল, আর ঠাহর হল না। তীরের লোকে আবার হায় হায় করে উঠল—কেউ বললে 'হায়রে বাপ', কেউ বললে 'হায়রে হতভাগা ছেলে'—আর বুড়োসুড়ো মানুষেরা জপের মালার থলিটা মাথায় ঠেকিয়ে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে বাড়িমুখো চলে গেল।

পঞ্চু সারাটা রাত ধরে সাঁতার দিল। রাতটাও সহজ নয়,—শুধু বৃষ্টি হলেও মানুষ পারে, তার উপর

শিলাবৃষ্টি ঝড় আর বজ্রপাত—আর বিদ্যুতের এমনি আতসবাজি যে রাতকে দিন করে দেয়। ভোরের দিকে মস্ত একটা ঢেউ এসে তাকে আড়কোলা করে তুলে ছোট একটা দ্বীপের উপর এমনি জোরেই আছড়ে ফেলল যে তার কাঠের হাড়-পাঁজর, পায়ের হাঁটু, হাতের কব্জা, সব খটমট করে উঠল। ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হল, সূর্যদেব দেখা দিলেন, পঞ্চুলাল ফ্যালফ্যাল করে চারিদিক দেখতে লাগল। কিন্তু সেই ছোট্ট নৌকোখানা কোথাও দেখা গেল না। শুধু জল,—নীল জল, কালো জল, ফেনা-ভরা জল, সাপের গায়ের মতো চারিদিকে ভুরিটানা অস্থির জল। কেবলি কাঁপছে, কেবলি দুলছে, কেবলি শব্দ করছে—যেন মস্ত একটি অজগর। পঞ্চু ভয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখলে মস্ত একটি মাছ জলের উপর মাথাটি জাগিয়ে রেখে ধীরে সুস্থে ডাঙার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তার নাম পঞ্চুর জানা ছিল না—তাই পঞ্চু বললে, 'ওগো মাছমশায়, একটি কথা বলতে চাই।'

'একটি কেন, দুটিও বলতে পার।'

'যে নৌকোতে আমার বাবা আছেন সে নৌকো দেখেছ কি ?'

'বোধ হয়, রাতের ঝড়ে নৌকোখানি ডুবেছে।'

'আর আমার বাবা ?'

'তাকে বোধ হয় সেই বোয়াল মাছে গিলে ফেলেছে।'

পঞ্চু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'বোয়াল মাছটা কি খুব বড় ?'

'বড় ! মাগো, সেটা এমনি বড় যে পাঁচতলা বাড়ি কোথায় লাগে—আর তার প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে আধ-ক্রোশ-লম্বা একখানা ট্রেনগাড়ি টুপ করে গলে যায়।'

'বাপরে ! তবে উপায় ?'—এই বলেই পঞ্চু তাড়াতাড়ি দৌড় দিলে। তার ভয় হল পাছে বোয়াল মাছটা রেল মুখে করেই তাকে তাড়া করে। কিছু দূর যেতেই সে ছোট্ট একটি গ্রামে পৌঁছল ; তার নাম 'মধুকর-নিবাস'। দেখলে সেখানে পথে ঘাটে, ঘরে মাঠে, চারিদিকেই লোকজন কাজে ব্যস্ত। কারো দাঁড়িয়ে গল্প করবার অবসর নেই। কুঁড়ে পঞ্চু মনে মনে ভাবলে, এ গ্রামে আমার বাস করা পোষাবে না। কিন্তু পেটে তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলেছে, কিছু খেতে না পেলে আর উপায় নেই। বাপের কাছে সে শিক্ষা পেয়েছিল যে ভিক্ষা করা বড় অপমান। কিন্তু তবু ভিক্ষার কথাটাই তার মনে এল। এমন সময় দেখলে কি, একটি বুড়োমানুষ অতি কষ্টে দুটি ছোট গাড়িতে করে কয়লা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চু তার কাছে গিয়ে বললে, 'মশায়, দয়া করে যদি দুটি পয়সা দেন, তবে খেয়ে বাঁচি ; কাল থেকে অনাহারে আছি।'

লোকটি বললে, 'দু পয়সা কেন, আমি তোমায় দু আনা দেব—তুমি আমার এই গাড়ি দুটি টেনে বাড়ি পৌঁছে দাও তো।'

বোকা পঞ্চুর ভারী রাগ হল। কী! এত বড় অপমান ? আমি কি গাধা যে গাড়ি টানব ? সে রেগেমেগে বললে, 'আপনার তো দেখছি ভারী আক্কেল, আমায় কি গোরু মোষ পেয়েছেন যে গাড়ি টানতে হবে ? আমার জন্মে কখনো এমন কাজ করি নি।'

বুড়ো মানুষটি হেসে বললে 'ওমা তাই তো, জন্মে কর নি, দেখো—মরলেও কোরো না যেন! তোমার অহংকারের চাপাটি আর রুটি বানিয়ে খেয়ে থেকো, দেখো যেন অজীর্ণ না হয়!'

কিছুক্ষণ পরে একজন রাজমিস্ত্রী সেই পথ দিয়ে একঝুড়ি চুন ঘাড়ে করে যাচ্ছিল। পঞ্চু আবার বললে, 'মহাশয়, দয়া করে যদি দুটি মাত্র পয়সা দেন, তবে খেয়ে বাঁচি।'

রাজমিস্ত্রী বললে, 'এসো বাছা, আমার এই চুনের ঝুড়িটা বয়ে দাও, আমি তোমায় দুটো ছেড়ে দশটা পয়সা দেব।'

পঞ্চু বললে 'ও বাবা। তাহলে যে বড্ড পরিশ্রম হবে।'

রাজমিস্ত্রী হেসে বললে, 'তবে বিশ্রামই করো, হাই তুলতে তুলতে পেটখানা ঢাক হয়ে উঠবে।'

এমনি করে কত লোক সে পথ দিয়ে গেল ; সবারি কাছে পঞ্চু হাত পাতলে, সবাই বললে, 'ছিঃ ভিখ মাঙ্‌তে লজ্জা করে না? কাজ করো।'

সবাই যখন চলে গেল, একজন আধা-বয়সী স্ত্রীলোক সেই পথে এল। সে দু হাতে দুই বালতি ভরে জল নিয়ে যাচ্ছিল। পঞ্চু তাকে দেখে বললে, 'মাগো, আমায় তোমার বালতি থেকে একটু জল খেতে দেবে? আমার বড্ড পিপাসা পেয়েছে।'

স্ত্রীলোকটি বালতি দুটি নামিয়ে রেখে বললে, 'পিপাসা লেগেছে? আহা, তবে জল খাও।'

জল খেয়ে পঞ্চু বললে, 'তৃষ্ণা তো মিটল, কিন্তু ক্ষুধায় যে প্রাণ যায়।'

স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ বললে, 'আমার একটা বালতি বাড়ি পৌঁছে দাও, তাহলে আমি তোমায় ভাত খেতে দেব।'

পঞ্চু বালতির দিকে চেয়ে রইল, হাঁ কি না কিছুই বললে না। স্ত্রীলোকটি বললে, 'শুধু ভাত নয়, খুব ভাল ফুলকপি আর কড়াইশুটির ডালনাও খাওয়াব।' এবারও পঞ্চু হাঁ কি না কিছুই বললে না। আবার সেই স্ত্রীলোকটি বললে, 'শেষে রসে ভরা একগণ্ডা রসোগোল্লা পাবে।' এ প্রলোভনে পঞ্চু কাবু হয়ে গেল, সে তৎক্ষণাৎ বালতি মাথায় করে নিয়ে চলল। বাড়ি পৌঁছে স্ত্রীলোকটি পঞ্চুকে আদর করে বসালে, দিব্যি আসন পেতে, জল দিয়ে, থালায় করে ভাত বেড়ে দিলে। দেখতে না দেখতে থালা ফরসা হয়ে গেল। খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে পঞ্চু যখন একটু অবসর পেলে তখন সে সেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইল—চোখ আর ফেরে না, যেন তাকে কেউ জাদু করেছে।

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, 'অমন হাঁ করে কী দেখছ বাছা?'

পঞ্চু বললে, 'তুমি কে? সত্যি বলো, তুমি কি সেই? তুমি কি আমার দিদি বনশ্রী?' বলেই স্ত্রীলোকটির পা জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে পঞ্চু কাঁদতে লাগল।

প্রথমে সে তো কিছুতেই স্বীকার করে না যে সে শ্যামা বনশ্রী, তারপর যখন দেখলে পঞ্চু ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছে তখন হেসে বললে, 'হ্যাঁরে দুষ্টু, কী করে বুঝলি যে আমি বনশ্রী?'

'আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি তাই বুঝতে পারলাম।'

'তুমি আমায় যখন ছেড়ে এয়েছিলে তখন আমি ছোট ছিলাম। এখন এত বড় হয়েছি যে তোমাকে আমার ছেলে বলে মনে হচ্ছে।'

'ভালোই হল—এবার থেকে তোমায় মা বলব। আমার তো মা ছিল না,—সব ছেলেরই মা আছে, আর মা নেই বলে আমার দুঃখু হত। এখন তুমি মা হলে। আচ্ছা মা, কেমন করে এত শীগগির এত বড় হয়ে গেলে? আমিও বড় হতে চাই—আমি বুঝি চিরকাল এই বামন অবতার হয়ে থাকব?'

'তুমি যে কাঠের পুতুল, তুমি এর চেয়ে আর কখনো বাড়বে না।'

'বাঃ, আমি যে মানুষ হতে চাই।'

'সে তো সোজা কথা। ভালো হও, তবেই মানুষ হবে।'

'আমি বুঝি ভালো নই?'

একেবারেই না। ভালো ছেলেরা কথা শোনে।'

'তা ঠিক, আমি কথা আদবেই শুনি নে।'

'ভালো ছেলেরা লেখাপড়া শেখে, কাজ করে, আর তুমি—?'

'আমি শুধু ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াই।'

'ভালো ছেলেরা সত্যি কথা বলে।'

পঙ্কু বললে, 'আবার যদি আমার বাবাকে দেখতে পাব জানি তবে আমিও ভালো হই।'

'আমার বিশ্বাস তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। তুমি আমার জন্য অত কেঁদেছিলে, তাই আমি বুঝেছিলাম তোমার মনটা ভালো—চেষ্টা করলে ভালো হতে পারবে। তাই তোমার খোঁজে এসেছি। এখন আমি যা বলব তাই করবে, বলো—তা হলে তোমার ভালো হবে।'

পঙ্কু বললে, 'আমি এখন থেকে তোমার কথামত চলব। পুতুল আর থাকতে চাই নে, এবার মানুষ হব।'

ঠিক হল পরদিন থেকে পঙ্কু ইস্কুলে যাবে।

[ক্রমশ

মহাপুরুষ উপেন্দ্রকিশোর

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

একদিন ডাকে আমার কাছে একখানি পত্রিকা আসিল। কৌতূহলী হইলাম। খুলিয়া দেখিলাম, পত্রিকাখানির নাম 'মুকুল'। আমার মা জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগান হইতে পাঠাইয়াছেন। খুলিয়া দেখিলাম, পাতায় পাতায় ছবি ও গল্প। লিখিয়াছেন অনেকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখাটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন বাড়ির পাশে আমগাছতলায় বসিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। প্রবন্ধটির নাম 'সেকালের কথা'। সেকালের জীবজন্তুদের ছবি, তাহাদের কোনো কালে দেখি নাই, দেখিবার আশাও করি নাই। এইসব বিচিত্র অদ্ভুত ছবি। আমার মনে পড়ে সে সময়ে সত্তর বৎসর আগে 'গল্প হলেও সত্য' গল্পটি পড়িয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াছিলাম। কী করিয়া একটি জাহাজের নাবিকের সহিত এক বাঘের ভালোবাসা হইয়াছিল ও সেই ভালোবাসার প্রতিদান কিরূপ সুন্দর, তাহা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমরা তো এ গল্প পড়িয়া প্রচুর আনন্দ পাইতাম। এমনি করিয়া 'পূর্বদিনের কথা', 'অন্ধজনের কথা' প্রভৃতি উপেন্দ্রকিশোরের লেখা বহু প্রবন্ধ পড়িয়াছি ও তাঁহাকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছি। এই উপেন্দ্রকিশোর লোকটি কেমন দেখিবার জন্য বড় কৌতূহল হইত। আমার মাতুল রেবতীমোহন সেন একবার দেশে আসিলেন। তাঁহাকে সেই পত্রিকাখানি দেখাইলাম ও জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি এই উপেন্দ্রবাবুকে জানেন?' তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'জানি না কী রে! তিনি অতি মহৎ লোক। এঁর লেখা ছোটদের অতি প্রিয়।' আমি বলিলাম, 'আমাকে দেখাতে পারেন?' তিনি উত্তরে বলিলেন, 'তিনি তো আমাদের সমাজেরই লোক।' তখন আমার মাতুল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সুগায়ক ও প্রীতিভাজন ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত।

অনেকদিন পর কলিকাতা আসিলাম। মামা কলিকাতায় থাকিতেন ২৮/২ অখিল মিস্ত্রী লেনে। একদিন তাঁহাকে বলিলাম, 'আমাকে উপেন্দ্রবাবুর ওখানে লইয়া চলুন।' তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'বেশ তো!' তখন কলিকাতা সার্কুলার রোডে মূকবধিরদের বিদ্যালয় হইয়াছে। তিনি সেখানে শিক্ষকতা করিতেন। মামার সঙ্গে সেই স্কুলে গেলাম, মূকবধিরদের শিক্ষার কৌশল দেখিলাম।

তারপর অপরাহ্নে মামার সহিত সুকিয়া স্ট্রীটে উপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলাম। সেখানে উপেন্দ্রবাবু পরিবারবর্গ লইয়া বাস করিতেন। সেই বাড়িটির নীচে ছিল ছাপাখানা ও অফিস। উপরের একটি ঘরে তিনি লেখাপড়া ও কাজকর্ম করিতেন। আমাকে লইয়া সেই বড় ঘরটির পর্দা সরাইয়া রেবতীবাবু মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, 'আসতে পারি কি?' উপেন্দ্রবাবু আনন্দের সহিত বলিলেন, 'এ আবার কী কথা! আসুন! আসুন!' মামা বলিলেন, 'আমার সঙ্গে এক ভাগ্নে আছে। সে [illegible] এক[illegible] ভক্ত। আপনাকে দেখবার জন্য সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।' উপেন্দ্রবাবুর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া [illegible]। [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিতেই দুই হাত দিয়া আমাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তখন তাঁহাকে [illegible]।

প্রফুল্লহাস্য মুখ, গৌরকান্তি দীর্ঘ দেহ, [illegible] দাড়ি, মাথায় কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশ। তাঁহাকে চিত্রে অঙ্কিত ছবির ন্যায় সুদৃশ্য দেখাইতেছিল। [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমার কী কী গল্প পড়েছ?' আমি তখন বিনা সংকোচে তাঁহার 'সেকালের কথা', 'গল্প হলেও সত্য', 'অন্ধজনের কথা' প্রভৃতির নাম বলিলাম।

আমার মনে হইল তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন। হাসিমুখে বলিলেন, 'বেশ বেশ, আশীর্বাদ করি তুমি ভালো ছেলে হও।' তারপর জলখাবার আসিল ও আঙুরের সহিত নানা বিষয়ে কথা হইল।

সেদিনের সেই প্রথম দেখা আমার হৃদয়ে যে ছাপটি আঁকিয়া দিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারি না। তারপর জীবনে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুবার দেখার সুযোগ হইয়াছে। সে ব্রাহ্মসমাজেই হউক কি সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতেই হউক বা গড়পার রোডেই হউক, আগে পরের কথা। তাঁহার প্রথম দৃষ্টিতে যে একটি স্নেহপ্রবণ সদাশয় ব্যক্তির দৃষ্টি লাভ করিয়াছি তাহা শেষ জীবনেও বিলুপ্ত হয় নাই। আজও তাঁহার সেই সৌম্যমূর্তি আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহাকে ভুলি নাই, জীবনের শেষদিন পর্যন্তও ভুলিব না। এমনি ছিল তাঁহার ভালোবাসা।

উপেন্দ্রকিশোর জন্মিয়াছিলেন ১২৭০ সনের ২৮শে বৈশাখ তারিখে। শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন দিক্‌পাল। তখনকার দিনে বাংলাসাহিত্যে শিশু ও কিশোরদের জন্য চিন্তা করিতেন কেশবচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতি। কেশবচন্দ্রের 'বালকবন্ধু' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সে কথা সকলেরই জানা আছে। তাহার পর প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত 'সখা' ছিল অমূল্য রত্ন। এই 'সখা' প্রকাশের জন্য প্রমদাচরণ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন ও ছবি আঁকিতেন। তারপর প্রকাশিত হইল 'সাথী,' 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি মাসিকপত্র। ইহাদেরই মধ্যে আমরা উপেন্দ্রকিশোরের অবদান পূর্ণরূপে দেখিতে পাই।

উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে যাঁহারা আলাপ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এরূপ সদাশয়, ধর্মপ্রাণ, শিশু ও বালকদের কল্যাণকামী ব্যক্তি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুদের কিসে ভালো হয়, কিসে তাহারা গল্প, আনন্দ ও শিক্ষার ভিতর দিয়া মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে তাহাই ছিল তাঁহার প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য 'সন্দেশ' হইল অপূর্ব সৃষ্টি। 'সন্দেশ' সেই সময় সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে ও উপেন্দ্রকিশোরের কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার রায় যোগ্যতার সঙ্গে 'সন্দেশ' পরিচালনা করিয়াছিলেন।

সন্দেশে তিনি বিবিধ গল্প, উপন্যাস এবং কাব্য সৃষ্টি করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে চিত্রও আঁকিতেন। নিজে ছিলেন শিল্পী। প্রত্যেকটি ছবি তিনি দরদ দিয়া আঁকিতেন। হাসির ছবির তিনি ছিলেন মস্ত বড় একটি জুড়ি। হাফটোন চিত্রাঙ্কন বিষয়ে এবং তাহার উন্নতিকল্পে উপেন্দ্রকিশোরের নিত্য নূতন আবিষ্কার জগদ্বিখ্যাত। পৃথিবীর সর্বদেশে ইহা সমাদৃত। ইংরাজ কোম্পানি তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়মকানুন অনুসরণ করিয়া উপেন্দ্রকিশোরের অনুমতি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

তাঁহার লিখিত বইগুলির মধ্যে 'ছেলেদের মহাভারত', 'ছোটদের রামায়ণ', 'টুনটুনির বই' ইত্যাদি অসংখ্য বইয়ের নাম করা যাইতে পারে। আমরা কতই না আগ্রহে এই সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া আনন্দ অনুভব করিতাম। এই সমস্ত বই সেকালে তরুণদের মন মুগ্ধ করিত, নূতন আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করিত। একালেও তাহার প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান।

উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের মুখে যে দু-একটি গল্প শুনিয়াছি তাহা নীচে দিলাম :

পুরাতন বেহালা বিষয়ে তারিজিয়ো একজন অতিশয় প্রামাণ্য এবং বিশেষজ্ঞ লোক ছিলেন। একবার তিনি জাহাজে চড়িয়া কোথাও যাইতেছেন ; সঙ্গে ওসারিনির অথবা গ্যাস্পার ডি সালর, হাতের (ঠিক ভুলিয়া গিয়াছি),

একখানি 'চেলো' (বড় আকারের বেহালা)। বিস্কে উপসাগরে আসিয়া জাহাজ ঝড়ে পড়িয়াছে ; রক্ষার আশা অতি কম ; আরোহীরা আপন আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল। ইহার মধ্যে তারিজিয়ো করিয়াছেন কি, জাহাজের একটু উঁচু এবং ফাঁকা একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া দুই হাতে প্রাণপণে চেলোখানিকে উঁচু করিয়া ধরিয়া রহিয়াছেন! ডুবিতে হইলে নিজে আগে ডুবিবেন, কিন্তু বেহালাখানিকে বাঁচানো চাই! ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে যাত্রা ঝড়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া তারিজিয়ো দেশে ফিরিলেন। তাঁহার ঝড়ে পড়ার সংবাদ পাইয়া বন্ধুরা যারপরনাই ব্যস্তভাবে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। 'কী হে! বড় নাকি ঝড়ে পড়েছিলে!' 'আর ভাই, সে কথা বোলো না ; বেহালাটা আর একটু হলে গিয়েছিল আর কি!'

আর একটি গল্প হইল—একজন ভারী শৌখীন লোকের একটি পুরাতন বেহালা ছিল। ঐ বেহালায় কোনো স্থান মেরামত করাইবার দরকার হওয়ায় তিনি এক প্রসিদ্ধ কারিগরের দোকানে গেলেন। কারিগর বলিল যে, 'বেহালাটা না খুললে দোষ সারানো যাবে না।' কিন্তু শৌখীন ব্যক্তি কিছুতেই বেহালা খুলিতে দিতে রাজী হইলেন না। ইহাতে কারিগর বলিল যে, 'তবে আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। আপনি অন্য কোথাও দেখুন।' তখন আর কী করা যায়, অগত্যা তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, খোলো ; কিন্তু আমি সামনে থাকব।' সুতরাং বেহালা খুলিবার সময় তাঁহাকে একখানি চেয়ার দেওয়া হইল। পুত্রের শরীরে সাংঘাতিক অস্ত্রোপচার হইতে দেখিলে পিতার মুখ যেমন হয়, তেমনি মুখ করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া বেহালা খোলা দেখিতে লাগিলেন। বেহালার কোনো স্থান ফাটিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কারিগরেরা বেহালায় টোকা মারিয়া দেখে। এ বেহালাখানিকে টোকা মারিবামাত্রই তাহার মালিক 'উঃ!' করিয়া উঠিলেন। টোকার পর টোকা পড়ে, আর তিনি বলেন, 'উঃ!' তারপর একখানি ছুরির সাহায্যে কারিগর বেহালার জোড় খুলিতে আরম্ভ করিল। আশ্চর্যের বিষয়, তখন শৌখীন ব্যক্তি কোনো গোলমাল করিলেন না। খোলা শেষ হইলে কারিগর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, 'এই তো হয়ে গেল মশাই!' কিন্তু তাঁহার কথা শোনে কে? শৌখীন ব্যক্তি ততক্ষণে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার এই গল্প দুটি উপেন্দ্রকিশোর 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিজের মুখে এই গল্প দুটি শুনিয়াছেন তাঁহারা হাসিতে হাসিতে অস্থির হইতেন। উপেন্দ্রবাবু এমনি সুন্দরভাবে বেহালা ধরিয়া অভিনয় করিতেন মনে হইত যেন প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটিতেছে। আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল তাঁহার সেই সুন্দর অভিনয় দেখিবার। আমার তরুণ বয়সের সেই মধুর স্মৃতি এখনও জাগিয়া আছে। আমি তাঁহার অপূর্ব বেহালাবাদন ব্রাহ্মসমাজে দুইবার শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ধীর স্থির ভাবে বেহালা পরিচালনা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিত। এখনও প্রতি বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের ১১ই মাঘের উৎসবে তাঁহার রচিত 'জাগো পুরবাসী, ভারতপ্রেমপিয়াসী' গানটি গীত হয়।

আমি তাঁহার পুত্রকন্যাগণের মধ্যে সুকুমার, সুবিনয়, সুবিমল ও কন্যা সুখলতা ও পুণ্যলতাকে জানিতাম। আজ তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিতযশা। যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা এই বৃদ্ধ বয়সেও পিতার নাম চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের সহিত আমার যে নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আমার জীবিতকালে কোনোদিন বিলীন হইবে না। আজ এই কীর্তিমান মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার মঙ্গলময় বাণী বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ষিত হউক। আমি তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি।

রকেট-রকেট

[illegible] চট্টোপাধ্যায়

পকেট ভরে রকেট পুরে লাফ দি যদি শূন্যে
হাত দিয়ে চাঁদ ধরতে পারি পক্ষীরাজের পুণ্যে।
মস্কো থেকে নকশা-করা খামে খবর পেলে
সামনে চড়াই দু হাত বাড়াই পেছন এলেবেলে।
মেঘ দাবড়াই মেঘ দাবড়াই শূন্যে রাখি পা
হাওয়ার মুখে লাগাম দিয়ে পক্ষীরাজের ছা।

চলতে মটাশ উঠতে পটাশ কেউ আকাশে হন্যে
৯-কার মিছে ডিগবাজি খায় চাঁদ ধরবার জন্যে।
মেঘডম্বুর মেঘডম্বুর মেঘের মাথায় ঘুণ
চরকা-কাটা চাঁদের বুড়ি হেসেই হল খুন।
চোখের উপর পক্ষী নাচে আর নাচছে কী
ভোঁ বন্ বন্ বিগড়ে মাথা ঘুরছে পৃথিবী।

পুষ্যিপুকুর দুধের সরা
সূয্যি চাঁদে আকাশ ভরা
এপার আকাশ ওপার আকাশ মধ্যিখানে হাওয়া
পকেট ভরে রকেট পুরে শূন্যে আসা যাওয়া॥

অরুণ চৌধুরী

[illegible]

ভয়ংকর

ঘুম ভেঙে গেল…

ঘুম ভেঙে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

সেই বীভৎস চিৎকার কানে গেলে জ্যান্ত মানুষ তো দূরের কথা, বোধ হয় কবরের মড়াও ‘বাপ রে’ বলে কবরের মধ্যে ধড়মড়িয়ে উঠে বসত…

ঘুমের ঘোর তখনও চোখ থেকে কাটে নি, আমার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠল এক ভয়ংকর দৃশ্য!

ভালো করে চোখ মুছে চাইলুম—না, স্বপ্ন নয়, নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অনেকগুলি চতুষ্পদ জীব—তাদের রোমশ দেহের কালো কালো চামড়ার উপর নাচছে অগ্নিকুণ্ডের রক্তিম আলোকধারা, অঙ্গার কণিকার মতো চোখে চোখে জ্বলছে ক্ষুধিত হিংসার নিষ্ঠুর প্রতিচ্ছবি।

কাকাতো হাতের বর্শা বাগিয়ে ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল, ঠাণ্ডা গলায় বললে, ‘মিঃ ম্যাক, বাঁচার আশা রেখো না, সাদা শয়তানের দল যাকে ঘিরে ধরে তার নিস্তার নেই—তবে মরার আগে মেরে মরব।’

পাশের রাইফেলটা তুলে ধরে সেফটি ক্যাচটা সরিয়ে দিলুম। সহসা একটা জানোয়ার অগ্নিকুণ্ডের খুব কাছে এসে চিৎকার করে উঠল—অস্পষ্ট আলোর আভায় ঝকঝক করে উঠল তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি।

অগ্নিকুণ্ডের কাছে ও দূরে যে চতুষ্পদ জীবগুলি এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল।

কাকাতো বললে, ‘মিঃ ম্যাক, প্রস্তুত হও—এবার ওরা আক্রমণ করবে।’

রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে চার পাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম। সামনে অগ্নিকুণ্ড, তার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমান যমদূতের দল, আগুনের এধারে আমি আর কাকাতো, পিছন থেকে আমাদের বাঁদিক ও ডানদিক দিয়ে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর।

আমার কাছে রাইফেলের কার্তুজ খুব বেশী নেই, ভরসা খালি আগুন। কিন্তু আগুনের তেজ কমে এসেছে ; জ্বালানি কাঠ, বসার টুল, এমনকি তাঁবুটাকেও আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি—আর এমন কিছু নেই যা দিয়ে আগুনটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়—এবার ?

কাকাতোর দিকে তাকিয়ে দেখলুম তার [illegible] পাথরের মতো মুখ সম্পূর্ণ নির্বিকার, শুধু শরীরের মাংসপেশীগুলি যেন এক ভয়ংকর প্রতীক্ষায় ফুলে ফুলে উঠছে···

সামনের জানোয়ারটা আরও কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে আগুন ডিঙিয়ে একেবারে আমাদের সামনে এসে পড়ল। [illegible] সঙ্গে দেখলুম তাকে অনুসরণ করে আরও দুটো জানোয়ার আগুনের বেড়ার উপর দিয়ে শূন্যে লাফ মারল।

আমার হাতের রাইফেল সশব্দে [illegible] করলে, সামনের জন্তুটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল।

কাকাতো [illegible] বর্শা চালিয়ে [illegible]কেও মাটিতে পেড়ে ফেলল ; কিন্তু তিন নম্বর শয়তানটা তার দেহের উপর এসে [illegible] বিকট হাঁ করে শত্রুর গলায় কামড় বসাবার উপক্রম করলে।

ভীষণ আতঙ্কে আমার হাতের আঙুল অবশ হয়ে এল—গুলি চালাবার উপায় নেই, কাকাতোর গায়ে গুলি লাগতে পারে।

আমি [illegible] এক বিয়োগান্ত নাটকের রক্তাক্ত দৃশ্যের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

কিন্তু এত [illegible] দেহের [illegible] দিয়ে কোনো উপবাসী শ্বাপদের উপবাস ভঙ্গ করতে কাকাতো [illegible] না—[illegible] মাথা [illegible] সে গলাটা [illegible] নিল, কিন্তু তীক্ষ্ণধার দাঁতগুলি তার [illegible] এঁকে [illegible] এক গভীর ক্ষতচিহ্ন।

কাকাতোর [illegible] বর্শায় আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল—তীব্র [illegible] জন্তুটার রক্তাক্ত দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ল—সব শেষ।

স্বস্তির [illegible] বললুম, 'যাক, বাঁচা গেল।'

কাকাতোর মুখে শুকনো হাসি খেলে গেল, [illegible] ম্যাক, বাঁচবার আশা রেখো না—ওরা আবার আক্রমণ করবে।'

সত্যিই তাই।

পর পর তিনটি সঙ্গীর মৃত্যু দেখে জন্তুগুলো একটু সরে গিয়েছিল কিন্তু একটু পরেই কয়েকটা জানোয়ার আবার আগুনের বেড়া ডিঙিয়ে আক্রমণ করল।

আবার গর্জে উঠল আমার হাতের রাইফেল, রক্তে লাল হয়ে গেল কাকাতোর হাতের বর্শা—আমাদের সামনে আর অগ্নিকুণ্ডর ওপাশে পড়ে রইল কতকগুলি শ্বেতকায় প্রাণহীন পশুদেহ।

কিন্তু শয়তানের দল পালিয়ে গেল না। কিছুক্ষণ পর পর তারা আক্রমণ করে, মাটিতে পড়ে থাকে কয়েকটা হতাহত জানোয়ার, ওরা পিছিয়ে আবার আক্রমণ করে···

হঠাৎ সভয়ে দেখলুম রাইফেলের বুলেট ফুরিয়ে গেছে।

অকেজো জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোমরের রিভলভারটা টেনে নিলুম—মাত্র ছয়টি বুলেট তাতে ভরা আছে, সঙ্গে আর কার্তুজ নেই!

কাফাতোর নীরস কণ্ঠ শুনতে পেলুম, 'মিঃ ম্যাক, ওরা আবার আসছে···'

আহোয়ার সাদা কুকুর সম্পর্কে কোনো কথা আগে শুনি নি। পরে যখন জানতে পারলুম তখন মনে মনে ঠিক করে ফেললুম কয়েকটা সাদা কুকুরের চামড়া জোগাড় করতেই হবে।

আমি জাত শিকারী, শিকার আমার শুধু নেশা নয়—পেশাও বটে। যেসব জানোয়ার সচরাচর দেখা যায় না তেমন বহু জন্তু আমি শিকার করেছি এবং পৃথিবীর বিখ্যাত জাদুঘরগুলি আমার কাছ থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সেই সব বিরল পশুচর্ম সংগ্রহ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। আমার হাতে নিহত সাদা কুকুরগুলি এখন ম্যানিলা, পাপিতি এবং হনলুলুর বিখ্যাত জাদুঘরের শোভাবর্ধন করছে।

তাদের সাদা চামড়ার শোভায় মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা প্রায়ই চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাঃ! বাঃ! কী সুন্দর! কী চমৎকার!'

চমৎকারই বটে! এই চমৎকার চামড়া জোগাড় করতে গিয়ে আমার গায়ের চামড়াই শরীর-ছাড়া হওয়ার উপক্রম করেছিল। সেই কথাই বলছি···

আহোয়া উপত্যকায় যাওয়ার আগে অবশ্য এই সাদা কুকুরদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। পরে জানতে পারলুম হাঙ্গারির 'কোভাজ' জাতের কুকুর থেকেই এদের উৎপত্তি।

এইজাতীয় কুকুরগুলি অত্যন্ত হিংস্র এবং শক্তিশালী হয় এবং এদের দেহের আয়তনও নেকড়ের চাইতে একটুও ছোট নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিভাওয়া দ্বীপে কোনো এক হতভাগা ইউরোপীয় নাবিক কয়েকজোড়া কোভাজ কুকুর আমদানি করে। হাঙ্গারির কোভাজ বছরের পর বছর এই দ্বীপে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে।

কিন্তু দ্বীপের মাঝখানে মানুষের হাতের তৈরী খাবার কোথা থেকে জুটবে? অতএব ক্ষুধার্ত কুকুরদের চোখ পড়ল পাহাড়ী ছাগল, বুনো মোষ ও গোরুর দিকে—হিভাওয়া দ্বীপের উপর শুরু হল এক বিভীষিকার রাজত্ব।

এইভাবে সভ্য জগতের বাইরে হিভাওয়া দ্বীপের ওহিও উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করল একদল হিংস্র রক্তলোলুপ শ্বাপদ—বিপুলবপু কোভাজ বিপুলতর হয়ে উঠল বন্য প্রকৃতির সংস্পর্শে, ধূসর রঙের ছোঁয়া লাগল তার দুধসাদা চামড়ায়, স্বভাবে তারা হয়ে উঠল আরও হিংস্র, আরও ভয়ংকর।

ইউরোপীয় নাবিকদের সঙ্গে আরও দুটি জানোয়ার এই দ্বীপে পদার্পণ করেছিল—ইঁদুর এবং বিড়াল। সাদা মানুষগুলি এখন আর নেই বটে কিন্তু কুকুর, বিড়াল আর ইঁদুর—এরা সবাই আছে।

কুকুরগুলি এখন বিরাটকায় নেকড়ে বাঘের আকার ধারণ করেছে, ইঁদুরগুলি প্রায় ভোঁদড়ের মতো এবং বিড়ালগুলি আমাদের পোষা বিড়ালের চাইতে অনেক বড় হয়ে বন্য মার্জারে পরিণত হয়েছে।

ওহিও উপত্যকার 'বনবিড়াল' এখন 'বুনো ইঁদুর' শিকার করে, কুকুরগুলি ইঁদুর বা বিড়াল কাউকেই রেহাই দেয় না।

আর ইঁদুরগুলি কী খায় ?

ইঁদুররা সর্বভুক—ফলমূল, পাখি, গিরগিটি, রুগ্ন কুকুর বা বিড়াল তো বটেই, এমন কি সুযোগ পেলে জাতভাইএর রক্তমাংসে উদরপূরণ করতেও তারা আপত্তি করে না।

যে ইউরোপীয় ভবঘুরের দল এখানে প্রথম এসেছিল তাদের কী হল ?

ক্ষুধার জ্বালায় সুসভ্য নাগরিক নরখাদকে পরিণত হল—এখনও এখানকার দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু লোক রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়, অনেক খোঁজাখুজি করেও তাদের পাত্তা মেলে না। এখানকার দেশী মানুষদের চেহারা ও আচার-ব্যবহারে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। মিশনারিদের কল্যাণে তারা সভ্যজগতের নিয়মকানুন কিছুটা শিখেছে বটে কিন্তু মন থেকে মেনে নেয় নি।

কাফাতো ঠিক এদের মতো নয়। তার বাপ ছিল মালয়ের অধিবাসী—সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তার পেশা। ভবঘুরে নাবিকের রক্ত শরীরে থাকলেও কাফাতো তার দেশ ছেড়ে এদিক ওদিক যেতে চাইত না, বরং বর্শা আর ছুরি হাতে শিকার করতেই সে বেশী ভালোবাসত।

শিকারের হাত তার চমৎকার। কাফাতোর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ হয়েছিল কিন্তু তার বেতের মতো পাকানো ছোট শরীরটা বয়সের ভারে একটুও কাবু হয় নি। রক্তারক্তি আর হানাহানিতে তার বড় আনন্দ ; তাকে ঠিক শিকারী না বলে 'খুনে' বললেই সঠিক আখ্যা দেওয়া হয়।

হিভাওয়া দ্বীপে যেদিন এসে নামলাম সেদিনই কাফাতোর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমার উদ্দেশ্য জানতে পেরে সে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হেসে ফেলল, 'তুমি বুঝি কুকুরের মাংস খুব পছন্দ কর ?'

মাংস নয়, শুধু চামড়ার জন্য মানুষ এমন বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে এ কথা কাফাতোর কাছে অবিশ্বাস্য। তবু যখন অনেক কষ্টে তাকে বোঝাতে পারলাম যে কুকুরের মাংস খাওয়ার লোভ আমার নেই তখন সে গম্ভীরভাবে বললে, 'ঠিক আছে, চামড়া তোমার—মাংস আমার। তবে সাদা কুকুরের মাংসের রোস্ট যদি খাও তাহলে জীবনে ভুলতে পারবে না…'

শিকারের অনুমতি নিতে আমায় অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছিল। হিভাওয়া দ্বীপটা ফরাসীরা শাসন করে, আর ফরাসীদের মতো সন্দেহপ্রবণ জাত দুনিয়ায় নেই। অনেক হাঙ্গাম-হুজ্জুত করার পরে কর্তৃপক্ষ আমাকে দয়া করে দু সপ্তাহ সময় দিলেন—তার মধ্যে আমার কাজ শেষ করে বিদায় নিতে হবে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এক অজানা দ্বীপের অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারব কি না এই কথা ভেবে দস্তুরমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলুম, এমন সময় হঠাৎ কাফাতোর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় স্বস্তি বোধ করলুম।

পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কাফাতো খুব উদার। কুকুরের মাংসের মতো লোভনীয় খাদ্যে আমি কোনো ভাগ বসাব না এতেই সে খুশী—চামড়ার মতো 'অখাদ্য' জিনিস নিয়ে তার কী লাভ?

'চামড়া তোমার—মাংস আমার,' এই তার শর্ত।

শর্তটা আমাদের দুজনেরই খুব ভালো লাগল।

সন্ধ্যার ধূসর যবনিকাকে লুপ্ত করে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। ক্যাম্পের সামনে আগুন জ্বালিয়ে আমি চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। ঠিক হল প্রথম রাত আমি নিদ্রাসুখ উপভোগ করব আর কাফাতো পাহারা দেবে, বাকি রাতটা কাফাতোকে ঘুমোবার সুযোগ দিয়ে আমি জেগে থাকব।

ক্লান্ত শরীরে ভরপেট খাওয়ার পরে চোখ বুজতেই ঘুম এসে গেল।

একটা বীভৎস চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা আগেই বলেছি।

হাঁ, ওরা আসছে—আসবেই। এখনই তীক্ষ্ণ দাঁতের আঘাতে টুকরো হয়ে যাবে আমাদের শরীর দুটো। নিশ্চিত মৃত্যু করাল ফাঁদ মেলে ছুটে আসছে, ঘিরে ধরছে আমাদের—এই ভয়ংকর মরণ-ফাঁদ থেকে আমাদের নিস্তার নেই···

কিন্তু আমি এখনও আশা ছাড়ি নি।

একটা উপায় আছে—শেষ উপায়।

হাতের রিভলভার উঁচিয়ে ধরে উপরি উপরি ছয়বার গুলি ছুঁড়লাম—চার-চারটে কুকুর মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল।

বাকি জন্তুগুলো আবার দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল।

ফাঁকা রিভলভারটা ফেলে দিয়ে কেরোসিনের বোতল আর টিনটা তুলে নিলুম, চিৎকার করে বললাম, 'কাফাতো, খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যাও—আমি পিছনে আসছি।'

শুনেছিলাম এই কুকুরগুলির দৃষ্টিশক্তি অতিশয় দুর্বল, এরা নির্ভর করে ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির উপর। জলন্ত আগুনের প্রখর আভা এবং রাইফেল ও রিভলভারের অগ্নিবৃষ্টি এদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল—কাজেই অন্ধকারের আড়াল দিয়ে আমরা যে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছি এটা তারা বুঝতেই পারে নি। কিন্তু তাদের চোখকে ফাঁকি দিলেও কানকে ফাঁকি দিতে পারলুম না।

খানিক পরেই পাহাড়ের গায়ে আমাদের জুতোর অস্পষ্ট আওয়াজ তাদের কানে এল, পরক্ষণেই হিংস্র গর্জন করে ছুটে এল শ্বেত বিভীষিকার দল পাহাড়ের নীচে—

এমন লোভনীয় শিকার হাতছাড়া করতে তারা রাজী নয়!

আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলুম। কুকুরগুলি যখন পাহাড়ের নীচে, আমি আর কাফাতো তখন অন্তত পঞ্চাশ ফিট উপরে উঠে গেছি।

উঁচু-নীচু পাথরের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ উঠে গেছে উপর দিকে—পাহাড়ে উঠতে হলে ওই

একটি রাস্তা ছাড়া অন্য পথ নেই। শয়তানের দল সেই পথ বেয়ে তীরবেগে উঠে আসতে লাগল, নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে কয়েকটা কুকুর ছিটকে পড়ল নীচে।

আমি কাফাতোকে ইঙ্গিত করলুম। সে সামনের কুকুরটাকে বর্শা দিয়ে চেপে ধরল পাহাড়ের গায়ে। কুকুরটার রোমশ দেহের উপর এক বোতল কেরোসিন ঢেলে দিয়ে আমি একটা দেশলাইকাঠি জ্বালিয়ে ফেলে দিলুম। বিকট চিৎকার করে জন্তুটা পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে গিয়ে পড়ল।

এইভাবে পর পর ছয়টা কুকুর উঠে এল আমাদের সামনে এবং তারা প্রত্যেকেই অগ্নিদেবের জ্বলন্ত আশীর্বাদ শরীরে বহন করে গড়িয়ে পড়ল পাহাড়ের নীচে।

অবশিষ্ট কেরোসিন পাহাড়ের সরু পথের উপর ঢেলে একটি জ্বলন্ত দেশলাইএর কাঠি ফেলে দিলুম। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সেই তরল অগ্নিস্রোতের উপর দিয়ে উঠে আসার ক্ষমতা কোনো প্রাণীর নেই।

আমরা একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসে নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম।

পাহাড়ের আগুন তখন নিভে এসেছে, কিন্তু দূরে অনেক নীচে কতকগুলি আগুনের গোলা ছুটছে, লাফাচ্ছে, গড়াচ্ছে। যে কুকুরগুলির শরীরে আগুন লেগেছে তারা অসহ্য যন্ত্রণায় দাপাদাপি করছে।

ধীরে ধীরে ধীরে আগুন নিভে গেল, বাতাসে ভেসে এল দগ্ধ রোম ও মাংসের কটু গন্ধ!

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখা গেল কয়েকটা সাদা সাদা ভুতুড়ে ছায়া মৃত কুকুরগুলির দেহ নিয়ে টানাটানি করছে—ওহিওর সাদা শয়তান জাতভাইএর মাংস খেতেও আপত্তি করে না!

রাত্রি প্রভাত হল।

পাহাড়ের উপর থেকে এতক্ষণ নামতে সাহস হয় নি। দিনের আলোয় যখন ভালো করে দেখলুম আশেপাশে একটিও জ্যান্ত কুকুর নেই তখন সাবধানে নীচে নেমে এলুম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়েছে এই বুঝি শয়তানের দল তাড়া করে আসে। কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। দিনের আলোয় কুকুরগুলি বিশ্রাম নিতে গেছে, এক রাতের অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলাতে তাদেরও বেশ খানিকটা সময় যাবে।

নীচে নেমে দেখলুম এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে অনেকগুলি কুকুরের মৃতদেহ। কতকগুলি কুকুরের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখে বুঝলাম তাদের দেহের মাংসে তাদের স্বজাতিরাই উদর পূরণ করেছে। আবার কতকগুলির শরীর আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে।

তবে কয়েকটা চামড়া একেবারে অটুট পেয়ে গেলুম। শুধু বুলেট এবং বর্শার ক্ষতচিহ্ন ছাড়া ওই চামড়াগুলিতে আর কোনো দাগ পড়ে নি।

আমি আর কাফাতো কয়েকটা চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে একটা গ্রামে এসে পৌঁছলুম। আমার

সমস্ত শরীর তখন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে কিন্তু কাফাতোর বেতের মতো পাকানো দেহে অবসাদের কোনো চিহ্ন নেই—একদল লোক নিয়ে সে হৈ হৈ করে চলল সেই পাহাড়ের নীচে যেখানে পড়ে আছে কুকুরগুলির মৃতদেহ।

কুকুরের মাংসে সেদিন রাতে এক চমৎকার ভোজ হল। ঝলসানো মাংস আমিও একটু চেখে দেখলুম। বললে বিশ্বাস করবে না, কুকুরের মাংসের রোস্ট ঠিক কুকুরের মাংসের মতোই, একটুও অন্যরকম নয়!

জেমস ফ্যালকনার নামে এক শিকারীর রোজনামচা অবলম্বনে। ছবি—প্রসাদ রায়

শান্তিনিকেতনে নতুন পাঠশালা

গত ১লা ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি পড়ুয়ারা মিলে এক পাঠশালা খুলেছে। ওদের সঙ্গে আলাপ করে ওদের বুদ্ধি আর আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। শান্তিনিকেতনের পড়ুয়ারা যে যার 'জানার বিষয়' বেছে নিয়ে নিখুঁতভাবে 'খোঁজ' করে চলেছে। শান্তিনিকেতনের পাঠশালা হল আমাদের দপ্তরের দ্বিতীয় পাঠশালা।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

মেঠো পথ, দুষ্টু শেয়াল ও আমি

জীবন সর্দার

'ক্যা হুয়া,' 'ক্যা হুয়া,'—সমস্ত রাত থেকে থেকে ওরা ডেকেছে। আমার ঘুম ভাঙে নি। খুব সকালে বাড়ির সকলের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল।

সাদা হাঁসটা কোথায়? খাঁচা কেন খালি? সাদা হাঁসটা ভোর না হতেই নিরুদ্দেশ!

নিরুদ্দেশ, না কেউ নিয়ে গেল? গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। শুনেছি আসামী প্রমাণ না রেখে যায় না। খাঁচাটার চারপাশ পরীক্ষা করলাম। দু-এক ফোঁটা শুকিয়ে-আসা রক্ত (ঘটনাটা তা হলে বেশীক্ষণ আগে ঘটে নি), দু-একটা ছেঁড়া সাদা পালক (ধস্তাধস্তি হয়েছিল তা হলে), আর চারপাশে কুকুরের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম।

আমার মনে সন্দেহ রইল না, এ কাজ পাড়ার কোনো কুকুরের। তাদের মুখ দেখলাম। কারও মুখেই রক্তের দাগ নেই। খাঁচার চারপাশের পায়ের ছাপের সঙ্গে তাদের পায়ের ছাপ মিলল না। তবে? তবে নিশ্চয়ই ও পাড়ার ভুলোর কাজ।

ভুলোকে আমি ডরাই। একটা লাঠি নিলাম তাই। আর নিলাম দূরবীনটা। আতস কাঁচটাও নিতে ভুললাম না।

ও পাড়ায় যেতে হলে একটা খাল পেরোতে হয়। খালের উপর কাঠের পুল। পুলের উপর রক্তের ফোঁটা দেখলাম। চোখে দূরবীন জুড়ে ভুলোকে খুঁজতে শুরু করলাম তক্ষুনি।

পুল থেকে নেমে রাস্তাটা চলে গেছে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে। রাস্তা থেকে কয়েক শ গজ দূরে ক্ষেতের মাঝে একটা খেজুর গাছ। আমার দূরবীন সেদিকে ফেরাতেই দেখতে পেলাম:

সাদা হাঁসটা মুখে করে ছুটে পালাচ্ছে, ভুলো কুকুর নয়,—একটা লেজমোটা লাল-শেয়াল।

লাঠি উঁচিয়ে আমি তার পেছনে ছুটলাম। সে আরও জোরে ছুটল। আমি দাঁড়ালাম। সেও দাঁড়াল। আমি নীচু হয়ে একটা ঢিল কুড়োলাম। মুখ তুলে দেখি সে 'হাওয়া'।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ছুটে সেখানে গেলাম। পায়ের ছাপ রয়েছে দেখলাম। ঠিক কুকুরের পায়ের ছাপের মতোই। শেয়াল আর কুকুর তবে কি এক!

কথাটা নীলাঞ্জনকে বললাম। সে বলল : শেয়াল কুকুর এক নয়, তবে এক জাতের দুই পরিবার। শেয়াল আর কুকুরের সবচেয়ে বড়ো গরমিল—শেয়ালেরা থাকে গর্ত খুঁড়ে বনে-বাদাড়ে, কুকুর থাকে আমাদেরই কাছাকাছি। দু-এক শ্রেণীর কুকুর আছে যারা দল বেঁধে বনে বনেই কাটায়—ডেঙ্গু বা কড়গড়ি আর নেকড়েদের কথা বলছি।

শেয়াল-কুকুর দু জাতই মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয়। তারপর নিজের খাবার নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হয়। কিন্তু শেয়াল বেচারীরা খায় তাড়া।

কুকুরের মুখটা হাঁ করে তার দাঁতগুলো দেখো—চারটে ভাগ করতে পারবে। কামড়ে ধরবার, ছিঁড়ে খাবার, চিবিয়ে খাবার আর চিবিয়ে ভাঙবার। কুকুরের পায়ের দিকে লক্ষ্য করো—লম্বা পা, থাবার চারটে নখ সব সময় বেরিয়েই আছে। গোটানো যায় না। এই ধরনের পা আর নখ থাকার ফলে, প্রকৃতি-পড়ুয়ারা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, ওদের দৌড়ে শিকার ধরা বা পালানোর পক্ষে ভারী সুবিধা। শেয়াল এই সুযোগটা নেয়।

শেয়ালের মতো দৌড়বাজ কম দেখেছি। কোনো অবস্থাতেই কুকুরের হাতে (!) তাদের ধরা পড়তে দেখি নি। তবে কুকুরের মতো তারা আদর বা খাবার পায় না বলে, রাতের অন্ধকারে খাবার খুঁজতে বেরোয়। শেয়াল দিনে বেরোয় না, এই কথা বললে ভুল হবে। খালের ধারে ধারে, নির্জনে, দিনের বেলা আমি শেয়ালকে পা দিয়ে কাঁকড়া মাটি সরিয়ে কাঁকড়া খুঁজতে দেখেছি। মেঠো-ইঁদুরের গর্তের কাছে ওত পেতে বসে থাকতে দেখেছি। ইঁদুর, খরগোশ এই ধরনের ছোটো প্রাণী ছাড়া আর বড়ো কারও জন্য ওত পেতে থাকতে শেয়াল ভরসা পায় না। তেমন শরীর হওয়া চাই তো।

তবে শোনো, শেয়াল যে হারে মেঠো ইঁদুর সাবাড় করে তা না হলে ইঁদুরেরা চাষের বড়ো ক্ষতি করত। আরও কথা, মরা, পচা, গলা পশুপাখি খেয়ে শেয়াল আমাদের যে উপকার করে, তার সঙ্গে তুলনা চলে শুধু কাকেরই। শেয়াল মাংসাশী হলেও পাকা ফল পেলে ছাড়ে না।

শীতের শেষে, বসন্তের হাওয়া যখন বইতে শুরু করবে তখন কোনো সন্ধ্যায় মাঠে-বাটে ঘুরতে ঘুরতে, কোনো ঝোপের আড়ালে হয়তো মা-শেয়াল, বাবা-শেয়াল আর তাদের কয়েকটি ছানা তোমাদের চোখে পড়বে। দেখে মনে হবে, বাবা-শেয়াল এখুনি খাবার আনতে যাবে, আর ছানাদের মা তাদের 'ক্যা হুয়া' ডাক শেখাচ্ছে। যদি ভয় না পাও আর ওদের বিশ্বাস জয় করতে পারি, তবে দেখবে কুকুরের মতো ওরাও পোষ মানে।
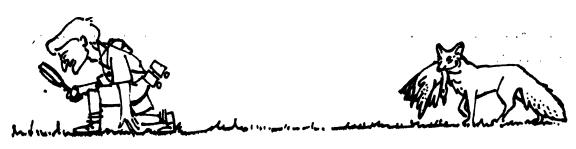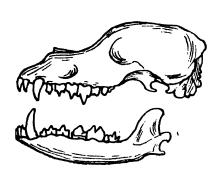
পড়ুয়াদের মেঠো খসড়া থেকে

দেবযানী দত্ত (৫৩)। দুটি বিচিত্র পাখির দেখা পেলাম। নীল-ম্যাগপাই—নকশাকাটা 'দীর্ঘপুচ্ছ' খুব সুন্দর। সবুজ-ম্যাগপাই—খুব গোপনচারী, দেহ উজ্জ্বল সবুজ আর লালে চিত্রিত। ২০-১০-৬৩।

আজ সুলতান-টিট নামে সুন্দর পাখি দেখেছি। হলদে-কালো রঙে মেশানো দেহ। মাথায় অতি বাহারের হলদে ঝুঁটি। ২১-১০-৬৩।

বেবী দাশ (১২)। আজ এক ধরনের জলের পোকা দেখলাম। নীলাঞ্জন এদেরই নাম দিয়েছে 'চিত-সাঁতারু'। এরা কখনও জলের উপরে আসছে না। নীচেই চলাফেরা করছে। শুধু দুটো খুব বড় লম্বা লম্বা পা দিয়ে সাঁতার কাটছে। কয়েকটাকে ধরে পরীক্ষা-নলে পুরলাম। পিঠটা রয়েছে নীচের দিকে, আর বুকটা উপরে। আকারে শ্যামাপোকার মতো। পায়ের ডগাটা হুকের মতো বাঁকানো। পিঠের উপর একজোড়া পাতলা ডানা। ছোট মাথা। যৌগিক চোখ। খুব সরু দুটো শুঁড়, রিঙ জুড়ে-জুড়ে হয়েছে। মুখে হুল নেই। তার বদলে রয়েছে করাতের মতো খাঁজ-কাটা শক্ত চোয়াল। শরীরটা দু পাশে চ্যাপটা, উপর-নীচ লম্বা—জল কেটে চলতে বেশ সুবিধা। ১৫-১১-৬৩।

ভাস্কর গুপ্ত (৫৬)। খেলার মাঠে উলকি-করা একটা মেঠো টিকটিকি দেখলাম। টিকটিকিরা সাধারণত সাদাটে, কিন্তু বাড়ির বাইরের টিকটিকিদের রঙ কালচে। একটা টিকটিকি ধরেছিলাম—তার লেজটা খসে গেল। ছটফট করতে লাগল। টিকটিকিটা ওত পেতে শিকারের দিকে তাকিয়ে ছিল। একবার সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের উপর। আমি চমকে উঠেছিলাম।

নতুন পড়ুয়া

(৫৯) গৌতম দত্ত—কলকাতা॥ (৬০) সৌমা চট্টোপাধ্যায়—কলকাতা॥ (৬১) বর্ণালী দে—হুগলী॥ (৬২) ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত—কলকাতা॥ (৬৩) সুচিত্রা সেন—কৃষ্ণনগর॥ (৬৪) গৌতম দত্ত—কলকাতা॥ (৬৫) প্রমিতা রায়—শান্তিনিকেতন॥ (৬৬) সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়—শান্তিনিকেতন॥ (৬৭) পিয়ালী দত্ত—শান্তিনিকেতন॥ (৬৮) বিজয়েন্দ্রনাথ পালিত—শান্তিনিকেতন॥ (৬৯) মায়া দাস—শান্তিনিকেতন॥ (৭০) গৌতম তালুকদার—শান্তিনিকেতন॥ (৭১) শিবাদিত্য সেন—শান্তিনিকেতন॥ (৭২) নীলা দাস—শান্তিনিকেতন॥ (৭৩) শান্তভানু সেন— শান্তিনিকেতন॥ (৭৪)বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় —কলকাতা॥

সুব্রত ভৌমিক
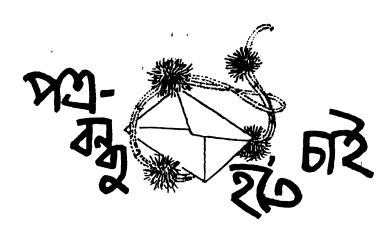
বয়স ১৫। অবধায়ক শ্রীসুধীরচন্দ্র ভৌমিক, পি-১ মহেন্দ্র নাথ রায় বাই লেন, হাওড়া। একাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান। ছবি আঁকা, ডাকটিকিট, গানবাজনা, অভিনয়, খেলাধুলা, কবিতা ও গল্প লেখা।

রূপক চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১০। পি-১১৮ সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-১৪। ষষ্ঠ শ্রেণী। ডাকটিকিট, খেলোয়াড়দের ছবি ও স্বাক্ষর সংগ্রহ, খেলাধুলা, বই পড়া।

সোমা চট্টোপাধ্যায়

বয়স ১০। অবধায়ক শ্রীসনৎ চট্টোপাধ্যায়, ৩২বি রাধাকান্ত জিউ স্ট্রীট, কলকাতা-৪। ষষ্ঠ শ্রেণী। গান (বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত), নাচ, অভিনয়।

শ্যামশ্রী মিত্র

বয়স ১৪। অবধায়িকা সুলেখা মিত্র, বড়বাজার, চন্দননগর হুগলী। অষ্টম শ্রেণী। গানবাজনা, ভ্রমণ, ভ্রমণকাহিনী, গল্পের বই পড়া, ছবি আঁকা।

অশোকচন্দ্র চন্দ্র

বয়স ১৪। ১৪০।এ রেল কোয়ার্টার্স, পোঃ রামপুরহাট, জেলা বীরভূম। নবম শ্রেণী বিজ্ঞান। গল্পের বই পড়া, গল্প লেখা, খেলাধুলা, ভ্রমণকাহিনী পড়া, ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানার ইচ্ছা।

ভাস্কর বসু

বয়স ১২। ২০ চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলকাতা-২০। অষ্টম শ্রেণী। ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, গল্প লেখা, ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, গল্পের বই পড়া, গানবাজনা।

তনিমা বসাক

বয়স ১১। অবধায়ক শ্রীকামাখ্যা বসাক, ১।৪ সাউথ এণ্ড পার্ক, কলকাতা-২৯। অষ্টম শ্রেণী। ডাকটিকিট, ব্যাডমিণ্টন, ক্রিকেট, হকি।

অর্চনা দত্ত

বয়স ১২। পি-৮১ সি. আই. টি. স্কীম ৬ এম, কলকাতা-১১ সপ্তম শ্রেণী। ডাকটিকিট, গান বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত, গল্পের বই পড়া।

তপতী চৌধুরী

বয়স ১৪। ১২।১ নাথেরবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৫। অষ্টম শ্রেণী। কোটেশন লেখা, গান শোনা, ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া।

সুব্রত ভৌমিক

বয়স ১৪। সাহেবগঞ্জ রোড, পোঃ দিনহাটা, জেলা কুচবিহার। দশম শ্রেণী কলা। রবীন্দ্রসংগীত, খেলাধুলা, গল্পের বই পড়া।

উচিত শিক্ষা

শশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী

তরুণ যুবক দণ্ডায়মান
একাকী পথের ধারে।
পোশাকে নব্য বিলাসী বলেই
অনুমিত হয় তারে ;
পরনে পাতলা ফিনফিনে ধুতি,
সিল্কের জামা গায়ে,
কাঁধে আলোয়ান, দামী মোজা জুতো
পরিহিত দুটি পায়ে !
হাতে হাতঘড়ি, পকেটে কলম,
মুখে সিগারেটে ধোঁয়া।
এদিকে ওদিকে চায় বারে বারে,
কিছু কি গিয়েছে খোয়া ?

না-না, কিছু তার যায় নি হারিয়ে
সবই আছে ঠিকমত।
এত ব্যস্ততা অন্য কারণে—
বড়ই সে বিব্রত !
পথের ওপারে পড়ে আছে ছোট
সুটকেশটুকু তার।
ভাবছে যুবক—ওই বস্তাটা
মাথায় চাপাবে কার ?
স্বল্প দূরেই যদিও তাহার
যাত্রাটি হবে শেষ,
তবু হাতে করে বয়ে নিতে সে তো
রাজী নয় সুটকেশ !!
তাই কুলি চাই অতি অবশ্য,
দরকার বাহুকের—
অথচ কারোর মেলে না যে দেখা,

ত্রস্তে ব্যস্তে ইতি-উতি চায়
যুবকটি ক্রোধভরে,
বিরক্তি নামে দুই চোখে তার,
রাগে দুনিয়ার 'পরে।

সহসা দূরের পথের প্রান্তে
দেখা গেল যেন লোক।
অতি আধুনিক ধূমপান-রত
যুবার পড়ল চোখ !
ইসারায় তাকে ডাকল তরুণ
নিজের সন্নিকটে,
ভাবে মনে মনে, যাহোক একটা,
মুটে মিলে গেল বটে !

দূর হতে সেই অচেনা পথিক
দাঁড়াল সমুখে এসে,
মনে হয় তারে দরিদ্রজন,
অতি সাধারণ বেশে !
পরিধানে মোটা থান ধুতিখানি
স্কন্ধে উত্তরীয়,
বয়সে প্রবীণ চেহারাটি তবু,
চোখে লাগে বড় প্রিয়
যুবক আদেশ করে প্রৌঢ়েরে,
সুটকেশ নিতে হাতে,
প্রৌঢ় বাক্য করেন পালন—
অচিরাৎ সাথে সাথে
চলল দুজনে : অগ্রে যুবক—

একের হস্তে ধুতির কোঁচা ও
অন্যের বোঝা হাতে।

অল্প দূরেই যখন তাদের,
যাত্রার শেষ হল,
যুবক বলল,—মজুরি বাবদ
কত চাও কুলি বলো ?
প্রৌঢ় নীরব। যুবক দু আনা
দিতে গেল তার হাতে।
প্রৌঢ় নিজের হাতখানি টেনে
নেন শুধু সাথে সাথে !
যুবকটি ভাবে—তবে বুঝি আরো
কিছু বেশী চায় কুলি,
তখন সে দিতে গেল চার আনা,
উদ্যত হাত তুলি।
ভাবল মনেতে বেড়ে গেছে ছোট-
লোকের অত্যাচার,
চার আনা পাবে সামান্য শ্রমে
দু আনা প্রাপ্য যার ?

প্রৌঢ় তখন কন মৃদু হেসে—
দাম দিতে চাও বাপু ?
যে দাম চাইব পারবে কি দিতে
তোমার মতন বাবু ?
স্বল্প-শ্রমের ভয়ে যে মানুষ,
হয় এত সকাতর,
সে কী করে দেবে যা চাইব আমি ?
আমার শ্রমের দর ?

তবু বলি শোনো—আজ থেকে যদি
শপথ করতে পার,
এ জীবনে আর হবে না কখনো
নির্ভরশীল কারো,—

নিজের কার্য নিজেই করতে
পাবে না লজ্জা আর।
তবেই বুঝব—পেলাম মূল্য,
যা কামনা বেশী তার !

যুবা শুনে ভাবে—এ মানুষ নন
সামান্য—কভু নন।
এ কোন্ নতুন সুরে এ বৃদ্ধ
অভিনব কথা কন !
শুধাল তখন—কে আপনি ? কিবা
পরিচয় আপনার ?
আপনার বাণী প্রাণে তোলে কেন,
সুমধুর ঝংকার ?

প্রৌঢ় বলেন,—আমি সামান্য
মানুষ তোমারই ন্যায়।
লোকে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-
-সাগর' জানে আমায় !
সামান্য ওই অনুরোধ মোর
আজ হতে মনে রেখো,
দেশের ভরসা তোমরা, মানুষ
হবার মন্ত্র শেখো।

পরিচয় শুনে যুবা বিস্মিত,
স্তম্ভিত হতবাক্,
মনে মনে কয়,—হে ধরণী তুমি,
হয়ে যাও দুই-ভাগ !
কোথায় রাখব, এ লজ্জা মোর,
মৃত্যুও ছিল ভালো,
উনি যে বাংলাদেশের রত্ন,
দশের প্রাণের আলো !

ত্বরিতে যুবক লুটিয়ে পড়ল,
বৃদ্ধের পদতলে,
ধরণীর ধূলি ভিজে গেল তার,
দুটি নয়নের জলে!
শপথ করল—হবে না কখনো,
পর-নির্ভরশীল,
হবে না কখনো কর্ম-বিমুখ
জীবনে সে একতিল॥
বৃদ্ধ তখন সাদরে তাহারে,
করেন আলিঙ্গন,
তোমরা বলো তো—বিদ্যাসাগর
প্রেমের সাগর-ও নন?

গ্রাহকরা লেখা পাঠাও

'হাত পাকাবার আসরে'
ছাপাবার মতো লেখা বেশি নেই।
গ্রাহক-গ্রাহিকারা লেখা পাঠাও।

বীর ও শিশু

নণীগোপাল মজুমদার

সে ছিল এক বীর, মস্ত বড় বীর। যেমনি তার চেহারা তেমনি তার হাঁকডাক। ছেচল্লিশ ইঞ্চি তার ছাতি, লোহার মতো তার পাঞ্জা। যখন সে ধমক দেয় কাউকে, তখন মনে হয় আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ল।

এমন যে বীর, তার মনটি কিন্তু ভালো। তার একমাত্র চিন্তা—কী করে লোকেদের ভালো করবে। দুষ্টুদের শায়েস্তা করার যত রকম কায়দা সবই তার কাছে আছে। সবাই জানে—

যন্তর মন্তর
ভরা তার অন্তর
ভয়ে সব কাঁপে থরথরিয়া।
ব্যাধি আর আধি তাই
কেঁপে বলে যাই যাই
কাজ নাই লোকেদের ধরিয়া॥

যত রকম রোগ শোক লোকেদের ছিল তাদের ধরে ধরে পাঠিয়ে দিল সে কোন্ সুদূর বনে; যত পাপ ছিল, দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল সব দিল সে দূর করে। যেমন করে বাগানের মালী উপড়ে ফেলে আগাছাদের তেমনি করে সে উপড়ে ফেলল দেশের যত অশান্তি।

উপড়ে ফেলল দেশের যত অশান্তি

অত্যাচারী জমিদার আর রাজা সব হয়ে গেল শায়েস্তা; দুর্দান্ত সব জন্তুজানোয়ারদের করল শান্তশিষ্ট, দুষ্টু হিংসুটে জাদুকরদের ভয় দেখিয়ে করল ঠাণ্ডা, দৈত্য-দানবদের দিল ভিরমি খাইয়ে, ভূত-প্রেতদের চুপসে যেন করে দিল আমসি। বীরের প্রতাপে সবাই ঠাণ্ডা। আর সাধারণ লোকদের মজা। তাদের আনন্দ আর ধরে না। লোকের আনন্দে ফুলেরা সব গাছে গাছে হেসে উঠল। পাখিরা সারা দিনরাত গান গেয়ে গেয়ে মাতিয়ে রাখতে লাগল।

বীরের আর কোনো কাজ নেই।—সে বলল, না এবার অন্য দেশে যেতে হয় যেখানে অত্যাচারীর

অত্যাচারের দমন দরকার। চোর ডাকাত তাড়ানো দরকার। লোকেদের দুঃখ তাড়িয়ে সুখের বাসা বাঁধতে হবে।

তার কথা শুনে লোকেদের মনে ভয় এসে ঢুকল। বীর চলে গেলে আমাদের দেখবে কে? সবাই বীরের জন্য কাজ নিয়ে আসতে লাগল।

একদিন চারজন লোক এসে হাজির। একজন তো ভীষণ গরিব। বীরকে বলল, একটা ব্যবস্থা করো যাতে আমার ক্ষেত শস্যে ভরে যায় আর আমার বাণেতে হরিণ রোজ যায় মারা। দ্বিতীয় ছিল ছোট জাতের লোক, বড় জাতের লোকেরা তাকে ঘেন্নার চোখে দেখে—তাকে জাতে তুলতে হবে। তৃতীয় জনের মেজাজ হল ভারী তিরিক্ষি—ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশাই তার পক্ষে মুশকিল, তার মেজাজ ভালো করতে হবে। চতুর্থ জন জুতোর ভেতর কাঠ ঢুকিয়েও ছোট্ট বেঁটে বাটকুল, সবার থেকে লম্বা তাকে করতে হবে!

বীর তাদের চারজনকেই একটা করে তেলের ভাঁড় দিল, বলল—বাড়ি গিয়ে সারা গায়ে তেলটা মেখে ফেলতে। প্রথম তিনজন ঠিক তার কথামত বাড়ি পৌঁছে গায়ে তেল মাখল। দেখতে দেখতে গরিব হয়ে গেল ধনী, ছোটজাতের লোক পেল সম্মান আর বদমেজাজী হয়ে গেল একেবারে হাসিখুশী আপনভোলা লোক।

কিন্তু চতুর্থ লোকটির আর তার সইছিল না, সে বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তার ভাঁড়ের তেল গায়ে মাখতে লাগল। সেদিনের পরে তাকে আর কেউ দেখতে পায় নি; কেবল কাঠুরেরা অবাক হয়ে গেল দেখে যে একটা দেবদারু গাছ কোত্থেকে এসে বনে জন্মেছে—সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে প্রায় আকাশের কাছাকাছি।

দিন যায়। বীরের কোনো কাজ নেই, বীর প্রায় দেশ থেকে যায় আর কি, এমন সময়ে এক মেয়ে এসে হাজির।

সে বলল, 'বীর আপনি তো এদেশ ছেড়ে চলেই যাচ্ছেন কিন্তু এখানকার সবাইকে আগে জয় করুন। তবে তো যাবেন।'

বীর চেঁচিয়ে বলল, 'কী বললে? কে সে যাকে আমি জয় করতে পারি নি?'

'কে সে যাকে আমি জয় করতে পারি নি?'

মেয়ে বললে, 'সে হচ্ছে আমার ছেলে ছোট্ট শিশু ওয়াসিস। কিছুতেই তাকে বাগ মানানো যায় না।'

বীর শিশুদের কথা কিছুই জানত না, সে তো আর বিয়ে করে নি! কাজেই সে ভাবল কী না যেন এক দানবের সে খোঁজ পেয়েছে। বলল, 'চলো, কোথায় সে দানব।'

মেয়ের সঙ্গে বীর তো গেল তার বাড়ি। গিয়ে দেখে ছোট্ট শিশুটি শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষছে। বীর তো আর হেসেই বাঁচে না।

হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল

এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে? এ বাচ্চা কি কখনো তার সঙ্গে পারে?

সে বলল, 'এই, এখানে আয়।'

বাচ্ছা তার পা নিয়ে খেলতে লাগল। বীরের দিকে একবার তাকালও না।

অ্যাঃ, এ দানবটার সাহস তো কম নয়! সে বাজের মতো চেঁচিয়ে বলল, 'এসো বলছি, ভালো চাও তো এসো।'

যেই না এমন চীৎকার শোনা, অমনি ওয়াসিস কান্না শুরু করে দিল।

বীরের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া! এত সাহস, তার থেকেও জোরে চেঁচায়! যতই সে তাকে থামতে বলে ততই সে চেঁচায়; যত জোরে চেঁচায় সে, ওয়াসিস চেঁচায় আরও বেশী।

শেষে কি আমায় করিবে ভর?

যতই তাকে থামতে বলে, ওয়াসিসের কান্না ততই ওঠে সপ্তমে। বীরের তো অবস্থা কাহিল। এ কী রকম ক্ষুদে দানব, যে কথা বোঝে না, ভয় পায় না! সে ভাবতে লাগল, বাবা এ আবার কী রকম দানব কে জানে?

মেরেছি হাতি, মেরেছি গণ্ডার পাল্লায় এবার পড়েছি ষণ্ডার
ধমক বোঝে না, পায় না ডর শেষে কি আমায় করিবে ভর?

যেই না এই ভাবা, অমনি বীরের মনের সাহস-টাহস গেল উড়ে—সে শুনেছিল ভূত-প্রেতদের শায়েস্তা করতে না পারলেই তারা ঘাড়ে চেপে বসে। ঘাবড়ে-টাবড়ে বীর সেই যে পালাল আর তার পাত্তাই নেই।

ওয়াসিস একটু দেখে আবার তার পা নিয়ে খেলতে খেলতে বিজয়গর্বে বলতে লাগল 'গু, গু।' 'গা, গা।'

সেই থেকে আজও শিশুরা তাদের এই যুদ্ধ-জয়ের কথা সবাইকে বলে বেড়ায়। কেবল, আমরা ওদের ভাষা বুঝতে পারি না বলে ভাবি ওরা বলে 'গু, গু।' 'গা, গা।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

।। দশ ।।

আলগোছে তাকের উপরে পড়ে আছে তাল-তাল সোনার বালা, তাগা, সাতনরী, আরও কত কি, মুকুট, হাঁসুলি—রাখালের কোঁকে কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে ভুতো একগাল হেসে বলে—মটুকটার বাহার দেখেছিস!

দেখে নি আবার! তাকিয়ে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না, ওর একমুঠো নিয়ে ভুঁইতরাসির সোনাপটিতে একবার ফেলতে পারলে আর জীবনে কোনো দুঃখু থাকে না গো। কিন্তু চারদিকে লোকজন গিজগিজ করছে; এর মধ্যে কোত্থেকে কী হবে? হ্যাঁ, তবে যারা জিনিস নষ্ট করে তাদের নাকি ঘরদোর সাফ করার কাজে লাগিয়ে রাখা হয় সবাই চলে গেলে পরও, রাত দশটা অবধি, যতক্ষণ না পড়ুয়াদের ঠেলে বের করে দেওয়া হয়। মোতিলাল বলছিল।

কনুই দিয়ে তাকের উপর থেকে একটা পুরোনো চীনেমাটির বাটি ফেলে দশখানা করে ভেঙে ফেলতে রাখালের একটুও দেরি হল না। আরে বাপ, অমনি হাঁই হাঁই করে গণ্ডা পাঁচেক লোকজন পাহারাদার ছুটে এসে মহা হল্লা লাগিয়ে দিল—যেন কী এক মহামূল্য জিনিস খোয়া গেছে। রাখালের হাসি পেল। এমন কি, মোতিলাল কেন, ভুতো পর্যন্ত রাগ দেখাতে লাগল।

রাখালও চটে গেল। হ্যাঁ, ভেঙেচি তো বেশ করেচি, ভারি তো এক চীনেমাটির বাটি! নাকি হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিদেশে কোথায় মাটি থেকে খুঁড়ে পাওয়া! তাতে হয়েছে কী? ভুঁইতরাসির হাটের দিনে মহাজনরা কাঁড়ি কাঁড়ি ওর চাইতে ঢের ভালো জিনিস ঢিবি করে ফেলে রাখে। রাখালের বে-আদবি দেখে সবাই অবাক।

যাই হোক, কাজ তো হাসিল হল। ম্যানেজারবাবু কানে কলম গুঁজে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে রাখালকে বললেন—আজ থেকে তিন দিন চারটে থেকে রাত দশটা অবধি সিঁড়ি মুছবে। এখন যেতে পার।

রাখাল তো তাই-ই চায়। অনেক কষ্টে হাসি লুকোল। কিন্তু ভুতো? সেও বলে—ও কাজ করলে, আমিও করব। অথচ বাইরে একটা স্যাঙাত না থাকলে পাচার করা হবে কেমন করে? সে যাই হোক গে, ভুতোর

কোনোরকমে দরজার বাইরে করে দিল। যাবার আগে রাখালকে চারটের সময় এসে আবার কাজে লাগতে হবে মনে করিয়ে দিল।

দুপুরে খাবার পর দুজনায় দিকদারের কাছে গেল। দিকদারের বড় কাজ, তার খাওয়াদাওয়াও হয় নি, চারদিকে লোকের ভিড়। তারা বিদায় হলে রাখাল-ভুতোকে কাছে ডেকে দিকদার তাদের সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল—তোমাদের মতলবখানা কী শুনি?

রাখাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। মতলব? কিসের মতলব বাবু? গরিব মানুষ, খেটে খাই—

কর্কশ গলায় বাধা দিয়ে দিকদার বললে—খেটে খাও বটে, জেল খেটে খাও!

ভুতোর হাঁটু দুটো যেন ময়দার তৈরী বলে মনে হতে লাগল। দিকদার বললে, আমি লোক চিনি নে ভেবেছ? হট্টমালার লোক চিনতে আমার আর বাকি নেই। তারা কাজের জন্য কাজ করতে চায় এ আমি বিশ্বাস করি নে। বল্, হতভাগারা, কী তোদের মতলব!

এমনি চেঁচাতে লাগল দিকদার যে কাঠের বাড়ির কড়ি-বর্গা থেকে টুকরো টুকরো ছাল ভেঙে পড়তে লাগল। রাখাল ভুতো দেয়ালে ঠেস দিয়ে কোনোমতে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার থপ করে বসে পড়ে দিকদারের পা ধরে বলল, খেতে পাই নে বাবু!

পা সরিয়ে নিয়ে দিকদার বললে—খেতে পাস না তো তার ব্যবস্থা দেবার জন্যেই তো ডেকেছি। আমার কথামতো চলিস তো আর তোদের কোনো ভাবনা থাকবে না, কিন্তু—রাখাল-ভুতোর চোখের উপর চোখ রেখে নীচু গলায় দিকদার বললে—না চলিস যদি, কিংবা এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও কাকেও বলিস যদি, তো সব ফাঁস করে দোব, হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে দোব—! ভালো চাস তো খুলে বল, ভুঁইতরাসি ছেড়ে কিসের আশায় এখানে এসেছিস?

রাখাল কেঁদে বললে—বাবু, বিশ্বাস করুন, আমরা ইচ্ছে করে আসি নি, কেমন যেন এসে পড়লাম। ফেরার পথটা বাতলে দিলে, কাল ভোরেই চলে যাব।

এখানে ভুতো একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। চোখ মুছে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি যাব না।

রাখাল চটে কাঁই। যাবি না মানে? যাব না বললেই হল কিনা! কেমন না যাস দেখব!—বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, যদি শেষটা সত্যি না যায়! একটা স্যাঙাত না থাকলে তো মুশকিল! অমনি নরম গলায় বললে, আচ্ছা, সে দেখা যাবেখন। তোর বুড়ো মা না খেয়ে মলে আমি আর কী করতে পারি বল। ইচ্ছে না হয় যাস না। থাকুক বুড়ি একা পড়ে।

দিকদার বললে—খেঁচাখেচি রাখ। আর দেখ ভুতো, এ জায়গাটাকে যত ভালো ভেবেছিস, মোটেই তা নয়। এখানে বোকাদের বড় বেশি প্রতিপত্তি। এখানে মুখ্যুরা বড় বেশি কথা বলে। দিকদারের পাশে নাক অবধি চাদর জুড়িয়ে একটা লোক বসেছিল, সে এবার কথা বললে—সাবধান, দিকদার, তোমার মুখটাও বড় বেশি খুলে ফেলছ বাইরের লোকের কাছে।

দিকদার বিরক্ত হয়ে বলল, বাইরের লোক আবার কিসের? ওরা আমাদের সুবিধা করে দেবে, আমরা ওদের সুবিধা করে দেব। বাইরের লোক কাকে বলছ বুঝলাম না।

রাখাল তো হাঁ। বলে কী লোকটা? সোনারুপোগুলো কি শেষে বকরা হবে নাকি? তবেই তো মুশকিল! এক হাতে যা সরাবে সে আবার পাঁচ ভাগ হলে এক-একজনার থাকবে কতটুকু? দিকদার তার মুখের দিকে চেয়ে বলল—তোদের কোনো ভয় নেই, সোনাদানায় আমাদের লোভ নেই। আমরা শুধু চাই এ দেশটাকে

চালাতে। বোকারা না চালিয়ে আমাদের মতো বুদ্ধিমানরা চালালে কী মন্দটা হবে শুনি? কী, চুপ করে রইলি যে? তোদের মতটা বল্।

রাখাল ভুতো ভয়ে ভয়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই।

দিকদার পাশের লোকটার দিকে ফিরে বলল—এদের কথা সব খাতায় লিখে রাখো, পরে যেন আবার অন্য রকম না বলে। রাখাল-ভুতোর হাত পা হিম, এ আবার কোন্ ফ্যাসাদে পড়া গেল। ভুতো রাখালের কানে কানে বলল, কাজ কি এদের ঘাঁটিয়ে; তার চেয়ে চল্, লম্বা দিই!

লম্বা দিতে তো রাখালেরও কম ইচ্ছে হচ্ছে না, কিন্তু এদেশ থেকে বেরুবার পথটা কে বলে দেবে? কই, ভুঁইতরাসির কেউ তো কখনো এখানকার কথা বলে নি। অথচ কতটুকুই বা দূর হতে পারে, ওরা নিজেরা তো এখানে ডুবল আর ওই ওখানে ড্যাঙা পেল। কতটুকু সময় বা পার হয়েছিল? ভাবলে কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে রাখালের। নাঃ, দিকদারকে চটানো যায় না, দেশে ফিরতে হলে তার সাহায্যের দরকার হবে। ভুতোটার যদি কোনো আক্কেল থাকে। দিকদার ওদের দুজনকে বসতে বলে ব্যাপারটাকে আরও খুলে বোঝাতে লাগল। এখানকার হালচাল বদলাতে হলে দু-চারটি এমন লোক চাই যাদের কেউ সন্দেহ করবে না! এখানকার লোকদের মধ্যে কার কী মতামত সকলেরই জানা, কাজেই বাইরের লোক আনতে হয়। কিন্তু বাইরের লোক পাচ্ছে কোথায়? কাজেই রাখাল-ভুতোকে দিয়েই কাজ সারাতে হয়। তার বদলে রাখাল-ভুতোর কী মনের ইচ্ছা সেটা জানালেই তার ব্যবস্থা করে দেবে দিকদার।

রাখাল বাস্তবিক অবাক হয়ে যায়, তাদের মনের ইচ্ছা তো একটাই হতে পারে। তবে তাতে আর দিকদারকে টানতে হবে না। ছোটবেলা থেকে রাখাল জানে দলে যত কম লোক থাকে ততই ভালো, কারণ জানাজানি, কানাকানি, ভাগাভাগি তা হলে ততই কম হবে। আটঘাট তো সব বাঁধাই হয়ে আছে, বাকি শুধু দেশে ফেরার ব্যবস্থা। সাতপাঁচ ভেবে দিকদারকে বললে, কাল আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দিন।

শুনে দিকদার ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল।—সত্যিই কি তোমরা দেশে ফিরতে চাও? কিন্তু কেন? সেখানে গরিব লোকে খেতে পরতে পায় না, পুলিশে ধরে জেল খাটায়, তবু সেখানেই যেতে ইচ্ছে করে—এ তো ভারি আশ্চর্য কথা! সে যাই হোক, কথা যখন দিয়েছি, তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে এখন।

নিজেদের আস্তানায় যাবার পথে ভুতো বললে—সোনার গয়না দিয়ে কী হবে রে? আসলে আমরা মরে গেছি, এটা হল সগ্‌গ। সগ্‌গ ছাড়া এমন ভালো জায়গা আর কী হতে পারে?

রাখাল বললে, হ্যাঁ, সগ্‌গ—চোরদের সগ্‌গ। অন্য কোনো সগ্‌গে তোকে আমাকে ঢুকতে দেবে না।

[ক্রমশ

জয়ন্তী সেন

খোকা-খুকুরা

একটি তারা দুটি তারা
আকাশজোড়া আঁধার ভরা
ঘুমছড়ানো ঘণ্টা বাজে
এবার খেলার সময় সারা।
তুলসীতলে পিদিম জ্বলে
ঠাকুরমারা গল্প বলে
রাজার ছেলে পক্ষীরাজে
চলছে দূরে ছুটিয়ে ঘোড়া
শিউলি ফুলের গন্ধ আসে
গাছের পাতায় হাওয়ার সাড়া।

অন্ধকার

বেশ হল বেশ হল
ঘুটঘুটে মিশকালো
ছমছমে রাত এল।
এই ভালো এই ভালো।
যাক দূরে যাক আলো
আঁধারটা জমকালো
ভয়ে কারা চমকাল
বেশ হল বেশ হল।

বাদুড়-পেঁচার দল

এখন আর ভয় করি না
সুয্যিমামার চোখ রাঙা
মিটমিটিয়ে মেঘের ফাঁকে
জ্বলছে যে চাঁদ—তাও ভাঙা।
অগাধ কালো সমুদ্দুরে
ডুবছে সবাই কাছে দূরে
যতই কেন বেড়াও ঘুরে
ডাইনে বাঁয়ে নাই ডাঙা।

কোরাস

(আহা) এমন যদি হত যে কাল সুয্যি পুবে উঠবে না,
ফুলের বনে শিশিরভেজা ফুলকুঁড়ি আর ফুটবে না,
গাইবে না গান পাখপাখালি,
এধার ওধার সবই খালি
ঘুম ভেঙে ঐ ছেলেরা সব খেলার মাঠে জুটবে না
আলোর জোয়ার নদীর জলে টলমলিয়ে ছুটবে না।

অন্ধকার

ওরে—ভয়টা তোদের কী :
আমি আছি সাহস দিতে
থমথমে এই রাতবিরেতে
লুকিয়ে থাকা রাতের প্রাণী
বাইরে ডেকে নি।
কালো কালো ছায়ার মতো
ঘুটঘুটে গাছ দাঁড়িয়ে যত
ফিসফিসিয়ে কইছে কথা
শুনতে পেলি কি ?
এখন জমবে মজা ঝোপে ঝাড়ে
আয় এগিয়ে চুপিসাড়ে
ভয় দেখাব ঘুমিয়ে যারা
দু চোখ খোলে নি।

বাদুড়-পেঁচার দল

আর ভয় নাই ভয় নাই ভয়
বলো অন্ধকারের জয়।
ভালো আর মন্দের
চিরকেলে দ্বন্দ্বের
শেষ বুঝি আজ রাতে হয়।
প্রদীপের আলোটুকু
আজ ঝড়ে পাবে—পাবে লয়।
ভয় নাই ভয়। নাই ভয়।

কিন্তু ও কে? ও কে? ও কে?
জ্যোছনা ঝরছে দুই চোখে—
দূর করো ওর হাসি
কেড়ে নাও ওর বাঁশি
নয়তো পালিয়ে যাব এই দেশ থেকে
বলো—ও কে? ও কে? ও কে?

স্বপনপরী

আমি ফুলের ডালি ভরে আনি।
রঙবেরঙের ফুল তুলে—
আমার আলোর ঢেউএর দোলা
সবার চোখে যায় দুলে—
আমি খুকুর মনে খোকার মনে
লুকিয়ে আনি সংগোপনে
নতুন আশা, নতুন ভাষা
নতুন দিনের দ্বার খুলে।
দেখো মিষ্টি সুবাস ভরিয়ে রাখি
সকালবেলার সব ফুলে।

অন্ধকার

এই স্বপনপরী রোজ লুকিয়ে
সবার মনের ভয় তাড়ায়,
আলোর পিদিম জ্বালিয়ে রাখে
নীল আকাশের শুকতারায়

ধর ধর ওকে ধর
ডেকে আন তারপর
দুঃস্বপনের চর—

দুঃস্বপ্ন

হা হা আমি আছি তোমার পিছনেই-
ওর মুখের হাসি নিভিয়ে দেব
আসবে কাছে যেই।
ওর ফুলের মালা পড়বে ঝ'
ওর রঙিন পাখা নেব কেড়ে
খোকাখুকুর চোখের 'পরে
থাকব যে নিজেই—
এই দুনিয়ায় তোমারই জয়
গাইব আনন্দেই।

স্বপনপরী

ঝড়ে যদি নিভল বাতি
প্রাণের প্রদীপ জ্বালি,
দুঃস্বপনে ক্লান্ত মনে
প্রেমের সুধা ঢালি।

হৃদয় যখন মরুভূমি
শুকনো ডালে ফোটাই আমি
নতুন কুঁড়ি নতুন পাতা
ভরতে সবার ডালি।

কোরাস

ধর ধর—ওকে ধর
আলোকের অনুচর
চাই নাকো বেঁচে ওঠা
চাই নাকো রাত ভোর।

স্বপনপরী

আহা—তবে যাই—
ফিরে যাই—
হেথা ভালোবাসা বুঝি নাই—
হেথা মিছে কেন গান গাই—।

ছোট্ট পাখি

চিক চিক চিক চিক
আমি জেগে আছি ঠিক
যেও না যেও না তুমি
আলো হবে পুব দিক।

বাদুড়-পেঁচার দল

উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে
বাসা থেকে বহু দূরে
দেব তোরে দূর করে—
বল্‌লিস বেঠিক?

ছোট্ট কুঁড়ি

ঘুমের মা. . . নে তোমার
পরশ লাগে,
তাই তো আমার ছোট্ট বুকে
খুশি জাগে—
থাকবে না কি সেই ছোঁয়াটি
সকালবেলার মধুর রাগে।

বাদুড়-পেঁচার দল

এ ঝড়ে ফুল ঝরে যায়
খুশি তখন থাকবে কোথায়?
কথা শুনে হাসি যে পায়
হা হা হা হা হা।

ছোট্ট খোকা ছোট্ট খুকু

স্বপ্নপরী স্বপ্নপরী,
আমরা ভালোবাসি,
স্বপ্ন দেখি আকাশ রাঙায়
আলোর জোয়ার আসি।
স্বপ্ন দেখি দুঃখ ব্যথা
হিংস বাধা গেল কোথা
সবাই মিলে হেলে দুলে
সুখের স্রোতে ভাসি—।
নাইকো উঁচু নাইকো নীচু,
লাগছে না কেউ কাহার পিছু
ভাইএ বোনে মিলে আনি
সবার মুখে হাসি।

বাদুড়-পেঁচার দল

এবার কেমন লাগছে মনে দ্বন্দ
গানের তালে মিলল না আর ছন্দ

ও হে অন্ধকারের রাজা
কেন থামাও বাজনা বাজা
লম্বা চওড়া বুলিগুলো এখন কেন বন্ধ ?
ওরে বাবা দেখ দেখি,
পুব দিক ফর্সা কিঃ
হিম ঝরে টুপটাপ
এ ধারটা চুপচাপ—
আলতার ফেলে ছাপ
আকাশে সে এসেছে কি ?

দুঃস্বপ্ন
বাইরে যতই আলো ফোটাও
থাকব তোমার মনের মাঝে,
আজ না হলেও কালকে আবার
ভয় দেখাব বিকট সাজে।

অন্ধকার
আজও আমি হার মেনেছি—
একটুখানি ছোট্ট আলো
কেমন করে ভরিয়ে দিল
আকাশজোড়া অতল কালো
একটু হাসির আভাস লেগে
সকল মানুষ উঠল জেগে
একটি গানের সুরে জগৎ
খুশির স্রোতে টলোমলো।

ছোট্ট পাখি
হার মেনেছে হার মেনেছে

ছোট্ট কুঁড়ি
নিজের বুকে বাজ হেনেছে

খোকা খুকু
আলোর ভাষা আজ জেনেছে
তাই তো পালায় ছুটে,
আয় শিউলিতলায় ফুল কুড়াতে
বিছনা ছেড়ে উঠে।

[সকাল বেলার ঘণ্টা]

খোকা খুকুরা
সোনার গুঁড়ো ঝরছে দেখো
নদীর জলে
সুয্যিমামা পুব আকাশে
নয়ন মেলে !
ভোর হয়েছে বাইরে ঘরে
আনন্দ তাই নাহি ধরে
সবাই মিলে গান ধরেছে
নাচের তালে।
থাকবে কে আর বাঁধন মেনে
এখন খেলা ফুলের বনে
এখন হাওয়া লাগবে মোদের
মনের পালে।

ছবি। সমর দে

১

১ থেকে ৭—পর-পর এই সাতটি রাশির প্রত্যেকটিকে মাত্র একবার ব্যবহার করে এমন একটি যোগের অঙ্ক তৈরি করতে হবে যার ফল হবে ১০০।

২

পৃথিবীতে যার বয়স ১৬, সে যদি মঙ্গলগ্রহে জন্মাত আর সেইখানেই থাকত, তাহলে তার বয়স হত কত?

৩

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯—এই আটটি রাশিকে দুটি জোটে ভাগ করো। প্রত্যেক জোটে চারটি করে রাশি থাকবে, আর দুই জোটের যোগফল সমান হবে।

গ্রাহকদের ধাঁধার উত্তর পাঠাতে হবে না। তোমরা সমাধান করতে থাকো—পরের সংখ্যায় উত্তর প্রকাশ করা হবে।

সত্য, না মিথ্যা ?

১। সব জন্তুই আওয়াজ করতে পারে।

৩। প্রত্যেক পতঙ্গেরই ছটি পা থাকে।

৩। আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস নিই তার বেশির ভাগটাই অক্সিজেন।

৪। কিউবার রাজধানী হল হনলুলু।

৫। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শুধু বাদুড়ই উড়তে পারে।

৬। সূর্য সব সময়েই পূর্বদিকে ওঠে।

৭। বিজোড় সংখ্যা মাত্রেই মৌলিক সংখ্যা।

৮। সব জন্তুই সাঁতার কাটতে পারে।

৯। চন্দ্রগ্রহণে চাঁদ থাকে পৃথিবী আর সূর্যের মাঝখানে

১০। সভাপতির স্ত্রীলিঙ্গ—সভাপত্নী।

'রাস্তায় ঘাটে সবখানে শুধু হাসি আর গান, হুড়োহুড়ি, লাফালাফি, নৃত্য আর চিৎকার।'

পঞ্চুলাল। পৃ ৯৭
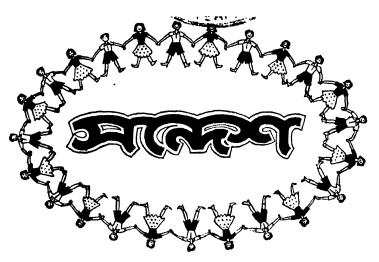
৩য় বর্ষ । ৯ম সংখ্যা

জানুয়ারি ১৯৬৩ । পৌষ ১৩৭০

কিচ্ছু নয়

বিমল দত্ত

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার
পাচ্ছি যেন গন্ধ কার
    সোঁদা সোঁদা দিচ্ছে বাস
    জোর দমকে নিচ্ছি শ্বাস
নিতান্ত কেউ বিদঘুটে
আছে কি দাঁত ছিরকুটে
    সিংহ ভালুক বাঘ শেয়াল
    ঘুপছি মেরে খুঁজছে তাল
বেল্ট কষে নিই খুব টাইট
যেই পড়েছে হেড-লাইট
    দেখি, ও মা, কিচ্ছু নয়—
    বন্ধু আমার চিত্তময়।
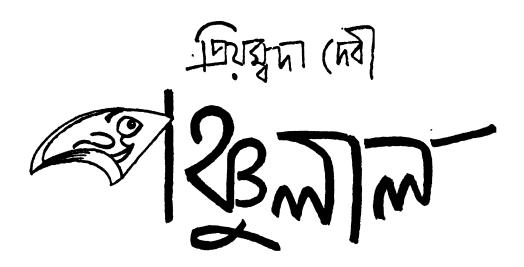
[ডিসেম্বর সংখ্যার পর]

পঞ্চু তো স্কুলে গেল, কাঠের পুতুলটিকে দেখে ছেলেদের আর আহ্লাদের পার নেই। তাকে নিয়ে নানান কাণ্ড করতে লাগল। কেউ নাক ধ'রে টানে, কেউ টুপি কেড়ে নেয়, কেউ বা কালি দিয়ে গোঁফ এঁকে দেয়। পঞ্চু অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'তোমাদের এ কী ব্যবহার বলো তো! আমি ভদ্রসন্তান, আমার বিশ্বাস তোমরাও তাই। এবার থেকে ব্যবহার সেই রকম কোরো।' পঞ্চুর গম্ভীর কথা শুনে সবাই যেন চমকে গেল, আর বিরক্ত করত না। পঞ্চুর ব্যবহার দিন দিনই ভালো হতে লাগল। ভালো পড়া করে, ঠিক সময়ে আসে, ঠিক সময়ে ফিরে যায়—প্রতিদিন পড়া তৈরি করে আনে। তার চালচলন দেখে মাস্টারমশায়ও খুশী হয়ে প্রশংসা করলেন। তবে পঞ্চুর একটি দোষ ছিল, সে যাকে তাকে বন্ধু করত। মাস্টারমশায় বার বার বলতেন, 'দেখো, দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে বেশী মিশো না—ওতে তোমার মন্দ হবে—একদিন বিপদে পড়বে।' হলও তাই।

সেদিন বড় চমৎকার দিন, রোদ উঠেছে অথচ বাতাসটি ঠাণ্ডা, আকাশ পরিষ্কার, চারিদিকে পাখি ডাকছে। স্কুলে যাবার পথে পঞ্চুর সাথীরা দুজনে বললে, 'শুনেছিস খবর? সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা বোয়াল মাছ এসেছে—পাঁচতলা বাড়ির সমান বড়।'

'সত্যি নাকি? আমার বাবাকে যে বোয়ালটা গিলেছিল সেটা নয় তো?'

'তোর বাবাকে গিলেছিল কিনা সে খবর জানি নে, তবে আমরা সেটাকে দেখতে যাচ্ছি। তুই যাবি?'

পঞ্চু বললে, 'না, এখন স্কুলে যাব।'

'আরে, স্কুলে তো রোজই যাওয়া যায়, অমন বোয়াল মাছ তোর জন্যে বসে থাকবে নাকি?

'মাস্টারমশায় বলবেন কী?'

'তাঁরা তো সবই জানেন। বকেন তো বকবেন, তাতে আর হবে কী? ওঁরা তো মাইনে পান, তাই অত কথা বলেন।'

'আর মা? মা যে দুঃখ করবেন।'

'মায়েরা ছাইও জানে না।'

'বোয়াল মাছটা আমার একবার দেখা দরকার; তা আমি স্কুলের পর যাব।'

'তুমি একটা আস্ত গাধা। জলের মাছ অতক্ষণ তোমার পথ চেয়ে বসে থাকবে! যেমনি খেয়াল হবে অমনি সে অন্য জায়গায় চলে যাবে।'

'আচ্ছা, কতক্ষণে ফেরা যায়?'

'কতক্ষণ আর? আধ ঘণ্টা।'

পঞ্চু তখন উৎসাহ করে বললে, 'চল্ ভাই, যে আগে যেতে পারবে সে বকশিশ পাবে।'

যত সব দুষ্টু ছেলে বই বগলে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল—পঞ্চুলাল সবার আগে—মনে হল তার পায়ে যেন পাখা লাগানো আছে।

সমুদ্রের ধারে এসে পঞ্চুর দল দেখলে মাছও নেই, কিছুই নেই—সমুদ্রের জল আয়নার মতো স্থির শান্ত। দেখে পঞ্চুর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে রুখে বললে, 'এ কী তামাসা পেয়েছ? স্কুল কামাই করিয়ে এনে এখানে এসে বাঁদরামি হচ্ছে?'

অন্যেরা বললে, 'আনব না? রাতদিন পুঁথি পড়ে পড়ে তুই একেবারে বয়ে যাচ্ছিলি, তোকে উদ্ধার করে এনেছি।'

'তোদের তাতে কী? আমি যদি শুধু পড়াশুনাই করি—তবে?'

'দেখো, বেশী জারিজুরি কোরো না। তুমি একা, আমরা সাতজন।'

'ওঃ, একেবারে সপ্তরথী—কর্ণ, শকুনি, জয়দ্রথ, দুর্যোধন, দুঃশাসন আর কী!' বলে পঞ্চু ভেংচি কেটে জিভ বার করে নাচতে লাগল।

সপ্তরথী আবার চেঁচিয়ে বললে, 'ভালো চাও তো মাপ চাও—নয়তো গাধা-পিটুনি দেব, তুলোধোনা করে ফেলব।'

তারপর দেখতে দেখতে লড়াই বেধে গেল। পঞ্চু যদিও একা, তবু তার কাঠের শরীর—চড়চাপড়ে বড় একটা কিছু হয় না। কিন্তু সে যখন তার কাঠের হাত পা কাজে লাগালে তখন তার শত্রুরা ক্রমে কাবু হয়ে পড়ল। হাতাহাতিতে না পেরে তারা পঞ্চুকে বই ছুঁড়ে মারতে লাগল। চালাক পঞ্চুও লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মাথা নুইয়ে আপনাকে বাঁচাতে লাগল। একখানা বইও তার গায়ের কোনোখানে লাগল না, সব গিয়ে ঝুপঝাপ করে সমুদ্রে পড়তে লাগল। সমুদ্রের মাছগুলো হঠাৎ এই জ্ঞানের বৃষ্টিতে একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো হয়েছিল। ছেলেদের আপন বইগুলি যখন নিঃশেষ

হয়ে গেল, তখন তারা পঞ্চুর বইগুলি নিয়ে তাকেই ছুঁড়ে মারতে লাগল—সেই যে কথায় বলে, 'যার শিল যার নোড়া তারি ভাঙি দাঁতের গোড়া।' কিন্তু বইগুলি পঞ্চুর গায়ে না লেগে তাদের দলের একটি ছেলের কপালে গিয়ে এমনি লাগল যে, কপাল্ ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, সে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ল। তাদের দলের ছেলেরা তখন একেবারে চোঁচা দৌড় দিয়ে কোথায় যে কে চম্পট দিলে মনে হল যেন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। সবাই গেল, শুধু পঞ্চু গেল না।

ছেলেটির নাম অর্জুন। পঞ্চু তার মুখের উপর পড়ে বারবার ডাকতে লাগল, 'ও ভাই অর্জুন, চোখ খুলে একবারটি দেখ ভাই, আমি তোকে মারি নি। যারা মেরেছিল, তারা সব পালিয়ে গিয়েছে।' কিন্তু অর্জুনের জ্ঞান হবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। পঞ্চু তাই দেখে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাটির উপর শুয়ে পড়ল। কেন যে দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিল, তাই ভেবে সে মনের দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাতে লাগল। এমন সময় শুনতে পেলে সেপাইরা কাওয়াজ করে এলে যেমন শব্দ শোনা যায়, তেমনি শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুলিস আসছে বুঝে পঞ্চুর আত্মাপুরুষ কাঠ হয়ে গেল।

পুলিসেরা এসে পঞ্চুকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে পা দিয়ে ঠেলা মেরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে রে তুই? এখানে পড়ে কী করছিস?'

পঞ্চু বললে, 'আমার এক বন্ধুর বড় আঘাত লেগেছে, আমি তাকে সাহায্য করছি।'

'আঘাত করলে কে?'

'আমি কিন্তু আঘাত করি নি।'

'কী দিয়ে আঘাত পেল?'

'এই বইখানা তার কপালে লেগেছিল।'

'বইখানি কার?'

'আমার।'

'ব্যস, আর প্রমাণ দরকার নেই—চলো এখন হাজতে।'

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, 'হুজুর, আমার কোনো কসুর নেই'—কিন্তু সে কথা কে কানে তোলে?

পুলিসের জিম্মায় পঞ্চু চললে, এ দেখলে পরী দিদির কত যে কষ্ট হবে, তা পঞ্চুর বুঝতে বাকী ছিল না। সে মনে মনে ঠিক করলে, এদের নজর এড়িয়ে পালাবেই। গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়েছে এমন সময় একটা দমকা বাতাস এসে তার টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল। পঞ্চু দেখল বেশ ছুতো হয়েছে। 'টুপিটে নিয়ে আসি' বলে সে দৌড়ে গিয়ে টুপিটা নিয়েই এক ছুটে সমুদ্রের দিকে পালাতে লাগল। পুলিস কজন দেখলে পঞ্চু বাতাসের মতো ছুটে চলছে, তাকে ধরা কারো সাধ্যি নয়। তাই তাদের পাহারা দেবার ডালকুত্তাটা তার দিকে লেলিয়ে দিলে। কুকুরে আর কাঠের পুতুলে পাল্লা দিয়ে দৌড় আরম্ভ হল, আর একটু হলে পঞ্চু ধরা পড়ে আর কি। এমন সময় সে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রের মধ্যে পড়ল। কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগল। তাই দেখে পঞ্চু বললে,

'বেশ হয়েছে, মর ডুবে মর।' কিন্তু কুকুরটা যখন 'মলাম গো, বাঁচাও গো' বলে ঘেউ ঘেউ করে কেঁদে উঠল, তখন পঞ্চু বললে, 'আচ্ছা, তুমি আর আমায় তাড়া করে আসবে না কথা দাও, তবেই তোমায় বাঁচাব।'

'দোহাই তোমার, আমি দিব্যি করছি, তোমায় আর তাড়া করে যাব না।'

পঞ্চু তখন সাঁতরে গিয়ে কুকুরটাকে টেনে তীরে তুলে দিলে। কুকুরটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ভগবান যদি কখনও দিন দেন, তাহলে এ ঋণ শোধ করব।'

পঞ্চু আবার সাঁতার দিয়ে যেতে যেতে সমুদ্রের ধারে একটা গহ্বরের কাছে এসে পৌঁছল। সেখানে রান্নার ধোঁয়া উঠছে আর ভাজা মাছের গন্ধ আসছে। পঞ্চু মনে মনে বললে, 'ভালোই হল, ওইখানে গিয়ে আগুন পুইয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নি। যেমনি সেদিকে গেছে, অমনি জেলের জালে পড়ে গেল। আর যাবে কোথা! জেলেও ঠিক সেই সময় বাইরে এসে জাল টেনে তুললে। জেলেটার মূর্তি দেখেই পঞ্চুর পিলে চমকে গেল। সেই জেলে জালটা ভিতরে নিয়ে গিয়ে ঝাড়া দিয়ে সব মাছ বার করে নিল। মৌরলা, বাটা, পারশে, ন্যাদস, পাবদা, বাচা, খলশে, পুঁটি, চিংড়ি, কাঁকড়া—কত রকমের মাছই খলবল করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুও খটাস করে পড়ল। সবই জেলের চেনা মাছ, কেবল পঞ্চুকে দেখে সে অবাক হয়ে বললে, 'এ আবার কোন্ দেশী মাছ?'

পঞ্চু বললে, 'মাছ হব কেন? আমি যে কাঠের পুতুল।'

জেলে কানে খাটো ছিল, সে 'কাঠের পুতুল' শুনতে, 'কাঁকড়া' শুনে ভারী খুশী হয়ে বললে, 'ভালোই হল। অনেক দিন কাঁকড়া চচ্চড়ি খাওয়া হয় নি।' এই না বলে পঞ্চুকে দিব্যি করে উল্টে-পাল্টে ময়দা মাখাতে লাগল। এদিকে সেই কুকুরটাও ভাজা মাছের গন্ধ পেয়ে আস্তে আস্তে সেই গুহায় এসে ঢুকল। মস্ত একটা কুকুর এসে গুহার মধ্যে ঢুকছে দেখে জেলেটা চটে গিয়ে হেই হেই করে তাড়াতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই সে যেতে চায় না। এমন সময় পঞ্চু একবার কেঁদে উঠল। কুকুরটা তার কান্না শুনে, পঞ্চুর গলার স্বর চিনতে পেরে, তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মুখে করে নিয়ে বাইরে চলে গেল। জেলে তার শখের কাঁকড়া হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু কুকুরটাকে কিছু করতে তার সাহস হল না।

পঞ্চুকে রাস্তায় রেখে কুকুরটা আস্তে আস্তে চলে গেল। পঞ্চুও একটু পরে কাছে কার একটা কুটিরে গিয়ে দেখলে এক বুড়ো বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাগা, অর্জুন বলে একটি ছেলে এখানে পড়ে ছিল, তার কী হল বলতে পার?'

'সে সুস্থ হয়ে বাড়ি গিয়েছে।'

পঞ্চুর মনটা নিশ্চিন্ত হল, কিন্তু শীতে সে হিহি করে কাঁপছিল। তার কাগজের তৈরি ইজের জামা জলে ভিজে একেবারে গলে গিয়েছিল। সে বুড়োকে বললে, 'আমি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলাম, কাপড় চোপড় সব ফেঁসে গিয়েছে, এক টুকরো কাপড় দিতে পার?'

বুড়ো বললে, 'আমি হত দরিদ্র, কাপড় কোথা পাব বাছা? এই ছোট ছালাটা আছে, এইটে কোনোরকমে পার তো পরো।'

পঞ্চু সেই ছালা জড়িয়ে আস্তে আস্তে পরীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা জানালা সব বন্ধ। তখন বৃষ্টি হচ্ছে। পঞ্চু গিয়ে খুব জোরে দরজায় ধাক্কা দিলে। আধ ঘণ্টা পর উপরের একটা জানালা খুলে গেল। পঞ্চু দেখলে মস্ত একটা শামুক—তার মাথার উপরে মোমবাতি জ্বলছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'এত রাতে কে তুমি দরজা ঠেলাঠেলি করছ ?'

পঞ্চু বললে, 'পরী দিদি কি বাড়ি আছেন ?'

'আছেন, তবে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি বাছা কে ?'

'আমি পঞ্চু।'

'তুমি ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।'

পঞ্চু বললে, 'চট করে এসো—শীতে আর ক্ষিদেয় আমি আধমরা হয়ে গেছি।'

শামুক বললে, 'জানই তো বাছা, আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি নে।' শামুকের নীচে আসতে রাত্তির প্রায় কেটে গেল। ততক্ষণে পঞ্চুও এক লাথিতে দরজা ফাটিয়ে ফেলেছে, আর সেই ফাটার মধ্যে পা আটকে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। পঞ্চু বললে, 'আমার পা'টা ছাড়িয়ে দাও।'

শামুক বললে, 'সে তো ছুতোরের কাজ।'

'তবে আমি পড়ে থাকি ? আমায় কিছু নয় তো খেতেও দাও।'

শামুক বললে, 'তাই তো তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে, এই যে খাবার নিয়ে আসি।' সেই যে গেল, আবার ফিরে আসতে আরো দু ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর যখন খাবার এসে পৌঁছল তখন সে আর কিছুই নয়—মাটি দিয়ে গড়া মাছ আর ভুষি দিয়ে গড়া রুটি! পঞ্চু কিছুই খেতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান হল তখন দেখলে সে বিছানায় শুয়ে আছে আর শ্যামা বনশ্রী তার কাছে বসে আছেন।

শ্যামা বললেন, 'আমি আর-একবার তোমায় ক্ষমা করব, কিন্তু এর পর যদি অপরাধ কর তবে আর তোমার দুঃখের অবধি থাকবে না।'

পঞ্চু আবার ভালো হবে বলে প্রতিজ্ঞা করলে। বছরের বাকী ক মাস সে খুব ভালো করে পড়া করলে, ক্লাসে প্রথম হল, প্রাইজ পেল। মাস্টারমশাইরা সবাই তার খুব প্রশংসা করলেন।

শ্যামার বড় আনন্দ হল, তিনি পঞ্চুকে আদর করে বললেন, 'কাল থেকে তুমি আর কাঠের পুতুল থাকবে না, তোমায় আমি মানুষ করে দেব।' পঞ্চু আনন্দে যে কী করে বেড়াতে লাগল তা না দেখলে বোঝানো কঠিন। পরদিন স্কুলসুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ—দু শো বাটি ক্ষীর তৈরী হল, আর কত রকমের যে পিঠে পুলি তার আর গোনা-গাঁথা নেই। পরদিন সকালটিও চমৎকার গেল, কিন্তু—যারা মানুষ নয়, পরের হাতের পুতুল, তাদের জীবনে ওই একটা ছোট্ট 'কিন্তু'তেই সব মাটি করে দেয়।

পরদিন পঞ্চু সব বন্ধুদের নিজে নিমন্ত্রণ করতে চলল। বনশ্রী বললেন, 'দেখো বাছা, সময়মত ফিরে এসো।' পঞ্চু তাঁর চারিদিকে নাচতে নাচতে বললে, 'যাব আর আসব—কোথাও একটু দেরি যদি করি তখন বোলো।'

একে একে অনেক বন্ধুরই নিমন্ত্রণ হল, কিন্তু যে তার প্রাণবন্ধু, একেবারে যার সঙ্গে হরিহর-আত্মা, যাকে ছেড়ে তার দু দণ্ড চলে না, সেই বন্ধুর বাড়ি বার বার তিন বার গিয়েও তার দেখা পেলে না। এই ছেলেটির নাম ব্যোমনাথ, কিন্তু তার ডাকনাম হয়েছিল 'মোমবাতি'। সে রোগা ডিগডিগে, লম্বা সোজা, মুখে রক্ত কম, পাংশে রঙ—দেখলে মনে হয় নিতান্ত নিরীহ গোবেচারী। কিন্তু দুষ্টুমিতে তার মতন এ কলিযুগে আর একটি জন্মায় নি।

পঞ্চু হতাশ হয়ে ফিরছে, এমন সময় একটা বাড়ির গাড়িবারান্দার কোণে দেখলে তার প্রাণের বন্ধু 'মোমবাতি' জ্বলছে। পঞ্চু তো ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কী করছিস?'

মোমবাতি বললে, 'আজ রাত দুপুরে আমি দূরে—বহু দূরে—অনেক দূরে যাব।'

'বা! কাল যে আমার নতুন জন্মদিন, আমি মানুষ হব। আমাদের বাড়ি তোর মধ্যাহ্নভোজন।'

'এই যে শুনলি আমি রাতদুপুরে চলে যাচ্ছি—আবার বলে দিনদুপুরে ওদের বাড়ি খাব—ক্ষেপলি নাকি?'

'কোথায় যাবি শুনি?'

'আমি যাব রাসভ-রাজত্বে। সে বড় চমৎকার দেশ—না আছে পুঁথি-পাত্তাড়ি, না আছে পণ্ডিত আর পাঠশালা। সে দেশে বেস্পতিবারে স্কুল বসে না,—আর এমনি মজা—হপ্তায় সেখানে ছটা বেস্পতিবার আর একটা রবিবার। সেখানে পুজোর ছুটি আরম্ভ হয় ১লা বৈশাখে আর শেষ হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে।'

'তা হলে সে দেশে সময় কাটায় কেমন করে?'

'কেন? আমোদ আহ্লাদ, গান আর গল্প, হাসি আর খেলা—এতেই দিনগুলো দেখতে দেখতে উড়ে পালায়! তুই চল্ না।'

'না, না, না,—আমি কিছুতেই যাব না। বাড়িতে বলে এসেছি সন্ধ্যার আগেই ফিরব। দেরি হলে মা যে বকবে।'

'তা বকে বকবে।'

'তুই কি ভাই একা যাচ্ছিস?'

'একা কেন? একশ জন একসাথে যাচ্ছি—মস্ত জুড়ি গাড়ি আসবে, তাতেই চড়ে গান গাইতে গাইতে আমরা সেই "সুখস্থানে" যাব।'

পঞ্চু চুপ করে থেকে থেকে, হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা, সে দেশে স্কুল নেই?'

'স্কুল কী রে! তার ছায়া পর্যন্ত সেখানে নেই, মাস্টারমশায়ের নাম কি গন্ধ কেউ জানে না, পড়ার বই সে দেশে কখনো জন্মায় নি, আর আজ পর্যন্ত আমদানী হয় নি। রাজার হুকুম, বই কেউ নিয়ে যদি যায়, তার তখনই ফাঁসি হয়, বইয়ের গলায় পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে হবে।'

'তবে কেউ পড়ে না?'

'ভুলেও না, স্বপ্নেও না।'

'আহা, কী সুখের দেশ! কিন্তু আমার বনশ্রী মাকে বলেছি—আর কখনো প্রতিজ্ঞা ভাঙব না—মানুষ হয়ে বুড়ো বাপের দুঃখু ঘোচাব।' পঞ্চু এই কথা বলে দু পা গিয়ে আবার একবার থামল, তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ রে, তোরা কখন ছাড়বি বলতে পারিস?'

এই কথা বলতে বলতেই অন্ধকার নেমে এল। তারা দূরে দেখতে পেলে একটি ছোট্ট মিটমিটে আলো ক্রমে এগিয়ে আসছে—কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—আর থেকে থেকে শিঙা বেজে উঠছে। কিন্তু সে শিঙার শব্দে কোনো ফুর্তি নেই। মনে হচ্ছে যেন সে শুধু মশার ডাক।

মোমবাতি লাফিয়ে বললে, 'এই যে।'

'এই যে কী রে?'

বলতে না বলতে গাড়ি এসে পৌঁছল, গাড়িতে বারো জোড়া গাধা সারি সারি জুতে দিয়েছে; কোনোটা সাদা, কোনোটা ছাইয়ে, কোনোটার গায়ে ডোরা কাটা, আবার কারো গায়ের চামড়ায় চকরা-বকরা ছিট-আঁটা। চব্বিশটি গাধার প্রত্যেকের পায়ে সুন্দর সাদা চামড়ার বুটজুতো—অন্য গাধাদের মতো নালবন্দী করা নয়। কোচম্যান যিনি, তিনি যেন একটি আহ্লাদে পুতুল,—ননী দিয়ে গড়া, পেটটি মোটা, গাল দুটি গোল আর লাল, মুখে হাসি লেগেই আছে, শরীরখানি লম্বার চেয়ে চওড়ায় বেশী। গাড়িখানাতে ছেলেগুলোকে পুরেছে যেন চালের বস্তার মতো, একেবারে একটা আর-একটার ঘাড়ের উপর। কিন্তু তবু কেউ উহু আহা করছে না। সবাই চোখ মুখ বুজে সুখের ধ্যান করছে। কোচম্যান বাবু বললেন, 'তবে তোমার যাওয়াই স্থির?' মোমবাতি ফুর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে বললে, 'আমি তো যাবই।' এই বলেই সে ঝাঁপিয়ে উঠে গাড়ির পাদানে দাঁড়াল। পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে,—'না আমি যাব না, বাড়ি থাকব, পড়াশোনা করব।' কিন্তু চারিদিকে ছেলেদের আনন্দধ্বনি শুনে পঞ্চুর মন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে লাগল, থাকি না যাই। কোচম্যান বললে, 'তুমি নিতান্তই যদি যেতে চাও আমার জায়গা তোমাকে দিয়ে আমি হেঁটে যাব।'

পঞ্চু বললে, 'সে হতেই পারে না—আমি বরং এই একটা গাধার পিঠে চড়ে যাব।' যেমনি গাধায় চড়া, অমনি এক লাথিতে সে পঞ্চুকে ধুলায় গড়াগড়ি পাড়লে। গাড়োয়ান গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এবারে উঠে পড়ো, আর কিছু গোল হবে না।' পঞ্চু গাধার পিঠে চড়ল, গাড়ি ছাড়ল কিন্তু পঞ্চু শুনতে পেলে কে যেন মিহিসুরে চুপিচুপি বলছে, 'না শুনিয়ে গুরুর বচন ভোগো কর্মের ফল—চোখের জলে পথ দেখতে পাবে না গো—পাবে না।' পঞ্চুর মনে মনে ভয় হল, কিন্তু কে যে কথাটা বললে বুঝতে পারলে না। মোমবাতি তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, ছেলেরা সব ঢুলে ঢুলে এ ওর গায়ে পড়ছে—জেগে আছে শুধু আহ্লাদে কোচম্যান—সেও গুনগুনিয়ে গান ধরেছে—রাতের বেলায় সবাই ঘুমোয়, আমি শুধু জাগি গো।

আরও মাইল খানেক পথ যাবার পর পঞ্চু আবার শুনলে, 'পালাচ্ছ আজ হাসতে হাসতে

কিন্তু কাঁদতে হবে ভাই, কাঁদতে হবে।' পঞ্চু দেখলে যে গাধার পিঠে সে সওয়ার, সে-ই এ কথা বলছে আর মানুষের মতো কাঁদছে।

ভোরবেলায় তারা সুখস্থান রাসভ-রাজত্বে এসে পৌঁছল। সে এক অদ্ভুত দেশ, খালি ছোট্ট ছেলে দিয়ে ঠাসা। সবারই বয়স আট থেকে চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত। রাস্তায় ঘাটে সবখানে শুধু হাসি আর গান, হুড়াহুড়ি, লাফালাফি, নৃত্য আর চিৎকার লুকোচুরি কানামাছি, আর ডু ডু খেলবার ধুম পড়ে গেছে। পথের মোড়ে মোড়ে যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা সেইখানেই কানাত খাটানো, তাঁবু পড়েছে, যাত্রা, কন্সার্ট, বায়োস্কোপ, পুতুলনাচ, আর ভেলকিবাজি। ভোর হতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হতে ভোর কেবলই আমোদ। পথেঘাটে যেখানে সেখানে বড় বড় কাঠের তক্তায় প্রকাণ্ড অক্ষরে চারিদিকে লেখা—

নাই পাঠ, নাই পাঠশালা,
নাইকো মাস্টারের জ্বালা,
আছে সুখ, শুধু একঢালা।

পঞ্চুর দিন যেন ছুটে চলেছে। আনন্দে অধীর পঞ্চুলাল মোমবাতির গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'সত্যি ভাই, তোর মতো বন্ধু ভাগ্যে পেয়েছিলাম, তাই আজ এই এমন দেশে আসতে পেরেছি। আর মাস্টারমশায় কিনা বলতেন, "খবরদার, মোমবাতির সঙ্গে কখনও মিশো না।" '

[ক্রমশ

ঝরা পাতা

জীবন সর্দার

গোপার হাত ধরে, শিশিরভেজা ঘাসে পা ফেলে ফেলে, অশথগাছটার তলায় এসে বসলাম।

ছুটির দিনগুলোতে খুব সকালে আমি চলে যাই আমার বন্ধুর এই ছোট্ট মেয়েটার ঘুম ভাঙাতে। সে আমাকে নিয়ে যায় কাছের এক ময়দানে। আমরা দুজনে কাঁচা রোদ আর ভেজা ঘাসে ছুটোছুটি করি। ক্লান্ত হলে এসে বসি এই গাছটার গুঁড়িটাতে। আধো-আধো স্বরে সে আমাকে কোনো গানের দু-একটা কলি গেয়ে শোনায়। কখনো আমি তার সাথে সুর মেলাই, কখনো তাল দিই।

আজ সে যে গানটা গাইলে আগে কখনও শুনি নি—'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারই দলে।'

অশথের পাতা ঝরে ঝরে নীচের মাটি ঢেকে গেছে। দুটো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে সে গেয়ে গেল—ঝরা পাতা গো……।

তার গান শুনছিলাম, আর দেখছিলাম পাতাঝরা গাছগুলোকে। সব গাছেরই আর পাতা ঝরে নি। যাদের ঝরেছে, কী করুণ হয়েছে তাদের দেখতে। যে পাতাগুলি এত মাস এত দিন ডালে ডালে ছড়িয়ে থেকে সমস্ত গাছটাকে রূপের রাজা করে রেখেছিল, আজ তারা নেই। গাছটা হয়েছে যেন শোকের চিহ্ন।

গান থামিয়ে গোপা বললে, 'কাকু, দেখেছ পাতাগুলো কেমন করে ঝরছে? কেউ লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে, কেউ ভাসতে ভাসতে, কেউ-বা সোজা।'

'দেখেছি।'

'আচ্ছা কাকু, পাতাগুলো কেন ঝরে পড়ে?'

ব্যস। এই এক প্রশ্নে আমাকে কাত করে দিলে। আমি যে অনেক কিছু জানি না তা জানি। তাই যখনই এমন কোনো প্রশ্ন মনে জাগে যার উত্তর জানা নেই, তখনই চলে যাই নীলাঞ্জনের কাছে। কেননা, তার মতো চোখে-দেখা পাকা খবর কেউ দিতে পারত না। পাতা ঝরে কেন, প্রশ্নটার উত্তরে নীলাঞ্জন বলল :

পাতা ঝরবার আগে রঙ পালটে যায় তা সে লক্ষ্য করেছে। আরও লক্ষ্য করেছে, ঝরে গেলে পাতার বোঁটার যে দাগ ডালে থেকে যায়, ভিন্ন জাতের পাতার বেলায় তা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু পাতা কেন ঝরে সে খবর সে রাখে না।

এখন উপায়! ছোট্ট মেয়েটার কাছে হেরে যাব! নীলাঞ্জনের মেজদার কথা মনে পড়ল। তিনি তামাম দুনিয়ার সব খবর রাখতে চান। দিনরাত বইপত্র নিয়ে থাকেন। নীলাঞ্জন তাঁকে অনেক খবর জানিয়েছে। তাঁকে গিয়ে আমাদের সমস্যার কথা বললাম।

বই থেকে মুখ না তুলেই তিনি বললেন, 'ও, এই ব্যাপার? তবে, আমার বোঝাতে সুবিধে হবে যদি একটু গোড়া থেকে শুরু করি।
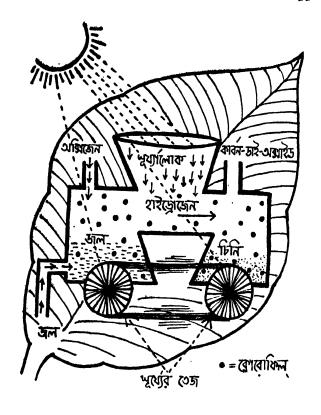
'পাতার সাধারণত দুটো কাজ : গাছ থেকে "বেশী" জল বের করা আর গাছের খাবার বানানো। এই খাবার বানানো—সাদা কথায় যাকে চিনি তৈরি করা বলতে পার—তা হয় এক চমৎকার উপায়ে।

'শেকড় মাটি থেকে জল যোগাড় করে পাঠিয়ে দেয় পাতায়। পাতা জলের গ্যাস দুটোকে ভাগ ক'রে হাইড্রোজেনকে রেখে, বের করে দেয় অক্সিজেনকে। তারপর বাতাস থেকে টেনে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এই সব কাজ ক্লোরোফিল (বা পাতার সবুজপ্রাণ) রোদের আলোয় বসে বসে ঘটায়।

'পড়ে ছিল হাইড্রোজেন, সাথী হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড। দুয়ে মিলে, সূর্যের আলোয়, মানুষের এখনো অজানা কোনো উপায়ে "চিনি" তৈরী হল। তারপর পাতার পর পাতা থেকে ডালের পর ডালে ছড়িয়ে পড়ে সে চিনি বা গাছের খাবার।

'এই ব্যাপারে কাকে কাকে দরকার?'

'জল, পাতা ও সবুজ-প্রাণ, হাওয়া আর রোদ'—আমরা বললাম।

'চমৎকার! কিন্তু সব সময় সব জিনিস ঠিক যেমনটি চাই তেমনটি কি আর মিলবে! তা হতে পারে না।

'পৃথিবী ঘুরছে। হেলছে। আলো আর তাপ বাড়ছে আর কমছে। মেঘ বৃষ্টি আর হাওয়ার

মতিগতি ঠিক থাকছে না। মানে, সারা বছর একই জায়গায় একরকম থাকছে না। এদের প্রভাব যে পাতার উপর হতে পারে সে কথা মান কি না?'

'কী করে?'

'আচ্ছা, পাতা ঝরতে শুরু করবার আগে আবহাওয়ার কথা একটু ভাবো তো। একটু একটু শীত, মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া। ঠিক এই সময় থেকে 'পাতা-ঝরা' গাছের পাতার খাবার তৈরি করার তাগিদ আর তাগদ কমে আসতে থাকে। পাতা যত খাবার তৈরি করে সব সে পাঠিয়ে দেয় বোঁটা দিয়ে ডালে। তাকে এই কাজে সাহায্য করে 'অক্‌সিন'। অক্‌সিন এক জাতের রস। তার কাজ—বোঁটা আর গাছের ডাল যেখানে মিলেছে সেখানে সরু সরু ছিদ্র দিয়ে গাছের খাবার যাতে ঠিকমত যেতে পারে তার জন্য হাজির থাকা।

'ঠাণ্ডা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতার খাবার তৈরি করার জোর কমে যায়, অক্‌সিনের কাজেও আসে মন্দা। তার ফলে, বোঁটার মুখে একটা পর্দা পড়ে—ছাড়াছাড়ির পর্দা। গাছের সঙ্গে তার বাঁধন আলগা হয়ে আসে। তারপর মাটির টানে, হাওয়ার দোলায় কখন যে সে কীভাবে ঝরে পড়ে তা তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখো।'

আমরা পাতা ঝরার কারণ তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। ওঁর কথা শেষ হতেই জিগগেস করলাম, 'শীত এলেই যদি পাতা ঝরবে তবে সব গাছেরই পাতা ঝরতে দেখি না কেন?'

'খুবই সংগত প্রশ্ন'—তিনি বললেন। 'অশথের মতো সব গাছে সব পাতা একসাথে ঝরতে দেখবে না বটে, কিন্তু যে গাছের পাতা একসাথে সব ঝরে না তারা সারা বছর ধরে একটি দুটি করে পাতা ঝরিয়ে যায়। একটি আমগাছের দিকে যে কোনোদিন নজর করলেই দেখতে পাবে তার কয়েকটি পাতা হলুদ হয়ে গিয়েছে, কারও রঙ খয়েরী—এবার ঝরবে সে।'

পাতা ঝরে পড়বার আগে তার রঙ ফেরা দেখতে আমার বড় ভালো লাগে। হিমালয়ে ঘুরতে গিয়ে বর্ণালীর সব কটা রঙ ঝরো-ঝরো পাতায় দেখেছি। মেজদা এবার বলতে শুরু করলেন:

'পাতার রঙ সবুজ, কেননা সবুজপ্রাণের (ক্লোরোফিল) কণা পাতায় অন্য রঙের কণার চেয়ে বেশী। আমাদের রক্তে লোহিতকণিকা বেশী থাকার জন্য যেমন রক্ত লাল দেখায়, সবুজপ্রাণের জন্য পাতাকে তেমনি সবুজ দেখি। পাতার রঙ-কণিকা জ্যান্‌-থো-ফিল্ আর কেয়া-রো-টিন্ সবুজ-প্রাণের কণার আড়ালে পড়ে থাকে, যেমন শ্বেতকণিকা রক্তের লোহিতকণিকার আড়ালে চাপা থাকে। পাতার রসে সবুজপ্রাণের সাথে সাথে অন্য ওই দুটো রঙের কণাও ভেসে বেড়ায়। যেই শীত পড়ে আসে, বাতাসে কমে আসে জল, 'পাতা-ঝরা' গাছের পাতার সবুজপ্রাণ সেই থেকে ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যায়, বেরিয়ে পড়ে লুকিয়ে-থাকা রঙগুলি।

'আরও একটা ব্যাপার কী হয় জান। একটু আগেই তোমাদের বলেছি, ডাল আর বোঁটার জোড়ের মুখে যেই ছাড়াছাড়ির পর্দা পড়ে, পাতা থেকে তখন কোনো কিছুই আর গাছে যেতে পারে না। তাতে, পাতা সে সময় যে চিনি বা গাছের খাবার তৈরি করে তা জমে যায় পাতায়। 'পাতার

চিনি বেশী জমে গেলে অ্যান্‌-থো-সায়া-নিন্‌স্‌ তার 'রং-মশাল' নিয়ে হাজির হয় পাতার উপর দিককার কোষে। অ্যান্‌-থো-সায়া-নিন্‌স্‌ জলে গোলা যায় এমন ধরনের রঙ—লাল, নীল, গোলাপী। ফুলের যে এত রঙ এত বাহার সে শুধু ওরই জন্য। এই ধরনের রঙের কণা যদি পাতার উপর দিকে থাকে আর নীচে থাকে অন্য রঙের কণা, তবে এক মজার রঙ পাতায় দেখা দেবে। কাঠবাদাম গাছের পাতা ঝরে পড়বার আগে কী রঙ ধরবে?'

'লাল।'

'বুঝতে পারছ কেন? পাতার যে এত রঙ ফেরা, আমরা গরমের দেশে বা সমতলে বেশী দেখি না। ঠাণ্ডাদেশ না হলে পাতা এত ঝরে না যে চোখে পড়বে। আমরা বেশী দেখি খয়েরী আর বিস্কুট রঙের পাতা ঝরতে। তা কিন্তু অ্যান্‌-থো-সায়া-নিন্‌সের জন্যে নয়, ট্যানিনের জন্যে।

'পাতা ঝরে পড়বার আগে অনেক আবর্জনা (!) গাছের কাছ থেকে নিয়ে নিজের কাছে জমায়। জমায় কী করে? পাতা থেকে জল উবে গেলে, জলের সাথে যে ধাতুগুলো মাটি থেকে শেকড় বেয়ে কাণ্ড বেয়ে পাতায় আসে, সেগুলো পড়ে থাকে। দু-এক ধরনের রঙ, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম —এরাই সেই সব 'আবর্জনা'। এরাই সব মিলে হয় ট্যানিন—শুকনো খয়েরী পাতাকে করে 'খয়েরী।'

সোজা সরল দুটো প্রশ্নের উত্তরে যে এত কথা, এত জটিল কথা, জটিলতর রসায়ন থাকবে আগে বুঝি নি। বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

মেজদাও দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে জিগগেস করলেন, 'মাটি গাছকে দেয় জল, গাছ পাতাকে দেয় সেই জল, পাতা ফিরিয়ে দেয় গাছের খাবার। কিন্তু মাটি পায় কী?'

'মাটি কী পায়? ঝরা পাতা।'

ফিরে এসে গোপার কাছ থেকে গানটা শিখে নিলাম—'ঝরাপাতা গো, আমি তোমারই দলে।'

গভীর বন সুন্দরবন

এক প্রকৃতি-পড়ুয়া সুন্দরবন গিয়েছিলেন। আরসব প্রকৃতি-পড়ুয়ার কথা তাঁর মনে ছিল। সঙ্গে তিনি মুভি-ক্যামেরা নিয়েছিলেন। পথ চলতে চলতে তিনি যা-কিছু দেখেছিলেন, অল্প সময়ে, রঙীন ফিল্মে সব তিনি তুলে এনেছেন।

এপ্রিল মাসে এক দিন কলকাতার প্রকৃতি-পড়ুয়াদের সেই ফিল্ম দেখানো হবে। কোন্‌ দিন? কোথায়? কখন? প্রত্যেক পড়ুয়ার কাছে চিঠি যাবে। সব খবরই চিঠিতে পাবে।

এক ভারি দুষ্টু বুড়ি ছিল। নাম জটাই বুড়ি। যেমন বিশ্রী নাম স্বভাবটাও তেমনি বিটকেল। সুবিধে পেলেই বুড়ি পরের গাছ থেকে কুলটা, শসাটা, লাউমাচা থেকে লাউটা পেড়ে নিত। কারুর বাড়ি গেলে হাতের কাছে যা পাবে, দরকার থাক আর না থাক, হাতিয়ে নিয়ে আসবেই। সে গৃহস্থের বাড়ি ঢুকলে অমনি সামাল সামাল রব পড়ে যেত। এই ছুঁচোপনা স্বভাবের জন্য কেউ তাকে দেখতে পারত না।

একদিন জটাই বুড়ি উনুন ধরাতে গিয়ে দেখে, ঘরে একটাও কাঠ কাটা নেই। কী করা যায়? গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল সে। আচ্ছা, কাঠকুটুম বুড়োর বাগানে শুকনো লতাপাতা পাওয়া যায় কিনা একবার খুঁজে দেখলে হয় না! যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ছুটল সে কাঠকুটুম বুড়োর বাড়ি। বুড়োর বাগানের কাছে আসতেই বুড়ি কাঠ কাটার শব্দ পেল। কে যেন দুম দুম করে কাঠ কেটে চলেছে। দেখতে হচ্ছে তো লোকটা কে। বাগানের বেড়া ফাঁক করে সে মাথা গলিয়ে দিল।

তাজ্জব ব্যাপার!

কাঠকুটুম বুড়ো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ দিব্যি কাঠ কাটা হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি চাকলা সমান মাপের—নিখুঁত।

একটা অদ্ভুত কুড়ুল নিজে নিজেই কাঠ কেটে চলেছে। কুড়ুলের ফলাটা এমন ঝকঝকে নীল যে তাকালে চোখ ঠিকরে যায়। কুড়ুলটা নিজের খেয়ালে একমনে কাঠ কেটে যাচ্ছে। কারুর সাহায্য দরকার হচ্ছে না। জটাই বুড়ি দু হাত দিয়ে বেশ ভালো করে চোখ রগড়ে নিল। নিজের চোখকেই যে বিশ্বাস হচ্ছে না। এও কি কখনও সম্ভব?

'থাম্'—কাঠকুটুম বুড়ো আদেশ করতেই কুড়ুলটা ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। বুড়ো তখন কাঠগুদাম থেকে আরও কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি নিয়ে এল। তারপর সুর করে বলল—

কুড়ুল! কুড়ুল! কাট রে কাঠ
মনের মতন কাট রে কাঠ,
দিন যায় যাক রাত যায় যাক,
কুড়ুল কাজের বিরাম না পাক—
খাট রে খাট
কাট রে কাঠ।

এই ছড়াটা সুর করে বলতেই কুড়ুলটা মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে কয়েক পাক ঘুরে নতুন উদ্যমে আবার কাঠ কাটতে লেগে গেল।

কচ—কচ—কচ। কী সুন্দর নিখুঁতভাবে কাঠ কেটে চলেছে। সব দেখে-শুনে বুড়ি তো অবাক। কোনোমতে ঐ কুড়ুলটা একবার বাগাতে পারলে তাকে আর পায় কে। যেমন করে হোক কুড়ুলটা বাগাতেই হবে। কথাটা মনে আসতেই ঝট করে একটা দুষ্টু বুদ্ধিও মাথায় খেলে গেল।

ঠিক সেই সময় রায়দের ভ্যাবলা যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। সে তাকে ডেকে বললে, 'তুই যদি কাঠকুটুম বুড়োর বাড়ির কড়াটা খুব জোরে নেড়ে পালিয়ে যাস তো তোকে চারটে পয়সা দেব।'

এ আর এমন কী শক্ত কাজ! চারটে পয়সা হাতে পেয়ে ছেলেটা তক্ষুনি কাঠকুটুম বুড়োর বাড়ির কড়া নেড়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

কড়া নাড়ার শব্দ শুনতেই কাঠকুটুম বুড়ো বললে, 'ভাই কুড়ুল, একটু থামতে হবে যে। কে আবার এল দেখে আসিগে।'

কুড়ুলও সঙ্গে সঙ্গে কাঠ কাটা থামিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

এই তো সুযোগ। কাঠকুটুম বুড়ো চোখের আড়াল হতেই জটাই বুড়ি বেড়া ফাঁক করে বাগানে ঢুকে কুড়ুলটা নিয়ে এক দৌড়ে সোজা বাড়ি।

বাড়িতে পা দিয়েই কাঠগুদাম থেকে এক পাঁজা কাঠ উঠোনে এনে সুর করে বলল—

কুড়ুল! কুড়ুল! কাট রে কাঠ
মনের মতন কাট রে কাঠ,
দিন যায় যাক রাত যায় যাক
কুড়ুল কাজের বিরাম না পাক—
খাট রে খাট
কাট রে কাঠ।

কুড়ুলটা অমনি শূন্যে লাফিয়ে উঠে নাচতে লাগল ধিনিক ধিন। ওর নাচের ভঙ্গিটা যেন কেমন কেমন। কিন্তু একটু নেচেই কুড়ুল তার নিজের কাজে মন দিল।

কচ কচ কচ। কাঠ কাটা হচ্ছে। জটাই বুড়ি কোমরে হাত দিয়ে মহা আনন্দে কাঠ কাটা দেখতে লাগল। কী নিখুঁতভাবে আর কী তাড়াতাড়ি কাঠ কাটা হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কাঠ কাটা হয়ে স্তূপাকার হয়ে উঠল উঠোনে। কাঠ কাটা শেষ হলে জটাই বুড়ি বলল, 'চমৎকার হয়েছে। এবার থাম্ দিকি নি ভাই।'

কুড়ুলটা থামল বটে কিন্তু ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল না। সে বুড়ির সামনে এসে থমকে থামল। কুড়ুলটা যেন বুড়ির দিকে চেয়ে আছে। কেমন যেন গা-ছমছম-করা চাহনি। ওকেই কাটবে নাকি? জটাই বুড়ি ভয়ে দু পা পিছিয়ে এল। কিন্তু কুড়ুলটা সেরকম কিছু না করে নাচতে নাচতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে, এগিয়ে গেল দেয়ালে ঠেসান দেওয়া ঝাঁটাটার দিকে। আর জটাই বুড়ি বাধা দেওয়ার আগেই ঝাঁটাটাকে কচ কচ করে এমন ভাবে কেটে ফেলল যে ঝাঁটাটা দিয়ে উনুন ধরানো চলতে পারে কিন্তু আর ঝাঁট দেওয়া চলবে না।

অসহ্য রাগে জটাই বুড়ি যেন জ্বলতে লাগল। কী সর্বনেশে কুড়ুল রে বাবা। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হতচ্ছাড়া কোথাকার। কী করলি বল্ তো। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজাটা।'

কুড়ুলটা অমনি থেমে গেল। এক লহমাই হবে—তাকিয়ে রইল বুড়ির দিকে। উঃ, সে কী শয়তানী চাহনি। ভয়ে জটাই বুড়ির গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। তবুও সাহসে ভর করে বলল, 'থামতে বলছি না? আচ্ছা বেয়াদব তো।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। উঠোনের এক কোণে পড়ে ছিল একটা বেঞ্চি। কুড়ুলটা এক ঝটকায় চলে গেল বেঞ্চিটার কাছে আর বাধা দেবার আগেই সেটাকে শত টুকরো করে ফেলল।

জটাই বুড়ি মরীয়া হয়ে তেড়ে গেল কুড়ুলটার দিকে, কিন্তু কুড়ুলটা তক্ষুনি ছিটকে লাফিয়ে উঠল তার মাথার উপর আর তারপর যেন প্রলয় নাচন শুরু করে দিল তাকে ঘিরে। ওকেই কেটে ফেলবে নাকি? জটাই বুড়ি ভয়ে দে পিট্টান সেখান থেকে। একেবারে বাড়ির বাইরে সদর রাস্তায়।

এবার কুড়ুলটা নিজের খুশিমত কাজ করতে লাগল। প্রথমে বাগানের গাছপালা সাবাড় হল—তারপর বাগানের বেড়া। উঠোনের উত্তর কোণে ছিল একটা বকুল গাছ—বুড়ির বড় সাধের বকুল গাছ। দেখতে দেখতে সেটাও টুকরো টুকরো হয়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল।

জটাই বুড়ি দূরে দাঁড়িয়ে হায় হায় করে বুক চাপড়াতে লাগল।

কুড়ুলটা রান্নাঘরে ঢুকল। তাক, জাল আলমারি, পিঁড়ি, বঁটি—মায় দরজা জানলা অবধি সব কুটি

জটাই বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে ছুটল কাঠকুটুম বুড়োর বাড়ি। বুড়ো তখন নিজের বাগানে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে জটাই বুড়ির বাড়ির কাণ্ড দেখছিল।

জটাই বুড়ি এসে কাঠকুটুম বুড়োর পায়ে আছড়ে পড়ল, 'আমার কী সব্বনাশ হয়ে গেল গো। তোমার হতচ্ছাড়া কুড়ুলটা আমার বাড়ি ঢুকে সব কেটে তচনচ করছে। তাকে ফিরিয়ে নাও—শিগগির'—

'তুমিই তাহলে কুড়ুলটাকে চুরি করে নিয়ে গেছ ? আর আমি এদিকে ভেবে মরছি।'

'না না, আমি চুরি করি নি। তুমি যখন ছিলে না, ও নিজের খুশিতেই নাচতে নাচতে আমার বাড়ি গিয়ে হাজির। তারপর—'

'ও যখন নিজের খুশিতেই তোমার বাড়ি গেছে বুঝতে হবে তোমাকে ওর মনে ধরেছে। তোমার বাড়িতে ও যখন থাকতে চায় আমি আর ওকে ফিরিয়ে আনতে চাই না'—এই বলে বুড়ো ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ওদিকে কুড়ুলটা রান্নাঘরের কাজ শেষ করে শোবার ঘরে ঢুকছে। খাট আলমারি চেয়ার টেবিল কিছুই আর বাকি রইল না।

জটাই বুড়ি দু হাত দিয়ে কাঠকুটুম বুড়োর পা সাপটে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ঘাট হয়েছে আমার। আমি মিথ্যা বলেছিলাম। কুড়ুলটা আমিই চুরি করেছিলাম। এবার ওকে থামতে বলো।'

কাঠকুটুম বুড়ো ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই কুড়ুলটাকে ডাকল আর ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুলটা উড়ে এসে তার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'কিন্তু বাবা, আমার ঘরদোর খাটপালঙ্কের কী হবে ?'

'কেন, উনুন ধরাবে।'

এই বলে বুড়ো হাসতে হাসতে কুড়ুল হাতে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

ছবি। সুবোধ দাশগুপ্ত

আঙুলে ছুঁচ ফোটানো

আঙুলেতে বিঁধিয়ে দিয়ে—
একটি ডজন ছুঁচ,
দাঁড়িয়ে থাকি মুচকি হেসে
পরোয়া নেই কুছ !

দর্শকেরা ভয়েই সারা—
কাণ্ড দেখে ভাই রে,
এই মজাদার খেলাই এবার
শিখিয়ে দিতে চাই রে !

রুমাল-ঢাকা বাঁ হাতখানার
বৃদ্ধ আঙুল উচ্চ
তাতেই ফোটাই ধারালো ছুঁচ,
বিপদ করে তুচ্ছ !

বিপদ হবার কারণ যে নাই;
রুমাল দিয়ে ঢেকে—
নকল বুড়ো-আঙুল বানাই
টুকরো গাজর রেখে।

মুঠো-করে-ধরা গাজর
রুমাল-ঢাকা থাকে,
সবাই ভাবে বাঁ হাতখানার
বুড়ো আঙুল তাকে।

এতেই বসাই ধারালো ছুঁচ
ডজন খানেক ভাই রে,
সকলে হয় অভিভূত—
যখন দেখে তাই রে!

খেলার শেষে উঠিয়ে ছুঁচ—
রুমাল নেবার ছলে,
সহকারী সরায় গাজর—
অলক্ষ্যে কৌশলে!

ছবি। সমর দে
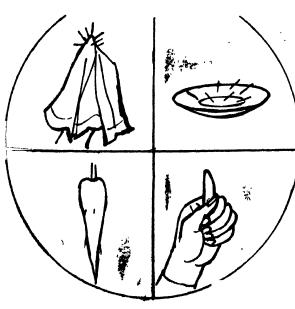
গৌরী চৌধুরী

কেষ্টতুলসীর থিকথিকে পাতার আড়ালে চারপায়ে দাঁড়িয়ে চারহাত গালে দিয়ে মাকড় ভাবছিল, ফাঁকা জায়গায় জাল বুনে বুনে অ্যাদ্দিন কী ঠকাই ঠকেছি। রোদ ঝলমল, হাওয়া শনশন, জাল ওড়ে-কি-ওড়ে ছেঁড়ে-কি-ছেঁড়ে। শ্যায়না পোকা, বিটলে ফড়িং, কাঁচপোকা, মৌমাছি এমন কি কানামাছি পর্যন্ত উড়তে উড়তে পড়তে পড়তে সামলে নেয়। সারাদিন উপোস, একটা-দুটো একলা পিঁপড়ে দিয়ে শেষবিকেলে পিত্তিরক্ষে করে সন্ধে থেকে উট্-চক্ষু হয়ে কেবল হাই তোলো আর তারা গোনো, তারপর সারারাত চিত হয়ে শুয়ে কুস্বপন দেখো। এবার থেকে আর নয় বাবা—

ইতং-বিতং-তিতং-তাল—
ঘিঞ্জি গাছে বুনব জাল।
পাতার টুপি মাথায় নে'
বসব জালের মাঝখানে।
ধিন্‌তা ধিনা তাধিন্ না
যে হোন্ আর সে হোন্ না,
পড়তে হবে পট্‌পটাপট
করতে হবে ছট্‌ফটাফট
মরতে হবে চট্‌পটাপট—

মাথার ওপর থেকে কে যেন বললে—তাহলে আর কী ? মরতেই যখন হবে, তখন চটপট মরাই তো ভালো। তা বেশ মোটাসোটা আছ দেখছি। একটা-দুটো পিঁপড়ে খেয়েই চেহারার এমন খোলতাই, ভরপেট খেতে পেলে না জানি কী হত।

মাকড়ের মুখে আর বাক্যি নেই। গোল চোখ আরও গোল হয়ে থেমে গেছে, হাত-পা অসাড়, বুকের রক্ত হিম। নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। তুলসীগাছের ডালে অঙ্গ এলিয়ে মাকড় মুচ্ছো গেল, চড়ুই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠোঁটে তুলে নিয়ে এক কামড় দিয়ে বললে—আহা।

লালবাড়ির দোতলায় কোণের ঘরের উঁচু ঘুলঘুলিতে চড়ুয়ের বাসা। লালবাড়ির বড়মেয়ের বিয়েতে মুরগীহাটা থেকে কাঁচের বাসন এসেছিল বাক্স বোঝাই হয়ে। সেই বাক্সের খড় দিয়ে কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে বাসা বেঁধেছে এই মাস দুই হল। তারপর ডিম হল, ছানা হল,—একটি মেয়ে দুটি ছেলে,—তাদেরও তো ওড়বার সময় হয়ে এল, আর কী। মেয়েটি তো এরই মধ্যে রীতিমত শৌখীন হয়ে উঠেছে,

খেতে বসে না না করে,
ঘণ্টায় ঘণ্টায় পালক ঝাড়ে।

ছেলে দুটি অবশ্য তেমন চৌকস হয় নি। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। ছেলেরা অমন একটু বোকাই থাকে, তারপর বউদের পাল্লায় পড়লেই সব ঠিক হয়ে যায়। সে নিজেই তো কী ছিল! বাবা বলতেন হ্যালাখ্যাপা, মা বলতেন ধ্যাকালা, দিদি বলত, 'চড়ুই-জন্মে ঘেন্না ধরালি, তোর ডিম হয়ে থাকা উচিত ছিল', ছোট বোনটা পর্যন্ত ছড়া কেটে কেটে বলত—

দাদা আমার শ্যায়না,
পারতপক্ষে নায় না।
অষ্টপহর ঘরেই থাকেন বন্ধ,
গাত্রে তবু সাত শহরের আঁস্তাকুড়ের গন্ধ।

সত্যি মাগো, কী নোংরা আর কী আলসে কুঁড়েই না ছিল সে। বাসি পালক ঝাড়ত না, ফুটোগাছটি নাড়ত না, দিনে ঝিমোত, রাতে ঘুমোত, বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলে খড়ের মধ্যে গা ডুবিয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকত যেন মড়াটি। সেই লোক এখন কী হয়েছে। কথায় বলে-না,

ঘরে লক্ষ্মী বউ এল
ছিরিহীনের ছিরি হল—

ঠক্ ঠঙ খটাং—

সকালবেলা বাড়ির চাকর ঝাঁট দেয় নি, জানলা খোলে নি, মুখে পান গুঁজে, চকচকে চুলে টেরি কেটে, ঝকঝকে পাম্পশু পায়ে দিয়ে ওপাড়ায় বেড়াতে গেছে, বাড়ির ছেলে সাড়ে-আটটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে এই সবে চটি ফটফটাং করতে করতে নীচে নেমেছে, অন্ধকার ঘরে একা-একা পাখা ঘুরছে বন্ বন্ শাঁই শাঁই, সেই পাখার কোনায় ধাক্কা লেগে চড়ুই ছিটকে পড়ল জানলার মাথায় তাকের ওপর সাজানো

কেষ্টনগরের পুতুলের গায়ে। খঞ্জনী ভেঙে টিকি ছিঁড়ে চোখ কপালে তুলে পুতুল উলটে পড়ল, মুখের মাকড় মুখে চড়ুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল পুতুলের পায়ের তলায়।

চড়ুই-গিন্নী ছেলেমেয়ের নিজের মুখ ঠোঁট গা পরিষ্কার করে রোদে পিঠ পেতে বসে বসে ভাবছিল, কে জানে আজ সকালের জলখাবার কিরকম আসবে, সেই বুঝে দুপুরের ব্যবস্থা—এমন সময়

ঠক্ ঠঙ খটাং।

চড়ুই-গিন্নী সাত চমক চম্‌কে তিনি থমক থম্‌কে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে—ওমা, মাগো মা, কোথায় যাব মা!

আর কোথায় যাব।
কে যায় কাছে, কে ডাকে বদ্যি
কে দেয় ওষুধ, কে দেয় পথ্যি—

সহায় নেই, সম্বল নেই, নাবালক ছেলেমেয়ে, পড়শীরা সব ভোর না হতে বেরিয়ে গেছে এপাড়া-সেপাড়া-বেপাড়া, কী আর করে, চড়ুয়ের মাথায় পায়ে আশেপাশে খড়ের বালিশ গুঁজে, গরুড় গরুড় স্মরণ করে, চোখের জল চোখে রেখে গিন্নী গেল বদ্যিবাটী।

সব শুনে-টুনে বদ্যি বললে—তোমার কত্তাটি কি চক্ষু বুজে চলেন? শখ করে মানুষের ঘরে বাসা নিয়েছেন, একটু সাবধানে ওড়াফেরা করবেন তো? যাক গে, যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন ওষুধ বলছি শোনো। যদি যোগাড় করতে পার তো বাঁচবেন, নইলে গরুড়ের ঠাকুরদার সাধ্যি নেই ওনাকে বাঁচায়।

চড়ুই-গিন্নী কাঁচুমাচু হয়ে বললে—বলুন, আমি যে করে হোক ওষুধ যোগাড় করবই করব।

বদ্যি বললে—শোনো তাহলে। আজ হল গিয়ে অঘ্রানমাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন। আজ মানুষের গিন্নীরা বাড়ির ছাদে ঘটা করে শাঁখ-টাঁখ বাজিয়ে বড়ি দিচ্ছে। সেই বড়ির মধ্যে যারা সব-চেয়ে বড় তাদের নাম বুড়ো আর বুড়ী। বুড়ো-বুড়ীর মাথায় ধান-দুব্বো দিয়ে বুড়ীর মাথায় সিঁদুর দিয়ে গিন্নীরা যেই ডালের বাটি জলের ঘটি নুনের কৌটো হিংএর শিশি নিয়ে নীচে নেমে যাবে, অমনি তোমাকে বুড়ীর মাথার সিঁদুর-লাগা একটি ধান আর বুড়োর মাথার একটি দুব্বো তুলে নিয়ে এক ছুটে এসে কত্তাকে খাইয়ে দিতে হবে। খবরদার, একটার বেশী দুটো ধান যেন না হয়, ধানের গায়ে সিঁদুরটুকু যেন না ঝরে যায়, দুব্বোটি যেন তাজা থাকে। এই যদি করতে পার, তাহলে—

চড়ুই-গিন্নী বললে—খুব পারব, খুব পারব। কিন্তু যতক্ষণ না ওষুধ পড়ে, ততক্ষণ একটা কিছু পথ্যির ব্যবস্থা যদি করে দেন—

বদ্যি বললে—কিছু না, কিছু না। কত্তার মুখে তো মাকড় আছে বললে, ওরই একটু একটু রস জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক পেটে যাচ্ছে তো। ওতেই হবে'খন।

বলেই বদ্যিমশায় কানে তুলো গুঁজে বাসার খড়ের খড়খড়িটা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। চড়ুই-গিন্নী চোখ বুজে বিড়বিড় করে ছোট্টবেলায় ঠাকুমার কাছে শেখা সেই মন্তরটা পড়ে নিলে :

এক ওড়নে হাঁটি
দুই ওড়নে ছুটি।
তিন ওড়নে পাহাড় চুর
চার ওড়নে সমুদ্দুর॥

বলেই গিন্নী উড়তে যাবে, এমন সময় পেছনের পালকে টান পড়ল। চোখ ফিরিয়ে গিন্নী দেখে—বাঃ,

ছিমছাম বেশ তো চড়ুই বউটি,
হাতে আবার পেতলের বাউটি,
মুখে একটি পানের বোঁটা,
কপালে ছোট্ট সিঁদুরের ফোঁটা।

গিন্নী বললে—কে গা তুমি? কাদের বউ? শুভকাজে যাবার মুখে পিছু টানলে?

বউ বললে—আমার শ্বশুরের কাছে ওষুধ নিলে, ব্যবস্থা নিলে, আর দর্শনীটি না দিয়েই চলে যাচ্ছ? বেশ তো?

গিন্নী জিভ কেটে বললে—ইশ, সত্যি তো, ভারী ভুল হয়ে গেছে। তা এখন তো বাছা আর সময় নেই, কত্তাকে সারিয়ে-সুরিয়ে দুজনে মিলে সামনের হপ্তায় তোমার শ্বশুরের দর্শনী দিয়ে যাব। আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে আমার ঠিকানাটা লিখে নাও।

বউ বললে—কোথায় কাগজ, কোথায় কলম, কোথায় অক্ষর, কোথায় কী! আপনি মুখেই বলুন, আমার মনে থাকবে।

গিন্নী বললে—লালবাড়ির দোতলায় কোণের ঘরের দু নম্বর উঁচু-ঘুলঘুলি।

—লালবাড়ি তো কতই আছে, কোন্ লালবাড়ি?

গিন্নী বললে—তুমি বাছা বড্ড দিক্ কর। ওই তো সবুজ জানলা, হলদে দরজা, আশে বারান্দা পাশে বারান্দা, বারান্দার টবে লবঙ্গফুলের গাছ, তেতলার চিলেকোঠায় ঠাকুরঘর, সকাল-সন্ধে শাঁখ-ঘণ্টা বাজে, একতলার ঐ কলতলাতে বুড়ী ঝি বাসন মাজতে মাজতে বকর বকর করে, গিন্নী-মা কাঁচা পাকা চুল রোদে মেলে বই পড়েন ছবি আঁকেন ছড়া কাটেন, বাচ্চা চাকর বাটনা বাটে, ছেলেরা গরম জলে দাড়ি কামায়, মেয়েরা পাটের শাড়ি কাঁধে ফেলে নাইতে যায়, ক্ষুদে মেয়ে বকবকম করে, কচি খোকা হাত-পা নাড়ে—দেখতে পাও না? শুনতে পাও না? তোমার চোখ নেই? কান নেই?

বউ বললে—বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এখন বলুন কোন্ দোতলা?

গিন্নী মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে বললে—ও মা! এ বলে কী গো?

এমন সুন্দর মুখের ছিরি,
মাথার মধ্যে গোবরের ঝুড়ি?

বলে কিনা কোন্ দোতলা ? এরপর বলবে কোন্ কোণের ঘর, তারপর বলবে···কী পাগলের পাল্লায় পড়েছি রে বাবা। ওদিকে কত্তা আমার এখন-তখন।

বলতে বলতে চড়ুই-গিন্নী হো হো করে কেঁদে উঠল। কান্নার শব্দে বল্‌কা ঘুম ভেঙে খড়খড়ি ফাঁক করে নীচের দিকে এক নজর তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বদ্যিমশায় বললেন—বউমা, আবার ?

বউটি ফুড়ুক করে উড়ে গিয়ে ওপাশের এক খোড়ো বাড়ির চালে গিয়ে বসল। চড়ুই-গিন্নী আর কোনো কথা না বলে কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে এসে হাজির হল লালবাড়ির ছাদে। দেখল, গিন্নী মা চার মেয়ে নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন, ছাদভর্তি থ্যাবড়া থ্যাবড়া কুমড়ো-বড়ি, বীটপালং-এর লাল বড়ি, তিসির বড়ি, তিলের বড়ি, পোস্তবড়ি, আহারী বড়ি, বাহারী বড়ি, কাপড়ে জালে থালায় ডালায় মটর-মুশুর-মাষকলাই-এর হাজার হাজার বড়ি ! সেই বড়ির দঙ্গলে কোথায় বুড়ো, কোথায় বুড়ী, কোথায় তাদের মাথার ধানদুব্বো—চড়ুই-গিন্নী খুঁজেই পেলে না।

মুখ শুকিয়ে আমসি, চোখের কোণে জল থমথম, চড়ুই-গিন্নী আস্তে আস্তে উড়ে গিয়ে বসল নীল বাড়ির ছাদে। নীল বাড়ির বড় বউ সাত-সকালে চান করে ডাল বেটেছে, মেজ বউ ফেনিয়েছে, ছোট বউ বড়ি দিয়েছে। বুড়ীর মাথায় সিঁদুর-লাগা ধান ঠিকই আছে, কিন্তু এতক্ষণ রোদ খেয়ে খেয়ে বুড়োর দুব্বোটি নেতিয়ে পড়েছে।

চড়ুই-গিন্নী কাঁদতে কাঁদতে গেল সবুজ বাড়ির ছাদে। সবুজ-বাড়ির মেয়ে-বউরা বেড়াতে গেছে, গিন্নী গেছেন বাপের বাড়ি, কত্তা শ্বশুরবাড়ি, বামুনঠাকুর নিয়মরক্ষে বড়ি-হাত করেছে হাতমোছার গামছাখানায়—একটা ব্যাঁকা, একটা চ্যাপটা, একটার নাক নেই, আর একটার তিনটে নাক। একটার মাথায় দুব্বোঘাসের আঁটি, একটার সারা গায়ে ধানের খোলা, একটার সারা গায়ে তিন-ধ্যাবড়া সিঁদুর আর একটার মাথায় বামুন ঠাকুর হাত ধোবার সময় জল ফেলেছিল, না, কী, সেটা গলে ক্ষীর হয়ে গামছার সঙ্গে লেপটে আছে। কোথায় বুড়ো, কোথায় বুড়ী, কোথায় ধান, কোথায় কী—এত দুঃখের মধ্যেও চড়ুই-গিন্নী ফিক করে হেসে ফেলল। তারপর চোখের জল মুছে গেল হলদে বাড়ির তেতলার বারান্দায়।

বারান্দার এক কোণে বড়ির ডালাটি রোদে মেলা রয়েছে, বুড়ীর মাথায় সিঁদুরটি ঝকঝক করছে, দুব্বোটি যেন ফুটে রয়েছে, আর ধানগুলি যেন এইমাত্তর শীষ থেকে ঝরে পড়েছে। 'এতক্ষণে পেলুম' বলে চড়ুই-গিন্নী সোজা গিয়ে মাথাটি নীচু করে ধানটি তুলতে যাবে, এমন সময় ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ এল—অ্যাই, হ্যাস। চমকে উঠে চড়ুই দেখলে, জানলার সামনে বড়ির দিকে মুখ করে গিন্নী-মা আহ্নিকে বসেছেন, বাঁ-চোখটা আধবোজা করে জপের মালার দিকে তাকাচ্ছেন, আর ডান চোখটা পাকিয়ে হাত নেড়ে বলছেন—হ্যাস হ্যাস।

চড়ুই-গিন্নী হাত জোড় করে বললে—বড়ি ছোঁব না, এঁটো করব না, শুধু একটি ধান আর একটি দুব্বো আলগোছে তুলে নেব। দোহাই আপনার, হ্যাস হ্যাস করবেন না।

কে শোনে কার কথা। গিন্নী বললেন—আ গেল যা, আবার কিচির মিচির করে। বড্ড আস্পদ্দা হয়েছে ! তুলসীগাছের তো একটি পাতাও রাখ নি, সব খেয়ে শেষ করেছ—

চড়ুই-গিন্নী বললে—সে আমি নই, আমাদের পাড়ারও কেউ নয়, সত্যি বলছি আপনাকে।

গিন্নী যেন সে কথা কানেই নিলেন না, চেঁচিয়ে বললেন—ওরে পচা, ঠ্যাঙাটা নিয়ে আয় তো।

এরপর চড়ুই-গিন্নী আর সেখানে কী করে দাঁড়ায়? নিশ্বাস ফেলে বেচারা গেল একতলা আসমানী বাড়ির উঠোনে। ও হরি, সে বাড়িতে মেয়ে নেই, বউ নেই কিচ্ছু নেই। আছে শুধু গেঞ্জিপরা এক ছোকরা বাবু আর তার বুড়ো চাকর। কোথায় বড়ি, কোথায় কী?

চড়ুই-গিন্নী এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, তারপর কাঁদতে কাঁদতে চলল বাড়ির দিকে। যেতে যেতে রান্নাঘরের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে শুনতে পেল, গিন্নী বলছেন—একটা কাজ যদি ঠিক সময়ে হয়। পই-পই করে বলে রেখেছি সক্কালবেলা উঠে দুব্বো এনে রাখবি, তা নয় ট্যাং ট্যাং করে খেলতে যাওয়া হয়েছিল। চড়ুই উঁকি মেরে দেখল, শালপাতার মোড়ক হাতে করে কালোকোলো বাচ্চা চাকর কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গিন্নী ছোট মেয়েকে ডেকে বললেন—যা তো, বুড়োবুড়ীর মাথায় তিন গাছি করে দুব্বো দিয়ে আয় তো, শুকিয়েই গেল বোধহয় এতক্ষণে।

শালপাতার মোড়ক খুলে দুব্বো বেছে ধুয়ে ছোট মেয়ে দৌড়ে গেল ছাদে, চড়ুই-গিন্নী তার আগেই গিয়ে হাজির হয়েছে। তারপর আর কী—ছোট মেয়ে দুব্বো দিয়ে যেই নীচে নেমে গেল, চড়ুই-গিন্নী বুড়ীর মাথার সিঁদুর-লাগা ধান আর বুড়োর মাথার তাজা দুব্বো তুলে নিয়ে একছুটে ঘরে এসে চড়ুয়ের মুখে গুঁজে দিল। চড়ুই চোখ মেলে উঠে বসে বললে—মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল, কী হয়েছিল বলো তো আমার?

আর কী হয়েছিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত চড়ুই-গিন্নী কত্তাকে বেরোতে দিলে না। সেই পাঁচ দিনে লালবাড়ির আনাচ-কানাচ আগা-পাশ-তলার যত মাকড় সব শেষ হল, গুদোমঘরে কালো বাক্সর পেছনে একটি নধরকান্তি ছিলেন, তিনিও গেলেন। ছদিনের দিন পাঁচজনে মিলে বদ্যিবাটী গেল বদ্যি-মশায়ের দর্শনী দিতে—কত্তা নিলে গঙ্গা-ফড়িং, গিন্নী নিলে পোস্তদানা, মেয়ে পাঁচ টুকরো রঙীন পশম, বড় ছেলে কচি কুঁড়ি, ছোট ছেলে কচি পাতা।

দর্শনী পেয়ে বদ্যিমশায় ভারী খুশী, বললেন—জীবনে এই প্রথম। সাধে কি আর বউমা অমন করে? অ বউমা, বউমা—

আর বউমা! কোথায় বউমা? বউমা গেছে আচারের খোঁজে সই-টইএর সঙ্গে মিলে একপাড়া দুপাড়া তিনপাড়া ছাড়িয়ে সেই মাঠের ধারের মাটকোঠাতে।

বদ্যিমশায়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে মাঝবরাবর এসে তিন ছেলে মেয়ে বললে—মা, বাবা, আমরা তাহলে যাই?

চড়ুই বললে—আচ্ছা।

চড়ুই-গিন্নী বললে—এসো।

তিন ছেলে মেয়ে তিন দিকে উড়ে গেল। কত্তা-গিন্নী একা-একা ফিরে এল লালবাড়ির দোতলায় রাণের ঘরের ঘুলঘুলিতে। তারপর বাসা-টাসা ফেলে রেখে একদিন দুজনে কোথায় উড়ে চলে গেল।

বাংলার খেলা

খেলার সাথী

[বাঙলাদেশ নদী-পুকুর-জলায় ভর্তি। অনেক জায়গায় ছেলেমেয়েরা প্রায় হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটতে শেখে। জলে তাদের কোনো ভয় থাকে না—নানারকম জলের খেলা তারা খেলে। তারই মধ্যে দুটি সহজ খেলার কথা খেলার সাথী শিখিয়ে দিয়েছেন। পাকা সাঁতারু না হলে এসব খেলায় নামতে কিন্তু অনেক বিপদ আছে। সম্পাদক।]

ব লা ই

'বলাই' খেলতে ভালো সাঁতার জানা চাই; কারণ এটি ডাঙার খেলা নয়—জলের খেলা। প্রথমত, পাঁচ-ছ জন ছেলে একটি পুকুরে বা নদীতে এক-কোমর জলে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন যে বলাই হতে চাইবে সে ডান হাতের একটা আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করবে, 'এই ফুট কী?' অন্য ছেলেদের মধ্যে যে কোনো একজন বলবে, 'বলাই'। তখন ছেলেটি বলবে, 'লইয়া পলাই'। বলেই সে ডুব দেবে, আর ডুব-সাঁতার দিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। অন্য সকলে ডুব-সাঁতার দিয়ে তাকে ধরতে চেষ্টা করবে। ডুব-সাঁতার না জানা থাকলে সাধারণ সাঁতার দিয়েও খেলা চলতে পারে। এইভাবে সাঁতার দিয়ে তাড়া করতে করতে যে 'বলাই'কে ছুঁতে পারবে সে আবার 'বলাই' হবে। তখন আবার অন্য সবাই তাকে ধরতে চেষ্টা করবে। এ খেলা যতক্ষণ খুশি খেলা যায়।

ন ল ডু বা নি

এই খেলাটি পুকুরে বা নদীতে খেলতে হয়। এতে পাঁচ-ছ জন ছেলের মধ্যে একজন 'নল' হবে। 'বলাই'এর সঙ্গে এ খেলার তফাত হচ্ছে এই যে, অন্য সব ছেলেরা ডুব-সাঁতার দিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে আর 'নল' তাদের ধরতে চেষ্টা করবে। সেইভাবে ডুবন্ত অবস্থায় যদি কারও গায়ে নলের ছোঁয়া লাগে তাহলে সে মোর হবে—তাকে জল থেকে উঠে খেলা ছেড়ে যেতে হবে। আর যদি 'নল' কাউকে ধরে 'চুবানি' দিয়ে জলের উপর তৎক্ষণাৎ টেনে তোলে, অথবা অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে পারে, তাহলেও সে মোর হবে। ডুব সাঁতার ভালোরকম না জানলে এ খেলা বিপজ্জনক।

খেলার আগে আঙুল মটকানো ছাড়া কোথাও কোথাও আর-এক উপায়ে 'নল' স্থির হয়। খেলুড়িরা একটা ছোটো নৌকো, সালতি বা ডোঙায় চড়ে পুকুরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে সেটা থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে, আর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকোটাকে উলটে দেয়। তারপর সকলেই সাঁতার পাড়ে ওঠবার চেষ্টা করে। যে সবশেষে পাড়ে দিয়ে পৌঁছয় সে 'নল' হয়।

[বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু বেশ কয়েক বছর যাবৎ নিখোঁজ। তাঁর একটি ডায়রি কিছুদিন আগে আকস্মিকভাবে আমাদের হাতে আসে। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' নাম দিয়ে আমরা সেটি সন্দেশে ছাপিয়েছি। ইতিমধ্যে আমি অনেক অনুসন্ধান করে অবশেষে গিরিডিতে গিয়ে তাঁর বাড়ির সন্ধান পাই, এবং তাঁর কাগজপত্র, গবেষণার সরঞ্জাম সবকিছুরই হদিস পাই। কাগজপত্রের মধ্যে আরো একুশখানা ডায়রি পাওয়া গেছে। তার কয়েকটি আমি পড়েছি, অন্যগুলো পড়ছি। প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি নীচে দেওয়া হল। ভবিষ্যতে আরো দেওয়ার ইচ্ছে আছে।]

ই মে, শুক্রবার।

লগিরির পাদদেশে একটি গুহার মধ্যে বসে পেট্রোম্যাক্সের আলোতে আমার ডায়রি লিখছি। হার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ঢিপি। গাছপালা বিশেষ কিছু চোখে ড়ে না—তবে গুহার সামনেই রয়েছে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ।

আমার কাছেই, গুহার প্রায় অর্ধেকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে হাড়ের স্তূপ—গত সতেরো দিনের ক্লান্ত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল। প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্বন্ধে আমি যতদূর পড়াশুনা করেছি, তে মনে হয় এ জানোয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর আয়তন বিশাল। পায়ের পাতা সাড়ে তিন ট। পাঁজরের মধ্যে দুজন মানুষ অনায়াসে বাস করতে পারে। সামনের পা-দুটো কিন্তু ছোট—কটা যেন টিরানোসরাসের মতো। লেজ আছে—বেশ লম্বা ও মোটা। সবচেয়ে মজা হল—দুটো ট ছোট ডানারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—যদিও এত বড় শরীরে অতটুকু ডানায় ওড়ার কোনো প্রশ্নই তে পারে না।

হাড়গুলো সরিয়ে এনে একত্র করা ছিল রীতিমত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। স্থানীয় ঢৌডারা অনেক সাহায্য করেছে। নাহলে একা প্রহ্লাদের সাহায্যে আমি আর কতটুকুই বা করতে পারতাম? অথচ বিরাট তোড়জোড় করে ঢাক পিটিয়ে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের ইচ্ছে আমার ছিল না। আমি বরাবরই নিরিবিলি কাজ করতে ভালোবাসি। তাছাড়া এ ব্যাপারে তো কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। নীলগিরির এদিকটায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড় থাকতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত অবিশ্যি আগেই পেয়েছিলাম—কিন্তু এসব ব্যাপারে তো নিশ্চয়তা বলে কিছুই নেই! অনেক বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে বলে শুনেছি।

এখানে বলা দরকার আমার হাড় সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার উৎসটি কী; কবে, কীভাবে এ নেশা আমাকে পেয়ে বসল। আমি আসলে বৈজ্ঞানিক—পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আমার কারবার; সেখানে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে হঠাৎ এত মেতে উঠলাম কেন?

এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে আমার জীবনে তিন বছরের আগেকার একটা ঘটনায় ফিরে যেতে হয়—যে ঘটনা আমার এই বহুবিচিত্র জীবনেও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

গ্রীষ্মকাল, বৈশাখ মাস। আমি বিকেলে আমার বৈঠকখানায় বসে কফি খাচ্ছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির। আমার গবেষণা নিয়ে অবিনাশবাবুর ঠাট্টাগুলো আমার মোটেই ধাতে সয় না, কিন্তু আজ তাঁর মুখ বন্ধ করার মতো অস্ত্র আমার হাতে ছিল।

আমি আমার নতুন গাছের একটি ফল তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

অবিনাশবাবু সেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন, 'ও বাবা—এমন ফল তো দেখি নি! গন্ধ আমের মতো—আবার ঠিক আমও নয়। আকারে গোল—কতকটা কমলার মতো অথচ একেবারে মসৃণ—দানাটানা কিচ্ছু নেই।'

আমি বললুম, 'ছুরি দিচ্ছি, কেটে খেয়ে দেখুন।'

অবিনাশবাবু এক কামড় খেয়েই একেবারে থ! বললেন, 'আহাহা—এ যে অতি উপাদেয় ফল মশাই! এ কি দিশি না বিলিতি? পেলেন কোথায়? এর নাম কী?'

অবিনাশবাবুকে বাগানে নিয়ে গিয়ে আমার 'আমলা' বা Mangorange গাছ দেখিয়ে দিলাম। এ গাছ আমার গত এক বছরের সাধনার ফল। বললাম, 'এবারে ছুটোর বেশি ফল মিক্স করে দেখছি। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টি—সব দিক দিয়েই আশ্চর্য নতুন সব ফল আবিষ্কার করার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে সোফায় বসতেই অবিনাশবাবু বললেন, 'এই দেখুন—ফলের ঝামেলায় আসল কথাটাই বলা হয় নি—যেটা বলার জন্যে আসা। শ্মশানটা পেরিয়ে একটা শিমুলগাছ আছে দেখেছেন তো? সেইটেয় এক সাধু এসে আস্তানা গেড়েছেন।'

'সেইটেয় মানে? সেই গাছটায়?'

'হ্যাঁ। গাছের ডাল ধরে ঝুলে যোগসাধনা করেন ইনি। পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে মাথা নীচু করে ঝুলে থাকেন, হাত দুটোও ঝুলে থাকে। এইটেই নাকি এঁর অভ্যাস।'

'যত সব বুজরুকি।'

সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার ভক্তির একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এদের মধ্যে বুজরুকের সংখ্যাই যে বেশি তার প্রমাণ আমি বহুবার পেয়েছি।

অবিনাশবাবু কিন্তু আমার কথা শুনে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। আমার টেবিলটা চাপড়ে কফির পেয়ালাটাকে প্রায় ফেলে দিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না মশাই—বুজরুকি না। সাধুটির সঞ্জীবনীমন্ত্র জানা আছে।'

'কিরকম?'

'কিরকম আবার? জন্তুজানোয়ারের কঙ্কাল এনে ফেলে দিলে মন্ত্রের জোরে সেগুলোকে রক্ত মাংস দিয়ে আবার জ্যান্ত করে ফেলেন! প্রথম দিন একটা শেয়ালকে জ্যান্ত করেন। আমার চাকর বাঞ্ছারাম নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে এসে আমার কাছে রিপোর্ট করে। শুনেটুনে আমিও প্রথমটা তাকে একটু ধমক-ধামক দিয়ে বিকেলের দিকে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে নিজেই গেসলুম। গিয়ে কী দেখলুম জানেন? ননী ঘোষের একটা বাছুর বুঝি মাসখানেক আগে রেল লাইনের ওদিকটায় চরতে গেসল। সেইখেনেই সাপের কামড়-টামড় খেয়ে ওটা বুঝি মরে পড়ে ছিল। শকুনিতে তার মাংস খেয়ে হাড়টুকু রেখে গেসল। এক রাখাল ছোকরা সেই হাড় দেখতে পায়। সাধুবাবার কীর্তির কথা শুনে সে দেখি হাড়গুলো এনে গাছের তলায় রেখেছে। আর সাধুবাবা সেই ঝোলা অবস্থাতেই দেখি সেই হাড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে হাত নাড়ছে আর চোখ পাকাচ্ছে। তারপর দেখি বাঁ হাতটা তুলে সটান পশ্চিম দিকে পয়েন্ট করে ডান হাতটা নীচের দিকে বন বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে মুখ দিয়ে কী জানি বিড়বিড় করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই—চোখের সামনে দেখলুম সে হাড়ের উপর কোত্থেকে মাংস চামড়া লোম খুর সব লেগে গিয়ে বাছুরটা যেন ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে গিয়ে হাম্বা হাম্বা বলে দে ছুট! বড় বড় ম্যাজিশিয়ান শুনেছি একসঙ্গে অনেকগুলো লোককে হিপ-নটাইজ করতে পারে। কিন্তু এখানে তাই বা হয় কী করে? এই তো আসবার সময়ও দেখে এলাম সেই বাছুরকে—দিব্যি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। তাই ভাবলুম, আপনার তো এসব ব্যাপারে বিশ্বেস-টিশ্বেস নেই—আপনাকে যদি একবার দেখিয়ে আনতে পারি, বেশ রগড় হয়! যাবেন নাকি একবার শ্মশানের দিকটায়?'

অবিনাশবাবু মিথ্যে বলছেন কিনা সেটা ওঁর সঙ্গে না গিয়ে বোঝার কোনো উপায় নেই। ভেবে দেখলাম, মিথ্যে হলে বড় জোর ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হবে। যাই না, ঘুরে আসি।

উস্রীর ধারে শ্মশান পেরিয়ে যখন শিমুলগাছটায় কাছে পৌঁছলাম তখন সূর্য ডুবতে আর মিনিট পনেরো বাকি।

সাধুবাবার চেহারা যে ঠিক এমনটি হবে তা আমি অনুমান করিনি। গায়ের রঙ মিশকালো, লম্বায় প্রায় ছ ফুট, চুল দাড়ি কাঁচা এবং ঘন, বয়স বোঝার কোনো উপায় নেই। শিমুলগাছের ডালে পা দিয়ে যেভাবে ঝুলে আছেন সাধুবাবা, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেভাবে বেশিক্ষণ থাকলে মাথায় রক্ত উঠে মৃত্যু অনিবার্য। অথচ এই লোকটির চেহারায় অসোয়াস্তির কোনো লক্ষণ নেই। বরং ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসির ভাব রয়েছে বলেই মনে হল।

সাধুটিকে ঘিরে জনা পঞ্চাশেক লোকের ভিড়। বোধহয় হাড়ের খেলার তোড়জোড় চলেছে।

অবিনাশবাবু ভিড় ঠেলে আমাকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেলেন। এবারে দেখতে পেলাম, সাধুটির মাথার ঠিক নীচেই বেড়ালের সাইজের কোনো জানোয়ারের স্তূপ হাড় করে রাখা হয়েছে। সাধু তাঁর দুহাত একত্র করে দশটি আঙুল সেই হাড়ের দিকে তাগ করে রেখেছেন। হঠাৎ এক বিকট হুংকার দিয়ে সাধুবাবা দুলতে আরম্ভ করলেন—তাঁর দৃষ্টি হাড়ের স্তূপের উপর নিবদ্ধ। অবিনাশবাবু আমার কোটের আস্তিনটা চেপে ধরলেন।

এখানে বলে রাখি—হিপনটিজম নিয়ে বিস্তর গবেষণা আমি এককালে করেছি, এবং একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে এমন কোনো জাদুকর পৃথিবীতে নেই যে আমায় হিপনটাইজ করতে পারে। ওয়াংলী, ম্যাক্সিম দি গ্রেট, ফ্যাবুলিনো, জন শ্যামরক ইত্যাদি পৃথিবীর সেরা সব জাদুকর নানান কৌশল করেও আমাকে হিপনটাইজ করতে পারে নি। বরং উলটে একবার তো সেই চেষ্টায় রাশিয়ান জাদুকর জেবুলস্কি নিজেই ভিরমি দিলেন। যাই হোক, আসল কথা হল—সাধুবাবা যদি সম্মোহনের আশ্রয় নেন, তাহলে আমার কাছে এঁর বুজরুকি ধরা পড়তে বাধ্য।

মিনিটখানেক দোলার পর সাধুবাবা স্থির হলেন। তারপর লক্ষ্য করলাম সাধুবাবার সমস্ত শরীরে একটা কম্পন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু সে কম্পন এতই মৃদু যে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তা ধরাই পড়বে না।

এবার হাড়গুলোর দিকে চাইতে একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম। হাড়গুলির মধ্যেও যেন একটা অতি অল্প, কিন্তু অতি দ্রুত স্পন্দনের লক্ষণ, এবং সেই স্পন্দনের ফলে হাড়ে হাড় লেগে একটা অতি মিহি খট খট শব্দ,—শীতকালে দাঁতে দাঁত লেগে যেমন শব্দ হয় কতকটা সেই রকম।

আমি অবিনাশবাবুর কানের ধারে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, 'লোকটা মন্তর-টন্তর আওড়ায় না?'

অবিনাশবাবু ঠোটে তর্জনী ঠেকিয়ে বললেন, 'সবুর করুন—মেওয়া ফলবে এক্ষুনি।'

এক্ষুনি না হলেও, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে সবেমাত্র শেয়াল ডেকে উঠছে, এমন সময় দেখি সাধুবাবা তাঁর বাঁ হাতটা উঁচিয়ে অস্তগামী সূর্যের দিকে নির্দেশ করছেন। আর ডান হাত বাঁই বাঁই করে ইলেকট্রিক পাখার মতো ঘোরাতে আরম্ভ করেছেন। তারপর আরম্ভ হল মুখ দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ। এটাই যদি সঞ্জীবনীমন্ত্র হয় তাহলে অবিশ্যি তা অনুধাবন করা মানুষের অসাধ্য। গ্রামোফোনের স্পীড অসম্ভব বাড়িয়ে দিলে সুর যেমন চড়ে যায়, আর

কথা যেমন দ্রুত হয়ে যায় এ যেন সেই রকম ব্যাপার। এত তীক্ষ্ণ উঁচু স্বর আর এমন দ্রুত বিড়বিড়োনি আমি মানুষের অসাধ্য বলেই জানতাম।

আবার চোখ গেল হাড়গুলোর দিকে।

আমি বৈজ্ঞানিক। এরপর চোখের সামনে যা ঘটল তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা জানি না। হয়তো আছে। হয়তো আমাদের বিজ্ঞান এখনও এসবের কূলকিনারা করতে পারে নি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে হয়তো পারবে। কিন্তু যা দেখলাম তা এতই জলজ্যান্ত পরিষ্কার যে সেটা অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যা ছিল আলগা কতগুলো হাড়, তা চোখের সামনে চোখের নিমেষে প্রথমে জায়গায় জায়গায় জোড়া লেগে গেল—অর্থাৎ মাথার জায়গায় মাথা, পাঁজরের জায়গায় পাঁজর, পায়ের জায়গায় পা, ইত্যাদি, এবং তার উপর—দেখতে দেখতে এল মাংস রক্ত স্নায়ু ধমনী চামড়া লোম নখ চোখ এবং সবশেষে—প্রাণ, আর প্রাণ আসার সঙ্গে সঙ্গেই হাড়ের জায়গায় একটি ফুটফুটে সাদা খরগোশ মিটমিট করে এদিক ওদিক চেয়ে কান দুটোকে বার কয়েক নাড়া দিয়ে এক লাফে লোকজনের পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।···

গভীর চিন্তা ও বিস্ময় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অবিনাশবাবুর কাছে এই প্রথম আমার নতি স্বীকার করতে হল। আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোক বেশ শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, 'পুথিগত বিদ্যার দৌড় তো দেখলেন মশাই। বিশ বছর ধরে অ্যাসিড ম্যাসিড ঘেঁটে হাতটাত পুড়িয়ে তো বিস্তর নাজেহাল হলেন। এবার এইসব ছেলেখেলা বন্ধ করে আমার সঙ্গে আলুর চাষে নেমে পড়ুন।'

পরের দিন দেখলাম আমার নিজের কাজে মন বসছে না। মন চলে যাচ্ছে বারবার ওই শ্মশানঘাটে শিমুলগাছের দিকে। দুদিন কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখে তৃতীয় দিনের দিন চলে গেলাম আবার সাধুদর্শনে। তারপরের দিনও আবার গেলাম। প্রথম দিনে কুকুর ও দ্বিতীয় দিনে একটি চন্দনাকে কঙ্কাল অবস্থা থেকে পুনর্জীবন পেতে দেখলাম। কুকুরটা নাকি পাগল হয়ে মরেছিল—জ্যান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মোতি ধোপার পায়ে এক কামড় বসিয়ে দিল। আর চন্দনাটা সটান শিমুলগাছের মগডালে উঠে 'রাধাকিষন' 'রাধাকিষন' বলে ডাকতে আরম্ভ করল।

আমি অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম।

আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও মন্ত্রটার কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না; অথচ ওটিকে দন্তস্ফুট করে বিশ্লেষণ করলে হয়তো রহস্যের কিছুটা সমাধান হতে পারত।

পরের দিন বিকেলের দিকে ভাবতে ভাবতে আমার মাথায় এক ফন্দি এল যেটার চমৎকারিত্ব আমি নিজেই তারিফ না করে পারলাম না।

আমার তো রেকর্ডিং যন্ত্র রয়েছে, এই দিয়ে কোনোরকমে লুকিয়ে মন্ত্রটাকে রেকর্ড করে রাখা যায় না? আলবত যায়, এবং সেটা করতে হবে এক্ষুনি। শুভস্য শীঘ্রম্। সাধুবাবা কোন্‌দিন অন্তর্ধান হবেন তার কি ঠিক আছে?

পরদিন অমাবস্যা। আমার রেকর্ডিং যন্ত্রের মাইক্রোফোনটি আকারে একটি দেশলাইএর বাক্সের মতো। তার সঙ্গে একটা লম্বা তার জুড়ে মাঝরাত্রে গেলাম শ্মশানঘাটে শিমুলগাছের কাছে।

গিয়ে দেখি সাধুবাবার খ্যাতি এমনই ছড়িয়েছে যে এত রাতেও জনা ত্রিশেক লোক গাছটার নীচে অর্থাৎ সাধুবাবার নীচে জটলা করে রয়েছে। এতে একদিক দিয়ে আমার কাজের সুবিধেই হল। আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গাছের গুঁড়িটাকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করার ভাব করে এক ফাঁকে টুক করে গুঁড়ির একটা ফাটলের ভিতর মাইক্রোফোনটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর তারের অন্য মুখটা গাছ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে একটা কেয়াঝোপের পিছনে লুকিয়ে রেখে দিলাম।

পরদিন হনুমান মিশ্রের একটা ছাগল জ্যান্ত করার সময় আমার যন্ত্রে সাধুবাবার মন্ত্রটি রেকর্ড হয়ে গেল।

যন্ত্রটি হাতে নিয়ে সন্ধ্যের দিকে যখন চোরের মতো বাড়ি ফিরলাম তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রহ্লাদকে গরম কফি বানানোর আদেশ দিয়ে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে ঢুকলাম। দু-এক ঝলক বিদ্যুতের চমক ও কিছু মেঘগর্জনের পর বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল। আমি জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে রেকর্ডটারটা টেবিলের উপর রেখে তারটা দেয়ালের প্লাগে লাগিয়ে দিলাম। আমার মতলব ছিল, প্রথমে সাধারণ স্পীডে মন্ত্রটা বার কয়েক শুনে তারপর অর্ধেক স্পীডে সেটাকে চালাব। তাহলেই মন্ত্রটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে। বিজ্ঞানের কাছে এইখানেই ত্রিকালজ্ঞ সাধুবাবাকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

সদ্য আনা গরম কফিতে একটা চুমুক দিয়ে রেকর্ডারের সুইচটা টিপে দিতেই বাদামি রঙের ম্যাগনেটিক টেপ ঘুরতে আরম্ভ করল। 'বলো হরি হরিবোল।' মনে পড়ল সাধুবাবার মন্ত্রোচ্চারণের কিছু আগেই একটি মড়া এসে পৌঁছেছিল শ্মশানঘাটে। এ তারই শব্দ।

তারপর এল শেয়ালের ডাক। তারপর এই সেই তক্ষকের ডাক। এইবার শুনব সেই মন্ত্র।

এই তো সেই তীক্ষ্ণ স্বর, সেই বিদ্যুদ্বেগে বিড়বিড়ানি—ঠিক কানে যেমনটি শুনেছি—অবিকল সেই রকম।

কিন্তু এ কী? যন্ত্র হঠাৎ থেমে গেল কেন?

আর এই বিকট অট্টহাসি কার? এ তো আমার রেকর্ড করা কোনো হাসির শব্দ নয়। এ যে আমার ঘরের পাশেই...

আমার চোখ চলে গেল পুবের জানালার দিকে। জানালার বাইরে আমার বাগান, এবং বাগানে গোলঞ্চগাছ।

বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় দেখলাম সেই গোলঞ্চগাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে শ্মশানের সেই সাধুবাবা—তাঁর তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি আমার রেকর্ডার যন্ত্রের উপর নিবদ্ধ।

ব্যাপারটা আমার কাছে এতই অস্বাভাবিক মনে হল যে আমি ভয় না পেয়ে সোজা জানালার কাছে গিয়ে সেটাকে এক ঠেলায় খুলে দিলাম।

কিন্তু কোথায় সে সাধুবাবা? গাছ রয়েছে, গাছের পাতা বৃষ্টির জলে চিক চিক করছে, কিন্তু সাধুবাবা উধাও, অদৃশ্য।

বিস্ময় হল। ভুল দেখলাম নাকি?

কিন্তু চোখ, কান দুইই কি একসঙ্গে এমন ভুল করতে পারে! হাসিও যে শুনলাম সাধুবাবার—গলার স্বর তো চেনা হয়ে গেছে এই তিন দিনে।

যাকগে—ভেলকিই হোক, আর সত্যিই হোক, চলেই যখন গেছে তখন আর ভেবে লাভ কী? তার চেয়ে বরং যন্ত্রটা চালানোর চেষ্টা করা যাক।

আশ্চর্য—এবার সুইচ টিপতেই দেখি যন্ত্র চলছে। কিন্তু শ্মশানের সেই সব শব্দ কোথায় গেল? মন্ত্রই বা কোথায় গেল?

মন্ত্রের বদলে এই বিকট হাসি রেকর্ড হয়ে গেল কী করে?

বাধ্য হয়েই মনে মনে স্বীকার করতে হল যে কোনো অলৌকিক শক্তির বলে সাধুবাবাজী আমার গোপন অভিসন্ধির কথা টের পেয়ে আমার প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দিয়েছেন।

সঞ্জীবনীমন্ত্রটি আয়ত্ত করার আর কোনো উপায় নেই।

পরদিন অবিনাশবাবু এসে বললেন, 'শিমুলগাছে টু-লেট টাঙানো রয়েছে দেখে এলুম। সাধুবাবা পগার পার।'

যেমন আকস্মিকভাবে এসেছিলেন, তেমনই আকস্মিকভাবে চলে গেছেন সাধুবাবা। রেখে গেছেন শুধু তাঁর বিকট হাসি, আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত কিছু পাখি আর জানোয়ার।

আরো একটি জিনিসকে সাধুবাবার দান বলেই বলব—সেটা হল হাড় সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা। হাড়ের নেশা এর পর থেকেই আমাকে পেয়ে বসে। আমার বাড়ির যে ঘরটা খালি পড়ে ছিল কয়েকমাসের মধ্যেই নানান পশুপক্ষীর কঙ্কাল দিয়ে সেটা এবার ভরাট হয়ে যায়। হাড় সম্বন্ধে যা কিছু পড়ার তা পড়ে ফেলি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার সবের মধ্যেই যে একটা অস্থিগত সাদৃশ্য আছে তা জেনে একটা অদ্ভুত মনোভাব হয় আমার। যাবতীয় প্রাণীর কঙ্কালের প্রতি একটা বিচিত্র আকর্ষণ আমি অনুভব করতে থাকি। একরকম চশমাও আমি আবিষ্কার করি যার মধ্য দিয়ে দেখলে জীবন্ত প্রাণীর রক্তমাংস না দেখে কেবল তার কঙ্কালটাই দেখতে পাওয়া যায়।

এই হাড় থেকেই জাগে প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ার সম্পর্কে কৌতূহল। অবিশ্যি

এই দুইএর মাঝখানে রয়েছেন শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গম দেশিকাচার শেষাদ্রি আয়াঙ্গার, বা সংক্ষেপে মিস্টার আয়াঙ্গার। এখানের অভ্রের খনিতে কাজ নিয়ে আসেন এই মিস্টার আয়াঙ্গার। ব্যাঙ্গালোরবাসী অমায়িক যুবক-ব্রাহ্মণ। আমার সঙ্গে আলাপ উস্ত্রীর ধারে। বেশ লাগল ভদ্রলোকটিকে। গণিতজ্ঞ পণ্ডিত লোক—তাই কথা বলে বেশ আরাম পাওয়া যায়।

তাঁর বাড়িতেই একদিন বিকেলে চা খেতে গিয়ে বৈঠকখানার কোণের টেবিলের উপর দেখলাম এক অতিকায় গোড়ালি অর্থাৎ কোনো অতিকায় জানোয়ারের গোড়ালির হাড়।

হাড়টা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'নীলগিরিতে এক বন্ধুর চা-বাগানে ছুটিতে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি পাহাড়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওই হাড়টা পাই। হাতি না গণ্ডার? বলুন তো কিসের হাড়?'

মুখে বললুম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' মনে মনে বললুম, তুমি গণিতজ্ঞ হতে পার, কিন্তু অস্থিবিদ্ নও। এ হাড় হাতিরও নয়, গণ্ডারেরও নয়! এ হাড় যে জানোয়ারের, সে জানোয়ারের অস্তিত্ব অন্তত কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

আমি নিজে বুঝেছিলুম—হাড়টা ব্রন্টোসরাসের, এবং তখনই মনে মনে স্থির করেছিলুম—নীলগিরিতে একটা পাড়ি দিতেই হবে।

সেইদিন থেকে তোড়জোড় শুরু করে আজ এই তিন সপ্তাহ হল আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। আশ্চর্য সৌভাগ্যক্রমে, আমরা আসার চার দিন পরেই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের সন্ধান পেয়েছি এই গুহার মধ্যে। টুকরো ইতস্তত ছড়ানো হাড় এক জায়গায় স্তূপ করে রাখতে বিস্তর বেগ পেতে হয়েছে। সত্যি বলতে কী, স্থানীয় টোডাদের সাহায্য ও সহানুভূতি না পেলে এ কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভবই হত না।

আগেই বলেছি, এ জানোয়ার আমার অপরিচিত। শুধু আমার কেন, প্রাণিবিদ্যার জগতে এ জানোয়ারের পরিচয় কেউ জানে বলে আমার মনে হয় না। আমি স্থির করেছি আর দু-এক দিনের মধ্যেই ব্যাঙ্গালোরে আমার আবিষ্কারের কথা জানিয়ে দেব। আমার একার পক্ষে এ হাড় স্থানান্তরিত করা অসম্ভব।

মাসখানেকের মধ্যেই কলকাতা কি মাদ্রাজের জাদুঘরে একটি নাম-না-জানা প্রাগৈতিহাসিক কঙ্কালের স্থান হলে মন্দ হয় না।···

৯ই মে, রবিবার।

ব্যাঙ্গালোর স্টেশনের ওয়েইটিং রুম-এ বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকালের ঘটনাটার একটা যথার্থ বর্ণনা দেওয়া বৈজ্ঞানিকের চেয়ে সাহিত্যিকের পক্ষেই বোধহয় সহজ বেশি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। অনেক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, অনেক বিষাদ, অনেক বিভীষিকা আমার জীবনে দাগ রেখে গেছে, কিন্তু কালকের ঘটনার যেন কোনো তুলনা নেই।

কাল বিকেল অবধি আমার কাজ ছিল হাড়গুলোকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করা। এই আদ্যিকালের ধুলো ঝাড়া কি আর এক নিমেষের কাজ? এক-একটি অংশ পরিষ্কার করছি, এবং সেইগুলো আমার টোডা অ্যাসিসট্যান্টদের সাহায্যে যথাস্থানে বসাচ্ছি। জন্তুর চেহারাটা যেন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

সন্ধ্যা হবার মুখটাতে টোডারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে দিলাম সব্জীর সন্ধানে।

আমি একা গুহার ভিতরে রয়েছি। এইবার পেট্রোম্যাক্সটা জ্বালাবার সময় হয়েছে। গুহার বাইরের অশথগাছে পাখির কলরব থেমে গিয়ে চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব।

দেশলাইটা জ্বালাতে হঠাৎ যেন একটা খচমচ শব্দ শুনতে পেলাম। গিরগিটি বা গোসাপ জাতীয় কিছু হবে আর কি। কিন্তু টর্চের আলোতে কিছুই চোখে পড়ল না।

পেট্রোম্যাক্সটাকে জ্বালিয়ে একটা চ্যাটালো পাথরের উপর রাখতেই গুহার ভিতরটা বেশ আলো হয়ে উঠল।

সেই আলোয় হাড়গুলোর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল সেগুলো যেন অল্প অল্প কাঁপছে।

এটা অনুভব করতেই তিন বছর আগেকার শিমুলগাছের সেই স্মৃতি আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে দিল এবং আমার চোখ চলে গেল গুহার মুখের দিকে।

বাইরে অশথগাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে সেই সাধুবাবা।

তার বাঁ হাত পশ্চিম দিকে তোলা, ডান হাত বনবন করে ঘুরছে, দৃষ্টি বিস্ফারিত, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে জ্বলজ্বল চোখ করে চেয়ে আছে আমারই দিকে।

তারপরই আরম্ভ হল তীক্ষ্ণ ক্ষীণ স্বরে অতি দ্রুতলয়ে সেই অদ্ভুত অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ।

কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করেই আমার দৃষ্টি সাধুর দিক থেকে ঘুরিয়ে দিল ওই প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের হাড়ের স্তূপের দিকে।

হাড় এখন আর হাড় নেই। তার জায়গায় এক অদৃষ্টপূর্ব অতিকায় আদিম প্রাণী সাধুবাবার অলৌকিক শক্তির বলে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হচ্ছে।

আমি এই বিপদেও আমার হাতিয়ারের কথা ভুলে গিয়ে যেই পাথরে বসেছিলাম, সেই পাথরেই পাথরের মতো বসে রইলাম। অন্তিমকালে ইষ্টনাম জপ করার চিন্তাও আমার মাথায় আসে নি। একটা কথাই কেবল মনে হয়েছিল যে যদি এই মুহূর্তেও আমার মৃত্যু হয়—অন্তত এটুকু জানব যে এ দৃশ্য দেখে মরার সৌভাগ্য আর বোধহয় কারুরই হয় নি।

প্রাণের স্পন্দন আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি জানোয়ারটির আকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিলাম। এত পরিশ্রম করে অতীতের যে জানোয়ারের কঙ্কালের আবিষ্কর্তা এই আমি, সেই কঙ্কাল পুনরুজ্জীবিত হয়ে কি শেষটায় আমাকেই ভক্ষণ করবে?

গুহার বাইরে অশ্বত্থগাছটার দিকে একটা দ্রুত দৃষ্টি দিয়ে বুঝলাম সাধুবাবার চোখে মুখে এক পৈশাচিক উল্লাসের ভাব। আমি এককালে আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে তাঁর মন্ত্র অপহরণের চেষ্টা করেছিলাম,এ বং অনেকদূর সফলও হয়েছিলাম। সাধুবাবা আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত।

এক বিশাল গর্জন গুহার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার রক্ত জল করে দিল। বুঝলাম জানোয়ারের দেহে প্রাণ এসেছে।

ক্রমশ সেই পর্বতপ্রমাণ দেহ তার পিছনের দু পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল। একজোড়া জ্বলন্ত সবুজ চোখ কিছুক্ষণ আমার পেট্রোম্যাক্সটার দিকে চেয়ে রইল।

তারপর দেখি জন্তুটা এগোতে শুরু করেছে। তার উত্তপ্ত নিশ্বাস আমি আমার দেহে অনুভব করছি। একটা মৃদু অথচ গুরুগম্ভীর গর্জন ও লেজের দু-একটা আছড়ানিতে অনুমান করলাম জানোয়ার কোন কারণে বিচলিত—হয়তো বিক্ষুব্ধ।

তারপর দেখলাম জানোয়ারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গুহার বাইরে অশত্থগাছটার উপর এবং পরমুহূর্তেই সে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পরের দৃশ্য আমার জীবনের শেষদিন অবধি মনে থাকবে।

জানোয়ারটা সোজা গিয়ে অশ্বত্থগাছের একটা ডাল ধরে পাতা সমেত সেটাকে মুখে পুরে দিল।

আর সাধুবাবা? তাঁর যে অন্তিম অবস্থা উপস্থিত সেটা কি তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন? আর তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে যে তিনি তাঁর শেষ ভেলকি দেখিয়ে যাবেন, সেটা কি আমি জানতাম? জানোয়ারটা যখন ডাল ধরে নাড়া দিচ্ছে তখনই লক্ষ্য করছিলাম যে সাধুবাবার প্রায় ডালচ্যুত হবার উপক্রম। কিন্তু সেই অবস্থাতেই দেখলাম তিনি তার বাঁ হাতটি পুবদিকে তুলে ডান হাত বনবন করে ঘুরিয়ে আরেকটা কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

মন্ত্র শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধুবাবা গাছ থেকে মাটিতে পড়লেন এবং পরমুহূর্তেই সেই অতিকায় আদিম জানোয়ার মুখে একগুচ্ছ অশ্বত্থপাতা নিয়ে চতুর্দিক কাঁপিয়ে এক বিরাট আর্তনাদ করে কাত হয়ে পড়ল সাধুবাবার উপরেই।

তারপর দেখলাম একদিন যা দেখেছি তার বিপরীত জাদু। একটি আস্ত রক্তমাংসের জানোয়ার চোখের সামনে আবার অস্থির স্তূপে রূপান্তরিত হল। আর সেই বিরাট কঙ্কালের পাঁজরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম এক নরকঙ্কাল সাধুবাবার মৃতদেহও জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গেই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে।

আপনা থেকেই আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হল। রাখে কেষ্ট মারে

কে ? এই জানোয়ার উদ্ভিদ্‌জীবী এবং পুনর্জীবন লাভের পরমুহূর্তে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল বলেই সামনে আর কিছু না পেয়ে অশ্বত্থের পাতায় ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করেছে। সর্বজ্ঞ সাধুবাবার এ কথাটি জানা ছিল না। মাংসাশী হলে জানোয়ার প্রথমে আমাকেই খেত এবং তারপরেই সাধুবাবা উলটো মন্ত্র উচ্চারণ করে জানোয়ারকে আবার অস্থিতে পরিণত করে তাঁর প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করে অন্য কোনো গাছে গিয়ে আশ্রয় নিতেন !

একেই কি বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা ?···

প্রহ্লাদ চা এনেছে। ট্রেনও বুঝি এসে গেল। এখানেই আমার লেখা শেষ করি।

আর ক্যাচ ফসকাবে না
ছবি। অমল চক্রবর্তী

এক স্বাভাবিক পশুশালা

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক আফ্রিকার ট্যাঙ্গানিকা অঞ্চলে একটা আশ্চর্য জায়গা আবিষ্কার করলেন। সোলার টুপি মাথায় দিয়ে কয়েকজন স্থানীয় লোক সঙ্গে নিয়ে বনজঙ্গল ভেঙে চলতে চলতে হঠাৎ দেখেন—পায়ের কাছে পৃথিবীর বুকে সবুজ গাছপালায় ভরা বিশাল এক গর্ত; আধ মাইল গভীর, এপার থেকে ওপার মাইল বারো হবে। সমস্ত জায়গাটি জুড়ে চরে বেড়াচ্ছে দলে দলে হাতি, জেব্রা, হরিণ ইত্যাদি। সমুদ্র থেকে এ জায়গাটা সাড়ে পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। গর্তের তলাটি দিব্যি সমান, আয়তনে প্রায় একশো-এক বর্গমাইল।

বৈজ্ঞানিকের এ কথা বুঝতে একটুও দেরি হল না যে এটা একটা নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির বিশাল মুখ ছাড়া আর কিছু নয়।

জায়গাটার নাম স্টোরস্টোরো। একে বাস্তবিকই প্রকৃতির লীলাভূমি বলা চলে। মনে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে এখানে মানুষের বাস ছিল না—জীবজন্তুরাই রাজত্ব করত। ইদানীং অবিশ্যি মাসাইজাতীয় অধিবাসী কিছু কিছু দেখা যায়। মাসাইরা যেমনি বীর যোদ্ধা তেমনি পশুপালনে ওস্তাদ,—এখানকার উপযুক্ত বাসিন্দাই বটে।

এই আশ্চর্য জায়গাটি আবিষ্কার হবার পর একাত্তর বছর কেটে গেছে; জায়গাটি সম্বন্ধে জানাজানিও হয়ে গেছে, পৃথিবীর অধিবাসীদের কৌতূহলী দৃষ্টিও এর উপরে পড়েছে, তবু এ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন এখানকার বিশেষত্বটুকুকে রক্ষা করতে। কারণ এমন একটি স্বাভাবিক পশুশালা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে বলে আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি।

সবচাইতে কাছের শহরের নাম আরুয়া, সেখান থেকে জীপে এখানে পৌছতে অসমান মেঠো পথ দিয়ে ছ ঘণ্টা লাগে। আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বতশিখর কিলিমাঞ্জারো, উচ্চতায় ১৯,৩৪০ ফুট। সেটি এখান থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে।

এখানে প্রতি বছরে হাজার দশেক যাত্রীর আগমন হয়। তাদের থাকবার জন্যে গর্তের দক্ষিণ দেয়ালের উপরে ঘর তৈরি করা হয়েছে। ল্যাণ্ডরোভারে নামতে প্রায় আধঘণ্টা লাগে; পাহাড়ের গা বেয়ে বনলতায় আচ্ছন্ন, শিকড় আর কাঁটা-ঝোপে আকীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে নীচে পর্যন্ত। সঙ্গে বন্দুক নেওয়া বারণ, শিকার করা নিষিদ্ধ। মনে হয়, পেট্রলের গন্ধের জন্যই মানুষের গায়ের গন্ধ ওখানকার নিশ্চিন্ত জানোয়াররা ততটা টের পায় না।

প্রকৃতির এই লীলাভূমির তুলনা হয় না। তলদেশটি সাদা, গোলাপী, নীল, হলদে, বেগুনী ফুলে ঢাকা, তার উপর দিয়ে মোটর চালাতে মায়া লাগে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকানো যায় না কারণ

চারদিকে রোমাঞ্চে ভরা। এক জায়গায় হয়তো দেখা গেল বুনো শুয়োরের জোড়া ছানাপোনা নিয়ে কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। পুরুষটার মুখের দুপাশে দুটি লম্বা ধারালো দাঁত তলোয়ারের মতো ঝুলে আছে, এক নিমেষে তাই দিয়ে বাঘের পেট চিরে ফেলতে পারে।

আরেক জায়গায় একপাল সিংহ, হয়তো গাড়ির কাছে ঘেঁষে এল, গাড়ির আরোহীদের তো আত্মা-পাখি খাঁচাছাড়া! সুখের বিষয়, বাবা মা ভোঁদা ভোঁদা ছানাদের সব জেবরার মাংস খেয়ে পেট ঢাক, বেশি নড়াচড়ার ক্ষমতাও নেই! মরা জানোয়ারটাও কাছেই পড়ে আছে, শেয়ালে হায়নাতে একটা ঠ্যাং ধরে টানাটানি করছে। দর্শকরা নিরাপদে তার মধ্যে দিয়ে চলে গেল। প্রকৃতির রাজ্যে কিছু ফেলা যায় না, আশেপাশে লম্বা-পা সারস ঘুরছে, শেয়ালরা সরলে তারা ভাগ বসাবে। আকাশে ঘুরছে শকুন-গৃধিণীর পাল, চাঁচিপুঁচিতে তারাই বা বাদ যায় কেন! তাদের পর আসবে বুনো ইঁদুররা, তারপর বাদবাকি পিঁপড়েরা খেয়ে সাফ করে দেবে। কেবলমাত্র সাদা ধবধবে কঙ্কালটা পড়ে থাকবে। ময়লা নোংরা দুর্গন্ধ এখানে অচল।

কোথাও হরিণের পাল চরছে, কোথাও স্বর্গের পাখির ঝাঁক, কোথাও বুনো হাতির দল। তারই মধ্যে দেখা গেল এক-আধজন মাসাই বীর। তামাটে রঙের গা, পাতলা শরীর তীরের মতো সোজা, শক্ত, মজবুত; পরনে একটি নেংটি, হাতে বল্লম। প্রকৃতির রাজ্যে এমন মানুষকেই মানায়। চিতাবাঘ, গণ্ডার আর আফ্রিকার বিখ্যাত আইরিস পাখির মতোই মানুষ এখানে সরল, স্বাভাবিক, সুন্দর।

কেন?

১। হাসলে চোখে জল আসে কেন?
২। দাগী আসামীর টিপসই নেওয়া হয় কেন?
৩। ভরপেট খাওয়ার পর ঘুম পায় কেন?
৪। পোড়বার সময় কাঠ থেকে শব্দ বেরোয় কেন?
৫। মাছেদের চোখের পাতা থাকে না কেন?

ঝন্‌ঝনিয়ে ঢালতলোয়ার

নির্মলেন্দু গৌতম

ঢালতলোয়ার সঙ্গে আমার
মিছেই তোদের বড়াই রে ;
আয় না করি লড়াই রে !
ঢালতলোয়ার সঙ্গে আমার
তোদের কি আর ডরাই রে !

ডরাই নাকো, বর্ম আঁটা
বুকের ভেতর সাহস তাই,
মাঠ কাঁপিয়ে হোক লড়াই !
ঝন্‌ঝনিয়ে ঢালতলোয়ার
ভেঙেই দেব তোর বড়াই !

আমার সঙ্গে কেউ পারে না
আসবি কে আয় লড়াইতে—
হারিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেব
সোজা মোগলসরাইতে !!

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

॥ এগারো ॥

আস্তানায় পৌঁছবার অনেক আগেই সেই চাদর-জড়ানো রোগা লোকটি হনহনিয়ে এগিয়ে এসে ওদের ধরে ফেলে কোনো কথা না বলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। ওদের তো হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল! লোকটা দুজনের মাঝখানে ঢুকে নীচু গলায় বললে, তাহলে এবার কী করা হবে?

রাখাল ভয়ের চোটে রেগে উঠল, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবার কী দরকারটা আপনার মশায়?

লোকটা হাসল, কোন্‌টা তোমাদের ব্যাপার আর কোন্‌টা আমাদের, তাই নিয়েই গোল বাধছে। দুটোই যদি এক হত, তাহলেই ল্যাটা চুকে যেত।

রাখাল বললে, বাবু, আমরা পাঠশালা-পালানো মুখ্যু মানুষ, অত হেঁয়ালির মানে বুঝি নে, পষ্ট করে বলুন কী বলতে চান।

লোকটা খানিক চুপ করে থেকে খোলাখুলি বললে, তাহলে পষ্ট কথা হল এদেশের নিয়মকানুন পালটাতে আমাদের সাহায্য করো, তা হলে যা চাও তোমরা আমরা তাই দিয়ে দেব।

এতক্ষণে ভুতো ফিক করে হেসে ফেলল, ধ্যাত! তাই দেয় কেউ কখনো!

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, তোমাদের বুঝে ওঠা দায়। কেন, দেব না কেন? কী চাও তোমরা? মনের মতো কাজ চাও, এই তো? তা আর দেওয়া যাবে না কেন?

এবার রাখাল হো হো করে হেসে উঠে বলল, বেশ বলেছ বাবু, মনের মতো কাজ চাই! হি, হি।

কেন, অত হাসির কী আছে শুনি? এ কাজ ভালো লাগে না, ও কাজ চাই, এটা নয় সেটা। তোমরা এসে ইস্তক তো তাই শুনে আসছি। দিকদারও তো তাই বলল। এখন আবার মত বদলাবার কী হল বুঝলাম না।

অবাক হয়ে গিয়ে রাখাল ভুতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। লোকটা আরও বলে যেতে লাগল, তার বেশি আর কী চাইতে পার জানি না। হ্যাঁ, তবে উদয়াস্ত খাটতে না-ও ইচ্ছা হতে পারে, এত আইন মেনে চলতে না-ও চাইতে পার। রোসো না, একবার গদিতে আমরা চেপে বসি না, দেখো, তোমাদের কত সুবিধা করে দিই।

ভুতো বললে, কে সুবিধা করে দেবে? তুমি না তোমার দিকদার?

ভুতোটার কথা বলার আস্পর্ধা দেখে রাখাল চমকে গেল। তার গেঞ্জি ধরে টেনে বললে, বাবুর সঙ্গে ওরকম অশ্রদ্ধা করে কথা বলছিস কেন?

ভুতো বললে, কেন, তাতে কী হয়েছে, এদেশে তো সবাই সমান। গদি-ফদি আবার কী? সভায় শুনে এসেছি সবাই মিলে দেশ চালায়, তার মানে জমিদার-টমিদার নেই। তবে আবার অত ভয় কিসের?

এই বলে ভুতো একটু তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে নিল। রাখালের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ও কী, ভুতোটা খেপে গেল নাকি? ধমক দিয়ে বলল, ও কী হচ্ছে?

ভুতো বললে, আনন্দের চোটে একটু নেচে নিচ্ছি। তোদের হট্টমালায় তো আর আনন্দের চোটে নাচবার উপায় নেই, তাই এখানেই একটু নেচে নিচ্ছি। সেখান থেকে মাকে নিয়ে আসব ঠিক করেছি। মা-ও একটু আনন্দের মুখ দেখুক। হ্যাঁগো বাবু, আমাদের ভুঁইতরাসির পথটা বলে দেবেন? ব্যস আমি আর কিচ্ছুটি চাই না। সারাজীবন যেমন করে বলেন খেটে দেব, পয়সাকড়ি কিচ্ছু চাই না, লাইব্রেরির সোনাদানা রাখাল একাই নিক গে, ওতে আমার ম্-ম্-ম্—

আর কিছু বলা হল না ভুতোর, রাখাল দু হাতে ওর মুখ চেপে ধরল। সঙ্গের লোকটা ওদের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর বললে, ঠিক বুঝলাম না তোমাদের কথা। দিকদারকে কী বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না।

রাখাল ততক্ষণে মরীয়া হয়ে উঠেছে। মুখ ভেংচে বলল, রাখো, ন্যাকামো রাখো, কিছুই বোঝ না, না? তবে শোনো, তোমাদের লাইব্রেরি ঘরে তাল তাল সোনার গয়না দেখে এসেছি, সেই সব আমাদের দেশে পাচার করতে চাই। এখন কী বলবে বলো।

লোকটা যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথা নাড়তে লাগল, এত জিনিস থাকতে, এত সুবিধা থাকতে, ওইগুলোর উপর লোভ? আশ্চর্য তো! আচ্ছা, কী করতে হবে বললেই করে দেব, তার আগে আমাদের কাজটি করে দিতে হবে কিন্তু।

রাখাল ভারি সেয়ানা, নইলে এতকাল একা হাতে আর করে খেতে হত না। এই শেষ বারও হয়তো ভুতোটা সঙ্গে না থাকলে ধরা পড়ত না। সে তাই বললে, কিচ্ছু করতে হবে না বাবু, শুধু ভুঁইতরাসি ফেরার পথটা বাতিয়ে দিন আর কারও কাছে কিছু যেন ফাঁস করে দেবেন না।

লোকটা ভাবিত হয়ে বললে, আমি পথ বাতলাব কী করে? ভুঁইতরাসির নামই শুনি নি কখনও। তবে দিকদার গাছগাছড়ার সন্ধানে ইদিক উদিক যায় অবিশ্যি, ওর জানা থাকতে পারে। গাছের খোঁজে বনে বনে ঘুরেই তো সেই যে জ্বর পাকড়ে আনল, সেই থেকে ও অন্যরকম হয়ে গেল। এখন আমাদের ক-জনাকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে। আরও লোক জড়ো করা দরকার। তোমরা এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পার।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে রাখাল, ওর কথার অর্ধেকের বেশি বোঝে না। তবু বলে, অতশত বুঝি নে বাবু, কী করতে হবে সেইটুকু বলে দাও, আমি করে দেব। তবে সইটই দিতে পারব না। টিপসই দিতে আমার ওস্তাদের বারণ ছিল।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে, কে আবার তোমার ওস্তাদ?

রাখাল ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তাই দিয়ে তোমার কী হবে বাবু, সে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। নাও, এখন কী করতে হবে বলো। তার বদলে কিন্তু আমাদের দেশের পথটি দেখিয়ে দিতে হবে, নৌকো ঠিক করে দিতে হবে।

লোকটা বললে, নৌকো করে যেতে হয় বুঝি সেখানে? বেশ তো মজা।

মজাটজা রাখো বাবু, কী করতে হবে বলো।

কিছুই না, শুধু চাদরের মধ্যে করে এই কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে যাবে আর লাইব্রেরির ভিড় কমে গেলে এখানে ওখানে একটা করে এমনভাবে সাজিয়ে রাখবে যাতে যে সেখানে বসবে তারই চোখে পড়বে।

তারপর ভুতোর দিকে ফিরে বললে, আর তুমি বাইরের কাজ করবে, এখানে ওখানে গাছের ডালে, নৌকোঘাটে, সেখানেই ফাঁকা দেখবে একটা কাগজ-এই পিন দিয়ে আটকে দেবে। নাও, ধরো।

ভুতো হাত বাড়ায় না দেখে লোকটা একটু যেন ঘাবড়ে গেল। রাখালকে শুধোল, বলি ওহে, তোমার এই স্যাঙাতটি যেন কেমনতর, ওকে বিশ্বাস করা যাবে তো?

রাখাল ভুতোর দিকে রুখে দাঁড়িয়ে বলল, খবরদার ভুতো, কেঁইচিপনা করেছিস কি মরেছিস। আমি পয়সা কড়ি নিয়ে একাই চলে যাব ভুঁইতরাসি, তারপর তোর বুড়িমার কী হয় দেখিস।

ভুতোর তাই শুনে নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড়, ওরে আমি কি তাই বলেছি নাকি? দিকদারের ব্যাপারে আমার কী, আমাকে যেটুকু করতে বলবে করে দোব, তারপর ভুঁইতরাসি গিয়ে মাকে আনব। তা হলেই হল তো? আরে এ যে আমাদের গাঁয়ের থিয়েটার পার্টির লোটিসের মতো। কিন্তু আমাদের তো চাদর নেই, সবাই দেখে ফেলবে যে?

লোকটি হেসে বললে, অত কাঁচা কাজ দিকদারের নয়। বলে চাদরের মধ্যে থেকে দুটি দিব্যি নতুন জোলার উড়ুনি বের করে দুজনার গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে জানিয়ে দিল এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে হবে না।

লোকটা চলে গেল, ভুতো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, কী জানি, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। ওগুলো বিলি করলে কোনো অন্যায় কাজ হবে না তো?

রাখাল বললে, দূর, তোর যেমন কথা। ছাপার লেখা দেখতে পাচ্ছিস নে? ও কখনো মন্দ হয় না।

তাই হবে হয়তো। পথঘাট নিঝুম, কেউ কোথাও নেই, নিরিবিলি জায়গা দেখে রাখাল-ভুতো ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিলের গোছা দুটিকে নিজেদের কোঁচড়ের কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে নিল, বাইরে থেকে কিছু মালুম দিল না। রাখালের একটু হাসিও পেল এই ভেবে সে এই কাগজের কুচি দিয়ে নাকি দিকদার এখানকার নিয়ম পালটাবে। নির্ঘাত পাগল! আরে সেবার দাঙ্গার সময়, জমিদারবাবুর শালা তাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে লেঠেল ঠ্যাঙাড়ে ভাড়া করেও কিছু করতে পারল না, মাঝখান থেকে নিজেই দেশছাড়া হয়ে রইল। আর দিকদার মনে ভেবেছে কী।

দেশের জন্যে রাখালের মন কেমন করে, অথচ এ জায়গাটা সত্যিই চোরদের জন্যই তৈরি, নইলে পুরোনো কোনা-ছেঁড়া পুঁথিপত্র আলমারিতে বন্ধ করে, সোনাদানাগুলোকে বাইরে ফেলে রাখবে কেন? আসলে এখানে যে ওসবের এক কানা কড়িও দাম নেই এ কথা রাখালের বুঝতে বাকি নেই, ওগুলোর দাম পেতে হলে ভুঁই-তরাসিতে না গিয়ে সোনাগঞ্জে যাওয়া দরকার। ভুঁইতরাসিতে ওসব নিয়ে পা দিয়েছে কি আবার ধরে নিয়ে যাবে থানায়। সোনাগঞ্জের সুখেন পোদ্দার এর আগে রাখালের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনেছে। বাজার দরের চেয়ে দাম একটু কম পাওয়া গেলেও, একেবারে নিরাপদ নিশ্চিন্ত হয়ে জিনিসগুলো পাচার করা যাবে। হাজার হাজার কাঁচা টাকা বের করে দিতে পারে সুখেন এক কথায়।

এইসব ভাবতে ভাবতে তিনভাগ পথ পেরিয়ে এসেছে, হঠাৎ খেয়াল হল ভুতোর মুখে কথা নেই। তার মানে কী? কেমন একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। কাজ কী ওকে জড়িয়ে, কী ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানে। অমনি তার দিকে ফিরে বলল, দেখ ভুতো, তোর আর কাগজ বিলি করে কাজ নেই। যার যা কাজ। তুই ভালো

আমি কি তাই বলেছি নাকি?

করে অ-আই চিনলি নে, কাগজের তুই কী বুঝবি। ও যা করবার আমিই করব এখন। তুই বরং জিনিসগুলো পাচার করতে আমাকে সাহায্য করিস।

ভুতো ভারি খুশী হয়ে উঠল প্রথমটা, তারপর আবার হাঁড়িমুখ করে বলল, ওসব ঘেন্নার জিনিসে তুই আর হাত দিস নে রাখাল। দেখলি না—ডাবওয়ালি ছাড়া কেউ ওসব ছোঁয়ও না।

রাখাল তেড়িয়া হয়ে উঠল, তুই থাম দিকিনি, এই ঘেন্নার জিনিস বেচেই ভুঁইতরাসিতে তোর মার জন্যে দুধ ঘি কেনা হবে। আর লোক হাসাস নি।

এ কথার উপর আর বলবার মতো কিছু ভেবে পায় না ভুতো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, তবে—তবে কি আজই সরাবি নাকি?

রাখাল রেগে যায়। ভুতোটার কী বুদ্ধি! চটপট চম্পট দেবার একটা ব্যবস্থা না করে সরালেই হয়েছে আর কী। যা কিছু শিখেছিল হতভাগা এই পোড়ার দেশে এসে সব ভুলে বসে আছে। মুখে শুধু এইটুকু বললে রাখাল, কী যে বলিস! জায়গা দেখতে হবে না! বেরুবার পথে খোলতাই করতে হবে না! জিনিস বাছাই

করতে হবে না! নইলে শেষটা হাতে হাতকড়া—বলতে বলতে মনে পড়ল এদেশে হাতকড়াও নেই, থানা-দারোগা জজ হাকিম কেউ নেই, অন্যায় করলে এরা নাকি শুধু খুব নিন্দে করে! তাও ধরা পড়লে তবে তো। তা ধরা পড়ছে কে? চারদিন সিঁড়ি মুছতে হবে, তার মধ্যে তিন দিনই কাটবে মতলব পাকা করতে, শেষ দিনে কাজ হাসিল। ততদিনে দিকদারের সব কাগজপত্র বিলি হয়ে যাবে, দেশে যাবার একটা ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। আহা, ভুঁইতরাসি বড় ভালো জায়গা, ঘাটের ধারে এঁটো বাসন মাজতে নামলেই, ভাতের গন্ধে এই বড় বড় রুই কাতলা ভেসে আসে গো!

মনটা কেমন করতে থাকে, এখান থেকে এক ঝাঁকা সোনাদানা নিয়ে যেতে পারলে সারা জীবন আর কোনো দুঃখু থাকবে না। আর চুরিচামারি—ও করতে হবে না, জেলখানাতেও যেতে হবে না। ভুঁইতরাসির মাঠগুলো কী সবুজ, পুকুরের জল কী মিঠে, জেলে বন্ধ থাকলে সে সবের স্বাদ পাবে কী করে? নাঃ, এই শেষ, এর পর আর চুরি করবে না রাখাল, জমিজমা কিনে চাষবাস করে খাবে। ভুতো যে একেবারেই বাজে কথা বলে তা নয়।

ততক্ষণে চারটে বেজেছে, লাইব্রেরির ফটকে এসে পৌঁছেছে ওরা। ভুতো বললে, আমি গাছ ছাঁটাই করতে গেলাম, কখন কী করতে হবে বলিস।

এই বলেই হন হন করে হাঁটা দিল, একবারও ফিরে তাকাল না, যেন পেছনে বাঘ লেগেছে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাখাল ভাবল,—এও দেখতে হল, ছোটবেলাকার বন্ধুও তার কাছ থেকে পালাতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচছে!

[ক্রমশ

এক-একটি খাবারের জিনিসের নাম দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করতে হবে।

ডাকে আ— — পেয়ে চলিলাম বাড়ি,
দরকারী কা—দি নিয়ে তাড়াতাড়ি।
হা—তে গিয়ে আমি উঠিলাম রেলে,
বেঞ্চিতে বি—টি আগে দিয়ে মেলে।
অব— মত নিয়ে গুছায়ে জিনিস,
জিজ্ঞাসিনু ভৃত্যে, 'যাত্রীদেরে কি —স ?'
কহিল, —ঞ্চিবাবু যাঁর হাতে ছুরি ;
অন্য জন —সেতে করেন চাকুরি।
ইঁহার দয়া— —ত্ত, নাহি দোষ লেশ,
স্বভাবে ফকির সাধু, যেন —।

ডিসেম্বর সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। ১৫+৩৬+৪৭+২=১০০

২। প্রায় ডবল, অর্থাৎ ৩২ বৎসর। কেননা মঙ্গল ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

৩। ১৭৩+৪=১৭৭ ; ৮৫+৯২=১৭৭

'কেন'-র উত্তর

১। প্রত্যেক চোখের বাইরের দিকে একটি করে গ্রন্থি আছে। গ্রন্থি থেকে রস বেরিয়ে চোখকে ভিজিয়ে রাখে। সাধারণত সেই রস চোখ থেকে একটি ছোট পথ বেয়ে গিয়ে নাকে জমা হয়। খুব দুঃখ হলে যেমন ঠিক তেমনি প্রাণ ভরে হাসলেও গ্রন্থি থেকে গলগল করে এত রস বেরোয় যে সেই পথে আর ধরে না। বাড়তি রস তখন চোখ বেয়ে পড়ে যায়।

* * *

২। আমাদের আঙুলের ডগায় দাগ থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রত্যেক মানুষের আঙুলের ডগার চিহ্ন আলাদা আলাদা : কোনো দুটি মানুষের একই আঙুলের চিহ্ন কখনও অবিকল এক হয় না। কাজেই কারও টিপসই নেওয়া থাকলে পরে তাকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করতে সুবিধা হয়।

* * *

৩। মস্তিষ্ক যখন কাজ করতে না চায়, বিশ্রাম চায়—তখনই আমাদের ঘুম পায়।

ভরপেট খাওয়ার পর পাকস্থলীতে দারুণ কাজের ধুম পড়ে যায়। খাদ্যগুলিকে ভেঙে ফেলতে হবে, খাদ্যের সারভাগটুকু গ্রহণ করে যা অপ্রয়োজনীয় তা ত্যাগ করতে হবে। রক্তকেই সেই কাজ করতে হয়। শরীরের বেশির ভাগ রক্ত তাই মাথা থেকে নেমে পেটে চলে যায়। মস্তিষ্ক তখন খাটতে চায় না। তাই ঘুম পায়।

* * *

৪। কাঠের সেলে সেলে বাতাস থাকে। তাপ পেয়ে সে বাতাস প্রসারিত হয়। কাঠের ভিতরের জলীয় অংশও তাপে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই বাতাস আর বাষ্প সজোরে বেরিয়ে আসে। তাই কাঠ পোড়ার সময় ফুট-ফাট শব্দ হয়।

* * *

৫। চোখের পাতার কাজ হল চোখকে ভিজিয়ে রাখা। মাছেদের চোখে সব সময়েই জল লাগছে। তাই তাদের চোখের পাতার দরকার হয় না।

ডিসেম্বর সংখ্যার 'সত্য, না মিথ্যা'র উত্তর

১। না; জিরাফ। ২। সত্য। ৩। না; প্রায় ৮০% নাইট্রোজেন। ৪। না; হাভানা। ৫। সত্য। ৬। না; অধিকাংশ সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে ওঠে। ৭। না; ২ মৌলিক সংখ্যা। ৮। হ্যাঁ। ৯। না। ১০। না; সভাপতি-ই হবে। সভানেত্রীও চলতে পারে।

'পঙ্কু এক হাতে পিদিম নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল।'

৩য় বর্ষ । ১০ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪ । মাঘ ১৩৭০

বিলির বিপদ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

১
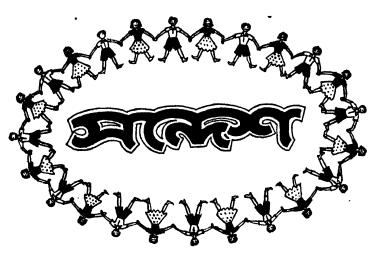
সুবোধ বালক যারা
যাহা পায় খায় তারা
কক্ষনো এটা সেটা চায় না।
চোঁ চোঁ করে খায় দুধ
যাই দাও সোনামুখ
গোপালের নেই কোনো বায়না।
প্রথম ভাগের সেই
ভালো ছেলে মনে নেই ?
খাতা বই থাকে যার আস্ত,
পাঠশালে তাড়াতাড়ি
রোদে জলে বাড়াবাড়ি
কিছুতেই নয় বরদাস্ত।

২

বিলি ছিল দুষ্ট
না হৃষ্ট না পুষ্ট
চিনি নিয়ে শুধু দুধে গুলত,
এ খাব না সে খাব
না খাব তো মাখাব
গোপালের একেবারে উলটো।
ভাত ডাল তরকারি
খাওয়াটাও দরকারী
চিনি খেয়ে বড় হওয়া শক্ত।
কে বা শোনে কার কথা
নিজেদেরই মুখ ব্যথা
বকে বকে জল হল রক্ত।

ঘুম থেকে উঠে তার
চা না পেলে চিৎকার
যেন কেউ ধরে মার দিচ্ছে।
খাই শুধু সারাদিন
চিনি টফি টিন-টিন
এই তার মনোগত ইচ্ছে।
মা বলেন বুড়ো ধাড়ী
গিয়ে দেখো ওই বাড়ি
দেখো গিয়ে কাকে বলে লক্ষ্মী,
যেন সোনা-টুকরোটি
নিশ্চয় দুধ রুটি
খেতে নেই এতটুকু ঝক্কি।
হয়েছে যা রান্না
খেতে পায় কান্না
তুমি কেন বলো দিকি এরকম ?
এ কেমন আবদার
নেই কিছু করবার
এত রাতে কোথা পাব চমচম !
থাকো তুমি না খেয়ে
চিনি টফি চা খেয়ে
খেয়েদেয়ে মোটা হোক অন্যে ;
তবে জলসাবু খেও
ডাক্তারবাবুকেও
বলে দিস আসবার জন্যে।

৩

খাট থেকে গড়িয়ে
বিলি হুড়মুড়িয়ে
পড়ে গেছে বারো হাত গাড্ডায়,
ছমছমে আঁধারে
বিলি যেন বাঁধা রে
ডাক্তারবাবুদের আড্ডায়।
কী যে হবে বুঝছে না
লোকজন চেনা চেনা
চারিদিকে ওষুধের গন্ধ
ডাক্তার যাই দিন
টিন্‌চার আইডিন
ভয়ে পালাবার পথ বন্ধ।
হাত করে নিশপিশ
তিনজনে ফিসফিস
চুপিসাড়ে চলে অভিসন্ধি,
দেখে চক্ষুস্থির
বিলি ভয়ে অস্থির
প্রাণ নিয়ে পালাবে কি ! বন্দী !

ডাক্তারবাবু কন
খাশা প্রেসক্রিপশন
বানিয়েছি একেবারে ঠিকঠাক
পেনিসিলিনের ঝোল
চিরেতার অম্বল
কিছু ইনজেকশান দেওয়া যাক।
তোমা হেন খোকাদের
এরকম বোকাদের
হাট থেকে হাটে বাপু বেচেছি।
হেনকালে ভেঙে ঘুম
এ কোথায় আসলুম
বিলি ভাবে কী বাঁচান বেঁচেছি।
তার পরে গল্প
রইল যা অল্প
লোকমুখে প্রায়ই শোনা যাচ্ছে
সেই বিলি আজকাল
দুধ রুটি ভাত ডাল
এমনকি ইয়েও খাচ্ছে।

সাভোর প্রান্তরে

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৮ সাল। ১লা মার্চ। মোম্বাসা বন্দরে জাহাজ থেকে নামলেন উগাণ্ডা রেলপথের নতুন ইঞ্জিনিয়র প্যাটার্‌সন। এইচ. জে. প্যাটার্‌সন।

আজকের আফ্রিকার সঙ্গে সেদিনের আফ্রিকার কোনো মিল নেই। নতুন রেলপথ সেখানে তখন সবে তৈরি হচ্ছে। রেলপথ ধরেই যেটুকু আধুনিকতা। রেলপথের বাইরে অজানা জগৎ। ভয়াল গভীর অরণ্য।

প্যাটার্‌সন যখন কাজের ভার নিলেন, রেলপথ তখন উগাণ্ডার সমভূমি 'সাভো' অবধি এগিয়েছে।

বড় সাংঘাতিক জায়গা 'সাভো'। বিশাল মাঠ। সেখানে চড়ে বেড়ায় জেব্রা জিরাফ উটপাখি। আর ঝোপে ঝোপে গাছের ছায়ায় বসে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গণ্ডায় গণ্ডায়—সিংহ।

প্যাটার্‌সন জাত শিকারী। রাইফেল তাঁর চিরসঙ্গী। সারা দিনের কাজের একঘেয়েমি কাটাতে তিনি বেরিয়ে পড়তেন সাভোর মাঠে। সঙ্গে ভারতীয় অনুচর মহিনা। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে শিকারের নেশা মেটাতে গিয়ে তিনি অনেক বিপদে পড়েছিলেন।

একটা ঘটনা বলি।

একদিন গভীর তৃণবনে বন্য জানোয়ারের শিকারে বেরিয়ে হতাশ হয়ে তিনি যখন ফিরে আসছেন, তখন নজরে এল—দূরে ঝোপের আড়ালে মেটে রঙের একটা জানোয়ার। তিনি বুঝতে পারলেন না—ওটা কী। বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিনি চোখে দূরবীন লাগাবার আগেই জানোয়ারটা পাশ কাটাল। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন প্যাটার্‌সন—এবার তাঁর বাঁ দিকে গভীর ঝোপে দেখা দিল এক সিংহ : উশকোখুশকো কেশর নিয়ে বিরাট এক মাথা। চিৎকার করে উঠল মহিনা—'দেখো সাব, শের!' তাকে চুপ করতে বলে তিনি আরও একটু এগিয়ে সিংহের প্রায় দু শো হাতের মধ্যে গিয়ে পড়লেন।

দুটো চোখ অপলকে তাকিয়ে আছে। কে কার শিকার? প্যাটার্‌সন সাহসী মানুষ : তিনি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

প্যাটার্‌সন ঠিক করে নিলেন সিংহটাকে পিছন থেকে ঘায়েল করবেন। তাই তাকে চোখের উপর রেখে তিনি অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু এমন মুশকিল—কোনো সময়েই সিংহটা তার পুরো শরীরটা নিয়ে তাঁর দৃষ্টির মধ্যে এল না। কেননা, প্যাটারসনের সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও ঘুরতে লাগল—ঘোরা শেষ করেও গুলি ছোঁড়ার একটুও সুবিধা হল না। জানোয়ারটা থেকে মাত্র

দেড় শো হাত দূরে তিনি আর মহিনা। সিংহমশায়ও সজাগ তার শিকারের উপর। তার ভাবভঙ্গি দেখে তাঁদের একটুও মনে হয় নি ও তাঁদের আক্রমণ করবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনই অন্ধকার নামবে। তখন হয়তো কিছুই নজরে পড়বে না। ভয়াবহ তৃণভূমিতে বিপদের সবরকম ঝুঁকি নিয়ে প্যাটার্‌সন প্রস্তুত হলেন। রাইফেল উঠল কাঁধে। ট্রিগার টিপলেন সাহেব। কিন্তু গুলি লাগল না। পশুরাজের চোখের একটি পলকও নড়ল না—কিছুই হয় নি যেন। আবার গুলি ছুঁড়লেন প্যাটার্‌সন। এবার দেখলেন লেজের উপর সিংহটার বিরাট এক ডিগবাজি। তিনি ভাবলেন—সব শেষ। কিন্তু তা তো নয়! এ কী! মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে আর একটা যমদূত এসে হাজির! একটা সিংহী! এবার দুটিতে বিকট চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে পলকের মধ্যে তাঁদের দিকে তেড়ে এল—মাঝখানে ব্যবধান হয়তো পঞ্চাশ হাত। তাঁরা তো ভয়ে কাঠ! দেহের রক্ত যেন হিম হয়ে এসেছে। এমনিভাবে এগোতে এগোতে সিংহ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে গেল। সিংহী আরও কয়েক কদম তেড়ে এল। তারপর আবার পিছিয়ে সিংহের পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়াল।

সিংহ সিংহী তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভীষণ গর্জনে তাদের প্রতিহিংসা জানাতে লাগল। কিন্তু তাতে না নড়লেন প্যাটার্‌সন সাহেব, না নড়ল মহিনা। সিংহটা এবার খানিকটা পিছিয়ে আবার পড়ে গেল, কিন্তু সিংহী তখনও গর্জে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে জানোয়ার দুটো পিছু হটতে লাগল, আর ক্রুদ্ধভাবে শিকারী-দের দেখতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। এক পক্ষের ক্রুদ্ধ আস্ফালন, অপর পক্ষ নিশ্চল। এর মধ্যে সিংহ আরও কাহিল হয়ে এসেছে। আস্তে আস্তে কয়েক কদম পিছিয়ে তারা দুটিতেই আগের জায়গায় ফিরে গেল।

এতক্ষণে প্যাটারসন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। এবার তিনি সিংহীটাকে তাক করে গুলি ছুঁড়লেন। সিংহীটাও ভীষণ মূর্তিতে তেড়ে এল। কিন্তু কয়েক রাউণ্ড গুলির শব্দে কোথায় পালাল কে জানে। (যদিও হাত কেঁপে সবগুলো গুলিই ফসকে গিয়েছিল)।

প্যাটারসন এগিয়ে গিয়ে আর-এক গুলিতে সিংহের শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিলেন। মহিনা কাছে এসে পশুরাজের গায়ে কটা ঢিল ছুঁড়ল। সাহেব কাছে এসে দেখেন বিরাট শক্তসমর্থ এক নওজোয়ান সিংহ। দেখে দুজনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হল। আনন্দে শিকার নিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন।

বাড়ি তো ফিরলেন প্রাণ হাতে নিয়ে আনন্দে। কিন্তু, কে ফিরিয়ে দিল তাঁদের প্রাণ? সিংহ সিংহী?

না। সাহেবের বুদ্ধি আর সাহস।

প্যাটারসন জানতেন—বনের জানোয়ারের সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে অতিবড় হিংস্র জানোয়ারও থমকে দাঁড়ায়। প্যাটারসন এই সুযোগ নিতে ভোলেন নি। কিন্তু তাঁরা যদি একটুও নড়তেন তাহলে আর কাউকেই আনন্দে বাড়ি ফিরতে হত না।

এইচ. জে. প্যাটারসনের
'ম্যান-ঈটার্স অব স্যাভো' থেকে।
ছবি। প্রসাদ রায়

স্টোনহেঞ্জের রহস্যভেদ

ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সল্‌স্‌বারি প্লেন। সেইখানে স্টোনহেঞ্জের বিরাট পাথরের স্তম্ভগুলো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে এক রহস্যময় অতীতের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ অবধি দেশবিদেশ থেকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কৌতূহলী ভ্রমণকারী স্টোনহেঞ্জ দেখতে যায়। অথচ দেখবার মতো এমন কিছু সূক্ষ্ম কারুকার্যময় স্থাপত্যও নেই। স্টোনহেঞ্জের অজ্ঞাত অতীতই তার প্রধান আকর্ষণ।

সেকালের ইংরেজরা নিজেদের দেশের বিগত ইতিহাস সম্পর্কে খুব সামান্যই জানত বলে স্টোনহেঞ্জের বিষয়ে নানান কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছিল। স্তম্ভগুলো যে মানুষের হাতে তৈরী সে বিষয়ে কারও সন্দেহই নেই ; তবে সাধারণ মানুষ কী করে যে এই বিশাল পাথরের থাম শুধু খাড়া করে নি, তাদের মাথার উপর দিয়ে খিলানের মতো করে বিরাট পাথরের ফলকগুলোকে তুলে যথাস্থানে রেখেছিল, সেই হল সবচেয়ে বড় বিস্ময়। সে সময়ে যন্ত্রপাতি কিছুই আবিষ্কার হয় নি। তবে কি এসব কোনো লুপ্ত দৈত্যবংশের হাতের কাজ ? আশেপাশের লোকেরা বলত, এগুলো দেড় হাজার বছর আগে বিখ্যাত জাদুকর মার্লিন রাতারাতি মন্ত্রবলে তৈরি করেছিল। কিন্তু দেড় হাজার বছর তো সেদিনের কথা। তার বহু পূর্বের ইতিহাস, জুলিয়াস সীজারের ব্রিটেন বিজয়ের কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু স্টোনহেঞ্জ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ নেই কেন ?

স্তম্ভগুলো যে অতি বিস্ময়কর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের হাতে পালিশকরা গা, কিন্তু ওরকম বিশেষ শ্রেণীর সুশ্রী ও শক্ত বেলেপাথর ও অঞ্চলে পাওয়াই যায় না। তবে সল্‌স্‌বারি প্লেনের কুড়ি মাইল উত্তরে মার্লবর ডাউন্সে এইরকম পাথরের বিশাল খণ্ডের ছড়াছড়ি !

অকারণে যে কোনো কিছু ঘটে এ কথা বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন না। তাঁরা যে বিষয়ে গবেষণা করেন তার প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কার না করা অবধি তাঁরা সন্তুষ্ট হন না। পৃথিবীর বিগত ইতিহাস মাটির নীচেকার স্তরে স্তরে তার প্রমাণ রেখে যায়, এ সত্য বহুকাল আগেই বৈজ্ঞানিকরা জানতেন ; আড়াইতলা অবধি উঁচু স্টোনহেঞ্জের অতীত কাহিনীও মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল।

যেসব পণ্ডিতরা প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অ্যাটকিন্সন নামে একজন অধ্যাপক। তাঁর দলের অনুসন্ধানের ফলেই স্টোনহেঞ্জের রহস্য অনেকখানি ভেদ করা গেছে। এসব গবেষণা হালের কথা ; ১৯৪৯ সালে এরোপ্লেন থেকে তোলা একটা ফোটো দেখে অ্যাটকিন্সনের মনে হল ডর্চেস্টার অন্‌-টেমসের একটা বিশেষ জায়গাতেও স্টোনহেঞ্জের মতো গোল করে দাঁড় করানো কোনো প্রাচীন সমাধিচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

সে জায়গাতে বাইরে থেকে কিছুই দেখা যেত না, চষা জমির মধ্যে কতগুলো ঢিবি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ত না। কিন্তু ঢিবিগুলো স্টোনহেঞ্জের প্রস্তরস্তম্ভের মতো করে সাজানো। সন্দেহ

হওয়াতে সেখানেই খুঁড়ে দেখা গেল বাস্তবিকই ঢিবিগুলোর নীচে কোনো ভুলে-যাওয়া সমাধির চিহ্ন রয়েছে—মানুষের পোড়ানো হাড়গোড় ইত্যাদি।

তখন অ্যাটকিন্সন এবং পিগট আর স্টোন বলে আরও দুজন বৈজ্ঞানিক আবার স্টোনহেঞ্জের দিকে নজর দিলেন। সেখানেও ওই রকম গোল হয়ে পাথরের থাম সাজানো, বৃত্তের মধ্যে আবার অর্ধচন্দ্রাকারে আর-এক সারি থাম, তার মধ্যে ডিমের মতো গোলাকারে আরও কতগুলো। মাঝখানটা ফাঁকা, সেইখানে বোধহয় বেদী ছিল। এখন অবশ্য সব স্তম্ভগুলি নেই, তাদের মাথার উপরকার খিলানও অনেক পড়ে গেছে।

কী বিশাল এই পাথরের ফলক! থামগুলোর এক-একটার ওজন হবে ৫০ টন। এক টনের ওজন হল ২৮ মনের বেশি, কাজেই থামগুলোর বিশালত্ব এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে। বহুদিন আগেই পণ্ডিতরা স্টোনহেঞ্জের ঠিক সীমানার বাইরে ঘাসের মধ্যে ৫৬টি গর্তের চিহ্ন লক্ষ করেছিলেন। এবার সেগুলি খোঁড়া হল এবং তার মধ্যেও মানুষের পোড়া হাড়গোড় পাওয়া গেল।

পোড়া হাড় কিছু অ্যামেরিকার বিখ্যাত রাসায়নিক ডাঃ লিবির কাছে পাঠানো হল। তিনি তাই দেখে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পোড়া হাড়ের বয়স বলে দিলেন যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ১৮৫০ বছর আগে। পণ্ডিতদের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠল, স্টোনহেঞ্জে দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত গবেষণা ও খোঁড়াখুঁড়ি চলতে লাগল, যার ফলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের একটা হারানো পাতা খুঁজে পাওয়া গেল।

অনেক পুরোনো মন্দির বা সমাধির মতো, দেখা গেল, স্টোনহেঞ্জের সমাধিও একবারে তৈরি হয় নি, বারে বারে গড়া হয়েছে, ভেঙেছে, আবার তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে পুরনো অংশ একরকম শক্ত নীল পাথরের তৈরী; এ সময় হয়তো জায়গাটা মৃতদের সমাধিরূপেই ব্যবহার হত। এখানকার মাটির সবচেয়ে নীচের স্তরে ভাঙা মাটির বাসন, পাথরের কোদালের ফলা, গোরুর কাঁধের হাড়ের তৈরী খুরপি ইত্যাদি দেখে তখনকার জীবনযাত্রা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। কাঁচা মাটি শুকোবার সময় তার গায়ে যেসব শস্যদানা লেগেছিল তার স্পষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে। তাই দেখে আন্দাজ করা যায় এরা এক জাতের গমের চাষ করত। এসব হল চার হাজার বছর আগেকার কথা, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এতকাল এসব লোকেদের কথা লেখা হয় নি।

এর উপরের স্তরগুলো দেখে মনে হয় পরবর্তী কালে বিদেশ থেকে বাণিজ্যের আশায় অনেক লোক এসে এখানেই বসবাস করত এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদীক্ষা অনেক উন্নত ছিল বলে সহজেই এখানকার আদি বাসিন্দাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পেরেছিল। মাটির নীচে পাওয়া গেছে মধ্য ইউরোপে তৈরী হলদে পাথরের মালা, ঈজিপ্টের নীল পুঁতি, গ্রীসের সোনার গয়না; এইসব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিশ্চয়।

পণ্ডিতদের ধারণা—এখন যে স্টোনহেঞ্জের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এর আগে আরও দুবার এই সমাধি গড়া এবং ভাঙা হয়েছিল। এই শেষ বারের সমাধিটি গড়ার সময় গ্রীসের স্থপতিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, কারণ উঁচু থাম তৈরি করার সময় চুড়া দুটোকে যেমন একটু মোটা করে গড়া হত,

যাতে নীচে দাঁড়ালে মাথাটাকে সরু না দেখায়, এখানেও ঠিক তাই। খিলানের জোড়াতেও গ্রীসের প্রভাব। তবে শুধু সন্দেহের উপর বিজ্ঞানীরা নির্ভর করেন না, তাই এই তথ্যটুকু নিয়েও বহু গবেষণা ও অনুসন্ধান চলতে লাগল। শেষটা মাত্র দশ-এগারো বছর আগে অ্যাটকিন্সন সাহেবই হঠাৎ লক্ষ করলেন একটা থামের গায়ে ছোট একটি নকশা খোদাই করা আছে, ছোট একটি হাতলওয়ালা ছোরা। এইরকম ছোরা কেবলমাত্র গ্রীসের একটি বিশেষ জায়গায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে তৈরি হত, কাজেই ওরই কাছাকাছি সময় কোনো গ্রীক কারিগরই যে এই থাম গড়ে ওইভাবে নিজের নামসইটি দিয়ে গেছে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই রইল না।

সেকালের এইরকম নানান চিহ্ন দেখে মনে হয়, স্টোনহেঞ্জ এবং এইরকম আরও যে দশ-বারোটি ধ্বংসাবশেষ যা আবিষ্কৃত হয়েছে এগুলি ছিল তখনকার লোকদের সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। মনে হয় প্রথমে গোল করে একটা খাল কাটা হত, সাধারণত উঁচু জায়গা দেখে। খালের মাটি ভিতর দিকে উঁচু করে সাজানো হত, যাতে মাঝখানটাকে ঘিরে একটা গড় তৈরি হয়। খাল পার হবার ব্যবস্থা থাকত। গড়ের ভিতরে গোল করে স্তম্ভ পোঁতা হত, তার ভিতরে আরও স্তম্ভ আর খিলান থাকত, মাঝখানটাকে ফাঁকা রাখা হত। হয়তো সেখানে ওদের পূজা উপাসনা হত।

শীতকালে এই গড়ের মধ্যে পোষা জন্তুজানোয়ার নিয়ে নিরাপদে বাস করত, অন্য সময়ও শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য এগুলি দুর্গের কাজ করত। থামগুলি নিশ্চয় ওদের শ্রেষ্ঠ কারিগরদের হাতের কাজ। কত মেহনত করেছিল তারা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। যানবাহন ছিল না, সে রকম পথঘাটও ছিল না, সম্ভবত কাঠের রোলারে চাপিয়ে হাতে ঠেলে দূর থেকে বিশাল পাথরের ফলকগুলো কেটে এনে যথাস্থানে পৌঁছে সেগুলিকে পালিশ করা হত। আশেপাশে মাটির নীচে পালিশ করার পাথরের যন্ত্রও পাওয়া গেছে। তারপর এগুলিকে খাড়া করে, কপিকলের সাহায্য ছাড়াই মাথার উপর বিশাল খিলানগুলি তুলে বসানোও কম বাহাদুরি নয়। পণ্ডিতরা বলেন চারদিকে কাঠের ভারা গেঁথে গেঁথে এক-একবারে এক বিঘত আধ বিঘত করে ওগুলোকে পঁচিশ ফুট উঁচুতে তোলা হয়েছিল।

অ্যাটকিন্সন্ সাহেবের হিসাব অনুসারে মার্লবর ডাউন্স থেকে স্টোনহেঞ্জের একাশিটি পাথরের ফলা রোলারে করে ঠেলে আনতে দেড়হাজার লোকের হয়তো সাড়ে পাঁচ বছর লেগেছিল। তারপর পঞ্চাশ জন কারিগর যদি সপ্তাহের মধ্যে একদিনও ছুটি না নিয়ে রোজ দশ ঘণ্টা করে সমানে খাটত, তা হলেও পাথরগুলো পালিশ করতে তিন বছর সময় লাগত। আর এক-একটা থাম চামড়ার দড়ি দিয়ে টেনে খাড়া করতে অন্তত দুশো লোকের দরকার হয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, এত পরিশ্রম করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সে বেশিদিন টিকতে পারে নি। বিদেশী বণিকরা এদিকে আসত আসলে আয়ার্ল্যাণ্ডের খনির সোনা ও অন্যান্য ধাতুর লোভে। এর পর যখন ইউরোপের নানান জায়গায় সস্তায় উৎকৃষ্ট ধাতু পাওয়া যেতে লাগল, তখন বণিকরা আর এত

কষ্ট করে এত দূরে আসা বন্ধ করে দিল। ফলে ইংল্যাণ্ডের এই বিশেষ ধরনের সভ্যতা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে এসে, শেষটা লোপ পেতে বসল।

থামগুলি ভেঙে পড়ল, খাল বুজে গেল, গড়ের উপর ঘাস গজাল, তার উপর চাষবাস হতে লাগল, পালিশ-করা পাথর ভেঙে নিয়ে লোকে ঘরবাড়ি তৈরি করতে লাগল। থামের ইতিহাস সবাই ভুলে গেল, নানান মনগড়া কথা দিয়ে কৌতূহল মেটাতে লাগল, যত দিন না বিজ্ঞান এসে সন্দেহ ঘুচিয়ে অতীতের রহস্য ভেদ করে দিল।

কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে?

ক ॥ (১) রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। (২) সুভাষচন্দ্র গোপনে দেশত্যাগ করলেন। (৩) অগস্ট আন্দোলন শুরু হল।

খ ॥ (১) ভাস্কো-দা-গামা ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করলেন। (২) কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। (৩) শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করলেন।

গ ॥ (১) জাপানে অ্যাটম বোমা পড়ল। (২) ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। (৩) চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

ঘ ॥ (১) জব চার্নক কলকাতা শহর পত্তন করলেন। (২) মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে তুলে নিয়ে এলেন। (৩) বর্গীরা বাঙলাদেশে উৎপাত শুরু করল।

ঙ ॥ (১) রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। (২) গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহ-যোগ আন্দোলন শুরু হল। (৩) দেশবন্ধুর মৃত্যু হল।

সন্দেশখালির ছন্দ

সন্দেশ খাবি ? সন্দেশ খালি
সন্দেশ রকমারি
আর কিছু নয়, সন্দেশ শুধু
ছন্দ বানাই তারি ।
কাঁচাগোল্লা খা পাল্লাভর্তি
কড়াপাক গোল মণ্ডা
আতা সন্দেশ লেবুর বরফি
কে বা খাবি কয় গণ্ডা ?
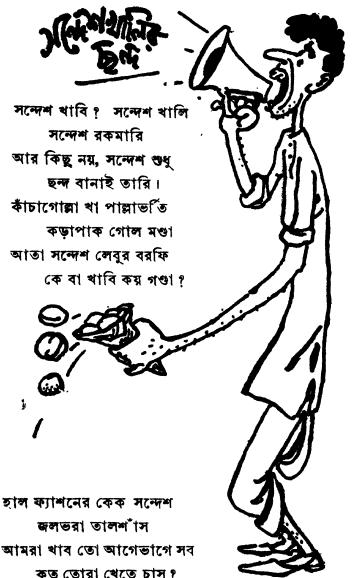
হাল ফ্যাশনের কেক সন্দেশ
জলভরা তালশাঁস
আমরা খাব তো আগেভাগে সব
কত তোরা খেতে চাস ?
গুপো কস্তুরী মনোহরা খাবি ?
ম্যাচা, দেদো দেলখোশ
শীতকাল এলে নতুন গুড়ের
সন্দেশ পাবি, রোস ।
সন্দেশ খাবি ? সন্দেশ খালি
ভরা শালপাতা ঠোঙা
জবর খবর তাও সন্দেশ
—হাঁকে মেগাফোন চোঙা ।

ছড়া ও ছবি
রেবতীভূষণ ঘোষ

প্রিয়ম্বদা দেবী

পঞ্চুলাল

[জানুয়ারি সংখ্যার পর]

হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে উঠে মাথা চুলকোতে গিয়ে পঞ্চু দেখে কী, তার কানটা বেজায় লম্বা হয়ে পড়েছে—ঠিক ওই ওপাড়ার হীরে ধোপার গাধাটার মতো। জন্মাবধি পঞ্চুর কান ছিল না বললেই হয়; তার বাপ গুপী ছুতোর কানের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। আয়নার সামনে যেতেই পঞ্চু নতুন কানের শোভা দেখে ডাক ছেড়ে কান্না শুরু করে দিলে। যতই কাঁদে, কান দুটি ততই বেড়ে চলে। ক্রমে তাতে আবার রোঁয়া গজিয়ে উঠল। পঞ্চুর রোদনধ্বনিতে সেই ঘরের বাসিন্দা একটি নেংটি ইঁদুর জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁগা বাবুমশায়, অমন করে কাঁদছ কেন?'

পঞ্চু বললে, 'নেংটি ভাই, আমার বড্ড অসুখ করেছে, তাই কাঁদছি।'

'ওমা, তাই তো! বড্ড শক্ত রোগ তোমায় ধরেছে। এ যে একেবারে "ডঙ্কি ফিভার"। আর ঘণ্টা দুয়েক বাদেই তোমার মানুষের দেহ বেঁকেচুরে চার-পেয়ে গাধায় গিয়ে দাঁড়াবে।'

পঞ্চু কিছুক্ষণ থ হয়ে থেকে তারপর একটা কানঢাকা টুপি মাথায় দিয়ে মোমবাতির বাড়ি গেল। গিয়ে দেখে, তারও ওই দশা। দুই বন্ধুতে দু মিনিট কথা কইতে কইতেই দুজনারই হাত পা, চারখানা পা হয়ে দাঁড়াল, মাথা নুয়ে পড়ল—আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কথা আর বেরোয় না, যা বলতে চায় গাধার ডাকে পরিণত হয়। হতবুদ্ধি দুজনে যে হা-হুতাশ করবে তারও পথ বন্ধ। তারপর যখন দুজনের দুটি লেজ ধীরে ধীরে দেখা দিলে তখন কথাও দূর হয়ে গেল, দুটো কেবল আস্ত গাধার মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় সেই জুড়িগাড়ির কোচম্যান এসে বললে, 'বাহবা! এমন দুটি গাধা এর আগে আর আমার ভাগ্যে জোটে নি, দাম মিলবে ভালো।' এই না বলে খরেরা বুরুশ দিয়ে তাদের খুব করে ঝাড়পোঁছ করে, হেট হেট করে খেদিয়ে হাটে নিয়ে চলল।

খরিদ্দার জুটতে দেরি হল না, মোমবাতিকে নিল এক চাষা আর পঞ্চু বিক্রি হল এক বাজিওয়ালার কাছে—সে 'ভানুমতীর খেল' দেখায়। পঞ্চুকেও সে নানান কসরত শেখাতে লাগল। কিন্তু পঞ্চুর কপাল মন্দ, কসরত শিখতে গিয়ে তার পা খোঁড়া হল। বাজিওয়ালা দেখলে, খোঁড়া গাধা রাখা নিছক লোকসান, একে যে দামে হয় বেচে ফেলাই ভালো! বাজারে কেউ দাম জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'কুড়ি টাকা'। শুনে সবাই হেসে বলে, 'কুড়ি আনা পাও তো ঢের।' কিছুতে যখন দাম চড়ল না, তখন সেই বাজিওয়ালা পাঁচ সিকেতেই পঞ্চুকে বেচে দিল।

পঞ্চুকে যে কিনলে সে ভাবলে, একে মেরে চামড়াখানা নিতে পারলে কাজ দেবে। মস্ত একটা ঢাক তৈরি করতে পারব। এই মনে করে সে পঞ্চুর গলায় গোটাকতক পাথর আর দড়ি বেঁধে তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে আর নিজে দড়ি ধরে ডাঙায় বসে রইল। পঞ্চু তলিয়ে গেল। তারপর যখন দড়ি ধরে টেনে তুলল, তখন মরা গাধা না উঠে উঠল সেই কাঠের পুতুল পঞ্চুলাল। খরিদ্দার তো অবাক। তাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে পঞ্চু ফিক করে হেসে বললে, 'মশায় আমার চামড়াখানার জন্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, কিন্তু ধর্ম কি অত সয়? ডুবে তলিয়ে যাবামাত্রই রাজ্যের মাছ এসে আমার উপরে পড়ল, সবাই মিলে আমার গাধার মাস চামড়া সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু যখন হাড়ে পৌঁছল সে টনক জিনিস শিশুকাঠের তৈরী, তাতে কি আর মাছের দাঁত বসে! দু-এক খাবল দিতে গিয়েই যখন তাদের চোয়াল মড়মড় করে উঠল, তখন সবাই পালাল। আমি তো আর সত্যিকার গাধা নই, আমি পঞ্চুলাল—গুপী ছুতোরের হাতে গড়া পুতুল।'

খরিদ্দার বললে, 'আমার সে পাঁচ সিকে পয়সা বুঝি অমনি যাবে? তোমায় আমি চুলোয় পুরে জ্বালাব।'

কথা শেষ না হতে পঞ্চুলাল জলে পড়ে সাঁতার দিয়ে পালাল, আর তাকে ধরে কে? কিন্তু বেশী দূর যেতে হল না, মস্ত একটা মাছ এসে তাকে গিলে ফেললে। এ আর কেউ নয়, সেই বোয়াল, যে তার বাবাকেও গিলেছিল। পঞ্চু কেঁদে উঠল: 'বাঁচাও বাচাও।' সে অকূলে কে আর বাঁচায়? চারিদিকের আলো সব নিবে গেল। কে তাকে রক্ষা করবে? কে তাকে আর বাঁচাতে পারে? কে জানে কে বলতে পারে?

পঞ্চু তো মাছের পেটে বন্দী, কে তাকে উদ্ধার করবে? প্রথমে অন্ধকারে পঞ্চু কিছুতেই দেখতে পায় নি, তার পরে খানিক বাদে হঠাৎ দেখলে, যেন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলে, দেলকোর উপর ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বলছে, তারই পাশে বসে একজন বুড়ো মানুষ কী যেন খাচ্ছে। বুড়োটিকে দেখে পঞ্চু নাচবে কি গাইবে, কাঁদবে না হাসবে, কিছুই বুঝতে পারল না—খানিকটা হাঁ করে থেকে তারপর একেবারে দৌড়ে গিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটি আর কেউ নয়, পঞ্চুর বাপ গুপী—নৌকাসুদ্ধ বোয়ালের পেটে বাস করছে। গুপী পঞ্চুকে জড়িয়ে

ধরে হেসে কেঁদে বললে, 'তুই কি সত্যি পঞ্চুই বটিস ? আমি ভাবছি পঞ্চু বাপই এসেছে, আবার পেত্যয়ও হচ্ছে না।'

পঞ্চু এক নিশ্বাসে তার সব বৃত্তান্ত বলে, তারপর একটু দম নিয়ে বললে, 'আর এখানে থাকা চলবে না, এবার ফিরতে হবে।'

গুপী বললে, 'কী উপায়ে ফেরা যায় ?'

পঞ্চু বললে, 'কুছ পরোয়া নেহি। চলো দেখি পথ পাওয়া যায় কিনা।'

পঞ্চু এক হাতে পিদিম নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে একবারে মাছের মুখের কাছটিতে এসে পড়ল। এখন বোয়াল মাছটার ছিল হাঁপানি রোগ, মুখ বুজে ঘুমোতে পারে না—সে হাঁ করেই ছিল। সেইখানটিতে দাঁড়িয়ে পঞ্চু দেখতে পেল, সাগরের নীল জল স্থির, আকাশের নীলে মেঘ নেই, কত যে তারার প্রদীপ জ্বলছে তার গোনাগাঁথা নেই। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ, ঢেউরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। পঞ্চু বললে, 'এবার আমায় জড়িয়ে ধরো, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সাঁতরে কূলে যাব।' গুপী ছেলের পিঠে এঁটে বসল—পঞ্চু ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কিছু দূর যেতে না যেতে গুপী কাঁপতে লাগল—বুড়ো শরীর, রাতের বেলা, ঠাণ্ডা জল, তার উপর ভয়ে রক্ত জল হয়ে আসছে।

গুপী কাঁপতে কাঁপতে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললে, 'শেষকালে দেখছি মাঝ দরিয়ায় ডুবে মরাই কপালে লেখা ছিল।'

পঞ্চু বললে, 'ভয় কী ? ওই যে কিনারা, এখনই পৌছে যাব।' কিন্তু বাপকে ভরসা দিলেও তার প্রাণের মধ্যে ভয় ঢুকেছিল ; প্রাণপণ সাঁতরে চলতে চলতে হঠাৎ সেও চিৎকার করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও, গেলাম গেলাম।' বলতেই অন্ধকারে কে যেন চেঁচিয়ে বললে, 'ভয় নেই, আমি আছি।' গলার স্বরে পঞ্চু বুঝলে এ সেই কুকুরটা—সে যার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনকেই টেনে তুললে। পঞ্চু তাকে কত ধন্যবাদ দিলে আদর করলে, তার ঠিক নেই। বেচারী কুকুরের ভাগ্যে চিরকাল লাঠি ঝাঁটা কিল চাপড় লাথি, এই ছিল বরাদ্দ—তাই পঞ্চুর সদয় ব্যবহারে তার দুটি চোখ জলে ভরে উঠল। ততক্ষণে ভোর হয়েছে। গুপী এমনি কাহিল হয়ে পড়েছে যে পঞ্চু তাকে ধরে ধরে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে চলেছে। কয়েক পা যায় আর বিশ্রাম করে। এমন সময় দেখে কী, একটা বেড়াল আর একটা শেয়াল 'দয়া করো গো ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়াল। তারা আর কেউ নয়, সেই পঞ্চুর চোর সঙ্গী দুজন, দেবক্ষেত্রের জুয়াচোর পাণ্ডা। বেড়ালটা ভান করতে করতে এতদিনে সত্যি অন্ধ হয়ে গেছে—আর শেয়ালটাও খোঁড়া—তার লেজটি পর্যন্ত নেই, পেটের দায়ে বেচে ফেলেছে। পঞ্চু তাদের চিনতে পেরে দূর করে দিলে। আরো কিছু দূরে একটি ছোট্ট পরিষ্কার ঝরঝরে খোড়ো কুঁড়ে দেখে পঞ্চু আর গুপী তার দুয়োর ঠেলা দিলে। যার ঘর সে দুয়োর খুলে দিলে, জিজ্ঞাসা করলে, 'কে ওখানে ?' সে কথা বলছে অথচ তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, পঞ্চু তাই জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাগা বাড়ির কর্তা, তুমি কোথা ?' কর্তা বললেন, 'এই যে এখানে।' পঞ্চু চেয়ে দেখে কী, কর্তা চালের মটকায় বসে। তিনি আর কেউ

নন সেই ঝিল্লী চক্রবর্তী। পঙ্কু তো অবাক! সে বললে, 'দোহাই তোমার, ঝিঁল্লী গোঁসাই, দয়ার শরীর তোমার, আমাদের কিছু খেতে দাও।'

ঝিল্লী বললে, 'আজ তো আমার দয়ার শরীর হল, কিন্তু হাতুড়ির ঘায়ে আমার মাথা থেঁতলে দিয়েছিলে মনে আছে? যাক, তোমরা অতিথি, তোমাদের কিছু বলতে নেই, খালি একটিবার মনে করিয়ে দিলাম।'

ঝিল্লীর পরিষ্কার ঝরঝরে সুন্দর ঘরখানি দেখে পঙ্কু বললে, 'আহা! সুন্দর ঘরখানি কোথা পেলে ঝিল্লী গোঁসাই?'

'একটি নীলগাই আমায় দিয়েছে। তার মাথার লোমগুলি আকাশের মতো নীল রঙের। সে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল আর বলছিল, "পঙ্কু আর ফিরে আসবে না।"

'তাই নাকি? কাঁদছিল? আমার জন্য কে আর কাঁদবে? সে নিশ্চয় আমার বনশ্রী-মা।'

পঙ্কুও বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলে। তারপর বললে, 'গোঁসাইঠাকুর, বলতে পার পোয়াটাক দুধ কোথায় পাওয়া যায়?'

ঝিল্লী বললে, 'ওই যে মাঠের পারে কুঁড়েঘর দেখছ, সেখানে থাকে গঙ্গা ঘোষ—সে দুধ দিতে পারবে।' পঙ্কু গঙ্গা ঘোষের দুয়ারে গিয়ে বললে, 'ঘোষের পো—ছটাক পাঁচেক দুধ দিতে পার?'

'তা আর পারি নে? পাঁচটি পয়সা চাই কিন্তু।'

পঙ্কু বললে, 'তবেই হয়েছে! পাঁচ পয়সা ছেড়ে পাঁচ কড়াও নেই যে।'

ঘোষ বললে, 'আচ্ছা, আমার একটা কাজ যদি কর তবে আর পয়সা দিতে হয় না'—

সেই সেকালের শয়তান পঙ্কু আজ আর দ্বিরুক্তি না করে তার কথামত ঘড়া আর দড়ি নিয়ে কুয়োর জল তুলতে লেগে গেল। দশ ঘড়া জল তুলে দিয়ে তবে তার ছুটি। গঙ্গা ঘোষ বললে, 'যে গাধাটা আমার কপিকল ঘুরিয়ে জল তুলত, সে আজ দুদিন থেকে পড়ে আছে—বাঁচবে না বোধ হয়।' পঙ্কু গোয়ালঘরে উঁকি মেরে দেখলে একটা গাধা বিচালির উপর পড়ে খাবি খাচ্ছে। পঙ্কু তার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে?' ক্ষীণ স্বরে উত্তর এল, 'মোমবাতি।' বন্ধুর দশা দেখে চোখের জলে পঙ্কুর বুক ভেসে যেতে লাগল—কিন্তু তখন আর উপায় কিছুই নেই! পঙ্কু দুধের ঘটিটা নিয়ে ফিরে আসতে ঝিল্লী চক্রবর্তী দয়া করে তাদের থাকবার জায়গা দিল।

আশ্চর্য! যে পঙ্কু নড়ে বসত না, নবাবি করাই ছিল যার কাজ, সে রোজ ভোরে কাক কোকিল ডাকবার আগেই উঠে গঙ্গা ঘোষের জল তুলে দিয়ে তার কাছ থেকে দুধটুকু এনে বাপকে খাওয়াত। তারপর অবসর সময়ে বেত দিয়ে ধামা বুনে তাই বেচে যে পয়সা পেত, তাতেই কোনোরকমে দুজনার দিন চালাত। এই রকম মেহনত করে সে কিছু টাকাও জমিয়ে ফেললে। একদিন সে গুণীকে বললে, 'কাপড়চোপড় তো কিছু নেই, আজ হাটবার, গিয়ে কিনে আনি। যখন নতুন কাপড় পরে ফুলবাবুটি সেজে এসে দাঁড়াব, তুমি আমায় চিনতে পারবে না।'

পথে মনের আনন্দে তাইরে নাইরে বলে গাইতে গাইতে চলেছে, এমন সময় শুনলে ক্ষীণ গলায় কে যেন তাকে ডাকছে। ফিরে দেখে শ্যামা বনশ্রীর দাসী সেই শামুক। যেমন দেখা আর অমনি আনন্দ, তারপর নৃত্য গীত। পঞ্চু নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, 'ওমা শামুক দিদি। তাই তো বলি, কে আমায় ডাকে! আমার বনশ্রী মা কোথায়, কেমন আছে? কী করছে? তুমি এখানে কী করছ? কত দূরে তার বাড়ি?' এত প্রশ্নের উত্তর একদমে দেওয়া কারও সাধ্যি নয়। শামুক থেকে থেকে বললে, 'পরী-দিদিমণির যে বড্ড ব্যামো—দুঃখু পেয়ে পেয়ে শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। খাবার যে কিনবে, এমন দুটি পয়সাও নেই—হাসপাতালে পড়ে আছে।'

পঞ্চুর মুখ পাংশু হয়ে গেল, দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে তাড়াতাড়ি টাকা কটি শামুকের হাতে দিয়ে বললে, 'এই নিয়ে যাও। নতুন পোশাক আমি চাই নে—দরকার হলে ট্যানা পরেই থাকব। এখন পাঁচ ঘণ্টা কাজ করি—এখন থেকে দশ ঘণ্টা খাটব। যাও শীগগির যাও—দুদিন পরে এসো, আমি আরো টাকা দেব।' টাকা পেয়েই শামুক একেবারে গড় গড় করে গিরগিটির মতো দৌড় দিলে। তার সেই ঢিমা তেতালা চাল কোথায় যে গেল, বোঝাই দায়! পঞ্চু আর হাটে গেল না—বাড়ি ফিরে ধামা বুনতে শুরু করে দিলে। অন্য দিন রাত নটায় শুয়ে পড়ে, আজ যখন শুতে গেল তখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—যেন বনশ্রী এসেছেন, বলছেন, 'সাবাস পঞ্চু! যে ছেলে বাপ-মায়ের সেবা করে—দুঃখীর দুঃখ দূর করে, সেই ধন্য হয়।' এই শুনে পঞ্চু জেগে উঠল।

জেগে উঠে সে তো অবাক! খোড়ো কুঁড়ের বদলে দিব্যি সুন্দর তকতকে ঝকঝকে সাদা পাথরের নতুন ঘর। আসবাবপত্র নতুন—বিছানার পাশে ছোট একটি হাতির দাঁতের কৌটো—কৌটোর ডালায় লেখা রয়েছে 'স্নেহের পঞ্চুকে বনশ্রী দিদির উপহার'। কৌটো খুলে দেখে ৪০টা নতুন মোহর ঝকঝক করছে, যেন তখনই ট্াঁকশাল থেকে গরম গরম তৈরি হয়ে এসেছে। ঘরে একখানি আয়নাও ছিল, মুখ দেখতে গিয়ে পঞ্চু নিজেকে চিনতেই পারে না! এ তো সে কেঠো মুখ নয়—এ যে একেবারে মানুষের মতো হাসিতে আনন্দে উজ্জ্বল মুখ। যে দিকে তাকায় সবই নতুন, সবই সুন্দর, সবই জীবন্ত। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে গুপী আবার ছুতোরের কাজে লেগে গেছে—তার সুস্থ শরীর সেই আগেকার পাকা আমটির মতো। পঞ্চু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন করে এসব হল?'

গুপী বললে, 'দুষ্টু মন বদলে যখন ভালো হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটাও বদলে গিয়ে নতুন হয়।'

পঞ্চু গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমি যখন কাঠের পুতুল ছিলাম তখন সবই কেমন বিগড়ে যেত, আজ মানুষ হয়ে দেখছি মানুষ হতে না পারলে সুখ নেই। পরের হাতের পুতুল হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। মানুষ হয়েছি, মানুষই থাকব—আর কখনো পুতুল হচ্ছি নে।'

ঘরে ঘরে পঞ্চুলাল জন্মে আর বাড়ে,
তাহাদের দুষ্টু শনি যদি কভু ছাড়ে
এ কাহিনী লেখা হল সেই ভরসায়—
হরি হরি বলো সবে, পালা হল সায়।

সমাপ্ত

ন্যায্য জবাব

শশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী

রেলে চলেছেন স্যার আশুতোষ
প্রথম শ্রেণীর কামরায় ;
সে যুগে বড়ই তফাত ছিল যে
সাদা আর কালো চামড়ায় !

শ্বেতাঙ্গ এক সাহেব-প্রবর,
সাথী কামরায়—সঙ্গের,
অহংকারে পা পড়ে না মাটিতে,
পরিধি বিরা-ট অঙ্গের !

স্যার আশুতোষ চোখ দুটি বুজে
চিন্তায় কিছু আনমন,
সাহেবমশায় বসে একপাশে
সিগারেট টানে প্রাণপণ ।

সহসা খেয়াল হল কী যে
সেই অসভ্য সাদা দুষ্টের,
বেয়াড়া কাণ্ড করে সে ভাবল—
পাবেন না আশুতোষ টের !

স্যার আশুতোষ জুতোজোড়া রেখে
ছিলেন অদূরে শয্যার,
সাহেব তা ছুঁড়ে ফেলল বাইরে ;
ছি ছি—ভাব তো কী লজ্জার !

পরিণত মন বুদ্ধি বিবেক
আছে যার—এ কি কাজ তার !
বিশেষত তাঁরা কেউ নন কারও
চেনা-পরিচয় রাস্তার !

শুয়ে শুয়ে স্যার আশুতোষ ঠিকই
দেখলেন এই কারবার,
স্বল্প হাসিতে ছেয়ে এল মুখ :
মানুষ কি তিনি হারবার ?

খানিক বাদেই সাহেবটি শুল,
শুরু হল নাসাগর্জন,
দেখে মনে হয়—ভালমানুষটি,
যেন অতিশয় সজ্জন !

আশুবাবু উঠে সাহেবের কোট
বাইরেতে ছুঁড়ে ফেললেন,
হুশ হুশ করে এগিয়ে চলল
সামনের পানে মেল-ট্রেন !

কিছুক্ষণ বাদে শ্বেতাঙ্গ প্রভু
নিদ্রা-অন্তে জাগতেই,
এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখল,
দেয়ালে ঝোলানো কোট নেই !

শুধাল তখন আশুবাবুকেই,
গতি কী হল হে কোটটার ?
দেখছি বিপদ হল ভারি : হাতে
পড়লাম না কি চোট্টার ?

আশুবাবু কন—জেনে রাখো তবে,
চাইছ যখন জানতেই,
তোমার কোটটি গিয়েছে আমার
জুতোজোড়াটিকে আনতেই !

যে গতি হয়েছে আমার জুতোর,
সেই গতি পেল কোটটাও,
নেহাতই ভদ্র মানুষ আমি হে,
নই ঠক—চোর চোট্টা-ও !

শেয়ানে শেয়ানে আজ কোলাকুলি,
সে কথা লুকিয়ে লাভ নেই ;
যা করেছ তারই জবাব দিয়েছি,
আমার বন্ধু পাপ নেই !

আড়চোখে দেখে সাহেব তখন
বীরবপু আশুতোষকেই,
হজম করতে হয় চুপ করে
প্রজ্বলন্ত রোষকেই !

এমন মানুষ যেজন তাঁকে তো,
বেশী ঘাঁটানোটা ঠিক নয়,
কে জানে হয়তো—দেবেন দু ঘা-ই,
মন যদি আরো বিগড়োয় !!

এই বছর আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করব ।

জরৎকারু মুনি সর্বদাই কঠিন তপস্যায় ব্যস্ত থাকিতেন। বিবাহ বা সংসারের অন্য কোনো কাজ করার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। তপস্যা করিয়া আর তীর্থে স্নান করিয়া তিনি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঘর, বাড়ি কিছুই তাঁহার ছিল না, যেখানে রাত্রি হইত, সেইখানেই নিদ্রা যাইতেন। এমন লোককে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করাইয়া দেওয়া কি সহজ কাজ! এ কাজ হওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না, যদি ইহার মধ্যে একটি আশ্চর্য ঘটনা না হইত। ঘটনাটি এই—জরৎকারু নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন দেখিলেন যে, একটা ভয়ংকর অন্ধকার গর্তের মুখে কয়েকটি নিতান্ত দীনহীন, রোগা, হাড্ডিসার মানুষ একগাছি খসখসের শিকড় ধরিয়া ঝুলিতেছে! উহাদের পা উপর দিকে, মাথা নীচের দিকে। একটা ইঁদুর ক্রমাগত সেই খসখসের শিকড়খানিকে কাটিয়া, উহার একটি আঁশ মাত্র বাকি রাখিয়াছে, সেটুকু কাটা গেলেই বেচারারা গর্তের ভিতরে পড়িয়া যাইবে! ইহাদিগকে দেখিয়া জরৎকারুর বড়ই দয়া হওয়াতে, তিনি বলিলেন, 'আহা! আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে! আপনারা কে? আর, কী করিয়াই বা আপনাদের এমন কষ্টের অবস্থা হইল? আমি কি আপনাদের কোনো উপকার করিতে পারি?'

সেই লোকগুলি বলিলেন, 'আমাদিগকে দেখিয়া তোমার দুঃখ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখ দূর করা বড়ই কঠিন দেখিতেছি। আমরা যাযাবরনামক ঋষি। আমরা কেহ কোনো পাপ করি নাই, কেবল আমাদের বংশ লোপ হওয়ার গতিক হওয়াতেই আমাদের এই দুর্দশা! আমাদের বংশে এখনও একটি লোক আছে, উহার নাম জরৎকারু। জরৎকারু বাঁচিয়া আছে বলিয়াই আমরা এখনও কোনোমতে এই খসখসের শিকড়টুকু ধরিয়া টিকিয়া আছি, উহার মৃত্যু হইলেই শিকড়টি ছিঁড়িয়া

যাইবে, আর আমরাও এই গর্তের ভিতরে পড়িয়া যাইব। সে মূর্খ কেবল তপস্যা করিয়াই বেড়ায়; কিন্তু উহার তপস্যায় আমাদের কী ফল হইবে? তাহার চেয়ে সে যদি বিবাহ করিত আর তাহার পুত্রপৌত্র হইত, তবে আমরা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম। বৎস, আমাদের দশা দেখিয়া তোমার দয়া হইয়াছে তাই বলি,—যদি সেই হতভাগার সহিত তোমার দেখা হয়, তবে দয়া করিয়া আমাদের কথা তাহাকে বলিও।'

হায়, কী কষ্টের কথা! পূর্বপুরুষরা এমন ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন, আর সেই কষ্টের কারণ জরৎকারু নিজে! এ কথা ভাবিয়া তিনি যারপরনাই দুঃখের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হে মহর্ষিগণ, আপনারা আমারই পূর্বপুরুষ। আমিই সেই দুরাত্মা হতভাগ্য জরৎকারু। আমার অপরাধের সীমা নাই। সেজন্য আমাকে উচিত শাস্তি দিন। আর বলুন, আমি কী করিব।'

ইহাতে পূর্বপুরুষেরা কহিলেন, 'তুমি বিবাহ করো।'

জরৎকারু বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি বিবাহ করিব; কিন্তু ইহার মধ্যে দুটি কথা আছে। মেয়েটির আমার নামে নাম হওয়া চাই। আর, বিবাহের পর স্ত্রীকে খাইতেও দিতে পারিব না। ইহাতে যদি আমার বিবাহ জোটে, তবেই বিবাহ করিব, নচেৎ নহে।'

এই বলিয়া জরৎকারু বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজিতে লাগিলেন। একে বুড়া, তাহাতে গরিব। স্ত্রীকে খাইতে পরিতে দিতে পারিবে না, কুঁড়েঘরখানি পর্যন্ত নাই যে তাহাতে নিয়া তাহাকে রাখিবে। এমন বরকে মেয়ে দিতে বোধহয় বাঘ-ভালুকেও রাজী হয় না—মানুষ তো দূরের কথা। মুনি দেশ-বিদেশে খুঁজিয়া হয়রান হইলেন, কোথাও মেয়ে পাইলেন না। তখন, পূর্বপুরুষদের কথা মনে করিয়া, তাঁহার নিতান্ত কষ্ট হওয়াতে, তিনি এক বনের ভিতরে গিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিলেন, 'এখানে যদি কেহ থাক, তবে শোনো। আমি যাযাবর বংশের তপস্বী, নাম জরৎকারু। পূর্বপুরুষদিগের আজ্ঞায় আমি বিবাহ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কন্যা জুটিতেছে না। যদি তোমাদের কাহারও নিকট কন্যা থাকে, আর যদি তাহার আমার নামে নাম হয়, আর যদি আমার টাকা না দিতে হয়, আর মেয়েকেও খাইতে পরিতে দিতে না হয়,—তবে নিয়া আইসো, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।'

এ দিকে হইয়াছে কী—বাসুকির লোকেরা সেই তখন হইতেই জরৎকারুকে খুঁজিতেছে, কিন্তু এতদিন কোথাও তাহার দেখা পায় নাই। জরৎকারু যখন সেই বনের ভিতর ঢুকিয়া কাঁদিতেছিলেন তখন বাসুকির ওইসব লোকের কয়েকজনও সেখানে ছিল। তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াই বলিল, 'ওই রে, সেই মুনি! ঐ শোন্, সে বিবাহ করিতে চায়! শীঘ্র কর্তাকে খবর দিই গিয়া, চল্।'

এই বলিয়া তাহারা বায়ুবেগে ছুটিয়া গিয়া বাসুকিকে এই সংবাদ দিল। বাসুকিও সে সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার ভগিনীকে অতি সুন্দর পোশাক এবং মহামূল্য অলংকার পরাইয়া, জরৎকারুর নিকট উপস্থিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জরৎকারু বলিলেন, 'মহাশয়, ইহার নামটি কী?'

বাসুকি বলিলেন, 'ইহার নাম জরৎকারু।'

জরৎকারু বলিলেন, 'বেশ! কিন্তু আমি তো টাকাকড়ি দিতে পারিব না।'

বাসুকি বলিলেন, 'আপনাকে কিছুই দিতে হইবে না, আমি অমনিই মেয়ে দিতেছি।'

জরৎকারু বলিলেন, 'বেশ, বেশ! কিন্তু মেয়েকে খাইতে দিবে কে? আমার তো কিছুই নাই।'

বাসুকি বলিলেন, 'তাহার জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমি ইহাকে চিরকাল ভরণপোষণ করিব।'

জরৎকারু বলিলেন, 'তবে ভালো, আমি ইহাকে বিবাহ করিব। কিন্তু যদি ইনি কখনও আমাকে অসন্তুষ্ট করেন, তবে আমি তখনই চলিয়া যাইব।'

এই কথাবার্তার পর জরৎকারুর সহিত বাসুকির ভগিনীর বিবাহ হইল। ইহাদের পুত্রই আস্তীক—যিনি সর্পগণকে জনমেজয়ের যজ্ঞ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তিকের জন্মের কয়েকদিন আগে, জরৎকারু তাঁহার স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বেচারীর কোনো দোষ ছিল না। তিনি পরম যত্নে স্বামীর সেবা করিতেন।

একদিন বিকালবেলায় জরৎকারু মুনি নিদ্রা গেলেন। ক্রমে সূর্যাস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাকালের উপাসনার সময় হইল। তথাপি মুনির ঘুম ভাঙিল না। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী ভাবিলেন, 'এখন কী করি? ঘুম ভাঙাইলে হয়তো ইহার রাগ হইবে, আর সন্ধ্যাপূজা না করা হইলে ইহার পাপ হইবে।' অনেক ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, যাহাতে ইহার পাপ হয়, এমন ঘটনা হইতে দেওয়া উচিত নহে, সুতরাং ইহাকে জাগানোই কর্তব্য। এই মনে করিয়া যেই তিনি মুনিকে আস্তে আস্তে জাগাইয়াছেন, অমনি মুনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'কী? আমাকে অপমান করিলে? এই আমি চলিলাম, আর এখানে কিছুতেই থাকিব না।'

ইহাতে বাসুকির ভগিনী নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'ভগবন্, সূর্যাস্ত হইতেছিল, তাই সন্ধ্যাপূজার জন্য আপনাকে জাগাইয়াছিলাম। আপনাকে অপমান করিতে চাহি নাই।'

জরৎকারু বলিলেন, 'আমি ঘুমাইয়া থাকিতে কি সূর্যাস্ত হইবার শক্তি আছে? কাজেই আমাকে জাগাইয়া আমার অপমান করিয়াছ। আমি আর এখানে থাকিব না।'

এই বলিয়া মুনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তাঁহার স্ত্রীর চোখের জলের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরেই আস্তীকের জন্ম হইল। ছেলেটি দেখিতে দেবতার ন্যায় সুন্দর। আর তাহার এমন অসাধারণ বুদ্ধি যে, শিশুকালেই বেদ পুরাণ সমস্ত পড়িয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিল। তাহাকে পাইয়া নাগগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। উহারা কত যত্নের সহিত যে তাহাকে পালন করিতে লাগিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই সময়েই জনমেজয়ের যজ্ঞ আরম্ভ হয়। যজ্ঞের সকল আয়োজন প্রস্তুত, সকলে তাহা আরম্ভ

করিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেখানে একটি লোক আসিল, তাহার চোখ দুইটা ভারি লাল। লোকটি স্থাপত্যবিদ্যায় বড়ই পণ্ডিত। সে খানিক এদিক ওদিক দেখিয়া, তারপর বলিল, 'যে সময়ে আর যে স্থানে তোমরা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে আমার বোধ হয়, তোমরা ইহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিবে না—এক ব্রাহ্মণ আসিয়া ইহাতে বাধা দিবে।' ইহা শুনিয়া জনমেজয় দারোয়ানদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, 'আমাকে না জানাইয়া কাহাকেও ঢুকিতে দিবে না।'

তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হইল। পুরোহিতেরা কালো রঙের ধুতি-চাদর পরিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে আগুনে ঘি ঢালিতে লাগিলেন, ধোঁয়ায় তাঁহাদের চোখ লাল হইয়া উঠিল। সর্পগণের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি পড়িবামাত্র (ঘৃত ঢালা হইবামাত্র) তাহারা বুঝিল যে, আর প্রাণের আশা নাই। অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, নানারকম সাপ আসিয়া আগুনে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বেচারারা ভয়ে অস্থির হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বাঁচিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছে, লেজ দিয়া আর মাথা দিয়া, একজন অপর-একজনকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিতেছে, আর ক্রমাগত আপনার লোকদিগের নাম লইয়া চিৎকার করিয়া কত যে কাঁদিতেছে, তাহার তো কথাই নাই। কিন্তু কিছুতেই তাহারা রক্ষা পাইতেছে না! সাদা, হলদে, নীল, কালো, ছোট, বড়, মাঝারি—সকল রকমের সাপ হাজারে হাজারে আগুনে পুড়িয়া মরিল।

সে সময়ে সাপের চিৎকারে আর কোনো শব্দই শুনিবার উপায় রহিল না। পোড়া সাপের গন্ধে সে স্থানে টিকিয়া থাকা ভার হইয়া উঠিল। হায়! মায়ের শাপ কী দারুণ শাপ!

কিন্তু যাহার জন্য আয়োজন, সেই তক্ষক এতক্ষণ কী করিতেছিল? যজ্ঞের কথা শুনিবামাত্র আর সকলের আগে উহারই প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল। সে তখনই নিতান্ত ব্যস্তভাবে ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোড়হাতে বলিল, 'দোহাই দেবরাজ! আমাকে রক্ষা করুন! জনমেজয় আমাকে পোড়াইয়া মারিবার আয়োজন করিতেছে!'

ইন্দ্র বলিলেন, 'তোমার কোনো ভয় নাই, তুমি আমার এইখানে থাকো।'

ইহাতে তক্ষক কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ইন্দ্রের পুরীতেই বাস করিতে লাগিল।

এদিকে ক্রমাগতই সাপ আসিয়া যজ্ঞের আগুনে পড়িতেছে। এইরূপে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই অধিকাংশ সাপ মরিয়া গেল, অল্পই বাকি রহিল। সাপের রাজা বাসুকি এ সকল ঘটনা দেখিয়া বার বার অজ্ঞান হইয়া যাইতে লাগিলেন। সাপেদের মধ্যে কেহ যে রক্ষা পাইবে, এমন আশা তাঁহার রহিল না। তাঁহার কেবল ইহাই মনে হইতে লাগিল যে, 'এইবারেই বুঝি আমার ডাক পড়ে।' এমন সময় তাঁহার আস্তীকের কথা মনে পড়িল।

বাস্তবিক, আস্তীক যদি সর্পগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জন্মিয়া থাকেন, তবে আর তাঁহার বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। এই বেলা গিয়া একটা কিছু না করিলে, আর তাহার যে কাজ করিবার অবসরই থাকিত না। সুতরাং বাসুকি তাড়াতাড়ি তাঁহার ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আর দেখিতেছ কী বোন? শীঘ্র আস্তীককে ইহার উপায় করিতে বলো।'

এ কথায় বাসুকির ভগিনী তখনই আস্তীকের নিকট গিয়া বলিলেন, 'বাছা, সর্বনাশ উপস্থিত! তুমি যে কাজের জন্য জন্মিয়াছিলে শীঘ্র তাহা না করিলে তো আর উপায় দেখিতেছি না!'

ইহাতে আস্তীক একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আমি কী কাজের জন্য জন্মিয়াছি মা? বলো, এখনই তাহা করিতেছি।'

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে

তিনটি ছড়া

বিমল দত্ত

১
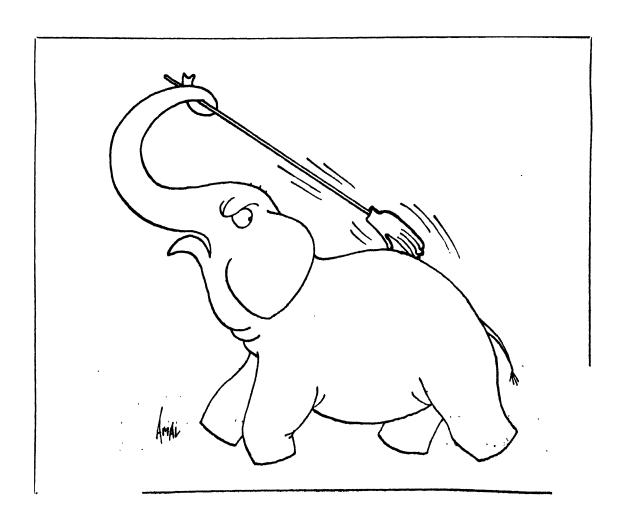
ভোমরা তুমি কেমন ছেলে
না ডাকতেই উড়ে এলে !
ফুলের ওপর পা রাখে না—ছিঃ।
গান তো ভারি গুনগুনানি
আমিও অমন গাইতে জানি
ফিরে যাচ্ছ ? আরে বাপু ঠাট্টা করেছি।

রাগ কোরো না, রাগ কোরো না
তুমি আমার লক্ষ্মীসোনা
তুমি গেলে বকবে আমায়
কুন্তলতার ঝি।

২

শিউলি ফুল কুড়োতে গিয়ে
হলুদ লাগল হাতে
বললে সবাই 'মাংস পোলাও'
সেঁটেছে খুব রাতে
তাই না শুনে দুপুর থেকে
পেটটা হল ভার
অষ্টসিকা নজরানা
লাগল চিকিৎসার।

★

৩

'ঋ'-গুলো সব বিচ্ছিরি—
যতই লিখতে যাই
বাঁকাচোরা কী যে ছিরি
যা ইচ্ছে তাই !

দীর্ঘ ঈ-টাও সঙের মতো
ও-ঔগুলোয় জট
তা না হলে অক্ষগুলো
এঁকে দি চট পট।

সব্‌চে আমার ভালো লাগে
চিকে শূন্যি আঁকতে।
বেশী শক্ত লেখা খারাপ
ছোট থাকতে থাকতে।

পতঙ্গ-রঙ্গ

জীবন সর্দার

একটু দাঁড়াও। তোমার ব্যস্ত পা সরিয়ে নাও। দেখো তো কী চাপা পড়েছে পায়ের তলায়।

একটা পোকা।

কী পোকা ওটা ?

চিনি না। নাম জানি না ওর।

আমি কিছু নিয়ম জানি যাতে ওদের চেনা যায়।

পোকাটা হাতে তুলে নাও। কটা পা ওর দেখো তো।

ছটা।

দেহটা কেমন ?

ভাঙা-ভাঙা তিন টুকরো একসঙ্গে জোড়া। সামনের ছোট টুকরোয় মুখ চোখ রয়েছে। মাঝের টুকরোটা লম্বাটে—তাতে আছে চারটি ডানা আর ছটি পা। পেছনের টুকরোটা সবচেয়ে বড়ো। তাতে কী আছে খালি চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

নাম-না-জানা এই পোকাটা এখানে কী করে এল বুঝতে পারছ ?

উঁহুঁ।

তোমার চারপাশটা একবার ভালো করে দেখো। চারপাশের পরিবেশ সব ঠিক একরকম নয়। কোথাও উঁচুনীচু, কোথাও ছায়া-ছায়া, কোথাও ভেজা-ভেজা। কোথাও শুকনো মাঠ, আবার কোথাও ঝোপঝাড়। কোথাও ঠাণ্ডা একটু, কোথাও বেশ গরম। এত সব আলাদা পরিবেশ নিয়েই একটা জায়গার গোটা পরিবেশ। কিন্তু সেই আলাদা 'পরিবেশ'গুলো খুঁজলে আলাদা আলাদা জাতের পতঙ্গ পাবে। পতঙ্গগুলো যেন সেই পরিবেশের বন্দী।

আরশুলাকে রান্নাঘর বা ভাঁড়ারঘরের অন্ধকার কোণ ছাড়া অন্য কোথাও ভাবতে পারা যায় না। মাছির ভন্‌ভন্‌ আর মশার পুন্‌পুন্‌ কোথায় গেলে শুনতে পাবে তুমিই বলো।

আমার এত কথা বলার কারণ এই যে, কী ধরনের পোকা কোথায় দেখতে পাবে তা নির্ভর করছে :

(ক) জল-হাওয়া-আলো এমন হওয়া চাই যেখানে সে বাঁচতে পারে।

(খ) তার ভেতরকার বোধ—যা দিয়ে বুঝতে পারে কোন্ পথে গেলে মনের মতো জায়গা পাব, খাবার পাব। আর,

(গ) খাবার সে জায়গায় এমন হওয়া চাই যা তার বিশেষ মুখ দিয়ে সহজে গিলতে পারা যায়। (রক্ত হলে প্রজাপতির চলবে না, মশার চলবে না ফুলের মধু)।

এই কটা কারণ ওদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে মনের মতো না হলে ওরা থাকবে না, মনের মতো হলেই থাকবে।

আমার এই কথাগুলি যদি বুঝতে পেরে থাক তবে পুরনো প্রশ্নটার জবাব দাও। এখানে কী করে এল পোকাটা ?

হয়তো সেই ভেতরকার বোধ থেকে। যেমন আমের গন্ধে মাছি আসে, চিনির গন্ধে পিঁপড়ে।

শুধু কি গন্ধেই পোকারা আসে ? ওদের দেহে নানা কারণে সাড়া জাগতে পারে। আলোয় সাড়া, গন্ধে সাড়া, ছোঁয়ায় সাড়া—কখন যে কী কারণে কী সাড়া দেয় বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। তুমি শোনো আমি বলি।

আলোয় সাড়া

প্রায় সব পোকাই আলোয় সাড়া দেয়—দুভাবে। হয় আলোর কাছে আসে, নয় দূরে চলে যায়। আরশুলা ছারপোকা বাতি জ্বাললে কী করে ? আলোর সঙ্গেই রঙ। আলোয় সাড়া মানে রঙেও সাড়া। রঙীন ফুলে ফুলে যে প্রজাপতি মধু খুঁজে বেড়ায় ডিম দেবার বেলায় সে খোঁজে—সবুজ পাতা। ডিম ফুটে তার ছানারা যে সবুজ পাতাই খুঁজবে খেতে। ফুল নয়, মধু নয়। প্রজাপতি নিশ্চয়ই ফুলের রঙ পাতার রঙ বোঝে। লাল নীল হলুদ সবুজ বোঝে।

গন্ধে সাড়া

পাতায় বা ফুলে, দুয়েতেই গন্ধ আছে। সে গন্ধ পোকারা পেতে পারে। কাঁঠাল ভাঙলেই মাছির ভন্‌ভন্ শুনব এ খবর সবাই রাখি। গন্ধে ওরা সাড়া দেয় দুটো কারণে। খাবার খোঁজা আর ডিম পাড়া। কিন্তু এই গন্ধ ওরা পায় কী করে ?

গন্ধ বয়ে নিয়ে আসে বাতাস। বাতাস যেদিকে বইবে গন্ধও ছড়াবে সেদিকে। বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ পেয়ে গন্ধের উৎসের দিকে আসতে ওদের একটুও অসুবিধা হয় না।

গন্ধ শুঁকেই পিঁপড়েরা সব ঘরে ফেরে। চলার পথে পিঁপড়েরা বিন্দু বিন্দু ফরমিক অ্যাসিড (পিঁপড়ের কামড়ে জ্বালা যার জন্য) ঢেলে রেখে যায়। ফেরার পথে ওই অ্যাসিডের গন্ধ শুঁকে ঘরে ফেরে।

তাপে সাড়া

আর মশা ছারপোকা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে তাপের ফলে। শীত বা ঠাণ্ডায় ছারপোকার উৎপাত কমে যায়। গুমোট গরমে দেয়ালের ফাটল দরজা-জানালার আনাচকানাচ থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ে।

গরম-রক্ত-খেকো পোকারা ঠিক মনের মতো উত্তাপ পায় তখন। আমাদের রক্তের উত্তাপ কত? সাধারণত ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহিট। মশা-ছারপোকা এই উত্তাপের উৎস কোথায়—অন্ধকারেও বুঝতে পারে। বুঝেই চলে তারা। ঘরের তাপ, বাইরের তাপ আর ঘুমন্ত ওই মানুষটার দেহের তাপ—সব তাপ আলাদা করে ওরা বুঝতে পারে।

'সাড়া' নিয়ে যখন আলোচনা করছি তখন একটা কথা মনে রাখতে হবে—সব পোকাই আর একই ব্যাপারে সাড়া দেয় না। কোনো শ্রেণী আলোয়, কেউ তাপে, কেউ গন্ধে, কেউ বা শব্দে।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। গাছে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনলেই ছুটো নারকেলের মালা নিয়ে তার তলায় দাঁড়াতাম। মালা ছুটো ঠুকে ঠুকে ছড়া কাটতাম :

ঝিঁঝিঁ লো সই লো—
তোর মা পুড়ল,
কুলো দিয়ে ঢাকল,
আয় লো ঝিঁঝিঁ ঘরে আয়।

তাকে ঘরে আসতে কখনও দেখি নি। অথবা সে যেখানে যেত সেটা আমার আজও অজানা। কিন্তু কেন সে ডাকে, কী করে ডাকে তা জানতে আমার বহুদিন কেটেছে।

শুধু ঝিঁঝিঁ নয়, অনেক পোকাই শব্দ করতে পারে। অনেক পোকার (যেমন মশা, মাছি, বোলতা) ওড়ার সময় খুব তাড়াতাড়ি ডানা নাড়ার জন্য বিশেষ অঙ্গ রয়েছে। ঝিঁঝিঁর ডানায় উকোর মতো খাঁজ কাটা। বেগে ঘষলে কর্কশ শব্দ হয়। এমনিভাবে ডানা ঘষে শব্দ করে ঘাসফড়িং। রঙীন পিঠে বিন্দুওয়ালা পোকাগুলো পেছনের পা আর দেহের পেছনে ঘষাঘষি করে অদ্ভুত শব্দ করে।

কিন্তু এত শব্দ, এত ডাকাডাকি কেন?

বিপদে পড়ে আমরা কেন ডাকি? বাতি নিবে গেলে অন্ধকারে কেন ডাকি? একা পথ হারিয়ে কেন ডাকি? —সঙ্গী চাই। ওরা বড় একা। ছোট্ট জীবন। সঙ্গী চাই। তাই এত ডাকাডাকি। তাই এত শব্দ।

আমার পুরোনো প্রশ্নটার উত্তর এবার নিশ্চয় দিতে পারবে। পোকাটা এখানে কী করে এল? কেন এল?

হয়তো শব্দের সাড়ায়, খাবারের খোঁজে। কিন্তু কী খাবার সে পাবে এখানে? তার মুখটা দেখো। প্রজাপতির মুখের শুঁড়ের মতো নয়। ফুলের মধু খেতে সে পারবে না। মশার মুখের ছুঁচের মতো ধারালো আর ফাঁপা নল নয়। রক্ত বা রস খেতে পারবে না। পোকাদের মধ্যে কেউ আমিষাশী, কেউ নিরামিষাশী। কেউ খায় ফলমূল ফুলের রস, কেউ শাকপাতা, কেউ গরম রক্ত, কেউ পচাগলা আবর্জনা, কেউ শুকনো কাঠ, কেউ ভেজা কাঠ। কিছুই ওরা বাদ দেয় না খেতে। যেমন হবে খাবার তেমনি হবে মুখ। খাবার ভঙ্গীও হবে আলাদা।

যাদের শক্ত মাড়ি তারা খাবার কুরে কুরে চিবিয়ে খাবে। আরশুলা, ফড়িং, শুঁয়োপোকা এই

জাতের। এমনি করে খাওয়াটাই বেশি দেখবে। মাছিরা খায় শুঁড় ডুবিয়ে তরল খাবার। বোলতা-ভিমরুলের শক্ত মাড়িও রয়েছে, শুঁড়ও রয়েছে। মাড়ি দিয়ে শিকার ধরে, বাসা বানায়। শুঁড় দিয়ে খাবার শুষে খায়।

তোমার হাতে যে অবশ পোকাটা ওর মুখে শক্ত মাড়ি। শুঁড় নেই শূল নেই। তবে কী খেতে সে এল এখানে?

ওর মুখ দিয়ে কুরে কুরে চিবিয়ে সবকিছু খাওয়া যায়। ও কিন্তু এখানে কিছু খেতে আসে নি।

কাল সন্ধ্যায় আবহাওয়া খুব ভালো ছিল। আনন্দে ওর মন ভরে উঠেছিল। একজন বন্ধুর খোঁজে আকাশে ডানা মেলে দিল সে। আরও অনেকে। সব রাজা আর রানী।

তার পর কোনো এক অবসরে নেমে এল সে। বাসা বাঁধবার আশায়।

তুমি পথ দেখে চল নি। তোমার পায়ের তলায় চাপা পড়ে ওর জীবনটা গেল।

বসন্তকালের এক ঝলমলে সকালে আমি আর নীলাঞ্জন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। তার সঙ্গে ওই রানী-পিঁপড়েটা নিয়ে আমার যে কথা হয়েছিল তোমাদের তা জানলাম।
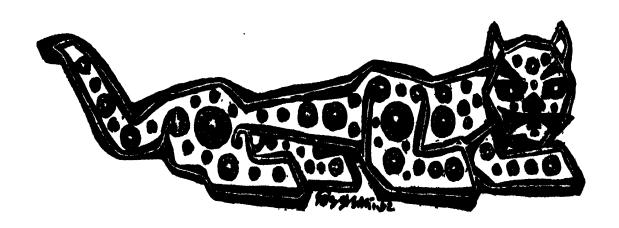
বাদুড় জিনিসটা আমার মোটেই ধাতে সয় না। আমার ভবানীপুরের ফ্ল্যাটের ঘরে মাঝে মাঝে যখন সন্ধের দিকে জানালার গরাদ দিয়ে নিঃশব্দে এক-একটা চামচিকে ঢুকে পড়ে তখন বাধ্য হয়েই আমাকে কাজ বন্ধ করে দিতে হয়। বিশেষত গ্রীষ্মকালে যখন পাখা ঘোরে, তখন যদি চামচিকে ঢুকে মাথার উপর বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকে আর খালি মনে হয় এই বুঝি ব্লেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাটিতে পড়ে ছটফট শুরু করবে, তখন যেন আমি একেবারে দিশেহারা বোধ করি। প্রায়ই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। আর আমার চাকর বিনোদকে বলি, ওটাকে তাড়াবার যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। একবার তো বিনোদ আমার ব্যাডমিনটন র‍্যাকেটের এক বাড়িতে একটা চামচিকে মেরেই ফেলল। সত্যি বলতে কি, কেবলমাত্র যে অসোয়াস্তি হয় তা নয়; তার সঙ্গে যেন একটা আতঙ্কের ভাবও মেশানো থাকে। বাদুড়ের চেহারাটাই আমার বরদাস্ত হয় না—না পাখি, না জানোয়ার, তার উপরে ওই যে মাথা নীচু করে পা দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়িয়ে ঝুলে থাকা, এইসব মিলিয়ে মনে হয় বাদুড় জীবটার অস্তিত্ব না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল।

কলকাতায় আমার ঘরে চামচিকে এতবার ঢুকেছে যে আমার তো এক-এক সময় মনে হয়েছে আমার উপর বুঝি জানোয়ারটার একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে! কিন্তু তাই বলে এটা ভাবতে পারি নি যে শিউড়িতে এসে আমার বাসস্থানটিতে ঢুকে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়েই দেখব সেখানেও একটি বাদুড় ঝোলায়মান। এ যে রীতিমত বাড়াবাড়ি। ওটিকে বিদেয় না করতে পারলে তো আমার এ ঘরে থাকা চলবে না!

এই বাড়িটার খোঁজ পাই আমার বাবার বন্ধু তিনকড়িকাকার কাছ থেকে। এককালে ইনি শিউড়িতে ডাক্তারি করতেন। এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছেন। বলা বাহুল্য, শিউড়িতে এঁর অনেক জানাশোনা আছে। তাই আমার যখন দিন সাতেকের জন্য শিউড়িতে যাবার প্রয়োজন

হল, আমি তিনকড়িকাকার কাছেই গেলাম। তিনি শুনে বললেন, 'শিউড়ি? কেন? শিউড়ি কেন? কী করা হবে সেখানে?'

আমি বললুম যে বাঙলাদেশের প্রাচীন পোড়ামাটির মন্দিরগুলো সম্বন্ধে আমি গবেষণা করছি। একটা বই লেখারও ইচ্ছে আছে। এমন সুন্দর সব মন্দির চারিদিকে ছড়িয়ে আছে! অথচ সেই নিয়ে কেউ আজ অবধি একটা প্রামাণ্য বই লেখে নি।

'ওহো, তুমি তো আবার আর্টিস্ট। তোমার বুঝি ওই দিকে শখ? তা বেশ বেশ। কিন্তু শুধু শিউড়ি কেন? ওরকম মন্দির তো বীরভূমের অনেক জায়গাতেই রয়েছে। সুরুল, হেতমপুর, দুবরাজপুর, ফুল্লবেরা, বীরসিংপুর—এ সব জায়গাতেই তো ভালো ভালো মন্দির আছে। তবে সে-সব কি এতই ভালো যে তাই নিয়ে বই লেখা যায়?'

যাই হোক—তিনকড়িকাকা একটা বাড়ির সন্ধান দিয়ে দিলেন আমায়।

'পুরোনো বাড়িতে থাকতে তোমার আপত্তি নেই তো? আমার এক পেশেন্ট থাকত ও বাড়িতে। এখন কলকাতায় চলে এসেছে। তবে যতদূর জানি, দারোয়ান-গোছের লোক একটি থাকে সেখানে দেখাশোনা করবার। বেশ বড় বাড়ি। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। পয়সাকড়িও লাগবে না—কারণ পেশেন্টটিকে আমি একেবারে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলাম, তিন-তিনবার। দিন সাতেকের জন্য তার বাড়ির একটা ঘরে একজন গেস্ট থাকবে, আমি এমন অনুরোধ করলে সে খুশী হয়েই রাজী হবে।'

হলও তাই। কিন্তু সাইকল্ রিকশ করে স্টেশন থেকে মালপত্র নিয়ে বাড়িটায় পৌঁছে ঘরে ঢুকেই দেখি বাদুড়।

বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বৃদ্ধ দারোয়ান-গোছের লোকটিকে হাঁক দিলাম :

'কী নাম হে তোমার?'

'আজ্ঞে, মধুসূদন।'

'বেশ, তা মধুসূদন—ওই বাদুড়বাবাজী কি বরাবরই এই ঘরে বসবাস করেন, না আজ আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন?'

মধুসূদন কড়িকাঠের দিকে চেয়ে মাথা চুলকিয়ে বলল, 'আজ্ঞে তা তো খেয়াল করি নি বাবু। এ ঘরটা তো বন্ধই থাকে; আজ আপনি আসবেন বলে খোলা হয়েছে।'

'কিন্তু ইনি থাকলে তো আবার আমার থাকা মুশকিল।'

'ও আপনি কিছু ভাববেন না বাবু। ও সন্ধে হলে আপনিই চলে যাবে।'

'তা না হয় গেল। কিন্তু কাল যেন আবার ফিরে না আসে তার একটা ব্যবস্থা হবে কি?'

'আর আসবে না। আর কি আসে? এ তো আর বাসা বাঁধে নি যে আসবে। রাত্তিরে কোন্ সময় ফস করে ঢুকে পড়েছে। দিনের বেলা তো চোখে দেখতে পায় না, তাই বেরুতে পারে নি।'

চা-টা খেয়ে বাড়ির সামনের বারান্দাটায় একটা পুরোনো বেতের চেয়ারে এসে বসলুম।

বাড়িটা শহরের এক প্রান্তে। সামনে উত্তর দিকে কার যেন মস্ত আমবাগান। গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দূরে দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত দেখা যায়। পশ্চিম দিকে একটা বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে একটা গির্জের চুড়ো দেখা যায়। শিউড়ির এটি একটি বিখ্যাত প্রাচীন গির্জা। রোদটা পড়লে একটু ওদিকটায় ঘুরে আসব বলে স্থির করলুম। কাল থেকে আবার কাজ শুরু করব। খোঁজ নিয়ে জেনেছি শিউড়ি এবং তার আশপাশে বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যে অন্তত খান ত্রিশেক পোড়াইটের মন্দির আছে। আমার সঙ্গে ক্যামেরা আছে, এবং অপর্যাপ্ত ফিল্ম। এইসব মন্দিরের গায়ের প্রতিটি কারুকার্যের ছবি তুলে ফেলতে হবে। ইঁটের আয়ু আর কতদিন? এসব নষ্ট হয়ে গেলে বাঙলাদেশ তার এক অমূল্য সম্পদ হারাবে।

আমার রিস্টওয়াচের দিকে চেয়ে দেখি সাড়ে পাঁচটা। গির্জের মাথার পিছনে সূর্য অদৃশ্য হল আমি আড় ভেঙে চেয়ার ছেড়ে উঠে সবে বারান্দার সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি এমন সময় আমার কান ঘেঁষে শন শন শব্দ করে কী যেন একটা উড়ে আমবনের দিকটায় চলে গেল।

শোবার ঘরে ঢুকে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দেখি—বাদুড়টা আর নেই।

যাক—বাঁচা গেল। সন্ধেটা অন্তত নির্বিঘ্নে কাটবে। হয়তো বা আমার লেখার কাজও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। বর্ধমান, বাঁকুড়া আর চব্বিশ পরগনার মন্দিরগুলো এর আগেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো সম্পর্কে লেখার কাজটা শিউড়িতে থাকতে থাকতেই আরম্ভ করব ভেবেছিলাম।

রোদটা পড়তে আমার টর্চটা হাতে নিয়ে গির্জের দিকটা বেরিয়ে পড়লাম। বীরভূমের লাল মাটি, অসমতল জমি, তাল আর খেজুর গাছের সারি—এসবই আমার বড় ভালো লাগে। তবে শিউড়িতে আমার এই প্রথম আসা। প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যদিও আসি নি—তবুও এই সন্ধেটায় লাল গির্জের আশপাশটা ভারি মনোরম লাগল। হাঁটতে হাঁটতে গির্জে ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে আরো খানিকটা পথ এগিয়ে গেলাম। সামনে দেখলাম খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে কারো বাগান বলে মনে হয়। একটা লোহার গেটও রয়েছে বলে মনে হল।

আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম—বাগান নয়, গোরস্থান। খান ত্রিশেক খ্রীষ্টানদের কবর রয়েছে গোরস্থানটায়। কোনোটির উপর কারুকার্য-করা পাথর বা ইঁটের স্তম্ভ। আবার কোনোটিতে মাটিতে শোয়ানো পাথরের ফলক। এগুলো যে খুবই পুরোনো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্তম্ভগুলিতে ফাটল ধরেছে। আবার ফাটলের মধ্যে এক-একটাতে অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে।

গেটটা খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকে ফলকের উপর অস্পষ্ট লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলাম। একটায় দেখলাম সন ১৭৯৩। আরেকটায় ১৭৮৮। সবই সাহেবদের কবর, ইংরেজ রাজত্বে গোড়ার যুগে ভারতবর্ষে এসে নানান মহামারীর প্রকোপে অধিকাংশেরই অকাল বয়সেই মৃত্যু হয়েছে। একটা ফলকে লেখাটা একটু স্পষ্ট আছে দেখে আমার টর্চটা জ্বালিয়ে ঝুঁকে সেটা পড়তে যাব, এমন সময় আমার পিছনেই যেন একটা পায়ের শব্দ পেলাম। ঘুরে দেখি একটি মাঝবয়সী বেঁটে-গোছের লোক

হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আমারই দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে। লোকটার পরনে একটা কালো আলপাকার কোট, একটা ছাইরঙের পেন্টুলুন আর হাতে একটা তালি-দেওয়া ছাতা।

'আপনি বাদুড় জিনিসটাকে বিশেষ পছন্দ করেন না—তাই না ?'

ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলুম। এটা সে জানল কী করে ? আমার বিস্ময় দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ভাবছেন কী করে জানলুম ? খুবই সোজা। আপনি যখন আপনার বাড়ির দারোয়ান-টিকে আপনার ঘরের বাদুড়টাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলছিলেন, তখন আমি কাছাকাছিই ছিলুম।'

'ওঃ, তাই বলুন।'

ভদ্রলোক এইবার আমাকে নমস্কার করলেন।

'আমার নাম জগদীশ পার্সিভ্যাল মুখার্জি। আমাদের চার পুরুষের বাস এই শিউড়িতে। খ্রীষ্টান তো—তাই সন্ধের দিকটা গির্জা-গোরস্থানের আশপাশটায় ঘুরতে বেশ ভালো লাগে।'

অন্ধকার বাড়ছে দেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে পা ফেরালুম। ভদ্রলোক আমার সঙ্গ নিলেন। কেমন যেন লাগছিল লোকটিকে। এমনিতে নিরীহ বলেই মনে হয়—কিন্তু গলার স্বরটা যেন কেমন কেমন—মিহি, অথচ রীতিমত কর্কশ। আর গায়ে পড়ে যেসব লোক আলাপ করে তাদের আমার এমনিতেই ভালো লাগে না।

টর্চের বোতাম টিপে দেখি সেটা জ্বলছে না। মনে পড়ল হাওড়া স্টেশনে একজোড়া ব্যাটারি কিনে নেব ভেবেছিলাম—সেটা আর হয় নি। কী মুশকিল! রাস্তায় সাপখোপ থাকলে তা দেখতেও পাব না।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি টর্চের জন্য চিন্তা করবেন না। অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যাস আছে আমার। বেশ ভালোই দেখতে পাই। সাবধান—একটা গর্ত আছে কিন্তু সামনে!'

ভদ্রলোক আমার হাতটা ধরে একটা টান দিয়ে বাঁ দিকে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জানেন ?'

সংক্ষেপে বললুম, 'জানি।'

ভ্যাম্পায়ার কে না জানে ? রক্তচোষা বাদুড়কে বলে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। ঘোড়া গোরু ছাগল ইত্যাদির গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। আমাদের দেশে এ বাদুড় আছে কিনা জানি না, তবে বিদেশী বইএ ভ্যাম্পায়ার ব্যাটের কথা পড়েছি। শুধু বাদুড় কেন—বিদেশী ভূতুড়ে গল্পের বইএ পড়েছি মাঝ রাত্তিরে কোনো কোনো কবর থেকে মৃতদেহ বেরিয়ে এসে জ্যান্ত ঘুমন্ত মানুষের গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। তাদেরও বলে ভ্যাম্পায়ার। কাউন্ট ড্র্যাকুলার রোমহর্ষক কাহিনী তো ইস্কুলে থাকতেই পড়েছি।

আমার বিরক্ত লাগল এই ভেবে যে বাদুড়ের প্রতি আমার বিরূপ মনোভাবের কথা জেনেও ভদ্রলোক আবার গায়ে পড়ে বাদুড়ের প্রসঙ্গ তুলছেন কেন।

এর পরে দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আমবাগানটা পাশ কাটিয়ে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ আনন্দিত হলুম। আছেন তো কদিন ?'

বললুম, 'দিন সাতেক আছি।'

'বেশ বেশ—তাহলে তো দেখা হবেই।' তারপর গোরস্থানের দিকটায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'সন্ধের দিকটায় ওদিক পানে এলেই আমার দেখা পাবেন। আমার বাপ-পিতেমহর কবরও ওইখানেই আছে। কাল আসবেন, দেখিয়ে দেব।'

মনে মনে বললুম, তোমার সঙ্গে যত কম দেখা হয় ততই ভালো। বাদুড়ের উৎপাত যেমন অসহ্য, বাদুড় সম্পর্কে আলোচনাও তেমনিই অতৃপ্তিকর। অনেক অন্য বিষয়ে চিন্তা করার আছে।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পিছন ফিরে দেখলুম ভদ্রলোক অন্ধকার আমবনটার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বনের পিছনের ধানক্ষেতের দিক থেকে তখন শেয়ালের কোরাস আরম্ভ হয়ে গেছে।

আশ্বিন মাস—তাও যেন কেমন গুমোট করে রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ভাবলুম বাদুড়ের ভয়ে জানালাদরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলুম—সেগুলো খুলে দিলে বোধহয় কিছুটা আরাম হতে পারে।

কিন্তু দরজাটা খুলতে ভরসা হল না। বাদুড়ের জন্য নয়। দারোয়ান বাবাজীর ঘুম যদি হালকা হয়, চোরের উপদ্রব থেকেও বোধ হয় রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সব মফস্বল শহরে মাঝে মাঝে দেখা যায়—দরজা খোলা রাখলে রাস্তার কুকুর ঘরে ঢুকে চটিজুতোর দফা রফা করে দিয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমার আগে অনেকবার হয়েছে। তাই অনেক ভেবে দরজা দুটো না খুলে পশ্চিম দিকের জানালাটা খুলে দিলুম। দেখলুম বেশ ঝিরঝির করে হাওয়া আসছে।

ক্লান্ত থাকায় ঘুম আসতে বেশি সময় লাগল না।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলুম জানালার গরাদে মুখ লাগিয়ে সন্ধেবেলার সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। তাঁর চোখ-দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, আর দাঁতগুলো কেমন যেন সরু সরু আর ধারালো। তারপর দেখলুম ভদ্রলোক দু পা পিছিয়ে গিয়ে হাতদুটোকে উঁচু করে এক লাফ দিয়ে গরাদ ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। ভদ্রলোকের পায়ের শব্দেই যেন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

বিছানা ছেড়ে উঠে মধুসূদনকে একটা হাঁক দিয়ে বললুম চা দিয়ে যেতে। সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে না পড়লে কাজের অসুবিধে হবে।

মধুসূদন বারান্দায় বেতের টেবিলে চা রেখে চলে যাবার সময় লক্ষ্য করলুম তাকে যেন কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বললুম, 'কী হল মধুসূদন? শরীর খারাপ নাকি? না রাত্রে ঘুম হয় নি?'

মধু বললে, 'না বাবু, আমার কিছুই হয় নি। হয়েছে আমার বাছুরটার।'

'কী হল আবার?'

'কাল রাত্তিরে সাপের কামড় খেয়ে মরে গেছে।'

'সে কী! মরেই গেল?'

'আজ্ঞে, তা আর মরবে না? এই সবে সবে সাতদিনের বাছুর! গলার কাছটায় মেরেছে ছোবল কী জানি গোখরো না কী!'

মনটা কেমন জানি খচ করে উঠল। গলার কাছে? গলায় ছোবল? কালই যেন—

হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। জন্তুজানোয়ারের গলা থেকে রক্ত শুষে নেয় ভ্যাম্পায়ার ব্যাট। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—সাপের ছোবলে বাছুর মরবে এতে আর আশ্চর্য কী? আর বাছুর যদি রাত্রে শুয়ে থাকে, তাহলে গলায় ছোবল লাগাটা তো কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়! আমি মিছিমিছি দুটো জিনিসের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি।

মধুসূদনকে সান্ত্বনা দেবার মতো দু-একটা কথা বলে কাজের তোড়জোড় করব বলে ঘরে ঢুকতেই দৃষ্টিটা যেন আপনা থেকেই কড়িকাঠের দিকে চলে গেল।

কালকের সেই বাদুড়টা আবার কখন জানি তার জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ওই জানালাটা খোলাতেই এই কাণ্ডটা হয়েছে। ভুলটা আমারই। মনে মনে স্থির করলুম আজ রাত্রে যত গুমোটই হোক না কেন, দরজা জানালা সব বন্ধ করেই রেখে দেব।

সারা দিন মন্দির দেখে বেশ আনন্দেই কাটল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর এই পোড়া ইটের মন্দিরের গায়ের কাজ দেখে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয়।

হেতমপুর থেকে বাসে করে ফিরে শিউড়ি এসে যখন পৌঁছলুম তখন সাড়ে চারটে।

বাড়ি ফেরার পথ ছিল গোরস্থানটার পাশ দিয়েই। সারাদিনের কাজের মধ্যে কালকের সেই ভদ্রলোকটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, তাই গোরস্থানের বাইরে সজনেগাছটার নীচে হঠাৎ তাঁকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তেই মনে হল লোকটাকে না-দেখতে পাওয়ার ভান করে এড়িয়ে যেতে পারলে খুব সুবিধে হয়। কিন্তু সে আর হবার জো নেই। মাথা হেঁট করে হাঁটার স্পীডটা যেই বাড়িয়েছি, অমনি ভদ্রলোক প্রায় লাফাতে লাফাতেই এগিয়ে এসে আমায় ধরে ফেললেন।

'রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল ভালো?'

আমি সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বলে এগোতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু দেখলুম আজও ভদ্রলোক আমার সঙ্গ ছাড়বেন না। আমার দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমার আবার কী বাতিক জানেন? রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারি না। দিনের বেলাটা কষে ঘুমিয়ে নিই, আর সন্ধে থেকে সারা রাতটা এদিক ওদিক বেড়িয়ে বেড়াই। এই ঘোরায় যে কী আনন্দ তা আপনাকে কী করে বোঝাব? এই গোরস্থানের ভেতরে এবং আশপাশে যে কত দেখবার ও শোনবার জিনিস আছে তা আপনি জানেন? এই যে এরা সব মাটির তলায় কাঠের বাক্সের মধ্যে বছরের পর বছর বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে দিচ্ছে, এদের অতৃপ্ত বাসনার কথা কি আপনি জানেন? এরা কি কেউ এইভাবে বন্দী থাকতে চায়? কেউ চায় না। সকলেই মনে মনে ভাবে—একবারটি যদি বেরিয়ে আসতে পারি! কিন্তু মুশকিল কী জানেন?—এই বেরোনোর রহস্যটি সকলের জানা নেই। সেই শোকে তারা কেউ কাঁদে, কেউ গোঙায়, কেউ বা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মাঝ রাত্তিরে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়, শেয়াল যখন ঘুমিয়ে পড়ে, ঝিঁঝিঁপোকা যখন ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন যাদের শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ—এই যেমন আমার—তারা এইসব মাটির নীচে কাঠের বাক্সে বন্দী প্রাণীদের শোকোচ্ছ্বাস শুনতে পায়। অবিশ্যি—ওই যা বললাম—কান খুব ভালো হওয়া চাই। আমার চোখ কান দুটোই খুব ভালো। ঠিক বাদুড়ের মতো...'

মনে মনে ভাবলুম, মধুসূদনকে এই লোকটির কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। এঁকে জিগ্যেস করে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না। কদ্দিনের বাসিন্দা ইনি? কী করেন ভদ্রলোক? কোথায় এঁর বাড়ি?

আমার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি সকলের সঙ্গে বিশেষ একটা এগিয়ে আলাপ করি না। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগল, তাই সেধে এসে আলাপ করলাম। আশা করি যে-কটা দিন আছেন, আপনার সঙ্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।'

আমি এবার আর রাগ সামলাতে পারলুম না। হাঁটা থামিয়ে লোকটির দিকে ঘুরে বললুম, 'দেখুন মশাই, আমি মাত্র সাত দিনের জন্য এসেছি এখানে। বিস্তর কাজ রয়েছে আমার। আপনাকে সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ হবে বলে মনে হয় না।'

ভদ্রলোক যেন প্রথমটা আমার কথা শুনে একটু মুষড়ে পড়লেন। তারপর মৃদু অথচ বেশ দৃঢ় কণ্ঠে ঈষৎ হাসি মাখিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে সঙ্গ না দিলেও, আমি তো আপনাকে দিতে পারি! আর আপনি যে সময়টা কাজ করেন—অর্থাৎ দিনের বেলা—আমি সে সময়টার কথা বলছিলাম না।'

আর বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। সংক্ষেপে 'নমস্কার' বলে আমি বাড়ির দিকে পা চালালুম।

রাত্রে খাবার সময় মধুসূদনকে লোকটির কথা জিজ্ঞেস করলুম। মধু মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে জগদীশ মুখুজ্জে বলে কাউকে—' তারপর একটু ভেবে বললে, 'ও, হাঁ—দাঁড়ান। বেঁটে খাটো মানুষ? কোট প্যান্টুলুন পরেন? গায়ের রঙ ময়লা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ও—আরে, তার তো বাবু মাথা খারাপ। সে তো হাসপাতালে ছিল এই কিছুদিন আগে অবধি। তবে এখন শুনছি তার ব্যামো সেরেছে। তাকে চিনলেন কী করে বাবু? তাকে তো অনেক দিন দেখি নি! ওর বাপ নীলমণি মুখুজ্জে ছিলেন পাদ্রী সাহেব। খুব ভালো লোক। তবে তিনিও শুনেছিলুম মাথার ব্যামোতেই মারা গিয়েছিলেন।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না, কেবল বাদুড়টার কথা সকালে বলা হয় নি, সেটা বলে বললাম, 'অবিশ্যি দোষটা আমারই। জানালাটা রাত্রে খুলে দিয়েছিলাম। ওটার যে মাঝের গরাদটা আবার নেই, সেটা খেয়াল ছিল না।'

মধু বলল, 'এক কাজ করব বাবু। কাল ওই ফাঁকটা বন্ধ করে দেব। আজকের রাতটা বরং জানালাটা ভেজানোই থাক।'

সারাদিন মন্দির নিয়ে যেসব কাজ করেছি, রাত্রে খাতা খুলে সেইগুলো সম্বন্ধে একপ্রস্থ লিখে ফেললাম। ক্যামেরায় আর ফিল্ম ছিল না। বাক্স খুলে আগামী কালের জন্য নতুন ফিল্ম ভরলাম। জানালার দিকে বাইরে তাকিয়ে দেখি গতকালের জমা মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলোয় বাইরেটা তকতক করছে।

লেখার কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারটায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম। এগারোটার কাছাকাছি উঠে একগেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে বিছানায় এসে শুলুম। মনে মনে ভাবলুম, আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে জগদীশবাবুর কথাগুলো সত্যিই হাস্যকর। স্থির করলুম, হাসপাতালে

জগদীশবাবুর কী চিকিৎসা হয়েছিল এবং কোন্ ডাক্তার চিকিৎসা করেছিলেন সেটা একবার খোঁজ নিতে হবে।

মেঘ কেটে গিয়ে, গুমোট ভাবটাও কেটে গিয়েছিল, তাই জানালা দরজা বন্ধ করাতেও কোনো অসুবিধা লাগছিল না। বরঞ্চ পাতলা চাদর যেটা এনেছিলাম সেটা আজ গায়ে দিতে হল। চোখ বোজার অল্পক্ষণের মধ্যেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কটার সময় যে ঘুমটা ভাঙল জানি না—আর ভাঙার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত ভাঙার কারণটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তারপর হঠাৎ পুবদিকের দেয়ালে একটা চতুষ্কোণ চাঁদের আলো দেখেই বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল।

জানালাটা কখন জানি খুলে গেছে, সেই জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে দেয়ালে পড়েছে।

তারপর দেখলাম, চতুষ্কোণ আলোটার উপর দিকে একটা কিসের জানি ছায়া বার বার ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে ঘাড়টা ফিরিয়ে উপর দিকে চাইতেই বাদুড়টাকে দেখতে পেলাম।

আমার খাটের ঠিক উপরেই বাদুড়টা বন বন করে চরকি পাক ঘুরছে এবং ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশ নীচে আমার দিকে নামছে!

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে যতটা সম্ভব সাহস সঞ্চয় করা যায় করলুম। এ অবস্থায় দুর্বল হলে অনিবার্য বিপদ। বাদুড়টার দিক থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে আমার ডানহাতটা খাটের পাশের টেবিলের দিকে বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে আমার শক্তবাঁধাই খাতাটা তুলে নিলুম।

তিন-চার হাতের মধ্যে নেমে বাদুড়টা যেই আমার কণ্ঠনালীর দিকে তাক করে একটা ঝাঁপ দিয়েছে—আমিও সঙ্গে সঙ্গে খাতাটা দিয়ে তার মাথায় তাগ করে প্রচণ্ড একটা আঘাত করলুম।

বাদুড়টা ছিটকে গিয়ে জানালার গরাদের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে একেবারে ঘরের বাইরে মাঠে গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটা মচমচ শব্দে মনে হল কে যেন ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাল।

জানালার কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখলুম—কোথাও কিচ্ছু নেই, বাদুড়টারও চিহ্নমাত্র নেই।

বাকি রাতটা আর ঘুমোতে পারলুম না।

সকালে রোদ উঠতেই রাত্রের বিভীষিকা মন থেকে অনেকটা কেটে গেল। এ বাদুড় যে ভ্যাম্পায়ার এখনো পর্যন্ত তার সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। আমার দিকে বাদুড়টা নেমে আসছিল মানেই যে আমার রক্ত খেতে আসছিল, তারও সত্যি কোনো প্রমাণ নেই। ওই বিদ্‌ঘুটে লোকটি ভ্যাম্পায়ারের প্রসঙ্গ না তুললে কি আর আমার ও কথা মনেও আসত? কলকাতায় যেমন বাদুড় ঘরে ঢোকে, এ বাদুড়কেও তারই সমগোত্রীয় বলে মনে হত।

যাই হোক, হেতমপুরে কাজ বাকি আছে। চা-পান সেরে সাড়ে ছটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম। গোরস্থানের কাছাকাছি আসতে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখলুম। স্থানীয় কয়েকটি লোক জগদীশ

বাবুকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। দেখে মনে হল জগদীশবাবু অজ্ঞান, আর তাঁর কপালে যেন চাপ-বাঁধা রক্তের দাগ। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সামনের লোকটি হেসে বললে, 'বোধ হয় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মাথাটি কাটিয়ে অজ্ঞান।'

বললুম, 'সে কী—গাছ থেকে পড়বেন কেন ?'

'আরে মশাই—এ লোক বদ্ধ পাগল। মাঝে একটু সুস্থ হয়েছিল—তার আগে সন্ধেবেলা এগাছ সেগাছে উঠে মাথা নীচু করে ঝুলে থাকত— ঠিক বাদুড়ের মতো।'

খুকুর পুষি, খোকার ভুলো

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

ছোট্ট খুকুর ছোট্ট পুষি
দুষ্টু বেজায়। হয় সে খুশী
মাছটা ফেলে, দুধটা ঢেলে ;
করবে চুরি সুযোগ পেলে !
রাতের বেলা খুকুর বুকে
দুষ্টু পুষি ঘুমোয় সুখে।

ছোট্ট খোকার ছোট্ট ভুলো—
নাদুস-নুদুস, গালটা ফুলো।
কান দুটো তার দিব্বি ঝোলা,
ওপর দিকে লেজটা তোলা।
নাকটা খাঁদা, রঙটা কালো—
খোকার ভুলো বড্ড ভালো॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র • লীলা মজুমদার

হট্টমালার দেশে

॥ বারো ॥

লাইব্রেরির সিঁড়ি মোছার একেকটা দিন যেন একেকটা যুগ। রোজ বেলা চারটের সময় হাজির হয় রাখাল, মোতিলাল ভুরু কুঁচকে তাকে বালতি ঝাড়ন দিয়ে দেয়, তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সে যে তার উপর কত বিরক্ত এই থেকে রাখাল যথেষ্ট বুঝতে পারে। অথচ কী এমন দোষটা করেছে সে! একটা পুরোনো ফাটলধরা চিনেমাটির বাটি ভেঙেছে বই তো নয়! মোতিলালকে সে বন্ধু ঠাউরেছিল, তারই কথায় লাইব্রেরিতে ঢুকতে পেরেছিল আর এখন সে তার সঙ্গে কথা বলা দূরে থাকুক, মুখের দিকে তাকায় না পর্যন্ত! মনের দুঃখে রাখাল জোরে জোরে সিঁড়ি মুছতে থাকে। এত ভালো করে মোছে সে রাতের ডিউটির দুই নম্বর ম্যানেজার বাবু পর্যন্ত তার তারিফ করতে থাকেন। বলেন—বাঃ, খাশা [illegible] তো তোমার! বল তো তোমাকে এই কাজেই বরাবরের মতো বহাল করি।

রাখাল মাথা নীচু করে কাজ করে যায়, মুখে কিছু বলে না। কোঁকে গোঁজা সেই কাগজগুলো গায়ে ফোটে। মনে মনে ভাবে—সিঁড়ি মোছার কাজে বহাল হতে তার বয়ে গেছে, ছুইতরাসি ফিরে গিয়ে সে একটা রাজা হবে। তবে এখন তিন দিন ভালোমানুষের মতো কাজ করে যাব, শেষের দিন কাগজগুলোকে লাইব্রেরির সব টেবিলে সাজিয়ে, কাগজবাঁধা ন্যাকড়াতে গয়নাগুলো পুঁটলি করে বেঁধে নিয়ে একেবারে লম্বা দেবে। যাবার সময় বাকি কাগজও পথের ধারে ছড়িয়ে ফেলে যাবে।

মুশকিল শুধু দেশে ফেরার কী ব্যবস্থা হল দিকদার সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলে না। আর ভুতোএকেবারে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। রাত দশটায় কাজ সেরে আস্তানায় ফিরে ভুতোর পাশে শুয়ে যখন তার কানে কানে একশো কথা বলে রাখাল, ভুতো চুপ করে থাকে। রেগে খোঁচা দিলে বলে—হুম্! রাখালের মন খারাপ হয়ে যায়।

বাস্তবিক এ দেশটা অদ্ভুত। লাইব্রেরিতে আর যারা রাখালের সঙ্গে সিঁড়ি মোছে, তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। অদ্ভুত সব কথা বলে তারা। এদেশে নাকি কেউ কাউকে মারধোর করে না, বাপমাও দুষ্টু ছেলেদের মারে না, পাঠশালের গুরুমশাইদের হাতেও বেত থাকে না। তবে কি এ দেশে দুষ্টু ছেলে নেই? লোকগুলো অবাক হয়ে বলে, তাই কখনো হয়? দুষ্টু ছেলে থাকবে না—তাই কখনো সম্ভব? তাদের শায়েস্তা করা হয় কী করে তা হলে?—কেন, কেউ তাদের সঙ্গে মেশে না, বাপমায়েরা তাদের সঙ্গে কথা বলেন না, [illegible] পর্যন্ত [illegible]

বাধ্য হয়ে ভালো হন। অবিশ্যি দুরন্তপনাকে এরা দুষ্টুমি বলে না। এদের ছেলেরা ইচ্ছেমতো গাছে চড়ে, জলে সাঁতরায়, মাঠে মাঠে দৌড়ঝাঁপ করে। সবচেয়ে দুরন্ত ছেলেরাই সবচেয়ে ভালো চাষের কাজ করে।

শুনতে শুনতে কেমন মন কেমন করতে থাকে রাখালের। এক-একবার ভাবে—থাক গে, সোনাদানায় কাজ কী, এখানেই থেকে যাই। আবার যেই একটা সিঁড়ি মোছা হল, নীচে নেমে অন্য একটা সিঁড়ি মুছতে শুরু করে, তাকের উপর থরে থরে সাজানো গয়নাগাঁটির উপর চোখ পড়ে যায় আর প্রাণটা আনচান করে ওঠে। এত গয়না যে কারও ঘরে থাকতে পারে ওদের গাঁয়ের লোকে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এ সব নিয়ে তাদের কাছে উদয় হলে আগেকার দুষ্কর্মের কথা কেউ মুখেও আনবে না। অমনি রাজা-মহারাজা খেতাব দিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় মাখবে। রাখাল তার নখ-ফাটা, খড়ি-ওঠা পায়ের দিকে চেয়ে ভাবে—চোরদের পা এইরকমই হয়। আবার যেই দু-একটা গয়না বেচে পয়সা পাব, পায়ে তেলজল পড়বে, পাম্পশু উঠবে, জমিদারবাবুর পায়ের সঙ্গে এর কোনো তফাত থাকবে না।

তবু এ জায়গাটা যে বেশ সে কথা মানতেই হবে। তবে ভুতোর কাছে সে কথা স্বীকার করা নয়। এমনিতেই এখানে ভুতোর মন বসে গেছে। এখানে বুড়ি মাকে আনার কথা ভাবে সে। তার কাছ থেকে গয়না সরানোর ব্যাপারে কতখানি সাহায্য পাওয়া যাবে সেটাই হল একটা খুব বড় সমস্যা। মনটা বাস্তবিক খুব খারাপ হয়ে যায়।

তবু সিঁড়ি মুছতে মুছতে ফন্দিটা পাকিয়ে নেয় রাখাল। এই তিন দিনে লাইব্রেরি বাড়িটার প্রত্যেকটি আনাচ-কানাচ গলিঘুঁজি চেনা হয়ে যাচ্ছে। কোন্ সময়ে কীভাবে জিনিসগুলো সরানো যায় আগে থাকতেই ঠিক করে ফেলতে হবে। কাজে এতটুকু ত্রুটি রাখলে চলবে না, তাহলে ম্যানেজার সন্দেহ করতে পারেন যে রাখালের মনে অন্য মতলব আছে। শেষ দিন সবার কাছে জাহির করতে হবে যে সে আস্তানায় ফিরছে, কিন্তু আসলে আস্তানায় না ফিরে সুখী বলে লোকটা যেই দোতলার বড় হলের সব আলো নিবিয়ে, তারপর বড় সিঁড়ির আলো নিবিয়ে নীচে চলে আসবে, সেই সময় দোতলায় ঘন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। তারপর সব নিঝুম হয়ে গেলে গয়নার পুঁটলি বগলে কলঘরের পাশের খিড়কি খুলে বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ! সব দরজাতে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে কেবল সদরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে সকলে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যায়। শুধু পড়ুয়ার দল সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়, তারা কিছুতেই বই ছেড়ে নড়তে চায় না।

এখানে থাকলে পয়সা খরচ করে তেল সাবান কিনতে হয় না। আস্তানার তাকে সব সাজানো আছে, দরকারমতো নিলেই হল। পয়সাকড়ি দিয়ে এখানে কিছু কেনবার দরকার নেই। ইস্কুলের মাইনে লাগে না, হাসপাতালে মিনি পয়সায় চিকিচ্ছে হয়। সুখীর কাছে শোনা যে আরও অন্য হাসপাতাল আছে—সেখানে রাগীদের, অসভ্যদের, দুষ্টু লোকদের চিকিচ্ছে হয়, ওষুধ খেয়ে তাদের নাকি রাগ পড়ে যায়, ভদ্রলোক ভালোমানুষ হয়ে যায়। এত কথা অবিশ্যি রাখালের বিশ্বাস হয় না। যাই হোক, গয়নাগুলো হাতিয়ে নিয়ে এখানে যে কোনো সুবিধে করা যাবে না, এটা ঠিক। কেউ কিনবে না সোনা। দেশে ফিরতে হবে—তার জন্য নৌকো কিংবা গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। ভুতোকেও জিনিস বয়ে নৌকোয় যেতে হবে, একা আর কতটুকু নেওয়া যাবে। দিকদারের সঙ্গে পষ্ট একটা ফয়সালা করতে হবে।

সিঁড়ির রেলিঙের ফাঁক দিয়ে রাখাল দেখতে পায়—সুখী আর ময়নাদিদি বলে একজন বুড়ি সোনার গয়নাগুলোকে ঝাড়পোঁছ করছে, তাকের উপর থেকে ঢিবি করে সেগুলোকে মেঝেতে নামিয়েছে, আলো পড়ে সেগুলো জ্বলছে যেন আগুনের পাহাড়! ছোটবেলা থেকে এইরকম সুযোগেরই স্বপ্ন দেখেছে রাখাল। হাত দুটো নিশপিশ করতে থাকে।

রেগে খোঁচা দিলে বলে—হুম্‌।

লাইব্রেরিটা দেখতে প্রকাণ্ড হলেও, একতলায় একটি বিরাট হলঘর, আর দোতলায় আর-একটি, তারপর ছাদের কাছে চারদিক ঘুরে চওড়া বারান্দার মতো, সেখানে সারি সারি আলমারি বই দিয়ে ঠাসা। সেইখানেই পড়ুয়াদের সবচেয়ে বেশি ভিড়, মাঝে মাঝেই বই নিয়ে টানাটানি হতে দেখা যায়। একতলা থেকে তিনতলায় যাবার অসংখ্য সিঁড়ি হাজার হাজার লোকের ওঠানামায় ধুলোয় ধুলোময় হয়ে যায়, সেইগুলোকেই রোজ মুছে সাফ করতে হয়।

সিঁড়িমোছা হল গিয়ে শাস্তির কাজ। লাইব্রেরিতে কেউ কিছু ক্ষতি করলে তাকে এই কাজে লাগানো হয়। তা ছাড়া জনাকতক বারোমেসে কর্মীও আছে। রাখাল সুখীকে জিজ্ঞাসা করলে, কাজে ফাঁকি দিলে কী হয়? সুখী তো অবাক। কাজে ফাঁকি দেবে কী! তাহলে যে দু নম্বর ম্যানেজারবাবু সবার সামনে লাইব্রেরি থেকে বার করে দেবেন।

রাখালের হাসি পেল। ভালোই তো, বার করে দিলে আরও মজা, কাজ করতে হবে না! ময়নাদিদি তার কথা শুনে এমনি চমকে উঠল যে তার হাত থেকে একটা সাতনরি পড়ে গিয়ে তার জোড়া খুলে গেল। সুখী সেটিকে আলাদা করে রেখে দিয়ে বলল—দেখো দিদি, তোমার মেয়াদ আর একদিন বাড়ল।

ময়নাদিদি সে কথা কানে না তুলে, রাখালকে বললে,—কী রকম লোক গা তুমি? কাজ না করবে তো করবেটা কী শুনি? কাগরাও কাজ করে। রাখাল বললে—হ্যাঁ! তাই না আরও কিছু! কাগরা আবার কী কাজ করে? ময়নাদিদির কথায় বোধ হয় কুলিয়ে উঠল না, সে সুখীর দিকে তাকাল। সুখী ঝাড়ন তুলে নিয়ে বললে—কাগদের যা কাজ, ময়লা খেয়ে সাফ করা, বাসা বানানো, বাচ্চা পালা, ইত্যাদি নানারকম কেগো কাজ! নাও, এখন হাত চালাও তো দেখি।

রাখাল আবার সিঁড়ি মুছতে থাকে আর ভাবে, এসব হল বাড়তি কাজ, এতেও এদের উৎসাহ কত! সারাদিন গাছ ছাঁটার কাঁচি চালিয়ে রাখালের হাতে এমনিতেই ব্যথা ধরে গেছে, তার উপর এক মিনিট এ কাজে হাত জিরুলেই কার চোখে পড়ে যাবে এই ভয়! শেষটা সত্যি যদি দু নম্বরের ম্যানেজারবাবু বার করে দেন তবেই তো চিত্তির।

ভুতো দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। সে এখানকার গানের দলে গিয়ে ভিড়েছে। সারাদিন গাছের কাজ করে, সন্ধ্যেবেলায় গানবাজনায় তার সময় মন্দ কাটছে না। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে আর চেনাই যায় না। তার যে এমন গানের গলা তাই বা কে জানত! সেই কথা বলাতে ভুতো একটু বিরক্ত হয়েই বলেছিল, কেন, ছোটবেলা থেকেই তো আমি গান গাই, আমাদের বাড়ির সবাই গান গায়।

রাখাল টিটকিরি দিয়ে বলেছিল—আর তুই চুরি করিস, জেল খাটিস। সেই ইস্তক ভুতো কেমন যেন গুম হয়েই আছে। অবিশ্যি অন্যদের সঙ্গে গালগল্প হাসি ঠাট্টা চলে। গাছের কাজটি ভারি পছন্দ, খুব আনন্দে তার দিন কাটে, যত রাগ শুধু রাখালের উপরে, যে রাখাল তার একমাত্র বন্ধু ও স্যাঙাত; আর শুধু স্যাঙাত কেন, একরকম গুরু বলা বলে। চিরকাল রাখাল মতলব এঁটে এসেছে, ভুতোকে যেমন যেমন বলেছে, সে মুখ বুজে তেমনি করে গেছে। এখনকার এই ভুতো যেন অন্য কেউ।

চারটে থেকে রাত দশটা অনেকখানি সময়, সন্ধ্যে সোয়া সাতটায় আধঘণ্টা টিফিনের ছুটি। তখন লাইব্রেরির ক্যান্টিনেই গরম গরম রুটি তরকারি দুধ খায় সবাই। তারপর আবার পৌনে আটটায় কাজে লেগে যায়। খেতে খেতে রাখাল বলে বসল—এসব খাবার-দাবারের খরচা কে দেয়? সরকার বুঝি?

পাশের লোকটা তো হাঁ! সরকার? সরকার দেবে কেন? কোন্ সরকারের কথা বলছ ভাই? রাখাল তার বুদ্ধি দেখে অবাক—আরে গবরমেট, গবরমেট গো। আমাদের দেশে জেলখানার সব খরচ গবরমেট চালায়। বলে রাখাল খুব হাসতে থাকে, যেন ভারি দেমাক করার বিষয় হল। লোকটা বললে—কী জানি, চিনি নে। কাজ করি খাইদাই, তার বেশি কী জানি, মুখ্যু মানুষ!

রাখাল বললে—কেন, তুমি লিখতে পড়তে জান না?

লোকটা হেসে ফেলল।—আহা, সে আর কে না জানে। আমি বিদ্যের কথা বলছিলাম।

রাখাল জিসগেস করলে—এখানে কি সবাই লেখাপড়া জানে নাকি?

তা জানবে না? ষোলো বছর বয়স অবধি সব্বাইকে যে ইস্কুলে যেতে হয়। তুমি কি—

রাখাল রেগে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, হট্টমালা থেকে আসছি, আমি লিখতে পড়তে জানি না।

লোকটা বললে—আহা! শিখবে নাকি?

রাখাল মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠে পড়ল। বাটিভরা ঘন সুগন্ধ দুধটা মুখে বিস্বাদ লাগছিল।

[ক্রমশ

চৌভাগা বছর

শুধু কলমটার জন্যেই। এই হতভাগা কলমটার জন্যেই আজ শিবুকে দু-দুটো প্রশ্ন ছেড়ে দিতে হল। অথচ সবই তো তার জানা ছিল। ইতিহাস পরীক্ষাটা খারাপ দিয়ে মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শিবু ভাবছে, কলমটা দুদিন ধরেই গোলমাল করছিল! বাবাকে সে বলেওছিল একটা নতুন কলম কিনে দিতে। কিন্তু বাবা বললেন, মাসের এ কটা দিন যাক, তারপর একটা ভালো কলম কিনে দেবেন। কিন্তু আজ তো সবে ২০শে অগস্ট। মাস কাবার হতে আর কতদিন বাকি? অগস্ট মাস কদিনে শেষ হয়? কী যেন একটা ছড়া আছে না! ধ্যেত!—কিছুতেই মনে পড়ছে না। কী যে রাগ হচ্ছে শিবুর! এই কলমটাই যত নষ্টের গোড়া। নইলে সে তো বরাবরই ইতিহাসে ভালো ছিল।

বাড়িতে ঢুকেই শিবু সোজা দাদার পড়ার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

—দাদা, অগস্ট মাস শেষ হতে আর কদিন বাকি আছে?

—কেন রে?

—বলোই না।

—আর এগারো দিন।

—তার মানে অগস্ট মাস একত্রিশ দিনের? সেই ছড়াটাও মনে আসছে না। কোন্ মাস কত দিনের ঠিক করতে গিয়ে এমন মুশকিল হয়!

দাদা বইটা বন্ধ করলেন। চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে একটু হেসে বললেন,—খুব মুশকিল হয়, তাই না? একলা তুমি নয়, এ মুশকিলে কিন্তু অনেকেই পড়ে। আর শুধু কি এই একটা মুশকিল! আরও অনেক মুশকিল আছে।

—আরও?

—হ্যাঁ, যেমন এক-এক মাস এক-এক বারে শুরু এবং শেষ হয়েছে। তুমি ক্যালেণ্ডার না দেখে কিছুতেই বলতে পার না যে জুলাই মাসের পয়লা তারিখ কী বার হবে অথবা সেপ্টেম্বর মাস কী বারে শেষ হবে। তার উপর আবার দেখো—কোনো মাস শেষ হয়েছে ৩১ দিনে, কোন মাস ৩০ দিনে। বেচারা ফেব্রুয়ারির ভাগ্যে তো জুটেছে মোটে ২৮টা দিন। এর জন্য অনেক সময় অর্থনৈতিক ঝামেলায় পড়তে হয়। আরও দেখো—১৯৬৩ সাল শুরু হয়েছিল মঙ্গলবারে, ১৯৬৪ সাল শুরু হল শুক্রবারে। অনিয়মের চূড়ান্ত একেবারে। আবার দেখো—আমরা বলে থাকি ২৮ দিনে এক চান্দ্রমাস অর্থাৎ ২৮ দিনে চাঁদ একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। কিন্তু এই চান্দ্রমাসেও খুঁত আছে। কারণ, ঠিক করে বলতে গেলে অমাবস্যার স্থায়িত্ব ১ দিন নয়, ১॥ দিন।

—বাব্বা! ক্যালেণ্ডার নিয়ে এত গোলমাল?

—হ্যাঁ, আর এই গোলমালের শুরু ক্যালেণ্ডার ব্যবস্থা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই। এই গোলমাল মেটাবার প্রথম চেষ্টা করেন জুলিয়াস সীজার আজ থেকে দু হাজার বছরেরও আগে। কিন্তু তিনি পারেন নি। তারপর চেষ্টা করলেন ইংলণ্ডের এক পাদরি ১৩শ গ্রেগরি। গ্রেগরির ক্যালেণ্ডারই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। কিন্তু তিনিও যে ক্যালেণ্ডারকে নিখুঁত করতে পারেন নি, তা তো বুঝতেই পারছ। গ্রেগরির ক্যালেণ্ডারকে নিখুঁত করার

আরেকবার চেষ্টা করেন ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রসংঘের (লীগ অব নেশন্‌স) প্রায় ৭০টি দেশ মিলে। কিন্তু নানা কারণে তাঁরা কাজ শুরু করতে পারেন নি।

—তাহলে কি এই ক্যালেণ্ডারকে নিখুঁত করার কোনো উপায়ই নেই?

—ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম আমি। উপায় আছে। তা হল চৌভাগা উপায়।

—চৌভাগা?

—মানে, একটা বছরকে অর্থাৎ ১২ মাসকে চার ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতি ভাগে যে তিনটি করে মাস পড়বে, তার প্রথমটি হবে ৩১ দিনের আর অন্য দুটি হবে ৩০ দিনের। আচ্ছা, আর একটু বুঝিয়ে বলছি, বলে শিবুর দাদা কাগজে একটি ছক আঁকলেন :

১ম ভাগ—	জানুয়ারি ৩১	ফেব্রুয়ারি ৩০	মার্চ ৩০
২য় ভাগ—	এপ্রিল ৩১	মে ৩০	জুন ৩০
৩য় ভাগ—	জুলাই ৩১	অগস্ট ৩০	সেপ্টেম্বর ৩০
৪র্থ ভাগ—	অক্টোবর ৩১	নভেম্বর ৩০	ডিসেম্বর ৩০

এইভাবে ভাগ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক ভাগে ৯১ দিন করে পড়ে। অর্থাৎ এক বছরে মোট দিনসংখ্যা হয় ৩৬৪। কিন্তু ৩৬৫ দিনে এক সৌরবৎসর, কাজেই একটা দিন এখনও হিসেবের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এই বাড়তি দিনটাকে অর্থাৎ এই ৩৬৫তম দিনটিকে 'বর্ষশেষদিন' হিসেবে ধরা হবে। অমুক 'বার' বলে এ দিনটির কোনো বিশেষ নাম থাকবে না। দিনটি হবে ৩০শে ডিসেম্বরের পরের দিন। ঠিক একই ভাবে লিপ ইয়ারের অতিরিক্ত দিনটিকেও নামতারিখহীন 'মধ্যগ্রীষ্মদিন' দিন হিসেবে ধরা হবে। এই দিনটি আসবে ৩০শে জুন শনিবারের পরে। এ দুটো দিনই হবে পৃথিবীর সার্বজনীন 'ছুটির দিন'।

শিবু যতই শুনছে ততই অবাক হচ্ছে। শিবুর দাদা বলতে লাগলেন—প্রায়ই দেখা যায়, ছুটির দিনগুলো রবিবারে গিয়ে পড়েছে। এতে কার না রাগ হয়! তাই ব্যবস্থা করা হবে যাতে ধর্মীয় ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলো সোমবার থেকে পড়ে। এতে খাটিয়ে মানুষেরা পর পর দু-তিন দিন ছুটি পেতে পারে।

—এ ক্যালেণ্ডার তুমি বানিয়েছ দাদা? শিবুর বোন রুবি কোন্ ফাঁকে যে এসে দাঁড়িয়েছে তা কেউ টের পায় নি।

—না পাগলী! রুবির গালে আলতো টোকা মেরে দাদা বললেন—এ ক্যালেণ্ডারের পরিকল্পনা করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের (ইউনাটেড নেশন্‌স্) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ক্যালেণ্ডার কমিটি। একটু থেমে আড়ামোড়া ভেঙে শিবুর দাদা বললেন, কিন্তু শিবু, নতুন ক্যালেণ্ডার চালু হলে আমাদের রুবি রানী কিন্তু ভীষণ রেগে যাবে।

—কেন?

—কারণ রুবির জন্মদিন ৩১শে মে। নতুন ক্যালেণ্ডার চালু হলে এই তারিখটাই থাকবে না যে! এই দুই দিনে যাদের জন্ম হয়েছে, তাদের জন্মদিন পালন করা যাবে না। রুবি তখন টফির বাক্স, পুতুলের সেট কোথায় পাবে?

—বাজে ক্যালেণ্ডার। রুবি ঠোঁট উলটে বলল।

—সত্যি, এটা একটা সমস্যা বটে! আচ্ছা, তোমরা ভাবো না এটার একটা ফয়সালা হয় কিনা। তাহলে নিশ্চয়ই একটা পথ বেরোবে।

বাতাবিলেবু-কন্যা

অমিতাকুমারী বসু

এক রাজা আর তাঁর দুই রানী। একই দিনে বড় রানীর হল এক ছেলে, আর ছোট রানীর হল এক বাতাবিলেবু। বড় রানী ছেলে পেয়ে আনন্দে আটখানা, আর ছোটরানী বাতাবিলেবু পেয়ে দুঃখে লজ্জায় মনমরা। ছোটরানী রাগের চোটে বাতাবিলেবুটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু কী জ্বালা, ছোটরানী যতবারই বাতাবিলেবু ছুঁড়ে ফেলেন, ততবারই সেটা ঘুরেফিরে তাঁর পায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়, কিছুতেই আস্তাকুঁড়ে থাকে না। তখন রানী আর কী করেন, ঘরের এক কোনায় বাতাবিলেবুটা রেখে দিলেন।

একদিন বাতাবিলেবুটা গড়াতে গড়াতে চলল নদীর ঘাটে। সেই সময় আর-এক দেশের রাজপুত্র নদীর অপর ঘাটে মাছ ধরছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন একটা বাতাবিলেবু গড়াতে গড়াতে এল, আর তার ভিতর থেকে এক রূপসী কন্যা বেরিয়ে এল। নদীর ঘাট আলো হয়ে উঠল কন্যার রূপে। কন্যা

নদীতে হাতমুখ ধুয়ে স্নান করে উঠল, তারপর তীরে ঘাসের উপর বসে মেঘের মতো একরাশ চুল পিঠে ছড়িয়ে দিল। চুল শুকিয়ে কন্যা আবার লেবুর ভিতরে ঢুকল। লেবুও গড়াতে গড়াতে ফিরে চলল।

রাজপুত্র এই অবাক কাণ্ড দেখে হতভম্ব। কন্যার পরিচয় জানবার জন্যে অস্থির হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে গোসাঘরে খিল দিলেন। রাজারানী উঠিপড়ি করে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'বাবা, দরজা খোলো।' কোনও উত্তর নেই। রানী দরজা ধাক্কা দিতে দিতে বললেন, 'বাবা, দরজা খুলে বাইরে আয়, যা চাইবি তাই দেব।'

তখন রাজপুত্র দরজা খুলে বললেন, 'বাতাবিলেবু-কন্যাকে আমি বিয়ে করব।'

রাজারানী ছেলের কথা শুনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। বাতাবিলেবু-কন্যা আবার কে?

রাজপুত্র বললেন, 'নদীর ঘাটে তার সঙ্গে আমার দেখা। কন্যা রূপে নদীতীর আলো করে বসে ছিল।' এই বলে নদীর ঘাটের সব কথা খুলে বললেন।

রাজারানী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। বাতাবিলেবুর ভিতর কন্যা থাকে, তার সঙ্গে আবার বিয়ে হয়, এমন কথা তো তাঁরা জীবনে শোনেন নি। রানী বললেন, 'বাবা, বাতাবিলেবু-কন্যা নিশ্চয় পরী, মানুষ নয়। ওর সঙ্গে কী করে বিয়ে হবে? আমি তিন দেশ ছেঁকে তোমার জন্যে অপূর্ব রূপসী কন্যা নিয়ে আসব, তুমি লেবুকন্যার কথা মন থেকে দূর করে দাও।'

রাজপুত্র বললেন, 'বাতাবিলেবু-কন্যা ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।' অনেক ভেবে-চিন্তে রাজারানী দেশে দেশে দূত পাঠালেন বাতাবিলেবু-কন্যার খোঁজে। কিন্তু কেউ কন্যার সন্ধান দিতে পারল না। রাজপুত্র হতাশ হয়ে পড়লেন। এবার নিজে দূত পাঠালেন তাঁর নাপিতকে বাতাবিলেবু-কন্যার খোঁজে। নাপিত বর্ণনা মিলিয়ে নদীর অপর পাড়ে সেই রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। তারপর খোঁজ নিয়ে জানল, ওই দেশের ছোটরানীর ঘরে বাতাবিলেবু আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে কোনো কন্যা আছে বলে তো কেউ জানে না।

নাপিত খুশী মনে রাজ্যে ফিরে এসে রাজপুত্রকে খবর জানাল, রাজপুত্র রাজারানীকে খবর দিলেন। তারপর একদিন ধুমধাম করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে বহুমূল্য শাড়ি গয়না উপহার ও রাজপুত্রের তলোয়ার নিয়ে সেনাপতি বাতাবিলেবু-কন্যার রাজ্যে চললেন। সে দেশে পৌঁছে সেনাপতি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার বাতাবি-কন্যার সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছি।'

রাজা তো অবাক। বললেন, 'কই, আমার তো কোনো বাতাবিলেবু-কন্যা নেই, তবে ছোটরানীর ঘরে এক বাতাবিলেবু আছে।'

সেনাপতি আগ্রহ করে বললেন, 'ওই বাতাবিলেবুর সঙ্গেই আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে দিন। তার তলোয়ার প্রতিনিধি করে নিয়ে এসেছি।' রাজা অবাক হয়ে ভাবেন, এ আবার কী কাণ্ড। যাহোক, বাজ্য ভাণ্ড বাজিয়ে রাজপুত্রের তলোয়ারের সঙ্গে বাতাবিলেবুর বিয়ে হল। সেনাপতি তাদের নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন।

রাজারানী দেখলেন, মস্ত বড় এক বাতাবিলেবু, দেখতে বেশ সুন্দর, তাজা আর পুষ্ট, কিন্তু তার

ভিতরে কী করে কন্যা থাকতে পারে কেউ বোঝে না। দিনের পর দিন কাটে—না রাজারানী, না রাজপুত্র : কেউ কন্যার সন্ধান পায় না।

রাজপুত্রের ঘরে হাতির দাঁতের পালঙ্কে মখমলের শয্যায় বাতাবিলেবুকে যত্ন করে রাখা হল। রাজপুত্র রোজই একবার বাতাবিলেবুটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, এদিক দেখেন সেদিক দেখেন, লেবুকে বলেন, 'কন্যা, তুমি যে হও সে হও, লেবুর ভিতর থেকে বের হও, কথা বলো।' কিন্তু কন্যা বেরও হয় না, কথাও বলে না, লেবুও নড়ে না চড়ে না। সেই একই জায়গায় চুপ করে পড়ে থাকে। রাজপুত্রের মন দুঃখে ভরে গেল। রাজ্যের লোকেরা রাজপুত্রের এই পাগলামি দেখে হাসাহাসি করে, রাজারানীর মনেও শান্তি নেই।

রাজপুত্রের জন্য রাত্রে সোনার থালায় পঞ্চ-ভাত-ব্যঞ্জন আসে, রাজপুত্র খানিকটা খান, বাকিটা ঢেকে রেখে দেন। বিছানায় শুতেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। আর সেই সুযোগে লেবুটা গড়াতে গড়াতে নীচে নামে, লেবু-কন্যা বের হয়ে রাজপুত্রের আসনে বসে থালা থেকে ভাত ব্যঞ্জন খেয়ে আবার লেবুর ভিতরে ঢোকেন, লেবুটা তখন গড়াতে গড়াতে খাটের কাছে যায়, এক লাফে খাটে উঠে চুপ করে বসে থাকে। ভোরে উঠে রাজপুত্র দেখেন, সব খাবার শেষ। এক কণাও থালায় অবশিষ্ট নেই। রোজ রাত্রেই এই কাণ্ড ঘটে, রাজপুত্র কিছুই বুঝতে পারেন না। রাত্রে জেগে থেকে দেখবেন কী ব্যাপার—রোজই এ কথা ভাবেন, কিন্তু খাওয়া অর্ধেক হতে না হতেই এত ঘুমে কাতর হন যে আর জেগে থাকা সম্ভব হয় না।

রাজপুত্রের মনের শান্তি আনন্দ নষ্ট হল। রোজ গালে হাত দিয়ে ভাবেন, নিজের চোখে দেখলাম এক কন্যা বাতাবিলেবু থেকে বের হয়ে আবার বাতাবিলেবুতে ঢুকল, আর এখন কেন সে কন্যাকে কোনোরকমেও দেখতে পাই নে।

এক বুড়ি এসে একদিন রাজপুত্রকে বললে, 'বাবা, তোমাকে এত বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন? সেদিন এত ঘটা করে বিয়ে করে বউ আনলে, তা আমাদের সে বউরানী কোথায়?'

তখন রাজপুত্র মনের দুঃখের কারণ খুলে বললেন। বুড়ি বললে, 'মন খারাপ কোরো না। আমি যতদূর জানি এ হচ্ছে পরীদের ছলা-কলা। মানুষ কি কখনও বাতাবিলেবুর ভিতরে বাস করতে পারে? আজ রাতেও তুমি খাবার খেয়ে থালায় অর্ধেক খাবার রেখে দেবে, আর তোমার খাটের বাইরে একটু আগুন জ্বেলে রাখবে। কিন্তু তুমি কিছুতেই ঘুমোবে না। ঘুমোবার ভান করে জেগে থাকবে। মাঝরাত্রে যেই বাতাবিলেবু থেকে কন্যা বের হয়ে খাবার খেতে বসবে, তুমি চট করে লেবুটা আগুনে ফেলে দিও। তা হলে তোমার পরী বউ আর পালাতে পারবে না। এই শিকড় দিচ্ছি, এটা তার মাথার চুলে ঘষে দিও, তাহলে সে মানুষ হয়ে যাবে, আর পরী থাকবে না।' এই বলে বুড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজপুত্র মহাখুশী। পরের রাতে বুড়ির পরামর্শমতো ঘরের বাইরে আগুন জ্বেলে রেখে ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে রইলেন। মাঝ রাতে বাতাবিলেবু-কন্যা বের হয়ে যেই খেতে বসল অমনি রাজপুত্র উঠে লেবুটা আগুনে ফেলে দিলেন। কন্যা 'কর কী, কর কী' বলতে বলতে লেবুটা পুড়ে ছাই

হয়ে গেল। রাজপুত্র কন্যার হাত খপ করে ধরে বললেন, 'কন্যা, তুমি রোজ রোজ পালিয়ে বেড়াও কেন?' এই বলে বুড়ির দেওয়া শিকড়টা তার চুলে ঘষে দিলেন, পরী-কন্যা মানুষ হয়ে গেল। রাজপুত্রের মনে আনন্দ আর ধরে না। পরদিন রাজা রানী ঘুম থেকে উঠে দেখেন কী, তাঁদের ঘর আলো করে বাতাবিলেবু-কন্যা বসে আছে। রাজ্যের লোক আনন্দে ভিড় করে এল রাজপুত্রের অপূর্ব সুন্দরী বউ দেখতে। রাজ্য জুড়ে উৎসব চলল, রাজপুত্র বাতাবিকন্যাকে নিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।
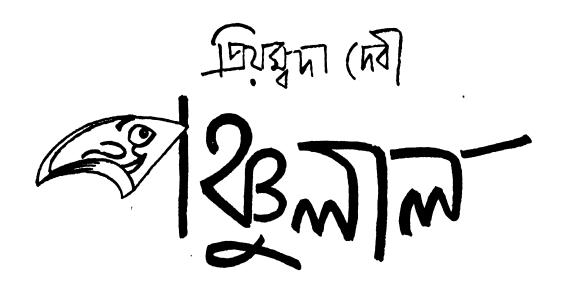
———

মৌমাছি

অভিসার সেনগুপ্ত। ২৬১৪। কলকাতা। বয়স ১১

সবুজ বরন গাছের পাতায়, সোনার রঙের মৌমাছি,
সকালবেলার হালকা রোদে গুনগুনিয়ে যায় নাচি।
পুকুরপাড়ে, গাছের ডালে, কোথাও তার নেই মানা,
পথে চলার ঠিকঠিকানা, নেইকো তাহার নেই জানা।
গুনগুনিয়ে খেলে বেড়ায় ওই যে দূরে যায় চলে,
মিষ্টি হাওয়ায় সন্ধ্যেবেলায় গাছের ডালে ওই দোলে।

দুই বন্ধু

দেবাশিস মিত্র। ১২৩০। মাইথন। বয়স ৮

একটা ইঞ্জিন ছিল। প্রত্যেক দিন সে পথে বেরিয়ে পড়ত। সমুদ্রের ধার দিয়ে শহরের বাজার পর্যন্ত। এমনি করে যাওয়া-আসার পথের দু ধারে তার অনেক বন্ধু হয়েছিল। তাদের মধ্যে তার প্রাণের বন্ধু একটি ছোট্ট বাড়ি।

একদিন গাড়ির পাইলট তাকে বলল, 'তুমি বুড়ো হয়েছ, এখন ছুটি নাও।' শুনে প্রথমে তার খুব আনন্দ হল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, আর তো তাহলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে না। মনে হতেই ইঞ্জিন কেঁদে আকুল হল।

একা-একা ঘরের কোণে বসে মনের দুঃখে তার দিন কাটে। এদিকে অন্য ইঞ্জিনরা সব কাজ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সেই বুড়ো ইঞ্জিনকে আবার কাজে লাগাবার কথা হল। শুনে তার ভীষণ আনন্দ হল। পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

পাগলের মতো গায়ের জোরে সে ছুটল। পিছনে যে অতগুলো গাড়ি আছে, তাদের নিয়ে যেতে হবে, সে কথা ভুলেই গেল। পাইলট তাকে চিৎকার করে থামতে বলল। তখন সে লজ্জা পেয়ে পিছন ফিরে গাড়িগুলোকে নিয়ে এল।

পুরনো বন্ধু বাড়ির সঙ্গে দেখা হওয়ায় সেদিন তার মনে দারুণ ফুর্তি। খুব ভালো কাজ করল সেদিন—আধ ঘণ্টা আগেই কাজ সেরে ফেলল। তাই দেখে তাকে আবার কাজে বহাল করা হল।

বুদ্ধির জোরে

শর্বরী মুখোপাধ্যায়। ২৭৮৮। বরোদা। বয়স ১৫

মায়ের পিসিমার মুখে অনেক ডাকাতের গল্প শুনেছিলাম। তার একটা তোমাদের শোনাই।

এক দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। তার নাম সর্দার। কিন্তু এক সময়ে মায়ের পিসিমার ঠাকুরদার কাছে উপকৃত হয়ে সে ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সংসারে এসে পাঁচজনের একজন হয়ে থেকে যায়।

পিসিমার ছোটোকাকার বিয়ের পর সর্দার পালকি নিয়ে বউ আনতে গেছে। ফেরবার পথে একটা সাঁকের কাছাকাছি আসতেই সর্দার দেখতে পেল সাঁকোর নীচ থেকে ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয়ই একদল ডাকাত ঘাপটি মেরে বসে হুঁকো টানছে। অথচ ওই সাঁকো পার না হলে এগোবার উপায় নেই। এদিকে নতুন বউয়ের গা-ভরা গয়না, সঙ্গে সিন্দুকে গয়না।

বেহারাদের সেইখানেই থামতে বলে সর্দার নিজে এগিয়ে গেল। সে ডাকাতদের সাংকেতিক ভাষায় হাঁক দিতেই তারা বেরিয়ে এসে আদর করে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেল। এই অসময়ে ওই জায়গায় কেন জিজ্ঞাসা করাতে সর্দার বলল, 'ছোটো ছেলেটার বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘরে ফিরছিলাম। তোমাদের দেখে ভাবলাম এক ছিলিম টেনে যাই। তা, আর তো বসতে পারি না ভায়ারা, এখনই গিয়ে আবার বউভাতের আয়োজন করতে হবে। ওরে, ও বেহারাগুলো, ঘুমোচ্ছিস নাকি? চল্ চল্, তোরা এগিয়ে পড়, আমি এই এলুম বলে।' এই বলে সে তাদের নির্বিঘ্নে সাঁকো পার করিয়ে যখন বুঝল যে আর বিপদ নেই, তখন সে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলল।

রাজগীরে

সুমিত মজুমদার। ২৫৭৭। কলকাতা। বয়স ৮

অনেক দিন ধরে মার কাছে শুনছিলাম আমরা কোথাও বেড়াতে যাব। শেষ পর্যন্ত রাজগীর যাওয়া ঠিক হল। হাওড়া থেকে রাত্রে গাড়ি ছাড়ল, পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ রাজগীর পৌঁছলাম।

রাজগীর এক দেখবার মতো জায়গা। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সবাই বলে তাতে স্নান করলে শরীর ভালো হয়। সেখানে আমি রোজ স্নান করতাম।

রাজগীরের দুটো ভাগ। একটা হল পুরনো রাজগৃহ—সেখানে রাজা বিম্বিসারের রাজধানী ছিল। নতুন রাজগৃহে ছিল তাঁর ছেলে অজাতশত্রুর রাজধানী।

ওখানে বৈভার বলে একটা পাহাড় আছে। আর-একটা পাহাড় আছে—খুব উঁচু। তার নাম বিপুলাচল।

রাজগীরের পাশেই নালন্দা। সেখানে দেখলাম বিরাট ইস্কুল আর ছাত্রদের থাকবার বাড়ি। কত ছেলে সেখানে থাকত জান? দশ হাজার। তাদের শোবার জায়গা, পড়বার জায়গা—সব দেখলাম। মিউজিয়মও দেখলাম।

পর দিন গেলাম গৃধ্রকূট পাহাড়ে। খুব উঁচু নয় পাহাড়টা। আমরা চূড়ায় উঠে ঘোরাঘুরি করলাম, অনেক কিছু দেখলাম। বুদ্ধদেব যেখানে থাকতেন সে জায়গাটাও দেখলাম। বাগানটা দেখলাম—কী সুন্দর! আর-একটা জায়গা আছে, সেখানে জরাসন্ধের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়েছিল; তাও দেখলাম। সব দেখেশুনে বাসে করে গয়া রওনা হলাম।

নীচে একটা চিঠি ছেপে দিলাম। ওই চিঠির ভিতরেই আর-একটা গোপন চিঠি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেটা অবশ্য আসল চিঠির চেয়ে একটু ছোট। গোপন চিঠিটাকে কে কে প্রকাশ করতে পার দেখো তো।

যদি কলকাতায় যাও, ভালো দিন দেখে যাত্রা কোরো। লোকমুখে শুনতে পেলাম, তোমার ইচ্ছা বিশু কলকাতায় থাকে এবং পড়ে।

আজ শুনলাম, গত রাত্রে নাকি হরিশ গোসাঁইদের নতুন দালান বাড়িতে আগুন লেগেছিল। নিশ্চয় জানবার জন্য উপস্থিত হতেই গোসাঁইজী 'হবে সর্বনাশ' বলে গান ধরলেন। তারপর খুব খানিক কেঁদে 'ভালো মন্দ যা হবার হবেই' এই কথা বলে সকলকে নিজে সান্ত্বনা দিলেন। 'গোবিন্দ-চরণে আজি দাস বিকাইল' এই গানের সঙ্গে এক দল লোক মৃদঙ্গ নিয়ে কীর্তন ধরল। উপস্থিত লোকেদের মুখে শুনলাম, গোসাঁইজীর নাকি খুব লোকসান হয়েছে। ভিড় কমতে দেরি হবে মনে হল—সুতরাং একটু দেখেই শীগগির চলে এলাম। আসতে আসতে ভাবলাম, পারলে দুপুরে গিয়ে ভালো করে দেখব।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

জিলিপি; গজা; বড়া; ছানা; সর; চিনি; খাজা; পুলি; লুচি; দরবেশ।

এ মাসের ধাঁধার উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ১৫ই মে।

কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে

উত্তর

ক। ১৯৪১ জানুয়ারি—সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ; ১৯৪১ অগস্ট—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু; ১৯৪২ অগস্ট—অগস্ট আন্দোলন।

খ। ১৬২৭-১৬৫৮ শাহজাহানের শাসনকাল; ১৪৯২—কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার; ১৪৯৮—ভাস্কো দা গামার ভারত আগমন।

গ। ১৯৪৫—জাপানে অ্যাটম বোমা; ১৯৪৭—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা; ১৯৪৯—চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

ঘ। ১৬৯০—কলকাতার পত্তন; ১৭১৭—বাঙলার রাজধানী কলকাতায়; ১৭৪২—বর্গীর উৎপাত শুরু।

ঙ। ১৯১৩—রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ লাভ; ১৯২১—অসহযোগ আন্দোলন; ১৯২৫—দেশবন্ধুর মৃত্যু।

হাওয়ার চাইতে দ্রুত
চলে আজ হাওয়া গাড়ি ;
ছাড়িয়ে শব্দের গতি
ওড়ে প্লেন তাড়াতাড়ি ;
উল্কার চেয়ে বেগে
রকেট ছুটেছে জোর ;
আরো বেশি দ্রুত ছোটে
"পক্ষীরাজ" ঘোড়া মোর !

৩য় বর্ষ। ১১শ সংখ্যা মার্চ ১৯৬৪। ফাল্গুন ১৩৭০

নতুন বছর

সুরুচি সেনগুপ্ত

খোকা ডেকে সুধায় মাকে,
নতুন বছর বলছ কাকে ?
ভোরে উঠে দেখি আকাশ সেই রকমই নীল,
তেমনি বসে গাছের আগায় ডাকছে শঙ্খচিল।
তেমনি অরুণ রাঙা-রাঙা,
আকাশে মেঘ ভাঙা-ভাঙা,
তবে কেন বলছ সবাই নতুন বছর এল ?
পুরোনো সে বছরটা মা, কোন্ পথেতে গেল ?

রোদও তো সোনালি রং, যেমন ছিল আগে,
আগের মতোই দুচোখ খুলে তেমনি সবাই জাগে।
হাই তুলছে, দিচ্ছে হাঁচি,
ভনভনিয়ে উড়ছে মাছি
নতুন কোথায় ? করছ ঘরের সেই পুরোনো কাজ।
তবে কেন বলছ সবাই নতুন বছর আজ।

গোরু দেখি তেমনি আছে, দুধ তেমনি সাদাই,
ছাগল তেমনি ছাগল আছে, গাধা তেমনি গাধাই।
ফেরিওলা যাচ্ছে হেঁকে,
ভিখিরী যায় ভিক্ষে মেগে,
টেলিফোনটা করছে কেন টুন্‌টুন্‌ টুন্‌টুন্‌ ?
তেমনি করে পানে কেন দিচ্ছ খয়ের চুন ?

খুকু তো মা তেমনি কাঁদে ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে।
মিষ্টি চিনি, তেঁতুল টক দেখেছি মা খেয়ে।
ফুল তেমনি ফুটছে ঠিক—
পাখি ডাকছে চিকির, চিক—
মাঠে মাঠে ধানের শীষ তেমনি খায় দোল—
নতুন বলে কোথাও কিছু দেখছি না তো গোল।

নয়া পয়সা নিয়ে দেখি ঝামেলার শেষ নেই,
ট্রামে বাসে মারামারি করছে সকলেই
নেই কো আনি, নেই দু আনি,
তাই নিয়ে যে কী হয়রানি—
নয়া বছর তেমনি যদি আসত নয়া বেশে,
দিন রাতও বদলে যেত চিনতাম না শেষে।

যার খুশি সে হোকগে নতুন, তুমি হোয়ো না কো
পুরোনো মা তুমি আমার সেই পুরোনোই থাকো।
তুমি যদি হও মা নয়া,
কঠিন হবে চিনে নেওয়া—
নতুন মা চাইনে আমি পুরোনো মা ফেলে,
আমিও মা আছি তোমার সেই পুরোনো ছেলে।

জরৎকারুর কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

[ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পর]

তখন আস্তীকের মাতা তাঁহাকে কদ্রুর শাপের কথা, আর জনমেজয়ের যজ্ঞের কথা, আর তাঁহাদ্বারা যে সেই যজ্ঞ বারণ হইবে সেই কথা, আগাগোড়া শুনাইলেন। তাহা শুনিয়া আস্তীক বাসুকির নিকটে গিয়া বলিলেন, 'মামা, আপনি আর দুঃখ করিবেন না। এই আমি চলিলাম—যেমন করিয়াই হয়, সে যজ্ঞ আমি বারণ করিয়া আসিব, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'

এই বলিয়া আস্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় বড় মুনি-ঋষিতে সে যজ্ঞস্থান পরিপূর্ণ ছিল, আর তাহার দরজায় যমদূতের মতন সিপাহীসকল ঢাল তলোয়ার হাতে পাহারা দিতেছিল। বালক আস্তীককে দেখিয়াই তাহারা ধমক দিয়া বলিল, 'এইয়ো! কোথায় যাইতেছ ?'

আস্তীক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিলেন, 'তোমাদের জয় হউক, দরোয়ানজী! যজ্ঞটি যেমন জমকালো, তোমরা তাহার উপযুক্ত দরোয়ান। এমন সুন্দর যজ্ঞ কেহ দেখে নাই, এমন ভালো দরোয়ানও আর কোথাও নাই! তোমাদের দয়া হইলে, আমি একটু তামাসা দেখিয়া আসি।'

প্রশংসা শুনিয়া দরোয়ানেরা বড়ই খুশী হইল। তারপর তাহারা আস্তীককে ঢুকিতে দিতে আপত্তি করিল না।

ভিতরে গিয়া আস্তীক জনমেজয়কে বলিতে লাগিলেন, 'হে মহারাজ! আপনি এমন সুন্দর যজ্ঞ করিতেছেন যে, কী বলিব! মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক। প্রাচীন কালের অতি প্রসিদ্ধ রাজা আর মুনিঋষিগণ যে সকল মহা মহা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও তেমনি হইয়াছে। মহারাজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক। কত বড় বড় মুনিগণ আপনার যজ্ঞে কাজ করিতেছেন। ইঁহারা যে কত বড় বড় পণ্ডিত, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আর আপনি যে কিরূপ ধার্মিক রাজা, তাহা মনে করিলে বড়ই সুখ হয়।'

নিজের প্রশংসা শুনিলে, দেবতার মনও খুশী হয়। আর সেই প্রশংসা যদি আস্তীকের ন্যায় অপরূপ সুন্দর একটি বালকের সুমিষ্ট কথায় হয়, তবে তাহার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং জনমেজয় বলিলেন, 'হে মুনিগণ, আপনাদের কী অনুমতি হয়? আমার তো ইচ্ছা হইতেছে যে, এই সুন্দর বালকটি যাহা চায়, তাহা তাহাকে দিয়া দিই।'

মুনিরা বলিলেন, 'তক্ষক বিনা ইনি আর যাহা চাহেন, তাহাই পাইতে পারেন।'

তখন রাজা আস্তীককে বর দিতে গেলে, প্রধান মুনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, তক্ষক কিন্তু এখনও আসিল না।'

তাহাতে জনমেজয় বলিলেন, 'আপনারা তক্ষককে শীঘ্র উপস্থিত করিবার চেষ্টা করুন।'

তখন, সেই লালচোখওয়ালা লোকটি—যে বলিয়াছিল যে, 'এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে বাধা দিবে'—বলিল, 'মহারাজ, তক্ষক ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাই তাহাকে সহজে আনা যাইতেছে না।'

মুনিরাও বলিলেন যে, 'হাঁ, এ কথা ঠিক।'

ইহাতে প্রধান মুনি ইন্দ্রের পূজা আরম্ভ করিলেন। তখন আর ইন্দ্র চুপ করিয়া স্বর্গে বসিয়া থাকিবেন কিরূপে? তাঁহাকে পূজার স্থানে যাত্রা করিতেই হইল। তক্ষক দেখিল, মহা বিপদ! ইন্দ্রকে ছাড়িয়া যাইতেও ভরসা হয় না, তাঁহার সঙ্গে যাইতেও সাহস হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ইন্দ্রের চাদরের ভিতরে লুকাইয়া রহিল।

এ দিকে রাজা জনমেজয় দেখিলেন যে, ইন্দ্রের আশ্রয় পাইয়া তক্ষক তাঁহাকে ফাঁকি দিতেছে। সুতরাং তিনি ক্রোধভরে মুনিদিগকে বলিলেন যে, 'যদি ইন্দ্র তক্ষককে লুকাইয়া রাখেন, তবে তাঁহাকে সুদ্ধই দুষ্টকে পোড়াইয়া মারুন।'

রাজার কথায় মুনিগণ তক্ষকের নাম লইয়া অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র, ইন্দ্রকে সুদ্ধই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আকাশের ভিতর দিয়া আসিয়া দেখা দিল। তখন ইন্দ্র প্রাণের ভয়ে তক্ষককে ছাড়িয়া ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিল, তক্ষক ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে যজ্ঞের আগুনের কাছে আসিতে লাগিল। তাগাতে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আর চিন্তা নাই। ঐ দেখুন, তক্ষক চেঁচাইতে চেঁচাইতে এ দিকে আসিতেছে! এখন বালকটিকে বর দিতে পারেন।'

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণকুমার, এখন তুমি যাহা চাহ, তাহাই দিব। বলো, তোমার কী বর চাই?'

আস্তীক বলিলেন, 'আমি এই বর চাহি যে, আপনার যজ্ঞ থামিয়া যাউক। আর যেন ইহার আগুনে পুড়িয়া সাপেদের মৃত্যু না হয়।'

এ কথা শুনিয়াই তো রাজা চমকিয়া উঠিলেন! তাঁহাকে যদি হঠাৎ তক্ষকে কামড়াইত, তবুও বোধহয় তিনি এত চমকিয়া উঠিতেন না। তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'সেও কি হয়? ঠাকুর, আপনি আর কিছু প্রার্থনা করুন। টাকাকড়ি যত আপনার ইচ্ছা হয়, আমি আপনাকে দিতেছি, কিন্তু যজ্ঞ থামাইতে পারিব না।'

আস্তীক বলিলেন, 'আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাইলাম, তবে টাকাকড়ি দিয়া কী করিব? আমি আমার মাতুলদিগকে বাঁচাইতে আসিয়াছি, টাকার জন্য আসি নাই।'

তখন মুনিগণ বলিলেন, 'মহারাজ যখন দিবেন বলিয়াছেন, তখন এই বালক যাহা চাহিতেছেন, তাহা ইঁহাকে দিতেই হইতেছে।'

এদিকে তক্ষক আগুনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর এক মুহূর্ত পরেই পুড়িয়া

মারা যাইবে। ইহা দেখিয়া, আস্তীক চিৎকার করিয়া তিনবার তাঁহাকে বলিলেন, 'তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ!' (থামো! থামো! থামো!) তাহাতেই তক্ষক আর আগুনে না পড়িয়া, কিছুকাল শূন্যে থামিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে ব্রাহ্মণদিগের কথায়, জনমেজয় আস্তীককে বর দিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে যজ্ঞ থামুক! সর্পগণের ভয় দূর হউক!'

এ কথায় তখনই যজ্ঞ থামিয়া গেল, তক্ষকেরও আর পুড়িয়া মরিতে হইল না। যাহারা যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে কোলাহল করিতে লাগিল। এইরূপে আস্তীক তাঁহার মাতুলদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

আস্তীকের এই কার্যে সাপেরা প্রাণে বাঁচিয়া গেল। সুতরাং তাহারা যে সন্তুষ্ট হইল, এ কথা বলাই বাহুল্য। তাহারা বার বার বলিতে লাগিল, 'বাছা, তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছ; বলো, আমরা কী করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিব?'

আস্তীক বলিলেন, 'আপনারা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে, আমার নাম যে লইবে, আপনারা আর তাহাকে হিংসা করিবেন না।'

সাপেরা বলিল, 'এখন হইতে, যে তোমার নাম লইবে, আমরা তাহার কোনো অনিষ্ট করিব না। এ কথা যে অমান্য করিবে, তাহার মাথা শিমুলের কলার মতো ফাটিয়া যাইবে।'

॥ সমাপ্ত ॥

অধ্যবসায়ের পুরস্কার

শশাঙ্কজীবন চক্রবর্তী

বছর পনেরো বয়সের ছেলে,
কাগজ ছাপায় হাতে ;
তাও বা কোথায় ? পরিত্যক্ত
রেলের কামরাটাতে।
সেই কাগজের মূল্য বাবদ,
সামান্য যা সে পায়
বেশী ভাগ তার ব্যয় করে ফেলে,
সংসার খরচায়।
উদ্‌বৃত্ত যা ক্ষুদ-কুঁড়া থাকে,
তাই দিয়ে কিনে আনে,
এটা ওটা সেটা,—যা যা দরকার,
যা যা ভালো লাগে প্রাণে !

সে সব জিনিস বহু বিচিত্র,
বিবিধ যন্ত্রপাতি।
কল-কব্জা ও ওষুধ আরক,
বইখাতা ইত্যাদি।
সব জড়ো করে পরিত্যক্ত
রেলের কামরাটাতে,
নাড়া-চাড়া করে সেসব জিনিস,
বিনিদ্র সারা রাতে !
পুঁথি পড়ে : বাড়ে জ্ঞান রসায়নে
পদার্থবিদ্যায়,
দিনে কাজ করে, রাত জেগে পড়ে ;
এইভাবে দিন যায় !

দিন যায়—যায় রাত্রিও : ফিরে
আসেও আরেক দিন।
কিশোর বালক নিজের লক্ষ্যে,
চলেছে ক্লান্তিহীন !
কেউ জানে না তো—কী সাধনা তার,
কী যে সে ঘটাতে চায়,
জানে না কিসের পরীক্ষাগার
রেলের কামরাটায় !
অলক্ষ্যে বসে সে শুধু নিজের
সাথে নিজে খেলা করে,
নাড়ে চাড়ে তার সব সম্ভার,
কত ভাঙে—কত গড়ে !
একটিমাত্র আশা জাগে সেই
ক্ষুদ্র হৃদয়ে তার,
দিতে চায় দান,—এই পৃথিবীরে,
বিজ্ঞানসম্ভার !
স্বপ্ন দেখে সে ঘুমে জাগরণে—
সে যেন বৈজ্ঞানিক,
তার সৃষ্টিতে প্লাবিত হয়েছে,
বিশ্বের চারিদিক !

হঠাৎ কী হল একদিন,— শোনো,
করুণ সে বিবরণ,
রেলের কামরাটিতে হল এক,
বিষম বিস্ফোরণ !
কী করে হঠাৎ কিশোর ছেলের
হাত থেকে পড়ে গিয়ে
দাহ্য দ্রব্য সহসা আসল,
বিষম বিপদ নিয়ে !

জ্বলে গেল সেই ট্রেনের কামরা,
সব কিছু হল ছাই,
বই-খাতা আর কলকজ্বাও !
নাই—না-ই,—কিছু নাই !!

ভস্মগুলির পানে চেয়ে ফেলে,
কিশোর দীর্ঘশ্বাস,
মনে হল যেন—হয়ে গেছে তার,
দারুণ সর্বনাশ !

এ দুর্যোগের জের আরো ছিল,
এখানেই শেষ নয়,
মানুষের হাতে সে কিশোরটিও
বহু লাঞ্ছনা সয় !
কেউ দিল গালি—গায়ে হাত দিয়ে
কেউ-বা মিটাল জ্বালা।
কানে ঘুঁষি খেয়ে কিশোরটি হল
জন্মের মতো কালা !
তবু তার মন নেই কোনো দিকে,
সে শুধু তাকায় ফিরে,
বারে বারে দেখে—দগ্ধাবশেষ
ট্রেনের কামরাটিরে !
কোনোখানে ঠাঁই না পেয়ে,—গোপনে,
গড়েছিল আশা লয়ে,—
সাধনার তরে মন্দিরটুকু :
তা-ও গেল শেষ হয়ে !

তবু সে কিশোর—হারে নি জীবনে,
জয় হয়েছিল তার,
কত সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত,
হয়েছে সে কতবার !
সব প্রতিকূল বাধা দূর করে,
লক্ষ্যটি ঠিক রেখে,
কত দিন তার—কেটেছে দুঃখে,
ক-ত রাত গেছে জেগে !!

তারপরে—তার জীবনে এসেছে,
সফলতা শুভদিন,
জয়ের মাল্য হয়েছিল ঠিকই,
তার আয়ত্তাধীন,
পৃথিবীর বুকে,—লোকমুখেমুখে,
ধ্বনিত হয়েছে নাম
কিশোর ছেলের—পূর্ণ হয়েছে
সুদৃঢ় মনস্কাম !
সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে
তার সাধনার ধন,
কে সেই কিশোর জান কি তোমরা ?
সে টমাস এডিসন।

টিপাটিপির কথা

রমলা কর

(ওড়িআ রূপকথা)

এক দেশে 'টিপা' আর 'টিপি' বলে দুটি ভাইবোন ছিল। তাদের বাবা, মা, কাকা, পিসি—কেউ ছিলেন না। ছোট্ট দুটি ছেলে মেয়ে, তারা রোজগার করবে কোত্থেকে? কিন্তু তাদের ব্যবহার এত সুন্দর ছিল যে গ্রামের সবাই তাদের বড্ড ভালবাসত। রোজ কেউ না কেউ তাদের ডেকে খেতে দিত। এমনি করে কোনও রকমে তাদের দিন কেটে যেত।

একদিন হয়েছে কি, টিপার বড় 'মণ্ডা পিঠা' (পুলি পিঠে) খেতে সাধ গেছে। টিপা সে কথা টিপিকে বলল। টিপি টিপার কথা শুনে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর টিপাকে বলল, 'পিঠে খাবি? বেশ তো, ভালো কথা। তবে, সব যোগাড় তো আগে চাই! চল্, দুজনে মিলে দোকান থেকে পিঠের জিনিস সব চেয়ে আনি।' অনেক ঘুরে তারা গুড়, নারকেল, চালের গুঁড়ি, আর যা যা লাগে পিঠেতে, সব যোগাড় করে ফেলল। বাকি রইল শুধু কাঠ। সেখানে কাঠ দোকানে বিক্রি হয় না। কাছেই জঙ্গল, যে যার দরকারমত কাঠ সেখানে গিয়ে কেটে আনে।

টিপাটিপি আর কী করে? পিঠে তো খেতে হবে! তারা দুজনে একটা কুড়ুল নিয়ে বনে গেল কাঠ কাটতে। কাঠ কাটা কি সোজা কথা? বড় মানুষই হিমসিম খেয়ে যায়, আর এরা তো ছেলেমানুষ! টিপা একটুখানি কাঠ কাটে, আর বসে হাঁফায়। আবার টিপি গিয়ে কুড়ুল দিয়ে দু ঘা মেরে জিভ বের করে বসে পড়ে। কাঠ কাটা আর এগোয় না! শেষে তারা ঠিক করলে যে গান গেয়ে কাঠ কাটলে কষ্টটা আর বেশি বোঝা যাবে না। দুজনে মিলে একটা গান ঠিক করলে—

বাঘ মামু, ঠো ঠা,
দুখানা কাঠ দিয়ে যা।

এখন হয়েছে কি, পাশেই ঝোপের ধারে যে বাঘ মামু শুয়ে আছে, সেটা তারা দেখতে পায় নি। ঘুমের মাঝে হঠাৎ নিজের নাম কানে যাওয়ায় বাঘমামু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল: 'কে রে! কে আমার নাম ধরে গান করছে রে!! কার এত সাহস! দেখি তো তাকে একবার!' টিপা টিপি আর কাঠ কাটবে কি, নিজেরাই ভয়ে একেবারে কাঠ।

টিপা একে পুরুষ মানুষ, তার টিপির চেয়ে বড়, সে সাহস করে এগিয়ে এসে বাঘকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, 'মামু! আমাদের চিনতে পারছ না? আমরা যে তোমার ভাগ্নে ভাগ্নী টিপা আর টিপি। আজ আমাদের বাড়ি পিঠে তৈরী হবে, তোমাকে নেমন্তন্ন করতে করতে এসেছি যে! আজ রাতে আমাদের বাড়ি তোমার পিঠে খাওয়ার নেমন্তন্ন রইল।'

বাঘ তো একে পেটুক, তায় পিঠে খাওয়ার সুযোগ তো আর তার ভাগ্যে জোটে না। সে উৎসাহের চোটে সামনের দুই পা দিয়ে টিপা আর টিপিকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাগ্নে আর ভাগ্নী, তোরা নিজেরা এসেছিস আমাকে নেমন্তন্ন করতে আর আমি যাব না, এও কি একটা কথা? আমি রাতে নিশ্চয়ই যাব। তবে ··যাই এখন, কাঁচা ঘুম ভেঙে গিয়ে মাথাটা বড্ড ধরেছে, আর কোথাও গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিই।' এই বলে বাঘ চলে গেল।

বাঘের কবল থেকে ছাড়া পেয়ে টিপা-টিপির ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। বাঘের মুখের পচা গন্ধে তাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি উলটে আসার যোগাড়। টিপি তো আর একটু হলে বমিই করে ফেলত!

কাঠ নিয়ে দুই ভাইবোন বাড়ি ফিরল, কিন্তু দুজনেরই মুখ শুকিয়ে চুন। দুজনেরই মনে এক চিন্তা—'কী করে বাঘের হাত এড়ানো যায়।' দুষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে একদিন না একদিন বিপদ হতে পারে—এ কথা তারা জানত। এখন থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

ভেবে ভেবে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। তখন টিপা বলল, 'টিপি লো, আগে পিঠে কর্, খাই, পরে আবার ভাবা যাবে। খালি পেটে মাথায় বুদ্ধি আসে কখনও?' টিপি যত্ন করে পিঠে তৈরী করল, তারপরে দুই ভাইবোন খেতে বসল। পিঠে খেতে এতই সুন্দর হয়েছিল যে তারা বাঘের কথা বিলকুল ভুলে গেল।

খাওয়া শেষ হলে টিপা টিপিকে বললে বাঘের জন্য পিঠে রেখে দিতে। কিন্তু সর্বনাশ! পিঠে আর কই? খেতে খেতে দুজনে সব পিঠেই খেয়ে ফেলেছে। এখন উপায়! বাঘ তো এসে পড়ল বলে—পিঠে না পেলে সে কি রক্ষে রাখবে!

কিন্তু ভাববার আর সময় রইল না—দূরে বাঘের গর্জন শোনা গেল। সে গর্জনে টিপা-টিপির গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। ক্রমশ বাঘ কাছে আসায় তারা শুনল যে বাঘ তার হেঁড়ে গলায় গাইছে—

আজ কী মজার দিন!
টিপা টিপি পিঠে করেছে,
(খেয়ে) নাচব তা ধিন্ ধিন্।

বাঘের এই গান শুনে ভয়ে টিপি অজ্ঞানের মতো মাটিতে পড়ে গেল। ঘরের এক কোণে একটা ঘুমা (বড় জালা) ছিল। টিপা চট করে টিপিকে টেনে নিয়ে সেই ঘুমার মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরজা খোলাই রয়ে গেল। পরক্ষণেই বাঘ ঘরে ঢুকতে এসে পিঠের লোভে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু কোথায় বা পিঠে! কোথায় বা কী! পিঠে না পেয়ে বাঘ টিপা-টিপিকে খুঁজল, তাদের নাম ধরে চেঁচিয়ে কত ডাকল। কিন্তু কে তার ডাকে সাড়া দেবে? টিপা টিপি তো তখন ঘুমার মধ্যে অজ্ঞানের মতো পড়ে রয়েছে!

এ দিক ও দিক তাকাতে তাকাতে ঘুমাটা চোখে পড়তেই বাঘ বলে উঠল—'বুঝেছি, বুঝেছি। টিপাটিপি বোধহয় কোনও কাজে বেরিয়ে গেছে। তাই ঘুমার মধ্যে আমার জন্য পিঠে রেখে গেছে।

আবার পাছে আমি ফিরে যাই, দরজাটাও তাই খুলে রেখে গেছে। সাবাস টিপাটিপি, ভারি বুদ্ধি তাদের।' এই বলে সে এক হ্যাঁচকায় অত বড় ঘুমাটা ঘাড়ের ওপর তুলে নিল।

ঘুমা পিঠে নিয়ে বাঘ চলেছে তো চলেই-ছে। এতক্ষণে কিন্তু টিপাটিপির ভয় ভেঙে গিয়ে ক্রমে তাদের সাহস ফিরে আসছে। যখন তারা বুঝতে পারল যে বাঘ কী ভয়ানক ভুল করেছে, তখন তাদের বড্ড হাসি পেল। টিপা টিপিকে সাবধান করে দিল, পাছে সে হেসে ফেলে। টিপিও টিপাকে ফিস ফিস করে বারণ করে দিল হাসতে। কিন্তু যতই সাবধান করুক, ছেলেমানুষ তো তারা! শেষকালে দুজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে হেসে উঠল। ঘুমার মধ্যে সেই চিৎকারের হাসি কী রকম একটা বিকট গর্জনের মতো শোনাল।

বাঘ তো এ ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। পিঠে খাওয়ার আনন্দ কল্পনা করতে করতে বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ এই বিকট শব্দে চমকে উঠে ঘাড়ের ওপর থেকে ঘুমা ফেলে দিয়ে বাঘ চোঁ চোঁ দৌড় দিল তার বাসার দিকে। ঘুমার মধ্যে কী ছিল, সেটা দেখবার মতো সাহসও তার রইল না।

ঘুমা ভেঙে টিপা টিপি তো বেরিয়ে পড়ল বাইরে। রাত তখন অনেক। আকাশে চাঁদ। সেই আলোয় দুজনে একটা খুব বড় গাছের ওপর উঠে বসল। টিপা বলল, 'টিপি লো, কাপড় দিয়ে নিজেকে গাছের ডালের সঙ্গে ভালো করে বেঁধে নে, না হলে ঘুম এলে একেবারে নীচে পড়ে যাবি। দেখছিস তো, এরই মধ্যে আমাদের গন্ধে কত জন্তু নীচে ঘুর ঘুর করছে! একবার পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।' টিপা টিপি দুজনেই শক্ত করে ডালের সঙ্গে নিজেদের বাঁধলে, তারপর সেই অবস্থাতেই রাতটা কাটিয়ে দিলে।

ক্রমে সকাল হল। সূর্য উঠল। বনের জীবজন্তু যে যার বাসার দিকে চলে গেল। টিপা টিপিও নিজেদের বাঁধন খুলে গাছ থেকে নেমে পড়ল। বনের মধ্যে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করবার পর তারা বাড়ি যাওয়ার পথ পেয়ে বাড়িতে ফিরে এল।

আর কখনও তারা বনে কাঠ কাটতে যায় নি। টিপা ক্রমে বড় হল। রোজগার করতে শিখল। গ্রামেরও অনেক অদলবদল হল। কাঠ বিক্রির জন্য দোকান হল। তার পর থেকে তারা যখনই পিঠে করত, দোকান থেকে কাঠ কিনে আনত। কিন্তু প্রথমবারের সেই পিঠে তৈরীর আর বাঘমামুর পিঠে খাওয়ার কথা তারা কখনও ভোলে নি। যখনই পিঠে খেত, দুজনে সেই গল্প করে হেসে হেসে লুটিয়ে পড়ত।

হট্টমালার দেশে

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার

কাজ সেরে আস্তানায় পৌঁছতে রোজ সাড়ে দশটা বেজে যায়, ভুতোদের গানের মজলিশও সেই সময় ভাঙে। পাশাপাশি মাদুর পেতে বালিশ মাথায় শোয় দুজনে, তবু আসল কথাটা বলা হয় না। ভুতো শোবামাত্র নাক ডাকতে থাকে, বোধ হয় কথা বলবার ইচ্ছাই নেই তার। রাখালও ছাড়ে না; চার দিনের মধ্যে দুদিন এমনিতেই কেটে গেছে, তবে কাজ যে কিছুই এগোয় নি তাও বলা যায় না; সমস্ত আটঘাট বেঁধে মতলব পাকা হয়ে গেছে, এখন শুধু কাজে লাগানোটুকু বাকি। ভুতোকে লাইব্রেরির মধ্যে না ঢোকানোই ভালো মনে হল, কোথা থেকে কার কাছে কী বলে বসবে কে জানে! তার চেয়ে সে খিড়কির বাইরে অপেক্ষা করুক, তার হাতে একটা পোঁটলা পাচার করে দিয়ে, অন্যটি নিজের কাঁধে তুলে একেবারে নদীর ঘাটে। সেখানে নৌকো থাকা চাই। দিকদারের কাজ রাখাল করে দেবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বদলে দিকদারকেও এটুকু করতেই হবে। রাখালের সঙ্গে তার দেখাই হয় না, কাজেই তাগাদাও দেওয়া যায় না, ওদিকে রোজই ভুতোর সঙ্গে তার নানান কাজের কথা হয়। ভুতোর কাজ দেখে সে নাকি খুব খুশী, খুব নাকি সুখ্যাতি করে, অথচ ভুতো তাকে দেশে যাবার কথাটা কিছুতেই মনে করিয়ে দিচ্ছে না।

আর সময় নেই; যা করবার এখুনি করতে হবে। রাখাল ভুতোর কোঁকে দারুণ এক গুঁতো দিয়ে বললে—'পরশু দেশের দিকে রওনা হব। নৌকোর কী করলে?'

ভুতো পিঠ ফিরে শুয়ে বলল—'সে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।'

ঘুম পাচ্ছে? ঘুম পাচ্ছে আবার কী? এই কি ঘুম পাবার সময় নাকি? জীবনে হয়তো আর কখনো বড়লোক হয়ে যাবার এমন সুবিধে হবে না, আর ভুতোর কি না ঘুম পাচ্ছে! হতভাগা জন্মে কখনো একটা ভালো জামা গায়ে দিল না, পেট ভরে ভালোমন্দ অন্তত এখানে আসবার আগে কখনো খেল না, সারা জীবন কেবল গালমন্দ শুনেই কাটাল, আর এখন যদি বা বড়লোক হবার একটা সুযোগ হল ব্যাটার, কি না ঘুম পাচ্ছে! রাগে রাখালের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

কান ধরে টেনে ভুতোকে একবারে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'কথাটা কানে গেল, নাকি অমনি অমনি বলছিস যে নৌকোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে? কাল অবধি তো হয় নি। দিকদারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?' ভুতো কানের গোড়ায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল—"তার সঙ্গে কী করে দেখা হবে? তার পেছনে ফেউ লেগেছে বলে সে তো ফেরারি হয়ে গেছে। তাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।'

এই বলে একটা হাই তুলে ভুতো যেই না দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে আবার শুতে যাচ্ছে, রাখাল হাউ হাউ করে কেঁদে তার পাদুটো জড়িয়ে ধরল। ভুতো তো অপ্রস্তুতের এক শেষ। জিভ-টিভ কেটে রাখালের হাত ধরে ফেলল—"ও কী, ছি ছি! ওতে আমার পাপ হবে। একদিন তোকে না গুরু বলে পেন্নাম করেছিলাম, ভুলে গেছিস? সত্যিই কাল রাত নটা থেকে ঘাটে আমাদের জন্যে নৌকো তৈরী থাকবে, তাতে দুটো দাঁড় থাকবে, তবে সঙ্গে লোক যেতে রাজী নয়। নিজেদেরই পথ খুঁজে নিতে হবে।'

রাখাল একেবারে হাঁ হয়ে গেল।

'দিকদারই যদি ফেরারি হল তো এত কথা তোকে বললে কে?'

'কেন, ঐ যে দিগম্বর বলে দিকদারের একটা শেয়ালপনা লোক আছে, সেই বলল।'

'কাল আবার কী? আমি তো পরশু যাবার কথা ঠিক করেছিলাম।'

ভুতোর এবার বোধ হয় সত্যিই ঘুম ছুটে গেল। নিচু গলায় সে বললে,

'নারে, যেতে হলে কালই যেতে হবে, দিগম্বর বললে। তারপরে কী হতে কী হয়ে পড়বে তার ঠিক কী? দিকদারকে এরা যদি একবার ধরতে পারে তাহলেই তো সব পণ্ড হয়ে যাবে। এক সুই দিয়ে নাকি দিকদারের রোগ সারিয়ে দেবে। তখন সে আর আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না, বরং দলের আর সবাইকে উলটে চিকিচ্ছে করিয়ে সারাবে, আগের মতো হয়ে যাবে।'

রাখাল বললে—'সে আবার কী?'

ভুতো আরো বুঝিয়ে দিলে—'সেই যে কে যেন বলেছিল দিকদার আগে ভালো ছিল, তার পর কোথায় বনের মধ্যে গাছের চারা খুঁজতে গিয়ে কিসের কামড় খেয়ে জ্বর পাকিয়ে একদম বদলে গিয়ে এইরকম হয়ে গেছে। এখানকার বদ্যিরাও সেই বনে গিয়ে সেই পোকা ধরে এতদিন পরে দারুণ ওষুধ বানিয়েছে, তাই ওরা দিকদারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর খবর পেয়ে দিকদারও গা ঢাকা দিয়েছে। মোট কথা, যেতে হয় তো কালই যাওয়া।'

এই অবধি বলে ভুতো সেই যে চোখ বুজে টান হয়ে শুল আর শত খোঁচাখুঁচিতেও উঠল না। কিন্তু রাখালের চোখে আর ঘুম আসে না। সে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—তাই ভালো, যত শিগগির এখান থেকে রওনা হওয়া যায়, ততই ভালো। এ জায়গাটার কেমন যেন একটা গুণ ধরে যায়, বেশি দিন থাকলে শেষটা ভুতোর মতো আর যেতে ইচ্ছাই করবে না। আহা, এখানে নাকি না খেয়ে কেউ মরে না; সবাইকে কাজ করতে হয় সত্যি, কিন্তু না করলে কেউ ধরে নিয়ে সাজাও দেয় না। দিনের বেলায় এখানকার পাঠশালার সামনে দিয়ে যেতে রাখাল দেখে এসেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো রঙিন জামা গায়ে দিয়ে গুরুমশায়দের সঙ্গে নেচে নেচে গান গাইছে আর চারদিকে ফুল ফুটে রয়েছে। বেড়ে জায়গা, যাই বল!

ছৎ! এসব কী ভাবছে রাখাল? যেমন এখানে কেউ না খেয়ে মরে না, তেমনি বড়লোকও তো কাউকে দেখল না রাখাল। টাকা-পয়সার আয় নেই, তা বড়লোক হবে কোত্থেকে? নাঃ,

যতই না ভালো হোক, এখানে আর নয়। কোনোমতে কালকের দিনটা কাটলে বাঁচা যায়, ডেরা থেকে ছুটি গামছায় কাগজগুলোকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে রাত দশটার পর সবাই লাইব্রেরি থেকে চলে গেলে, ব্যস্ আর কি, কাগজগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে, ছুই পোঁটলা গয়নাগাঁটি নিয়ে ঘাটে গিয়ে নৌকোয় চাপা। নাই বা গেল কেউ সঙ্গে, নৌকোয় একবার উঠতে পারলে পথটুকু খুঁজে নেওয়া কী এমন শক্ত কাজ? এর চাইতে কত বিপদ থেকে রাখাল নিজেকে আর ভুতোকে উদ্ধার করেছে।

পাশ ফিরে শুয়ে দেখে রাখাল চাঁদ কখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, তারার আলোয় চারদিক ছমছম করছে, ঝিরঝির করে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। একটু অদলবদল করে নিতে পারলে রাখালেরও থেকে যেতে আপত্তি হত না। ঐ বিনি পয়সায় দোকান থেকে জিনিস কেনা, ওটি তুলে দিতে হবে। যেমন খাটছে খাটুক সবাই, তবে মাসকাবারে মাইনে পাক, ভুঁইরাসির মতো দোকানপাট থেকে জিনিসপত্র কিনে খাক পরুক। একটা হাই তুলে আরো ভাবে রাখাল, দোকানপাটগুলো সব যদি রাখালদাসের হয় তবে আরো ভালো; দোকান চালাবার ভার দেওয়া যাবে ভুতোকে। সেও মাস মাইনে পাবে, বাকি পয়সাকড়ি রাখালের তহবিলে জমা হবে।

তারপর একটা একটা করে সব দোকানগুলোকে কিনে নিতে পারলে ইচ্ছেমতো জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে পারবে, তখন যারা দোকানে কাজ করবে আর যারা কিনে খাবে, সবাই রাখালের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে—তখন চাই কি—স্বয়ং দিকদারকেও আর রাখাল ভয় করবে না, সে ব্যাটাকেও—এই রকম সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে রাখাল ঘুমিয়ে পড়ল নিজেই টের পেল না।

পরদিন ভোরে ভুতোর ডাকে উঠেই রাখালের খেয়াল হল—সেই গভীর রাতের আগে, ছুপুরে খাবার সময়টুকু ছাড়া ভুতোর সঙ্গে তো আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। খাবার সময়েও আশেপাশে বড় বেশি লোকজন থাকাতে নিরিবিলি কথা কইবার জো নেই।

সারাদিন ভুতো কমলার বাগানে আগাছা উপড়োবে আর রাখাল বাকশালের পুকুর ছেঁচবে। কাজেই যা বলবার এখুনি বলা দরকার। ভুতোকে ডাক দিল রাখাল, নিচু গলায় বলল,

'তোর সঙ্গে সেই ঘোর রাতের আগে আর কথা হবে না, কাজেই ভালো করে শোন্। রাত সাড়ে দশটায় তুই লাইব্রেরির খিড়কি দোরের বাইরে জুঁইগাছের আড়ালে অপেক্ষা করবি। সবাই বেরুলে পর আমি অদ্ধেক জিনিস পুঁটলি বেঁধে দোর ফাঁক করে তোর হাতে গুঁজে দেব, তুই অমনি নদীর দিকে রওনা দিবি, নৌকোতে জিনিস লুকিয়ে চুপ করে বসে থাকবি। আমি কাগজ বিলি করে, আরেকটা পুঁটলি নিয়ে একটু পরেই এসে জুটব। তারপর সোজা ভুঁইতরাসি। নৌকো সত্যি থাকবে তো?'

ভুতো ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'থাকবে, থাকবে। কিন্তু দেশে যাবার পথ চিনিস তো?'

রাখাল বিরক্ত হয়ে উঠল—'ওসব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যা বলছি তাই করিস। এখন যা, আমাদের বেশিক্ষণ কথা বলতে দেখলে আবার কেউ না সন্দেহ করে।'

করে না অবিশ্যি, এখানে কেউ কাকেও সন্দেহ করে না।

রোজকার মতো হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে কাজের জন্যে তৈরী হল রাখাল, আর খালি খালি মন কেমন করতে লাগল। এই ফুলে ফলে ভরা বাগানে, এই খোলামেলা জায়গায়, ঝিরঝিরে বাতাসে মাদুর পেতে আর শোয়া হবে না। আজ রাতটা হয়তো নৌকোতে কাটবে, কাল আবার সেই ভুঁইতরাসির চেনা মাটিতে পা পড়বে।

ভুঁইতরাসির জল-হাওয়াতে জন্মেছিল মানুষ হয়েছিল রাখাল, সেখানকার পাঠশালা থেকে তাড়া খেয়ে, কিছুকাল ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়ে চোর-ছ্যাঁচড়দের দলে ভিড়েছিল। ভুঁইতরাসি যাবে না তো যাবে কোথায়? এত সোনাদানা ওখানকার লোকে চোখেও দেখে নি কখনও, হকচকিয়ে যাবে সব, রাখাল-ভুতোকে ফাটকে দেবার কথা কারও মনেও হবে না। তারপর আর কি, এখানে যা হতে পারবে না, ভুঁইতরাসিতে তাকে সম্ভব করবে রাখাল। গোটা বাজার কিনে ফেলবে, যেখানে যত চাল নুন সব নিজের গোলায় জমা করবে, ইচ্ছেমতো দাম চড়াবে। দেখতে দেখতে ফেঁপে লাল হয়ে যাবে। তখন আর কেউ তাকে ঘেন্না করবে না, সিঁদেল চোর বলে নাক সিঁটকোবে না। অবিশ্যি এটুকু মানতেই হবে যে ভুঁইতরাসিতে সিঁদেল চোরদের রাজা বলে রাখালের নাম হয়েছিল। কিন্তু রাজা হলে হবে কি, ট্যাঁক ছিল গড়ের মাঠ, কাছে কেউ ভিড়তে দিত না। এবার সোনার পাহাড় নিয়ে গিয়ে উঠবে সেখানে, অমনি সবাই এসে পায়ে লুটোবে। তখন দেখা যাবে।

কোনো রকমে দিনটা কাটল, আট ঘণ্টাকে মনে হল আট বছর। শেষটা সত্যি সত্যি বেলা চারটে বাজল, শেষবারের মতো পুকুর ছেঁচার কাজ সেরে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে রাখাল লাইব্রেরিতে হাজির হল। শেষবারের মতো সিঁড়ি মোছার কাজে লাগল। মনটা কেমন খারাপ হয়ে রইল। মন্দ নয় এখানকার লোকরা। যদিও ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই বোঝে না, কিন্তু সবাই সবাইকে ভারি সাহায্য করে। রাখালের হাঁড়ি মুখ দেখে দুই নম্বর ম্যানেজার বারবার এসে জিজ্ঞাসা করে গেলেন ওর শরীর খারাপ কিনা।

ক্রমে বেলা পড়ে এল, জলখাবার এল, রাখালের যেমন পেটকামড়ানি শুরু হয়ে গেল, ভালো ভালো পুরী তরকারিগুলো মুখে তুলতে পারল না। শেষবারের মতো হলঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল, সোনার গয়নার তাল তাকের ওপর এমনি খোলা পড়ে আছে। রাত দশটার পর ওপরের আলো যেই নিববে, সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। আলো নেবার কথা মনে করে কেন জানি বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল, অথচ সঙ্গে দেশলাই বাক্স আছে, ভাবনার কোনও কারণই নেই।

আসলে এভাবে কাজ করে অভ্যাস নেই। গত দশ বছরে কম চুরি তো করে নি রাখাল, জেলই খেটেছে চারবার। কিন্তু সে সবই বাইরে থেকে সিঁদ কেটে ভেতরে সেঁদিয়ে চুরি করা। এবার যেন সবই উলটো, ভেতর থেকে চুরি করে দোর খুলে বেরিয়ে পড়া। কাজটাকে কি রকম যেন অন্যায় অন্যায় মনে হচ্ছিল।

যাই হোক, শেষটা রাত দশটা বাজল, অমনি রোজকার মতো ঠেলাঠেলি পড়ে গেল, এক দল

পোড়ো কিছুতেই উঠতে চায় না, নাকের ওপর চশমা টেনে বই আঁকড়ে ঝুলে থাকে, টানাটানির মধ্যেও যে ক লাইন পারে পড়ে নেয়। শেষটা তাদের হার মানতে হয়, দুঃখিত মুখে বই জমা দিয়ে গুটি গুটি বাড়িমুখো হয়, একে একে লাইব্রেরি-বাড়ির আলো নেবে।

দোতলায় যখন সব আলো নিবে গেছে তখন দু নম্বর ম্যানেজারকে শুনিয়ে রাখাল বললে—'উওফ্, আজ বড্ড ঘুম পেয়েছে, বাড়ি গিয়ে শুয়ে বাঁচব!' তারপরেই এক সুযোগে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গিয়ে গা ঢাকা দেওয়া!

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘর খালি হয়ে গেল, দু নম্বরের ম্যানেজার দু-একবার হাঁকডাক করলেন যদি কেউ পড়ে থাকে, তারপর তিনিও শেষ আলো নিবিয়ে, সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে থেকে তালা দিলেন, তারপর সব চুপচাপ।

সে যে কী বিশ্রী চুপচাপ সে আর বলা যায় না। মনে হতে লাগল ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাদের যেন ফোঁসফোঁস নিশ্বাস পড়ছে, কার যেন হাঁটু মটকাল, রাখাল তো ভয়ে সাদা! কোনোমতে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নেমে দেখে একেবারে অন্ধকার নয়। ছাদের কাছের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তারার আলো এসে সোনার গয়নার ওপর পড়ে আলো ঠিকরোচ্ছে। নিঃশব্দে এদিকে ওদিক কাগজ ছড়িয়ে তারপর খান কুড়ি-বাইশ গয়না গামছায় বেঁধে খিড়কি দোরের কাছে গিয়ে খুট করে ছিটকিনি নামাল রাখাল।

সেই ছোট্ট খুট্ শব্দটা একশো গুণ জোর হয়ে যেন ছাদ থেকে দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, রাখালের প্রাণ-পাখি প্রায় খাঁচাছাড়া! কিন্তু এখন পেছু হটলে সব পণ্ড, অনেকখানি মনের জোর করে রাখাল খিড়কিদোর একটুখানি ফাঁক করল। বাইরে তারার আলো ফুটফুট করছে, জুঁই-গাছের ছায়া থেকে ভুতো এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই, তার হাতে পুঁটলি গুঁজে দিয়ে, কোনো কথা না বলে, খিড়কি দোরটা রাখাল ভেজিয়ে দিল। পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, ভুতোও অমনি এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ছায়ায় ঢাকা পথ ধরে চোঁ চাঁ দৌড় লাগাল।

এদিকে নিজের বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দে রাখালের কান ঝালাপালা, তাকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুই হাতে মণিমানিক্য-বসানো গয়নাগাঁটি আরেকটা গামছায় ঢালছে আর খালি মনে হচ্ছে বুঝি ঘরভরা লোক পা টিপেটিপে নড়াচড়া করছে, ঐ তাদের নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে! শেষটা আর থাকতে না পেরে ফস করে রাখাল একটা দেশলাইকাঠি জ্বালল। আর অমনি ধর ধর সর সর করে এক দল ছায়ামূর্তি ঘরের চারদিক থেকে রাখালের চারদিকে জড়ো হতে লাগল।

আর দাঁড়াল না রাখাল, বিকট একটা চিৎকার দিয়ে গয়নাগাঁটি কাগজপত্র সব ফেলে এক দৌড়ে খিড়কি দোর খুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন পড়ুয়ারা সব অবাক হয়ে আলো জ্বেলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তর্কচঞ্চু বললেন, 'আহা! এগুলো হয়তো ওর দরকার, ভয় পেয়ে ফেলে পালাল। রোজ তোদের পই পই করে বলি, দশটার পর তোদের অত পড়াশুনোর কী দরকার? আমরা বুড়ো হয়েছি, বেশি সময় পাব না, আমাদের কথা আলাদা। ছ্যাখ্ দিকিনি

এই বেচারিকে না অসুবিধেয় পড়তে হয়। যা, যা, পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে দিয়ে আয় গে যা।
তাই শুনে গামছাটা গুটিয়ে নিয়ে পাঁচ-ছজন পড়ুয়া রাখালের পেছন পেছন দৌড়ল। তাদের পায়ে
শব্দ শুনতে পেয়ে রাখাল বাতাসের মুখে খড়ের কুটির মতো ছুটল। ভুতোর হাতের পুঁটলিতেও ক
জিনিস নেই, এখন এরা ধরে ফেলবার আগে নৌকোয় চাপতে পারলে আর ভয় নেই, রাখালের সমা
দাঁড় বাইতে যে পারবে সে এখনও জন্মায় নি। কোমরে যে কখানি কাগজ গোঁজা ছিল সেগুলো
আপনা থেকেই বাতাসে উড়ে যেখানে সেখানে পড়তে লাগল, তার জন্যেও রাখালকে থামতে হল না।

[ক্রমশ

হাত পাকাবার আসর

মেঘের খেলা

প্রবাল রায়। ৮৭২। কলকাতা। বয়স ১২

ওই দেখ ভাই মেঘের খেলা,
কেমন মজার দেখছ কি ?
এই ফটোটা কোথায় তোলা
বলতে পার তোমরা কি ?
কেউ জান না কোথায় তোলা।
শুনবে তবে মোর কথা ?
এসব হল মধুপুরের
বর্ষাকালের আকাশটা।

নীরেনদা

দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৫৬। কলকাতা। বয়স ১৩

নীরেনদা ওরফে নীরুদা আমাদের আপন কেউ নয়। আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করে। খুব ভাল ছাত্র। আমাদের স্কুলেই পড়ে নীরুদা। স্কুলের হেডমাস্টার মশাই থেকে দরওয়ান পর্যন্ত সবাই ওকে ভালবাসে। ও আমার চেয়ে তিন-চার ক্লাশ উঁচুতে পড়ে। আমার নীরুদাকে একটুও ভাল লাগে না।

আমাদের (আমি বিলটু আর কানুর) সকলেরই নীরুদার উপর একটু রাগ আছে। ও আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। আমাদের রেজাল্ট দেখে হাসে। আর আমাদের সম্বন্ধে বাবার কাছে লাগাতে ওর মতো আর কেউ পারে না। একবার আমাকে ঝালমুড়ি খেতে দেখে নীরুদা ঠাকুমাকে বলে দিয়েছিল। এইসব কারণেই আমরা নীরুদার উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিলাম না।

আমাদের বাড়ির পাশেই একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরে আমরা রোজ স্নান করি। এই সেদিন-কার ঘটনা। সেদিন ইস্কুল ছুটি ছিল। দুপুরবেলা স্নান করছি। স্নান হয়ে যাবার পর আমরা জল থেকে উঠে এলাম। আমি আর বিলটু পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। কানু তখন উঠছে। হঠাৎ সিঁড়িতে পা পিছলে ও জলে পড়ে গেল। কানু একটু-আধটু সাঁতার জানলেও ভাল করে জানত না। তাই হাবুডুবু খেতে লাগল। আমরা কী করব বুঝতে পারলাম না, আমাদের গলা শুকিয়ে এল। ছুটে গিয়ে বাড়িতে খবর দেবার কথাও মনে রইল না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানুর হাবুডুবু খাওয়া দেখতে লাগলাম। তারপর চিৎকার করে উঠলাম : 'কানু! কানু ডুবে গেল।' হঠাৎ নীরুদা কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। আর কানুকে একহাতে কাঁধে তুলে আর-এক হাতে সাঁতার কেটে পাড়ে নিয়ে এল। আমরা শুধু অবাক হয়ে দেখলাম।

তারপর থেকেই নীরুদার উপর আর আমাদের একটুও রাগ নেই। বিশেষ করে কানু নীরুদা ওরফে নীরেনদার ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়েছে!

খোকনমণি

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স ১৩। কলকাতা

একটি গাছে একটি ফুল,
দেখতে ভারি ভালো।
খোকনমণির বাগানটিরে
করে রেখেছে আলো॥
সবাই বলে, 'ও ভাই খোকন,
এই ফুলটি দাও,
তার বদলে চারটে করে
নতুন পয়সা নাও।'
খোকন বলে, 'তা হবে না
ফুটবে না আর ফুল,
ফুল না নিয়ে নিতে পার
দশটি টোপা কুল।'

সন্দেশ

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত। ২৬০১। কলকাতা। বয়স ১৫।

গোলগাল মোটাসোটা কলেবরখানি
জলযোগ মুখ ঢেকে বলে 'হার মানি',
পাকা হাতে কচি হাতে আমাদের পাতে পাতে
খবরেতে গল্পেতে পড়ে টানাটানি
লকলকে ভরে ওঠে রসে জিভখানি।
সারা মাস বসে থাকি তোর পথ চেয়ে
ঘড়ি যেন চলে নাকো দম দিয়ে দিয়ে,
এলে তুই হৈ হৈ খেলনা পড়ার বই
মেঝেতে লুটায় পড়ে উই-এ যায় খেয়ে
দম-দেওয়া গাড়ি ঘোড়া চোরে যায় নিয়ে।
জলপাই গাছ ভরে আছে জলপাই
নলেন গুড়ের হাঁড়ি রয়েছে বাঁধাই,
পড়ার বইয়ের তাকে লুকিয়ে রেখেছি তোকে
বড়দের মোটা হাতে কানমলা খাই
মাসেতে দুবার করে আয় না রে ভাই।

সাহসী

সুচিত্রা ঘোষ। ২৩০৩। ভাটপাড়া। বয়স ১৪

সেবার আসাম থেকে মেজমামা প্রথম এলেন আমাদের বাড়ি। নধর চেহারা, ভুঁড়িটি সকলের আগে চোখে পড়ে। তিনি আসা অবধি আমার— মানে আমি, দাদা, বাবু, সুবু সবাই সবসময় ভয়ে জড়সড় হয়ে রইলুম এই ভেবে যে কখন কিভাবে তিনি প্রমাণ করে দেবেন আমরা বোকা, ভীতুর হদ্দ আর স্বাস্থ্যহীন বালক-বালিকার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনি এসেই আমাদের দেখে মাকে বললেন, 'বড়দি,

তোর ছেলেমেয়েগুলোর কী দশা রে! যেন তাল-পাতার সেপাই। আমার ভাগনে-ভাগনী বলে

মনেই হয় না।' মাও খুব চিন্তিত মুখে তাঁর মেজভায়ের কথায় সায় দিলেন। মেজমামা বলতে লাগলেন, 'তা তোর আর দোষ কী, ভাটপাড়ার জলহাওয়া একেবারে যাচ্ছেতাই, এসেই বুঝতে পারছি।' আমরা তাঁর বোধশক্তি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। তখন বোধহয় কুড়ি মিনিটও হয় নি তিনি এসেছেন আমাদের বাড়িতে। তারপর জলখাবার খাওয়ার পর আবার তিনি শুরু করলেন, 'ছেলেমেয়েরাও আজকাল দারুণ অবাধ্য হয়েছে। যতই নিষেধ করা হোক—রোজ ডালমুট, তেলেভাজা, আইসক্রীম মুখে লেগেই আছে। অমন ছাইভস্ম খেয়ে কি আর তাগড়াই হওয়া যায়!' একটু আগেই মামার জল-খাবারে মায়ের হাতে ভাজা গোটা চারেক আলুর চপ ছিল। মেজমামা সেগুলি বিনা আপত্তিতে খেয়েছিলেন। মা সে কথা মনে করে হেসে ফেললেন। পাঁচ দিন কেটে গেল। এর মধ্যে আমরা মেজমামার কাছ থেকে আলসে, ভীতু, টিংটিঙে সর্দার, এমনি অনেক খেতাব পেলুম। এসব খেতাব পাওয়া মোটেই আমরা পছন্দ করতুম না বটে কিন্তু মেজমামা নিজের শিকারকাহিনী এমন সরেস করে বলতেন, আমরা সব অপবাদ ভুলে যেতুম, এমনকি ভাটপাড়ার নিন্দে অবধি। মেজমামার সঙ্গে বাঘের ভয়ংকর লড়াই শুনতে শুনতে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। অনেক বাঘের চামড়া তিনি জোগাড় করেছিলেন। পরের বার একটা চামড়া তিনি আমাদের এনে দেখাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। দাদা তাঁর শিকারকাহিনী একদম বিশ্বাস করত না, তবু শুনত।

একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা গরম গরম সুজির পায়েসে লুচি ডুবিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় পাশের ঘরে চাপাগলায় চিৎকার শোনা গেল। তারপরেই দড়াম করে কী একটা শব্দ শোনা গেল। মা আর পিসীমা 'কী হল, কী হল' বলে ছুটলেন। আমরা তাঁদের পিছু নিলাম আর বাবা উপর থেকে নেমে এলেন। সবাই পাশের ঘরে গিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দেখি মেজ-মামা ইজিচেয়ারের সঙ্গে জড়িয়ে মেঝেতে কাঠ হয়ে পড়ে আছেন। পিসীমা 'ওমা কী হল' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। বুদ্ধু চাকরটা জল আনতে যাবে, এমন সময় দাদা উত্তর দিকের বন্ধ জানলার দিকে চেয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখি একটা কালো কাপড় টাঙানো জানলার গায়ে, আর তার উপর সাদা কাপড়ের টুকরো কঙ্কালের আকারে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমি বুঝতে পারলুম ওটা দাদার কীর্তি। তার পরের দিন আমাদের কিশলয় সংঘের বার্ষিক উৎসব পালন করা হবে, তাই দাদা ম্যাজিক দেখাবে বলে ওটা তৈরী করেছিল।

মামা অজ্ঞান হয়ে যান নি, তাই গোলমাল শুনে

ধড়মড় করে উঠে বসে জানলার দিকে তাকালেন। আলোয় ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নিলেন। তার পর তিনি আমাদের দেখে লজ্জায় মুখ চোখ লাল করে, জামা ছাড়তে এসে 'পাটা এমন পিছলে গেল!' বলেই ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। বাবা সুবুর মুখে মেজমামার নিজের অনেক শিকার কাহিনী শুনেছিলেন। যে লোক রাতদুপুরে মস্ত মস্ত বাঘ আর বুনো মোষের সঙ্গে লড়েছে সে একটা কঙ্কাল দেখে শিবনেত্র! বোধহয় এ কথাটা ভেবে বাবার হাসি পেয়ে গেল। তিনি হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে লাগলেন। সেই থেকে আজঅবধি মেজমামা আমাদের ভাটপাড়ার জলবায়ুর সম্বন্ধে কিংবা আমাদের সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত আছেন।

লাক্সর

মিশরদেশে নীল নদের তীরে ছোট একটি শহর, বা গ্রামও বলা যেতে পারে। নাম তার লাক্সর। ছোট হলে কী হবে, এই লাক্সরই হল প্রাচীন কালের বিখ্যাত থীবিস্, যেখানকার ফেরো-পদবীধারী রাজাদের নাম পৃথিবীর সবাই জানত। এঁদের আকাশচুম্বী বিশাল মূর্তি ও মন্দির আজ পর্যন্ত সেই খ্যাতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। অবিশ্যি সবচেয়ে মজার কথা হল যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র এই হাজার হাজার বছরের খ্যাতির লোভেই ঐ সব মূর্তি ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আসলে দেবভক্তি বা বা প্রজাপালন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। মন্দিরের প্রাঙ্গণে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ফেরোদের অতিকায় সব পাথরের মূর্তি, মন্দিরের মধ্যেও সারি সারি বিশাল থামের গায়ে যেসব অপূর্ব ছবি আঁকা, তাতেও ফেরোরা নানারকম বহুমূল্য উপহার নিয়ে দেবদর্শনে চলেছেন। সব জায়গাতেই মনে হয় দেবতাটির চেয়ে ফেরোটিই যেন অনেক বড়।

ঐতিহাসিকরা বলেন, সেকালে ছয় হাজার বছর ধরে সমানে মিশরীয় এই সভ্যতার প্রচলন ছিল। এখন কতকগুলি বিশাল মূর্তি, মন্দির আর কবর ছাড়া তার বিশেষ কিছু বাকি নেই। কায়রো শহরে কোথাকার এক ভগ্নস্তূপ থেকে অনেক কষ্টে আনা দ্বিতীয় রামশেষের একটা বত্রিশ-ফুট-উঁচু মূর্তি দেখা যায়, মূর্তিটি একটুকরো পাথর কেটে তৈরী, এবং প্রায় সোয়া তিন হাজার বছর পুরোনো।

কায়রো শহর থেকে কিছু দূরে চিয়প্সের বিশাল পিরামিড, অত্যাশ্চর্য রকম বড় একটা পাথরের স্তূপ, যার না আছে কোনো সৌন্দর্য না আছে কোনো মর্মস্পর্শী কাহিনী। কিন্তু তার বিরাটত্ব দিয়েই চিয়প্সকে সে অমর করে রেখেছে।

তাছাড়া আছে স্ফিঙ্কস্, যার নাম কে না শুনেছে? সত্তর-গজ-লম্বা বিশাল একটা সিংহের মতো তার গা, সামনে ছুটো থাবা গেড়ে বসে রয়েছে। বিরাট মুখটা দেখে মনে হয় বুঝি কোনো মেয়ের কিংবা দেবীর মুখ। বহু যুগ ধরে এই মূর্তির অর্ধেকের বেশি মরুভূমির বালি চাপা পড়ে ছিল, এর রহস্য কেউ জানত না, নানা রকম মনগড়া কথা বলত।

প্রাচীন গ্রীক ভ্রমণকারীরা বলত এটি একটি দেবীমূর্তি; এই দেবী নাকি যেই কাছে আসত তাকেই একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করতেন এবং ধাঁধার সঠিক উত্তর না পেলে সে হতভাগাকে টপ করে গিলে ফেলতেন।

সব বাজে কথা। অনেক কাল পরে বালি সরিয়ে পাওয়া গেছে পাথরে খোদাই একটি ফলক, তাতে যা লেখা রয়েছে তার মানে হল মূর্তিটি কোনো দেবীরও নয়, মানবীরও নয়। আসলে মূর্তি হল খাফ্রে নামক একজন ফেরোর। এত কাল এটি বালি চাপা হয়ে ছিল, শুধু মাথাটি দেখা যেত। লোকে খাফ্রের নাম ভুলেই গিয়েছিল, তারপর আরেকজন ফেরো চতুর্থ আমেন হোপিস নাকি স্বপ্নে

আদেশ পেয়ে বালি খুঁড়ে মূর্তিটাকে বের করেন। তিনিই ঐ পাথরের ফলকে খাফ্রের ও নিজের কথা লিখে যান, নইলে এ মূর্তির আসল তথ্য কেউ জানতে পারত কিনা সন্দেহ।

মিশরের প্রাচীন রাজধানী ছিল মেম্ফিসে। সেখান থেকে সরে এসে পরে থীবিসে রাজধানী হল। তারই বর্তমান নাম লাক্সর।

এইখানেই সেই বিখ্যাত রাজাদের উপত্যকা, যার কথা রূপকথার মতো শোনায়। নীল নদের দুই পাড়ে ছড়ানো জায়গাটি ভারি মনোরম, জলহাওয়াও ভালো। এই সব কারণে পুরোনো পুঁথিতে পাওয়া যায় যে হাজার হাজার বছর আগেও লোকে হাওয়াবাতাসের জন্যে থীবিসে বেড়াতে আসত আর যাবার সময় প্রশংসাপত্র লিখে যেত। এমন কি একটা মূর্তির গায়ে একজন মহিলা কবির দু-ছত্র কবিতা লেখা আজও পড়া যায়। কবিতাটি এমন কিছু ভালো হয় নি।

লাক্সরে পৌঁছে নীল নদের তীরে দাঁড়ালে সামনেই নদীর ওপারে দেখা যায় শ্যামল খানিকটা জমি, তার পরে উঁচু পাথুরে জায়গা, তার পেছনে মরুভূমি। পেছনেও মাইল খানেক সবুজ গাছপালায় ঢাকা মাটি, মাঝে মাঝে বিশালকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, তার পরেই আবার মরুভূমি। ওপারে মৃতদের শহর, এপারে জীবিতদের, কিন্তু ওপারটারই আকর্ষণ বেশি।

সে এক অভাবনীয় রাজ্য। সবুজ গাছগাছালি পার হয়ে, মেটে রঙের উঁচু পাথুরে জমিতে যাবার জন্য ঢালু পথ তৈরী করা আছে। এই পথ দিয়েই সেকালে মৃতদের শবাধার ঠেলে নিয়ে যাওয়া হত। পথের একটা বাঁক ঘুরেই সামনে দেখা যায় বিখ্যাত ভ্যালি অভ কিংস, যেখানে ফেরোদের সমাধিস্থ করা হত। শুকনো পাথুরে উপত্যকা, গাছপালার নামগন্ধ নেই। উঁচু পাথরের দেয়ালের মাঝে মাঝে খাঁজ কাটা রয়েছে, খাঁজের মধ্যে দিয়ে ঢালু পথটি আরো খাড়া হয়ে নেমে গেছে, পথের শেষে পাথরের গায়ে সাধারণ বাড়ির দরজার মাপে একটা করে দরজা কাটা।

দরজা দিয়ে ঢুকে অবাক হয়ে যেতে হয়। পাথরের বুকের মধ্যে ঠিক যেন কার থাকবার জন্মে বাড়িঘর তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু ঘরগুলো সব এখন খালি, শুধু দেয়ালে এমন অপরূপ সব ছবি আঁকা যে তাই দেখে মনে হয় না-জানি এককালে মৃতদের এই ঘরগুলো কী সুন্দর করেই সাজানো ছিল। ঘরগুলি মৃত ফেরোদের সমাধি ছাড়া আর কিছু নয়।

সেকালের মিশরবাসীরা মনে করত পরকালে মানুষ ঠিক এই পৃথিবীর মতো জীবনই যাপন করে। কাজেই এখানকার যাবতীয় প্রয়োজনের ও বিলাসের জিনিসের তাদের দরকার হবে। এই মনে করে সমাধির মধ্যে কাপড়, গয়না, প্রসাধনী জিনিস, বই, কলম, বাজনাবাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, চেয়ার-টেবিল, খাট-বিছানা, ঘর সাজাবার বহুমূল্য সব সামগ্রী, খাবার-দাবার তারা পুরে দিত। মৃতদেহটাকেও ওষুধ দিয়ে কাপড় জড়িয়ে চমৎকার-কারুকার্য-করা সোনারুপোর আধারে ভরে, সেটাকে সুন্দর কাঠের বাক্সে ভরে সাজিয়ে রাখত,—অত ভালো ভালো জিনিস ভোগ করতে হলে একটা শরীর চাই তো। এই সব ওষুধ দিয়ে রক্ষিত মৃতদেহকে ম্যমি বলা হয়।

মৃতের প্রিয় জন্তুজানোয়ার, চাকর-দাসীদের পাথরের মূর্তি গড়ে সঙ্গে দেওয়া হত, নইলে পরকালে যদি মন কেমন করে, কিংবা কষ্ট হয়!

এইসব জিনিসপত্র এত মূল্যবান ছিল যে সর্বদাই চোর-ডাকাতের ভয় থাকত, কাজেই সমাধির দরজা সীল করে, পাথর মাটি ইত্যাদি দিয়ে চাপা দেওয়া হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চোর-ডাকাতরা ঠিক খুঁজে বের করে সমস্ত জিনিসপত্র সরিয়ে নিত। তাই আজ পর্যন্ত যত সমাধি দেখা গেছে, সবগুলিই প্রায় খালি, যদি বা মৃতদেহ থাকে, তার জন্যে অত যত্ন করে সাজানো সামগ্রীর কিছুই নেই।

কেবল একটি সমাধি যে কারণেই হোক, চোর-ডাকাতের হতে এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটি হল টুটেন খামেন নামে একজন ফেরোর। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্নাউন নামে একজন ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই সমাধিটি আবিষ্কার করেন। কবর খুলে তার অপূর্ব দ্রব্যসম্ভার দেখে সকলে হকচকিয়ে গিয়েছিল। টুটেনখামেন তেমন বড় রাজাও ছিলেন না, অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিলেন, কবরের মধ্যে দামী দামী জিনিসপত্র যেরকম এলোমেলোভাবে সাজানো ছিল যে মনে হয় কোনো কারণে খুব তাড়াতাড়ি যেমন তেমন করে সমাধিতে পোরা হয়েছিল।

দুটি শবাধার, একটার মধ্যে অন্যটা, একটা সোনার, একটা মূল্যবান পাথরের; ভিতরে রাজার দেহ প্রায় অবিকৃত অবস্থায়। চারপাশে স্তূপ করা রাজার যোগ্য সামগ্রী, মায় একটি সোনার সিংহাসন। শবাধারে রাজার সম্বন্ধে অনেক তথ্য খোদাই করা। জিনিসপত্র কায়রোর মিউজিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু রাজার ম্যমি তার বিশ্রামস্থলেই রাখা আছে।

আমাদের কাছে ফেরোদের সমাধিগুলি যতই বিস্ময়ের বস্তু হোক না কেন, সেকালের মিশরীয় ফেরোরা নিজেরা বেঁচে থাকতেই নিজেদের নাম যাতে কেউ না ভোলে তার ব্যবস্থা করতেন নিজেদের ঐসব কীর্তি দিয়ে। যেমন ধরা যাক কার্নাক গ্রামের আ-মনের মন্দির। লাক্সর থেকে কিছুদূরে সদর রাস্তার দুদিক জুড়ে কার্নাক গ্রাম। মন্দিরে যাবার পথের দুধারে দু সারি ছোট ছোট স্ফিঙ্কস্ মূর্তি, তারপর বিরাট একটা প্রবেশদ্বার। তারপরে বিশাল একটা উঠোন। তারপর আরেকটি প্রকাণ্ড দরজা দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। প্রথমেই বিশাল বিশাল থামে ভরা একটা হলঘর। হলটা ৩৩০ ফুট লম্বা, ১৮০ ফুট চওড়া, তার মধ্যে ২৪টি থাম, সেগুলি ৭৫ ফুট লম্বা আর বেড়ে পঞ্চাশ ফুট। এক-একটা থামের মাথায় নাকি পঞ্চাশ জন লোক দাঁড়াবার জায়গা হতে পারে। এই থামগুলির ওপরে পাথরের ছাদটি ভর দিয়ে আছে। থামগুলিতে আগাগোড়া ছবি আঁকা ও ধর্মস্তোত্র লেখা।

তারপরে পর-পর ক্রমে ছোট হয়ে আসা চারটি দরজা, তবে মন্দিরের অভ্যন্তরে আসা যায়। এখানে পুরোহিতরা আর ফেরোরা ছাড়া বড় কেউ ঢুকবার অনুমতি পেত না। এখানে আ-মন দেবতার মূর্তি, সেকালে তাঁকে যত্ন করে সাজানো গোছানো, ভোগ দেওয়া হত।

ছবিগুলির বেশির ভাগেই দেখা যায়, মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা ফেরো অনুচরদের হাতে দিয়ে দেবতার জন্যে নানান উপহার আনছেন। এই উপহার দেওয়াই ছিল ওদের দেবপূজার খুব বড় একটি অঙ্গ। বলা বাহুল্য, তার ফলে পুরোহিতরা বড়লোক হয়ে যেতেন।

কোনও কোনও মন্দিরের প্রাঙ্গণে অসংখ্য বিশালকায় মূর্তি, প্রত্যেকটিই একজন লোকের মূর্তি, অর্থাৎ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ফেরোর। নিজেদের প্রাধান্যের ওপর এত বিশ্বাস ছিল ফেরোদের।

আসলে কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতদের উপরেই ফেরোদের ক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করত। যথেষ্ট উপহার দিয়ে তাঁদের খুশী রাখতে না পারলে, এক ফেরো সরিয়ে তাঁর জায়গায় আরেক ফেরো বসানো তাঁদের পক্ষে খুব শক্ত ছিল না। সেইজন্য রাজা ও পুরোহিত উভয় উভয়কে সমর্থন করতেন।

এইরকম ছিল সেকালের মিশর সভ্যতার একটা দিক। অতি বিলাসী সে সভ্যতা। সোনা রুপো, বহুমুল্য রত্ন মানিক, রেশমি কাপড়, খোদাই-করা কাঠের আসবাব, বিশাল বাড়ি ও মন্দির, এইসব ঘিরে তাদের জীবনযাত্রা চলত। এইসব তৈরী করে ও সরবরাহ করে দেশে টাকা আসত, দেশ বিদেশ থেকে লোকে এসব দেখতে আসত। ধর্মজীবন আর পার্থিব জীবনে কোনো তফাত থাকত না।

কিন্তু স্বপ্নের মতো শেষ হয়ে গেছে সেই সভ্যতা, এখন আর তার কোনো প্রভাব দেখা যায় না। তবু দর্শকরা, শিল্পীরা আর পণ্ডিতরা তার ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্ময় রাখবার জায়গা পান না।

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্রিকা
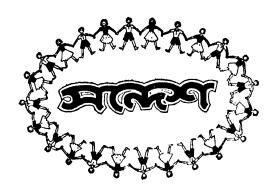
তৃতীয় বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা

এপ্রিল '৬৪ | চৈত্র '৭০

সম্পাদক। লীলা মজুমদার ও সত্যজিৎ রায়

কদ্রু ও বিনতার কথা
উপেন্দ্রকিশোর রায় ২১৭

টোপাকুল
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২০

নিখিল বঙ্গ কবিতা সংঘ
নলিনী দাশ ২২১

হট্টমালার দেশে
প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার ২৩৪

কবিতায় হেঁয়ালি
জয়ন্তকুমার মিত্র ২৩৪

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর
জীবন সর্দার ২৩৫

সম্পাদকের চিঠি ২৩৮

নতুন প্রতিযোগিতা ২৩৯

'সন্দেশে'র বার্ষিক চাঁদা
সডাক ৯'০০

চাঁদা পাঠাবার ঠিকানা :
ম্যানেজার 'সন্দেশ'
১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-২৯

৩য় বর্ষ। ১২শ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৬৪। চৈত্র ১৩৭০

কদ্রু ও বিনতার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

কদ্রু আর বিনতা দক্ষের কন্যা। মরীচির পুত্র কশ্যপের সহিত ইঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। একদিন কশ্যপ ইঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে বর দিব, তোমরা কী বর চাহ ?'

এ কথায় কদ্রু বলিলেন, 'আমার যেন এক হাজারটি পুত্র হয়।'

বিনতা বলিলেন, 'আমি দুটির বেশী পুত্র চাহি না। কিন্তু সেই দুটি পুত্র যেন কদ্রুর এক হাজার পুত্রের চেয়ে বীর হয়।'

কদ্রু আর বিনতার কথা শুনিয়া কশ্যপ বলিলেন, 'আচ্ছা! তোমরা যেমন চাহিতেছ, তেমনই হইবে।'

অনেক দিন পরে, কদ্রুর এক হাজারটি আর বিনতার দুটি ডিম হইল। তারপর আর পাঁচশত বৎসর চলিয়া গেল, কদ্রুর ডিমগুলি ফুটিয়া এক হাজারটি পুত্র বাহির হইল। কিন্তু বিনতার ডিম দুটি হইতে তখনও কিছু বাহির হইল না।

কদ্রুর ডিমগুলি সবই ফুটিল, আর, বিনতার একটি ডিমও ফুটিল না; ইহাতে বিনতার বড়ই দুঃখ আর লজ্জা হইল। তখন তিনি আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া, নিজ হাতেই তাঁহার দুটি ডিমের একটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। সেই ডিমের ভিতরে তাঁহার যে পুত্রটি ছিল, তাহার শরীরের সকল স্থান তখনও ভাল করিয়া মজবুত হয় নাই। তাহার উপরকার অর্ধেক বেশ মজবুত হইয়াছিল, কিন্তু নিচের অর্ধেক তখনও নিতান্তই কাঁচা ছিল। ছেলেটি বাহির হইয়া যারপরনাই দুঃখ ও রাগের সহিত তাহার মাতাকে

বলিল যে, 'মা, তুমি আমাকে কাঁচা থাকিতে বাহির করিয়া কেন আমার সর্বনাশ করিলে? যাহা হউক, তুমি যখন কদ্রুকে হিংসা করিতে গিয়া আমার এমন ক্ষতি করিয়াছ, তখন আমিও তোমাকে শাপ দিতেছি যে, তোমাকে পাঁচশত বৎসর এই কদ্রুর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে।'

তারপর সেই ছেলেটি আবার বলিল যে, 'আর একটি ডিম যে আছে, তাহাকে যেন এমন করিয়া ভাঙিয়া ফেলিও না। উহার ভিতরে তোমার যে পুত্র আছে, তাহার দ্বারাই তোমার দাসী হওয়ার দুঃখ ঘুচিবে। সুতরাং তাহাকে যদি খুব শক্ত করিতে চাহ, তবে, ডিমটি আপনা আপনি ফুটিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকো। উহা ফুটিতে আরো পাঁচশত বৎসর আছে।'

এই বলিয়া সেই ছেলেটি আকাশে উড়িয়া সূর্যের নিকট চলিয়া গেল। ছেলেটির নাম অরুণ। সূর্যের নিকট গিয়া সে তাঁহার সারথি হইল। সেই কাজ সে এখনও করিতেছে। সূর্যদেব যেমন সমান ওজনে চলাফেরা করেন, তাহাতে নিশ্চয় বুঝা যায় যে, অরুণ তাঁহার কাজ বেশ ভাল করিয়াই করিতেছে।

অরুণ যে আকাশে উড়িয়া গেল, ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। অরুণ মানুষ ছিল না, সে পাখি ছিল! আর কদ্রুর সেই এক হাজার ছেলেও যে মানুষ ছিল, তাহা নহে; তাহারা ছিল সাপ!

অরুণ বিনতাকে শাপ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর কী হইল শুনো।

ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক একটা শাদা ঘোড়া ছিল। একদিন কথায় কথায় কদ্রু বিনতাকে বলিলেন, 'বলো দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার কিরূপ বর্ণ?'

বিনতা বলিলেন, 'কেন? শাদা!'

কদ্রু বলিলেন, 'হইল না! উহার শরীর শাদা, কিন্তু লেজ কালো!'

বিনতা বলিলেন, 'বাজি রাখো!'

কদ্রু বলিলেন, 'রাখো বাজি। যাহার কথা মিথ্যা হইবে, সে পাঁচশত বৎসর অন্যজনের দাসী হইয়া থাকিবে।'

এমনি করিয়া বাজি রাখা হইল আর স্থির হইল যে, পরদিন দুজনে মিলিয়া ঘোড়াটাকে দেখিতে যাইবেন। অবশ্য, উচ্চৈঃশ্রবা যে শাদা, এ কথা সকলেই জানে। কদ্রুও যে এ কথা না জানিতেন, এমন নহে। তাঁহার মনে দুষ্ট অভিসন্ধি ছিল, এজন্য তিনি জানিয়া শুনিয়াই বলিয়াছিলেন যে, 'উচ্চৈঃশ্রবার লেজ কালো।'

বিনতার সঙ্গে বাজি রাখিয়া, কদ্রু চুপি চুপি তাঁহার ছেলেদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, 'বাছাসকল, আমি তো বিনতার সঙ্গে এই রকম বাজি রাখিয়া আসিয়াছি। কাল গিয়া যদি উচ্চৈঃশ্রবার লেজ কালো দেখিতে না পাই, তবেই কিন্তু আমাকে পাঁচশত বৎসর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। তোমরা এই বেলা গিয়া কাল কাল সুতার মতন হইয়া, উহার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাকো। এমনি করিয়া তাহার লেজটাকে কালো করিয়া দেওয়া চাই, নহিলে আমার বড়ই বিপদ।'

কদ্রুর কথায় দলে দলে সরু সরু কালো সাপ গিয়া উচ্চৈঃশ্রবার লেজ ধরিয়া ঝুলিতে থাকিলে, সেই লেজের রং দূর হইতে কালোই দেখা যাইতে লাগিল। কতকগুলি সাপ কদ্রুর কথামত কাজ করিতে রাজি হয় নাই। তাহাদিগকে তিনি এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'তোরা জনমেজয় রাজার যজ্ঞের আগুনে পুড়িয়া মারা যাইবি।'

পরদিন প্রাতঃকালে কদ্রু আর বিনতা দুজনে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে চলিলেন। বিনতা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয় উচ্চৈঃশ্রবাকে শাদা রঙের দেখিতে পাইবেন। কিন্তু ঘোড়ার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, উহার লেজটি মিশমিশে কালো!

তখন কদ্রু বলিলেন, 'কেমন? বড় যে বলিয়াছিলে ঘোড়াটি শাদা। দেখো তো উহার লেজটি কী রঙের। এখন, আইসো! আমার ঘর ঝাঁট দাও আসিয়া!'

ইহাতে বিনতা নিতান্তই আশ্চর্য ও দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বাজি যখন হারিয়াছেন, তখন তো আর কদ্রুর দাসী না হইয়া উপায় নাই! কাজেই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দাসীর কাজই করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পাঁচশত বৎসর পরে বিনতার অপর ডিমটি ফুটিলে, তাহার ভিতর হইতেও একটি পক্ষী বাহির হইল। এই পক্ষীটির নাম ছিল গরুড়।

কশ্যপ হইতেই অধিকাংশ জীবের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সন্তানেরা যে, কেহ দেবতা, কেহ অসুর, কেহ মানুষ, কেহ জানোয়ার, কেহ সাপ, আর কেহ পাখি হইবে, ইহা তো ধরা কথা! কিন্তু এই গরুড় যে পাখি হইয়াছিল, মহাভারতে তাহার একটা বিশেষ কারণের কথা আছে।

টোপা কুল

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুকূল প্রতিকূল ঘটনায় অনাকুল,—
জনহীন কুলবেড়ে—কুলটিতে জনাকুল
সব ঠাঁই থেকে, ভাই, দেখেছি একান্তে
তাই মোর কোনো কূলই বাকী নাই জানতে।
খানাকুল ইস্কুলে বিশদিন পড়লাম,
গুরুকুলে যাব বলে হিমাচলে চড়লাম।
শেয়াকুল কাঁটা ফুটে 'বেয়াকুল' হয়েছি,
বাঁটকুল নকুলেরে কাঁধে তুলে বয়েছি।
আছে জানা কুরুকুল কেন হল ধ্বংস,—
যদুকুল বিলকুল হল নির্বংশ।
নদীকূলে ফুলে ফুলে অলিকুল গুঞ্জে,
ছনিয়াটা গড়ি তুলে 'মলিকুল'পুঞ্জে।
বকুলের মালা গলে সেজে নীল তুকূলে
যমুনায় কূলে যেত গোপীকুল গোকুলে,
দেখে এনু আজো সেথা 'সাজো' কাচে ধোপাকুল
কোনো কূলে কাজ নাই,—আমি চাই টোপাকুল।
কাঁচা আমে জিভে জল,—আচারে অমূল্য,—
সংসারে ফল নাই টোপাকুল তুল্য।
গাছে চড়ে পেড়ে খাও না থাকে তো সম্বল,
পাকা খাও আখা জ্বেলে রেঁধে গুড়-অম্বল,—
ছেঁচে খাও চিনি নুন লঙ্কায় মাখিয়া,—
রোদে ফেলে কুলশুঁটো ক'রে দাও রাখিয়া।
বদরীর বনে বসে ব্যাস বই লিখিছেন,
যত কিছু বিছে তা কুল খেয়ে শিখেছেন।
কুলাচার প্রচলিত যত আছে বঙ্গে
তুলনায় মানে হার 'কুল-আচার' সঙ্গে।
সব কূল গেছে যার—অকূলে যে ভাসছে—
টোপা কুল মুখে দিলে দেখবে সে হাসছে।

বড় মিস্ বিশ্বাসের ক্লাশ; বিষয়বস্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ; তাতে আবার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ ঘনিয়েছে। প্রাণপণে হাই চেপে ছুটির ঘণ্টার প্রতীক্ষায় আছি। এমন সময়ে ডেস্কের তলা দিয়ে একখানা দলা-পাকানো কাগজ এসে আমার হাতে ঠেকল! এমন চমকে গিয়েছিলাম যে আর একটু হলেই শব্দ করে ফেলতাম আর বকুনি খেতাম। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এ আমাদের 'গণ্ডালু' দলের কোনও "লু"র কাজ। ও বাবা, মিস্ বিশ্বাস যে আমার দিকেই তাকাচ্ছেন! তাড়াতাড়ি ভালমানুষের মতন মুখ করে পড়ায় মন দিলাম। ভয় আর কৌতূহলের মধ্যে দ্বন্দ্বে শেষে কৌতূহলেরই জয় হল, সাবধানে কোঁচকানো কাগজটা কোলের ওপরে মেলে ধরলাম। ওমা—এ যে দেখি পদ্য! মালুর কীর্তি নিশ্চয়!

স্কুলে ভর্তি হবার দিন কয়েক বাদেই মালু তার মাসির বাড়ি গিয়েছিল আর সেখান থেকে কালুকে পদ্যে চিঠি লিখেছিল—

কালু ভাই, পেয়ে তোর পত্তোর
ভাবলাম 'দিতে হবে উত্তর'—
পেন নিয়ে বসে গেছি সত্বর,
        চুল বেঁধে, করে সাজসজ্জা।
হয় যদি কবিতাটা মন্দ,

মিল ভাঙে, কেটে যায় ছন্দ,
তবু তোর হবে তো পছন্দ ?
(না হলেও নেই মোর লজ্জা)!

সেই থেকে মালুর কবি-খ্যাতি সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমাদের ক্লাশে উনিশটি মেয়ে ছিল বলে মালু সকলের নাম দিয়ে লম্বা এক পদ্য লিখেছিল—'উনবিংশতিরত্ন-কথা' :

বিক্রমাদিত্যের সভাগৃহ খানি,
ন-টি রত্নের গুণে ভরেছিল জানি।
সংখ্যাটা আজি যদি বাড়ে, কিবা ক্ষতি ?
রত্ন তো ন-টি নয়, উনবিংশতি।
কলিকালে রাজসভা কোথা পাবে বলো ?
ছোট ক্লাশরুম তারা করে থাকে আলো ?

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে কয়েক ছত্র লিখবার পরে সে নিজের বেলা ফাঁকি দিয়েছিল—

নিজমুখে নিজগুণ বলা নাহি যায়,
সরমেতে কালি মোর কলমে শুকায় !

তারপর থেকে স্থানে-অস্থানে, সময়ে- অসময়ে, কাটা কুলগাছের শোকসভায় ও পরীক্ষার্থিনীদের সংবর্ধনায়, চাইতে না চাইতেই মালুর পদ্য প্রস্তুত !

মিস্ বিশ্বাসের চোখ এড়িয়ে ভাল করে দেখলাম—এ কি ব্যাপার আজ ! এ তো কেবল মালুর লেখা নয়—বাদলা হাওয়ায় আজ দেখি সবার মনেই কবিত্ব জেগেছে। প্রথমেই অবশ্য মালুর লেখা—

হে বোনেরা মোর,
ঝরে আঁখি-লোর,
কিবা গাব আজ কহো !
পচা পচা ক্লাস
করে বারে মাস,
জীবন দুর্বিষহ !
তার চে' অদ্য,
লিখিয়া পদ্য, সারা পিরিয়ড ধরি,
নিখিল-বঙ্গ
কবিতা-সংঘ আমরা স্থাপন করি !

সমস্ত কাগজখানা জুড়ে নানা-হাতের লেখায় নানারকম ছড়া। বড় বড় হরফে লেখা—

আমরা দুজন আছি দলে
কাজল এবং বীণা বলে।

তারপরে লাল পেনসিলে—

মোরা তোমাদের সংঘে
যোগ দেব আজি রঙ্গে।
লেখা যদি হয় মন্দ
করবি নে তো ভাই দ্বন্দ্ব ?

তারপরে প্রায় ডজন খানেক সই—ক্লাসের কোন মেয়েও বাদ পড়ে নি দেখছি!

এক কোনায় ছোট ছোট করে বুলু লিখেছে—

আমি তো নিশ্চয় আছি।
সংঘ শুরু হলে বাঁচি।

অন্য কোনায় কে? নাম নেই—কিন্তু এ কালু না হয়ে যায় না—

আমি তো ভাই, মিল রেখে পদ্য লিখতেই চাই,
কিন্তু, ছন্দ-টন্দ কিছু ঠিক থাকে না যে ছাই!
আমাকে দল থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিবি কি তাই?"

আর একটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম! ও বাবা, মিস বিশ্বাস আমার দিকেই ঘন ঘন তাকাচ্ছেন! নিশ্চয় সন্দেহ করছেন! প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন নাকি? কী হবে, কিছুই যে শুনি নি এতক্ষণ! বাঁচিয়ে দিল কালু। হাত তুলে সে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। মিস্ বিশ্বাস তার দিকে মনোযোগ দিতেই আমি কাগজে লিখে ফেললাম— ক্লাসের মাঝারে কবিতা রচনা

সুবিধা কি আর হবে?
কোন্ দিন শেষে ধরা পড়ে যাব
বকুনি খাব যে তবে!

সন্তর্পণে ডেস্কের তলা দিয়ে আবার লেখাটা হাতে হাতে মালুর কাছে ফেরত পাঠালাম। ঠিক তার পরেই ঢং ঢং করে ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল। এইভাবেই ক্লাসের মধ্যে আমাদের "নিখিল-বঙ্গ কবিতা সংঘের" সূত্রপাত হয়েছিল।

কাজ শুরু করতে গিয়ে কিন্তু দেখা গেল যে মহা মুশকিল! মিটিং করাই দায়!

আমরা চার বন্ধু "গণ্ডালু"—মানে মালু, কালু, বুলু ও আমি টুলু—আমাদেরই সবচেয়ে উৎসাহ বেশী। কালুকে সভাপতি, বুলুকে তার সহকারী আর আমাকে কোষাধ্যক্ষ করে মালু নিজে হল সম্পাদিকা। গালভরা নাম সব! কিন্তু সভা কই, যে তার আবার সভাপতি? বাইরে থেকে যে মেয়েরা আসে, তারা তো ক্লাস শেষ হতে না হতেই বাড়ি চলে যায়। টিফিনের মাত্র আধ ঘণ্টা ছুটি, তার মধ্যে খাব, না কাব্যি করব? অবশেষে কেবল বোর্ডারদের মেম্বার করা হল। কোষাধ্যক্ষের কোষে দু চার টাকা জমাও পড়ল। কিন্তু সভা আর কিছুতেই হয় না!

মালু বিজ্ঞভাবে বলল, 'সাহিত্য-চর্চা তো আর দশ-পনেরো মিনিটে হুড়মুড়িয়ে সারা যায় না—অন্তত ঘণ্টা দুই বসতে হবে সবাইকে—'

বুলু বলল, 'তবেই হয়েছে! সকালে পড়া, বিকেলে খেলা, সন্ধ্যায় আবার পড়া, তারপর খাওয়া আর ঘুম। দুঘণ্টা সময় কখন পাবে শুনি?'

আমি বলতে গেছিলাম, 'রবিবার দুপুরে—' কিন্তু কথাটা শেষ হতে না হতেই কাজল, ললিতা আর বিজলী সমস্বরে আপত্তি তুলল— 'বা—রে, রবিবারে তো বাড়ি যাব আমরা—'

মালু বলল, 'তাহলে শনিবার বিকেলে?'

বীণা, হাসি আর নন্দিতা আপত্তি জানাল—'তা কী করে হবে?' শনিবার যে আমাদের গানের ক্লাস!'

কালু রেগে বলল, 'তবে ক্ষ্যান্ত দে, ক্ষ্যান্ত দে—নাচ শিখবি, গান শিখবি, বাড়ি যাবি, আবার কাব্যিও করবি। অত শত পারা যাবে না!'

কাজল আর বীণা চটে উঠল—'তবে অমন সভা চাই না।'

তাড়াতাড়ি মিটমাট করে দিল মালু—'থাম্ থাম্—ভেবেচিন্তে, সকলের সুবিধামত সময় ঠিক কর্।'

'ভেবে ভেবে তো হদ্দ হলাম'—বিরস বদনে গাল ফুলিয়ে উত্তর দিল বুলু।

আমাদের পশ্চিমের ডর্মিটরিতে সন্ধ্যাবেলা বসে কথা হচ্ছিল। ক'দিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলেছে। মাঠে-ঘাটে-রাস্তায় প্যাচপ্যাচে কাদা, কদিন ধরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ, খেলা বন্ধ, রোজ-রোজ কেবল হল-ঘরে ড্রিল হয়। সবাই একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। সকলের মন খারাপ। 'কী করি, কী করি', 'একটা নতুন কিছু চাই', 'একটা মজার কিছু চাই!'

'ইউরেকা—!' কালু চেঁচিয়ে উঠল—'আমাদের প্রথম অধিবেশন হোক কাল রাত বারোটায়।'

'ও বাবা!', 'রাত বারোটায়!' 'কোথায়?' 'কেন?' 'কি করে?' তাকে সবাই প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তুলল।

'ঝড়বাদলে তো আর বাইরে সভা করা যাবে না—আমার মনে হয় খাবার ঘরে সবচেয়ে ভালো হবে।'

'ধরা পড়ব না তো?'

'খুব সাবধানে পা টিপে টিপে যেতে হবে—যেন কাক পক্ষীটিও টের না পায়। ধরা পড়ব কেন?'

'খাবার ঘরে সভা হবে—এর সঙ্গে একটা ভোজ জুড়ে দে না', প্রস্তাব করল হাসি।

'ঠিক ঠিক', 'চমৎকার', সবাই সমর্থন জানাল। আমি বললাম, 'যা ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছিস—দুনিয়ার লোক তো এখনই সব কথা জেনে গেল। দরজার বাইরে কে?'

'এই চুপ চুপ—আস্তে কথা বল্।' সবাই সামলে নিল। বীণা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল 'ও কেউ না, কেষ্টদাসী মণিকাদিদের ঘর ঝাঁট দিতে এসেছে। আমাদের কথা শুনতে পায় নি।' এর পরে আমাদের ফিসফিস করে পরিকল্পনা হল। কদিন ধরে কোন কিছুতেই আমরা

রসকষ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সাহিত্য-সভার ব্যবস্থা হতেই যেন মন্ত্রবলে সকলের মন মেজাজ ভাল হয়ে গেল। একটা সাংঘাতিক গোপন উত্তেজনা, পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেই চোখ টেপা আর চাপা হাসি। ক্লাসের পড়ায় অবশ্য সকলেই কেবল ভুল করতে লাগলাম আর বকুনি খেলাম। কিন্তু কার সাধ্য যে আমাদের দমিয়ে দেয়।

বুলু দুই ক্লাসের ফাঁকে ফিসফিস করে বলল, 'আমার কিন্তু ভাই বড্ড ভয় করছে! মণিকাদির যেন কেমন রাগ-রাগ ভাব! তবে কি— ?'

নিজের মনের ভয় চেপে রেখে তাকে সাহস দিলাম, 'ভাগ্, ভীতু কোথাকার! পড়া না পারলে তো রাগ করবেনই। দেখিস, এর পরের দিন ভাল করে পড়া শিখে এসে কত খুশী করে দেব—'

কালুর সব কাজই ঠিকঠাক। দুই ক্লাসের মধ্যে মধ্যে আমাদের কাছে ছোট ছোট একেকটা চিরকুট পাঠাতে লাগল—'সম্পাদিকার রিপোর্ট তৈরী আছে তো মালু?'—'বিস্কুট আনবার ভার তোমার, মনে আছে হাসি?'—'পেয়ারা কিন্তু তোকে আনতে হবে বুলু'—'পেয়ারা, বিস্কুট আর চিনেবাদাম কিনবার পয়সা বুলু, হাসি আর কাজলকে দিয়ে দিস টুলু।'

নিদারুণ উত্তেজনায় আমাদের দিনটা যেন আর কাটতে চায় না! দুপুর আর বিকেল হয় না, বিকেল হল তো সন্ধ্যা হবার নাম নেই, সন্ধ্যা যদি বা হল, রাত আর কিছুতেই হতে চায় না!

শেষে রাতও হল, শোবার ঘণ্টাও পড়ল, 'কিছুতেই ঘুমোব না' পণ করে শুয়েও কখন যেন ঘুমিয়েও পড়লাম। মাঝরাতে কালুর সাংকেতিক শিশ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম—'কী হবে—কী যেন হবে—ঠিক কথা—কবিতা সংঘের অধিবেশন হবে—' বুলুটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে— এক ধাক্কায় তাকে জাগিয়ে দিলাম। কোনও মতে জামাটা গায়ে দিলাম। চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনি খুঁজে পেলাম না—যাক গে, মাঝ রাত্রে আর কে আমার চুল দেখতে আসছে!

ততক্ষণে কালু আর মালু পুবদিকের ঘরের মেয়েদেরও ডেকে নিয়ে এসেছে। খালি পায়ে অতি সাবধানে আমরা নিঃশব্দে একতলায় নেমে চললাম।

'কিঁচ'—সিঁড়ির দরজাটা বুঝি একটু শব্দ করেছিল—অমনি কালুর চাপা ধমক—'আস্তে!'

—আমার কানে কানে বুলু বলল 'ও বাবা—ভয় করছে!'

মাঝরাতে সব কিছুই অস্বাভাবিক লাগছে। কাদের যেন নিশ্বাসের ফোঁসফাঁস, নড়াচড়ার খুসখাস আর কথা বলার ফিসফাস! দূর, নিশ্চয় সবই আমাদের কল্পনা। আসলে চারিদিক ঘোর অন্ধকার আর নিস্তব্ধ, নিঝুম। কেবল দূরে একবার শেয়াল ডাকল। মাঝরাতের ট্রেনটা চলে গেল। সকলের সামনে ছিল কালু। সাবধানে খাবার ঘরের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল, পিছন পিছন আমরাও সবাই হুড়মুড়িয়ে ঢুকলাম আর ঢুকেই হকচকিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

সেদিনের হতভম্ব ভাব কি জীবনে কোনও দিন ভুলব! এ কি সত্যি, না স্বপ্ন? ঘটনা, না কল্পনা? সমস্ত ঘরখানা আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল—ঠিক স্কুলের বার্ষিক উৎসবে যেমন সাজানো হয়। মাঝের বড় টেবিলে ধপধপে শাদা সৌখিন ফুলকাটা চাদর পাতা ছিল। বড় বড় পিতলের ফুলদানিতে

পদ্ম আর গোলাপ সাজানো ছিল। আর ভাল ভাল কাঁচের বাসনে আইসিং ও চকোলেট দেওয়া কেক আর নানারকম সন্দেশ ছিল। টেবিলের চারদিকে চেয়ার সাজানো ছিল, তারই একদিকে বসে ছিলেন তাঁরা।

ভাল ক'রে চোখ রগড়ে, আমরা আবার তাকিয়ে দেখলাম—হ্যাঁ তাঁরাই—মণিকাদি, অণিমাদি, মিস বোস, হিরণদি, এমন কি মিস বিশ্বাস পর্যন্ত! তাঁরা মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমাদের স্তম্ভিত অবস্থাটা উপভোগ করছেন। তাঁদের পরনে দামী সিল্কের জামা কাপড়, যেন নেমন্তন্ন বাড়িতে এসেছেন।

আমরা ফ্যালফ্যাল করে পরস্পরের দিকে তাকালাম—চুলে তো কারোই চিরুনি পড়ে নি, জামা কাপড় এলোমেলো, হুক-বোতাম ঠিক মতন লাগানো হয়নি। হাসির ব্লাউসটা উলটো করে পরা আর কাজলের দুটো বেণীর একটা খুলে গেছে! ভয়ে লজ্জায় সকলের মুখ শুকিয়ে আমসির মতন।

নির্বিকার ভাবে মণিকাদি বললেন—'ঠিক সময়েই এসেছ'—

আমরা নিরুত্তর!

অণিমাদি ডাকলেন—"এসো—বস—দাঁড়িয়ে কেন?

আমরা তো আর এক-পাও নড়তে পারছি না!

মণিকাদি কালুকে বললেন—'সভানেত্রী—সভা শুরু করো।'

ও বাবা—ওঁরা দেখি সব খবরই জানেন!

এর পরে আর দেরি করা চলে না—কোনও মতে বসে পড়লাম। বুলু ফিসফিস করে বলল—'আমার হাতে যে পেয়ারার থলি—কী হবে—!'

আমি ততক্ষণে চিনেবাদামের ঠোঙা মাটিতে ফেলে দিয়েছি।

মণিকাদি আবার বললেন—'সভা শুরু করো, মেয়েরা খাও।' আমাদের গলা দিয়ে খাবার যেন আর নামতে চায় না! এমন যে ডানপিটে মেয়ে কালু, সেও অপ্রস্তুতভাবে কাঁপা-গলায় শুরু করল—'ভদ্রমহিলা আর মহোদয়গণ'—

মণিকাদি বললেন—'সেকি, তোমাদের সব কথা তো পদ্যে হতে হবে!' কে জানি চাপা হাসির সঙ্গে বলল—'মহোদয় কে রে?' কালু আবার শুরু করল—'ভদ্র মহিলা আর মহোদয়গণ,

আসিনি করিতে আমি মিঠে আলাপন।
অ-কবি কাজের কথা বলে নেব আগে
কবির কবিতা যাতে বেশী ভাল লাগে।
আজিকার আলোচনা পরীক্ষা বিষয়ে,
কবিরা এবার বলো যাহা মনে লয়।'

মণিকাদিদের হাততালির সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যোগ দিলাম। হঠাৎ বুলুর হাতের পেয়ারার থলি ফেটে গিয়ে সব পেয়ারা টেবিলের তলায় ছড়িয়ে পড়ে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করল। এবার কাজলের কবিতা—

দিদ্দিমণি শোনো, ছাত্রীর আবদার শোনো,
পরীক্ষা পাশ করি যেন, আর মোর সাধ নেই কোন।
আমরা চেঁচাব যত খুশি;
ক্লাসে যদি না যাই, না যাব;
হেসে দেব অকারণ হাসি;
কোনও দিন বই নাহি ছোঁব;
তবু যদি পরীক্ষা হয়,
পাশ করে দিও নিশ্চয়।

আবার চটাপট হাততালির পালা। মেয়েদের উৎসাহ ততক্ষণে বেড়েছে। দুরু দুরু বুকে আমি উঠে শুরু করলাম:

পরীক্ষা যদি কিছু না থাকিত আর,
সবগুলো বার যদি হত রবিবার।
গল্পের বই যদি সব বই হত
হতেন খেলার সাথী শিক্ষিকারা যত।
ইস্কুল-কলেজ কিছু না থাকিত দেশে,
তাহলে কী মজা হত ভাবি বসে বসে।

বীণার লম্বা কবিতার দু লাইন কেবল মনে আছে:

দয়া করে তুমি হে examiner, আমাকে পাশ করিও,
ভুল করে যদি ভুল শিখে ফেলি, নম্বর তবু দিও।

বুলু কবির উপর কেরদানি করেছিল:

রেখো গো আমারে মনে, এ মিনতি করি পদে,
পরীক্ষা করিতে পাস,
গলে যদি লাগে ফাঁস,
ভুলিয়া যেও না মোরে স্ফীত হয়ে গর্বমদে! ইত্যাদি;

সভার কাজ চলতে লাগল। প্রথমে ভয়ে ভয়ে শুরু করলেও টিচারদের উৎসাহের চোটে আমরাও যে কখন সানন্দে কবিতা পড়েছি ও শুনেছি তা টেরও পাই নি। কখন যে কেক-সন্দেশগুলি শেষ করেছি, তাও খেয়াল করি নি। সবার শেষ সম্পাদিকার বিবৃতি—কবিতা-সংঘের পরিচয়।

নিখিল-বঙ্গ-কবিতা-সংঘ নতুন হয়েছে সৃষ্টি,
এর মধ্যেই করেছে সবার আকর্ষণ সে দৃষ্টি।
খুবই ভাল লোক যিনি প্রেসিডেন্ট কাকলি চক্রবর্তী;
মুখটি যেমন সদা হাসি-মাখা, মনটিও স্নেহে ভর্তি।

সহকারী তাঁর বুলবুলি সেন, বলব কি বেশী আর,
রূপে, গুণে, কাজে কোন ত্রুটি নাই, মানুষ চমৎকার।
ট্রেজারার তিনি লোক বড় ভাল, নাম তাঁর টুলু বোস,
রূপেও যেমন, কাজেও তেমন নাই তাঁর কোনও দোষ।
মন্দ নেহাত নন্ সেক্রেটারি মালবি' মজুমদার—
(নিজমুখে নিজ গুণগান করা শোভা পায় নাক' তাঁর।)
মেম্বার যাঁরা আছেন তাঁদের একে একে দিই লিষ্টি,
মোটের উপর সকলেই তাঁরা লোক অতিশয় মিষ্টি।"

প্রত্যেকটি মেয়ের নামে দু লাইন করে কবিতা পড়বার পরে সেক্রেটারির রিপোর্ট শেষ হল।

সভানেত্রীর অনুমতি নিয়ে অণিমাদি উঠে দাঁড়িয়ে টিচারদের পক্ষ থেকে কবিতা-সংঘকে অভিনন্দন জানালেন।

এবার মণিকাদির পালা।

'ও বাবা—বকুনি দেবেন নাকি'—আমরা ভয়ে ভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওই করছি! দু-একজন হাই তুলতে শুরু করেছে। কিন্তু, মণিকাদি শুধু বললেন,—'আজকের সভা এখানেই শেষ হোক—যাও লক্ষ্মী মেয়ের মতন সবাই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো—'।

এর পরের কয়েকটা দিন আমাদের ভয়ে ভয়ে কাটল। কি ভাবে যে আমাদের গোপন সভার কথা ফাঁস হয়েছিল তা আমরা আজও জানতে পারি নি। হয়তো মিস বিশ্বাস ক্লাসেই কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন; হয়তো কেষ্টদাসী আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনে দিদিদের বলে দিয়েছিল; কিংবা হয়তো মণিকাদি-অণিমাদি পাশের বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে আমাদের কথা শুনেছিলেন, প্রথমে আমরা যা চেঁচাচ্ছিলাম!

আমাদের বিস্কুট-পেয়ারা-চিনেবাদামের কী গতি হয়েছিল তাও জানি না। আমরা সেগুলিকে খাবার ঘরের মেঝেতেই ফেলে এসেছিলাম। হয়তো কেষ্টদাসী, পাঁচির মা এদের ছেলেপিলেরা তুলে নিয়ে খেয়ে থাকবে। আমাদের সে-সব কথা ভাববার অবসর ছিল না। কখন টিচারদের ঘরে ডাক পড়বে, কত-না-জানি বকুনি খেতে হবে, শাস্তি পেতে হবে, এই ভয়েতেই আমরা তখন অস্থির!

কিন্তু, কী আশ্চর্য! টিচারদের ঘরে ডাক যখন পড়ল, তখন বকুনি খাবার জন্য নয়, কবিতা-সংঘের অধিবেশনের উপযুক্ত দিন ও সময় স্থির করবার জন্য! মাঝরাতের সভার নাম পর্যন্ত কেউ উচ্চারণ করলেন না!

ঠিক হল যে সোম থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রোজ সকাল-সন্ধ্যা পড়বার সময় পনের মিনিট করে বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর, তার পরিবর্তে শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা পড়ার ঘণ্টা থাকবে না, তখন মেয়েরা সাহিত্য-সভা, গানের আসর, অভিনয় বা ঐ জাতীয় কোনও কিছু করবে।

আবার অণিমাদি আমাদের লেখাগুলির প্রশংসা করলেন। আমরা যেন লেখার অভ্যাস না ছাড়ি, এ-কথা বার-বার বললেন।

মণিকাদি মন্তব্য করলেন—'অবশ্য, সব সময়েই কেবল পরীক্ষার বিষয়ে কবিতা লিখো না—'

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে ফিসফিস করে কালু বলল—'আমাদের দিদিদের মতন এমন ভাল টিচার আর কোনও স্কুলে আছে কি?'

উৎসাহে উজ্জ্বল মুখে মালু বলল, 'তাঁদের মুখ রাখতে হবে। আমাদের সাহিত্য-সভাকে ভালো করে গড়ে তুলতে হবে!'

আজকাল আমাদের সাহিত্য-সংঘ যা জমাট হয়েছে কী বলব! সপ্তাহে সপ্তাহে অধিবেশন হয়, প্রায় সব ক্লাসের কিছু কিছু মেয়ে যোগ দিয়েছে। মাঝে মাঝে বড় একটা অনুষ্ঠান হয়, তখন আমরা হোস্টেলের সব মেয়েদের আর টিচারদের নেমন্তন্ন করি। একটা হাতে লেখা মাসিক-পত্রিকাও আমরা বার করেছি। কয়েকজনের লেখার যে কী আশ্চর্য রকম উন্নতি হয়েছে কী বলব! বিশেষত "গণ্ডালু" দলের। হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা 'সন্দেশে'র 'হাত পাকাবার আসরে' মালুর কবিতা, বুলুর গল্প, কালুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আর আমার হেঁয়ালি দেখতে পাবে।

হট্টমালার দেশে

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার

॥ চোদ্দ ॥

বাতাসের মুখে খড়ের কুটোর মতো ছোটে রাখাল, কেন ছোটে নিজেই জানে না। লাইব্রেরির ভেতরকার কালো মূর্তিগুলোও পেছন পেছন ছুটছে টের পায়। তাদের 'ও মশাই, দাঁড়ান, থামুন,' ইত্যাদি নানান চিৎকারও কানে আসে; নিজের হাত খালি; এ দেশে পুলিশ বা জেলখানা কিছুই নেই ভালো করেই জানে সে; ধরলে শুধু নিন্দা করবে; হয়তো বলবে—ছিঃ, অমন করতে নেই! তবু প্রাণপণে ছোটে রাখাল। বুক ধড়াস ধড়াস করে; ভয়ে নয়, কালো মূর্তিগুলো যে মোটেই ভূত নয় তাও বুঝেছে রাখাল, ভূত কি আর ভূতের বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে 'ও মশাই, ও মশাই' করে ডাক ছাড়ে? তবু সমানে দৌড়তে থাকে রাখাল। ঐ দেখা যায় নদী, ঐ নদীর ঘাট।

নদীর ঘাটে মেলা লোকজন, লণ্ঠন, মশাল, চ্যাঁচামেচি। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, সব জানাজানি হয় নি তো? নৌকো আটকে রাখলে আর দেশে ফেরা হবে না! ভুতোকে ধরে নি তো? নাঃ, ঐ তো দেখা যায় ঘাট থেকে দশ হাত তফাতে ছোট্টো নৌকোয় ভুতো বসে হাত পা নেড়ে চ্যাঁচামেচি করছে। তবে কি—তবে কি ঘাটে এসেও সব পণ্ড হয়ে গেল? না, তাও তো নয়, আরেকটু কাছে এসে অনেকগুলো লণ্ঠনের আলোয় দিকদারকে চিনল রাখাল। আঃ, বাঁচা গেল, দিকদার যখন নিজে এসেছে, তখন আর কোনো ভয় নেই। দিকদারের কাজ রাখাল করে দিয়েছে; এবার রাখালের দেশে যাবার ব্যবস্থা দিকদারও নিশ্চয়ই করে দেবে। লোকে বলে তার মেজাজ যেমনই হোক না কেন, তার কথার কখনও নড়চড় হয় না। তা হলে ফেরারী হয় নি দিকদার।

রাখালকে দেখতে পেয়ে ঘাটের লোকও মহা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল—'ঐ যে, ঐ যে আরেকটি এসেছে, দাও এবার ঠুসে!'

কিছুই বুঝতে পারে না রাখাল, নৌকে থেকে ভুতো ব্যস্ত হয়ে কেবল হাত নেড়ে চলে যেতে ইসারা করে। কী যেন বলেও, কিন্তু নদীর হাওয়া তার কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঘাটের আলো তার মুখে পড়েছে, মনে হচ্ছে কোনও কারণে বড্ড ভয় পেয়েছে, অথচ তার পাশেই দেখা যাচ্ছে গামছায় বাঁধা গয়নার পুঁটলি, ছোটার বেগ সামলাতে না পেরে রাখাল একেবারে দিকদারের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিকদারও অমনি তাকে দু হাতে জাপ্টে ধরে, কাকে যেন হেঁকে বলে, 'দেখছেন কী, লাগান একে আমার চেয়েও বড় ডোজ!"

চোখের কোনা দিয়ে রাখাল দেখতে পায় লাইব্রেরির লুকোনো পোড়োরা গামছায় বাঁধা অন্য পুঁটলিটাকেও এনে হাজির করেছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখতে পায় যে এই বড় একটা ইন্‌জেক্সনের সুই হাতে নিয়ে একজন ষণ্ডামতো ডাক্তারবাবু তারই দিকে এগিয়ে আসছেন! গায়ের জোরে হাত পা

ছুঁড়তে থাকে রাখাল, ডাক্তারবাবু ইতস্তত করেন। দিকদার বলে—'কী দেখছেন ডাক্তারবাবু? ওর সাকরেদের রোগ আমাদের এখানকার জলহাওয়া লেগেই সেরে গেছে। কিন্তু এ হতভাগার ব্যামো আমার চেয়েও কড়া।'

অমনি দিগম্বরটা পাশ থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিকদারের ব্যামোই যখন সেরে গেল, আমাদেরও সারল, তিনগুণো ওষুধ দিলে এ ব্যাটারও সেরে যাবে।'

অমনি সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনে মিলে রাখালকে পেড়ে ফেলল আর ডাক্তারবাবু তার পেছনে প্যাঁট করে সুই দিয়ে দিলেন!

সে যা চ্যাঁচাল রাখাল, গাছ থেকে ঘুমন্ত কাগরা সব কা-কা করে উড়ে পড়ল। পোড়োরা গয়নার পুঁটলি বাগিয়ে ধরে বারবার বলতে লাগল, 'এই নিয়ে যাও, এ সব বোধ হয় তোমার দরকার।" কিন্তু কে কার কথা শোনে! যেই না ডাক্তারবাবু সুইটা টেনে বের করে নিয়েছেন আর দিগম্বররাও রাখালকে ছেড়ে দিয়েছে, অমনি এক লাফে রাখাল ঘাট থেকে একেবারে ভুতোর নৌকোর ওপর পড়েছে।

সে ছোট নৌকো, অত ভার সইবে কেন! সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্ণি খেয়ে একেবারে জলের নীচে তলিয়ে গেছে। এক মুহূর্ত চোখে সর্ষেফুল দেখল রাখাল, তারপর সব অন্ধকার।

ফের যখন চোখ মেলে চাইল, দেখে ঐ তো কিছুদূরেই ভুঁইতরাসির দক্ষিণে গঞ্জের ঘাট দেখা যাচ্ছে, রাখাল বালির চরায় পড়ে আছে। উঠে বসে দেখে ভুতোও তার সামনেই আসন পিঁড়ি হয়ে

বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রাখাল—'ও কী রে, কাঁদছিস্ যে? সুইয়ের ব্যথা হয়েছে বুঝি?'

ভুতো নাক টেনে বললে—'নারে, আমাকে সুই দেয় নি, ব্যামো এমনি সেরেছে। আমি ভাবলাম তুই মরে গেছিস, তাই কাঁদছি।'

রাখাল বললে, 'তোর মতো বোকা তো আর দেখি নি। নে ওঠ্, আগে হারু মোড়লের কাছে, তারপর তোর মা কেমন আছে দেখিগে চল্।'

এই বলে নদীর পাড়ে গিয়ে নিজের কোমর থেকে সিঁদকাঠিটা রাখাল ছুঁড়ে জলে ফেলে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—'তোরটা?'

ভুতো একগাল হেসে বলল—'আমারটা কবে হারিয়ে গেছে।'

তখন ভোর হয়েছে, ভুঁইতরাসির মাঠে অনেক লোকের জটলা। ভুতো রাখালের কানে কানে বললে—'অবিশ্যি হারু মোড়ল আমাদের দেখলেই থানায় চালান দেবে, মার কাছে আর এখন যাওয়া হবে না।'

ঠিক এই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—

'এসে গেছে, এসে গেছে, আর ভাবনা নেই।'

রাখাল ভুতো তো হাঁ, তাদের দেখে এত আনন্দ কিসের তারা ভেবে পায় না।

হারু মোড়ল ছুটে এসে ভুতোকে বলল—'তুই না নিচু জায়গার জল কী করে বাঁধ দিয়ে উঁচু জায়গার খালে নিতে হয় তা জানিস? আয়, আয়, আমাদের শিখিয়ে দিবি চল্।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে ভুতোর মা রেগে বলল, 'অ মা, লোকটার আক্কেল দেখো, পনেরো দিন খেল না দেল না ছেলেটা, অমনি টেনে নিয়ে কাজে চলল!'

ভুতো ছুটে গিয়ে মাকে একটা প্রণাম করে ফেলল। রাখালও তার দেখাদেখি গড় করল। সবাই অবাক। তখন রাখাল হারু মোড়লকে বলল, 'বলেই ফেলো মোড়ল, আমাদের ধরে ফাটকে দিচ্ছ কিনা?'

মোড়ল যেন আকাশ থেকে পড়ল—'কেন? ফাটকে কেন?'

'সেই যে তোমার ঘরে সিঁদ দিয়েছিলাম।'

'তার জন্যে পেট্নাইও তো কম খাও নি। নাও, চলো এখন। অনেক কাজ আছে।'

অমনি রাখাল মোড়লের হাত চেপে ধরে বলল, 'আমাকে একটা বারোমেসে কাজ দিও, মোড়ল, পুরোনো ব্যবসাটা ছেড়েই দিলাম।'

বাস্তবিক পুরোনো ব্যবসাটা ছেড়েই দিল রাখাল। মোড়ল তাকে গাঁয়ের চৌকিদারিতে লাগিয়ে দিল। সবাই বলে নাকি এত ভালো চৌকিদার ভুঁইতরাসিতে কেউ দেখে নি কখনও। ভুতোও খালকাটা জল সরবরাহ করে খুব প্রশংসা পেল। বুড়ি মা'র আজকাল অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। তার

একমাত্র দুঃখ ভুতো বাড়িতে এক কণা সোনা ঢুকতে দেয় না, বউ এলে কী মনে করবে এই নিয়ে বুড়ির মহা ভাবনা।

মাঝে মাঝে তিন-চার দিনের ছুটি নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে দুজনে কোথায় বেরিয়ে পড়ে, ফিরে আসে একটু মনমরা হয়ে। নদীর দুই তীরের দুই দিকে, তিন দিনের পথ তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে, কোথাও সেই ছায়ায় ঘেরা সুগন্ধে ভরা কমলামের বাগানের খোঁজ পায় নি।

খুব যদি মন কেমন করে, ভুতো রাখালকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, 'হ্যাঁরে, সে কি সত্যি আছে রে? আধ ঘণ্টার মধ্যে যেখানে ভেসে ওঠা যায়, তিনদিন ধরে খুঁজেও তাকেও পাওয়া যায় না কেন? স্বপ্ন নয় তো রে?'

রাখাল বলে—'দ্যুৎ, স্বপ্ন বুঝি পনেরো দিন ধরে দুজন লোক মিলে দেখে! জায়গাটা আছে ঠিকই, তবে বোধ হয় আমাদের মনের মধ্যে।'

ভুতো ফিক করে হেসে ফেলে বলে, 'কি যে বলিস!"

॥ সমাপ্ত ॥

কবিতায় হেঁয়ালি

"কে আমি ?"

জয়ন্তকুমার মিত্র

দুরন্ত ভাই আছে যত, দুষ্টু যত রয়
সবার সেরা হলাম গো এই আমি।
আমায় তবু কেউ বকে নি, দেয় নি কেউ সাজা
পিঠের 'পরে কিল আসে নি নামি।
এই তো সেবার শীতের বিকেল, পার্কে বেড়ায় দাদু
চাদরটি তার দিলাম টেনে খুলে।
একটুও রাগ করে নি তো, ধমকায় নি মোটে
ঘাসের থেকে সেটাই নিলে তুলে।
খোকন সেদিন ঠোঙায় ভরে কী খাচ্ছে কী জানি
খেলার ছলে দিলাম আমি ফেলে।
এমনি বোকা ছেলেমানুষ, কিচ্ছু বোঝে নি সে
হাত-পা ছুঁড়ে উঠল কেঁদে ছেলে।
ঘুমিয়ে ছিল কার খোকা ঐ রঙিন দোলনাটাতে,
তখন আমি এলাম চুপিসাড়ে।
আদর করে দিলাম চুমা, ভাঙে নি ঘুম তাতে
দুষ্টুমি কি তোমরা বল তারে ?
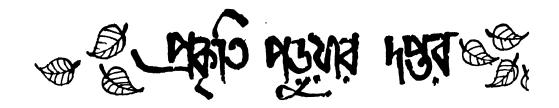
সে, তুমি আর আমি

জীবন সর্দার

সে কে—এই প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি। আমি তার কাছে থাকি। সব সময় তাকে দেখি। তুমিও তার কাছে থাক। সে থাকে তোমাকে, আমাকে—সবাইকে ঘিরে। তাকে ছেড়ে তুমি বা আমি দূরে যেতে পারি না। যত দূরেই যাই না কেন, তারই কাছে যাই।

সে—তোমার ও আমার চেয়েও অনেক অনেক দিন ধরে এখানে আছে। চোখ মেললেই তাকে দেখি। তার আলোয় দেখি, তার বাতাসে শ্বাস নিই। সে উজান-ভাঁটায় বয়ে যায়—আমরা মালা গাঁথি, ডালা ভরি। ফলমূলে সে রস ভরে তোলে, আমরা গড়ে তুলি জীবন। এমনি করে দিনের পর দিন, সে একদম শূন্যকে, শূন্য থেকে কেমন করে পরিপূর্ণ করে তুলেছে সে কথা তোমাদের অজানা নয়। সবুজে, শিশিরে, আলোয় যেদিন ঝলমল করে উঠল চারদিক, প্রজাপতি ডানা মেলে দিল, ডালে বসে পাখি গাইল গান—তারও অনেক, আরো অনেক পরে আমরা এলাম।

আমরা এলাম, দেখলাম, আর জয় করে নিলাম সবদিক। কিন্তু কী করে পারলাম তা একবার ভাবো দেখি।

বাইরটা নয়, আমাদের ভিতরটা একবার যদি খুলে দেখি—হৃদয়, ফুসফুস, পাকস্থলী। প্রকৃতির আর সব প্রাণী—ইঁদুর, বেড়াল, বাঁদর—ওদের ঐ জিনিসের সঙ্গে আমাদের ঐগুলোর সামান্যই গরমিল। যেভাবে আমাদের শ্বাস পড়ে, হজম হয়, আমরা জন্ম নিই আর বড় হই—হুবহু, প্রায় হুবহু তেমনি ব্যাপার ঘটে তাদেরও বেলায়।

সবার কাছ থেকে আলাদা না হয়ে এসো আমরা যাদের যাদের শিরদাঁড়া আছে আর যারা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়, তাদের পাশে দাঁড়াই।

কী দেখলে ?

মনে হয়, কোথায় যেন এমন কিছু রয়েছে যাতে বোঝা যায়, ভেতর বা বাইরে যত মিল থাক গরমিল রয়েছে হাবভাবে, স্বভাবে।

এই যে এতটুকু ভেদ—শুধুমাত্র তারই জোরে আমরা সবার বড়। এই জোরটুকু একদিনে আর

আমরা পাই নি। আমাদের আগে আগে যারা গিয়েছে, তাদের কাছ থেকে আমরা দুভাবে দুটো জিনিস পেয়েছি :

—বংশ বংশ ধরে এই দেহ আর তার বাইর-ভেতরের সবকিছু।

—শব্দ আর চিহ্ন ধরে ধরে তাদের জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি।

আমরা যেদিকে যত বড়ই হই না কেন, প্রকৃতির প্রভাব ছাড়িয়ে বেরুতে পারি নি। এমন যে আমাদের খাসা বাড়ি, বাহারে পোশাক আর রকমারি খাবার, বিচার করে দেখো দেখি—তাপ, আলো, জল, বাতাস আর মাটির নীরব আদেশ না মেনে কি একটি পা কোথাও একবারও ফেলেছি।

তাহলে আবার সেই প্রশ্নটাই ওঠে, প্রকৃতির সবই যদি মেনে চলি তবে কোথায় আমরা সবার বড়। এসো চুলচেরা বিচার করি,—তিনটি সত্য ধরা পড়বে :

এক ॥ আমাদের শরীরের গড়নে,

দুই ॥ আমাদের স্বভাবে,

তিন ॥ আমাদের বুদ্ধির প্রকাশে—আমরা সবার বড়।

দু পায়ে ভর করে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই। তখন থাকে দু হাত খালি। যেমন খুশি দু হাতে যা কিছু ধরতে পারি, ছুঁড়তে পারি। ঠেলতে পারি দূরে আর টেনে নিয়ে আসতে পারি দূরেরটা কাছে। পায়ের পাতা ফেলে ফেলে অনায়াসে হাঁটি বা ছুটি। কিন্তু গাছে চড়লে সেই পা তত কাজে আসে না। আমাদের মাথাটি শিরদাঁড়ার ওপর সোজা বসানো। তাই সামনে যতদূর চোখ যায় তাকাতে কোনো বাধা নেই। করোটির মধ্যে মগজ রয়েছে অনেকটা; তাতে বুদ্ধি গিয়েছে বেড়ে আর শেখার জিনিস শিখতে পারি সহজে। আমাদের সরল মুখে ছোট্ট চিবুক, উঁচু নাক, সাজানো দাঁত—যা কিছু সবই আমাদেরটা আমাদেরই মতো। অন্য কারোর মতো নয়।

আমাদের গড়নে এত কিছু শুধু আমাদেরই মতো হওয়ায় স্বভাবেও আমরা একটু আলাদা হয়ে পড়েছি।

খাবার রসালো করে বানিয়ে খেতে শিখেছি। প্রকৃতির আর কেউ এমনটি পারে না। একা আমি এই বিরাট বিশ্বে বড় অসহায়। সে কথা আমরা বুঝি। তাই দল বেঁধে থাকতে ভালবাসি, থাকিও।

নেকড়ে, পিঁপড়ে বা মৌমাছি ওরাও দল বেঁধে থাকে। কিন্তু ওদের দল বেঁধে থাকার মধ্যে বুদ্ধির সাড়া নেই, শুধু 'বোধের' সাড়া।

মায়ের আঁচল ছেড়ে স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে আসতে আমাদের কতদিন লাগে? পাঁচ ছয় সাত আট বছর। এত সময় অন্য কারো বেলায় লাগে না। কিন্তু মা-বাবার কাছে থেকে এতদিনে আমরা এত কিছু শিখি যা শুধু আমাদের স্বভাবটাই গড়ে না; আগামী দিনের ভাবনা, কল্পনা, স্বর, সুর ও ভাষা সব কিছু গড়ে দেয়। এই শিক্ষাটাই আর সবার কাছ থেকে আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। আমাদের কথা বলতে গিয়ে সবার আগে এই কথাটাই মনে পড়ে—আমাদের ভাষা আছে, আমাদের ভাবনা আছে, আমরা আগুন জ্বালতে পারি, আমরা যন্ত্র গড়তে পারি।

একবার চারপাশে তাকাও দেখি। বিরাট তফাত মনে হবে পশু আর মানুষে। মানুষ তার এ ক-দিনের শিক্ষা নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিরূপ প্রকৃতিতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। তারপর নিজেই রূপান্তর এনেছে সেই বিরূপ প্রকৃতির।

সে কে—তার পরিচয় পেয়েছি। সে তোমার আমার কোনো মানা মানে না। বরং তার নীরব আদেশ আমাদের মেনে চলতে হয়। মাধ্যাকর্ষণে সে আমাদের ধরে রেখেছে, শীত-গ্রীষ্মে, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তারই দেওয়া দান নিয়ে জীবন বাঁচাই।

কিন্তু তার শাসনে থেকেও, তারই জিনিস দিয়ে আমরা তাকেই সাজাতে পারছি। আমরা যে ভাবতে পারি, বিচার করতে পারি। আমরা নতুন রূপ দিতে পারি। পাহাড়কে ভেঙে, নদীর বুক বেঁধে, বন কেটে, আবাদ করে আমরা ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির বীজ বুনতে পারি।

মানুষ যা কিছু গড়ে তুলতে পেরেছে তা কী করে পেরেছে সে খোঁজের বিরাম নেই। কেউ কেউ অতীত মানুষের টুক্‌রো স্মৃতি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরা দেখে বেড়াব চারপাশের পশুপাখির স্বভাব। গাছপালার উপযোগিতা। ওদের সাথে আমাদের নিবিড় যোগ। আমাদের কাছাকাছি এসে কত পশুপাখি, গাছপালা, নদীনালা, আমাদের সভ্যতার বাহন হল অথবা মুছে গেল পৃথিবী থেকে।

এরপর কেউ যদি প্রশ্ন করে মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো জন্যে কি জায়গা নেই? কী অধিকার আছে আমাদের প্রকৃতিকে যেমন খুশি গড়বার ভাঙবার? প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব বলেই কি আমরা সবার উপর জোর খাটাতে পারি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর কেউ দিক বা না দিক, সবাই আমরা জানি, আমরা প্রকৃতিরই অংশ। সে মুছে গেলে আমরাও থাকব না। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই প্রকৃতিকে আরও একটু বুঝে নিতে হবে—খোলা মন আর বুদ্ধি দিয়ে। বুঝিয়ে দেবার ভার তোমার, আমার—সকল প্রকৃতি-পড়ুয়ার।

সম্পাদকের চিঠি

ভাই সন্দেশের বন্ধুরা,

এবার তোমাদের প্রিয় পত্রিকার চতুর্থ বছর শুরু হবে। তোমরা নতুন বছরে আমাদের শুভ কামনা জেনো।

সন্দেশ নিয়মিতভাবে না পেয়ে তোমরা অনেকেই দুঃখিত হয়েছ জানি। নানান কারণে এরকম হয়ে গেছে ; এটা আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। এবার নতুন ঠিকানায় সন্দেশের আপিস হল, কাজকর্মের কিছু অদলবদল হল, এখন প্রতি মাসে তোমরা পত্রিকা পাবে।

আমরা কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ চাই। যে সব লেখা ছাপানো হয় সেগুলির বিষয়ে তোমাদের মতামত চাই ; কী ধরনের লেখা ছাপালে তোমরা খুশী হও তা জানতে চাই। তা ছাড়া 'হাত পাকাবার আসরে'র জন্যে আরো বেশি ও আরো ভালো কবিতা গল্প প্রবন্ধ নাটক চাই।

তার মানে দাঁড়াল যে তোমাদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে অনেক অনেক চিঠি চাই। অবিশ্যি সবগুলির যে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে তা বলছি না,—বুঝতেই পারছ সেটা সম্ভব নয়! কিন্তু প্রত্যেক মাসেই খানকতক বাছাই-করা চিঠির উত্তর ছাপা হবে আর সর্বদাই তোমরা কী ধরণের লেখা চাও সেটা আমাদের মনে থাকবে। কাজেই একটু ভেবেচিন্তে যত্ন করে চিঠি লিখো।

আরেকটি কথাও মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ লেখে যে সন্দেশে ছোটদের জন্যে কিছু থাকে না, সবই তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্যে,—এটা ভারি অন্যায়। আবার কেউ কেউ লেখে সব লেখা কেন ছোটদের জন্যে হবে, বড়রা কি কিছুই পড়বে না ইত্যাদি।

আসল কথা হল আমরা সর্বদাই চেষ্টা করি এমন সব লেখা দিতে যা পড়ে ছয়-সাত থেকে চোদ্দ-পনেরো বছর অবধি সবাই আনন্দ পাবে।

বয়সের সেরকম ভাগ না করে দিলেও, কয়েকটি রচনা হয়তো একটু ছোটদের জন্যে থাকে, কয়েকটা একটু বড়দের জন্যে ; মনে রেখো তোমাদের ছোট ছোট ভাইবোনেরাও তো চায় যে তাদের সন্দেশ পড়ে শোনানো হোক। সবাইকে একটুখানি ভাগ না দিলে কেমন করে চলে বলো?

তোমাদের চিঠির আশায় রইলাম। বৈশাখ সংখ্যায় উত্তর পাবে। ইতি

স. স.
সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯